দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

ফ্রান্স

পূর্ব্ব ইতিহাস

একদা ফরাসী-রাজ চতুর্দ্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্র ? সে ত আমি।" বস্তুত এই কথা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্স সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলিত। রাজ্যশাসন ব্যাপারে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, লোকমত বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব মানা তাঁহার পক্ষে দরকার ছিল না।

চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্বকালের কথা ভাবা যাক্। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগ; ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্যবোধ পরিণতি লাভ করিয়াছে, সমগ্র দেশ একচ্ছত্র শাসনাধীনে থাকিয়া দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে এবং ফ্রান্স ইয়োরোপে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; ধর্ম্মের জন্য মারামারি কাটাকাটি আর দেখা যায় না। স্বায়ত্বশাসনের চিহ্নমাত্র নাই, স্বাধীনতার কথা কেহ মুখেও উচ্চারণ করে না। চতুর্দ্দশ লুই ও পরবর্ত্তী কাল।

কিন্তু ধীরে ধীরে লোকের মত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না বটে, কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যে একটা সংশয়বাদ দেখা দিল। রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার সমালোচক জুটিল,—মণ্টেস্কু আসিয়া বলিলেন: ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থা অনুকরণ করা ছাড়া পথ নাই, অমনি আত্মসমালোচনা বাড়িয়া গেল। পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে নানা প্রকার প্রতিকূল ঘটনায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র লোকের চোখে হীন প্রতিপন্ন হইল এবং উদারমতাবলম্বী হওয়াটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আমেরিকার বিপ্লবে সাহায্য করিল, আর ঐ বিপ্লবের ঢেউ দেখিতে দেখিতে গোটা ইয়োরোপের সাহিত্যে ছড়াইয়া

পড়িল এবং নূতন ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল। রাজার পদমর্য্যাদা পূর্ব্বের মত থাকিলেও তিনটি গুরুতর পরিবর্ত্তন এই সময়ে হইয়াছিল। প্রথমত "নোব্‌ল" অর্থাৎ আমীর ওমরাহদের হাতে আর স্থানীয় শাসন-ক্ষমতা ও কার্য্যভার ছিল না। এই সব ক্ষমতা রাজা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন—সমস্ত দেশের শাসকরূপে রাজকীয় পরিষদ্‌ ভ্যার্সাই হইতে শাসন-কার্য্য চালাইতেছিল। দ্বিতীয়ত জমিদারদের প্রতি চাষীদের এক বিদ্বেষভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল—জমিদারদের শাসন-ক্ষমতা না থাকিলেও ফিউডাল অধিস্বামী হিসাবে চাষীদের উপর অনেক অধিকার ছিল। তৃতীয়ত গ্রামগুলিতে চাষীদের ও জমিদারদের মাঝখানে মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া)দের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। মধ্যবিত্তেরা ওমরাহদের থেকে অনেকখানি পৃথক্‌ হইলেও চাষীদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্যটা তত গভীর ছিল না। কিন্তু উচ্চ মধ্যবিত্তেরা চাষীদের হীনচক্ষে দেখিত বলিয়া চাষীদেরও তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ছিল,—প্রকৃত পক্ষে এই উচ্চ মধ্যবিত্তেরাই দেশের শাসন ব্যবস্থা করিত। এইরূপে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপ্লবের পূর্ব্বাহে।

১। শাসন ও ব্যবস্থা-সম্পর্কিত সকল প্রকার ক্ষমতা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীদের হাতে কেন্দ্রীকৃত হইল; প্রাদেশিক ও জাতীয় সকলপ্রকার বিষয়ের উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিল।

২। ব্যক্তিগত ভাবে প্রজার স্বার্থ বা অধিকারের জন্য কোন দায়িত্ব রহিল না, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অব্যাহত ক্ষমতা মানিয়া লইতে হইল।

৩। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ও শত্রুতা প্রকট হইয়া উঠিল; ওমরাহরা মধ্যবিত্তদের, মধ্যবিত্তেরা চাষীদের হীনচক্ষে দেখিতে থাকিল, আর চাষীরা উর্দ্ধতন সকল শ্রেণীর লোকের উপর কোপবিশিষ্ট হইয়া রহিল।

ফরাসী বিপ্লব।

তারপর দেখা দিল প্রথম ফরাসী বিপ্লব। গোটা দেশটাই যেন ভিতরে ভিতরে ঐ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিপ্লবের মুখে ওমরাহদের ফিউডাল ক্ষমতা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল, যাজকদের আধিপত্য নষ্ট হইল, আর সম্মানসূচক সকল প্রকার পদবী ও উপাধি একেবারে উঠিয়া গেল। দেশ শাসনের জন্য পূর্ব্বে যে সব বিভাগ কায়েম ছিল তাহাদের পরিবর্ত্তে জিলা (দেপার্ত্তমাঁ)র সৃষ্টি হইল।

কিন্তু ফরাসী জাতির ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবই শেষ কথা নয়। শাসন-ব্যবস্থা-সম্পর্কে ফ্রান্সে পুন পুন "কনষ্টিটিউশন্‌" বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তনগুলি সংক্ষেপে এই :—

ফ্রান্সের একাদশ বার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন।

(১) ১৭৯১ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর। সসীম রাজতন্ত্রের পত্তন। রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা শেষ হয়।

(২) ১৭৯৩ সনের ২৪শে জুন। রিপাবলিক্‌ বা স্বরাজ। জ্যাকোবিয়ান্‌রা এই তন্ত্র খাড়া করেন।

(৩) ১৭৯৫ সনের ২২শে আগষ্ট। জ্যাকোবিয়ান্‌দের কার্য্যের প্রতিক্রিয়ারূপে রক্ষণশীল দল এই কাঠামো খাড়া করেন। পাঁচ জনকে লইয়া এক অধ্যক্ষ সভা (ডিরেক্টরি) গঠিত হয়।

তাঁহাদের হাতে শাসন (এক্জিকিউটিব্) ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। আর ব্যবস্থার (লেজিস্লেটিব্) ক্ষমতা থাকে পাঁচ শ জনের পরিষদ্ ও প্রাচীনদের পরিষদের হাতে।

(৪) ১৭৯৯ সনের ১৩ই ডিসেম্বর। ১৭৯২ সন হইতে ১৭৯৯ সন পর্য্যন্ত একটার পর একটা রাষ্ট্রের কাঠামো খাড়া করা হয় বটে, কিন্তু এসব প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয় নাই। এই কাঠামোর দ্বারা সমগ্র দেশকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। পাঁচ জনে গঠিত অধ্যক্ষ সভাটিকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করিয়া দেওয়া হইল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই সভার একজন ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ক্ষমতা নিজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন ও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম "কনসাল" মনোনীত হন। পরে এই পদে তাঁহাকে আজীবন বহাল করিয়া দেওয়া হয়, তাঁহার ক্ষমতাও অনেক বাড়িয়া যায়। বোনাপার্টের দৃঢ়তা ও সুশাসনের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া উঠে। পূর্ব্বে রাজা ও তাঁহার অনুচরদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, সে স্থলে সহজ সরল আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হয় এবং প্রত্যেক প্রজার অধিকার আইনের চোখে সমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

(৫) ১৮০৪ সনের ৫ই মে। কনসালের শাসনের স্থলে সাম্রাজ্য দেখা দিল এবং নেপোলিয়ান সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৮০৪ সন হইতে ১৮১০ সন অবধি কয়েকটি বিধির সাহায্যে এই কাঠামোর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

(৬) ১৮১৪ সনের ৪ঠা জুন। নিয়মতান্ত্রিক বুর্ব্ঁ সনন্দ। বুর্ব্ঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসানো হইল। সনন্দ হইতে বুঝা যায় যে, পার্লামেণ্টীয় শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা উদ্দেশ্য ছিল। মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবে। পার্লামেণ্টের অন্তর্গত দুই সমিতি—একটিতে সমস্ত সদস্য কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত হইবে, অন্যটিতে সদস্যগণ ভোটের বলে নির্ব্বাচিত হইলেও ভোট দিবার ক্ষমতা অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৭) ১৮৩০ সনের ১৪ই আগষ্ট। ১৮৩০ সনের জুলাই মাসে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব দেখা দিল। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্থলে তিয়ের্ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুর্ব্ঁ-অরলিয়াঁ বংশের লুই ফিলিপ্‌কে সিংহাসনে বসানো হইল। ফিলিপ রাজা হইয়া ১৮১৪ সনের সনন্দ অনুমোদন করত জনমতের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তিনি বংশানুক্রমিক ওমরাহগিরি লোপ করিতে স্বীকৃত হন এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থীর ও ভোটদাতার যোগ্যতার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কম সম্পত্তি থাকিলে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা দেন। এই বিপ্লব দেশব্যাপী না হইলেও ইহার ফলে সমগ্র ফরাসী রাষ্ট্রের কাঠামোর পরিবর্ত্তন ঘটে।

(৮) ১৮৪৮ সনের ৪ঠা নবেম্বর। তৃতীয় ফরাসী বিপ্লব দেখা দিল এবং দ্বিতীয় বার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। ইহাও প্যারিসে প্রসূত। সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচন বিধি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগ এবং শাখাবিহীন ব্যবস্থাপক সভা প্রবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বজনীন ভোটে একজন রাষ্ট্র-নেতা (প্রেসিডেণ্ট) চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। কথা থাকে, কোন একজন রাষ্ট্র-নেতা তাঁহার কার্য্যকাল অন্তে পুন নির্ব্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। কিন্তু ১৮৫২ সনের ১৪ই জানুয়ারীতে লুই নেপোলিয়ান যখন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন, তখন তাঁহার কার্য্যকাল দশ বৎসর করিয়া দেওয়া হইল।

(৯) ১৮৫২ সনের ৭ই নবেম্বর। লুই নেপোলিয়ান পুনরায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন ও সম্রাট্ উপাধিতে নিজে ভূষিত হইলেন। ১৮৫২ সনের ২১শে ও ২২শে নবেম্বর তারিখে দেশব্যাপী ভোটে তাঁহার কার্য্য সমর্থিত হয়।

(১০) ১৮৭০ সনের ১লা মে। ১৮৬০ সন হইতে রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেইগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া এক নূতন কাঠামো তৈরী হইল। জনমত ইহার অনুকূল ছিল।

(১১) ১৮৭০ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর। নেপোলিয়ান সেডান যুদ্ধে জার্ম্মাণ হস্তে বন্দী হওয়ার সংবাদ আসিবামাত্র সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল। এই সময়ে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়। স্বদেশ রক্ষার জন্য এক অস্থায়ী ব্যবস্থা কায়েম করা হইল। ১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহাই "ন্যাশনাল এসেম্‌ব্লি" বা জাতীয় সংসদে রূপান্তরিত হয়।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, সন ১৭৯১ হইতে সন ১৮৭০ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে একটার পর একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে, কোন একটা কাঠামো বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া প্রকট হইতে পারে নাই। এই বিভিন্ন কাঠামো সৃষ্টির মধ্যে দেখিতে পাই গণ ও অভিজাতদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝে ফ্রান্সে বিদ্রোহরূপে দেখা দিয়া সমগ্র দেশকে আলোড়িত করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডেও কাঠামোর বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘটিবার অবসর হয় নাই। বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় প্রবেশ করার এখানে দরকার নাই। কিন্তু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ফরাসী জনশক্তি ফ্রান্সে রাজ্যশাসন-ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতা একদিনে লাভ করে নাই, বহু শক্তি-পরীক্ষা ও বহু উত্থান-পতনের পর ফ্রান্স আপনার উপযুক্ত কাঠামোটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ফরাসী দেশে গণতন্ত্রের জয়লাভ।

ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কথা,—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। প্রজার অধিকার, স্বাধীনতা, ইত্যাদি লইয়া পূর্ব্বেও অনেক অনুসন্ধান ও দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রয়োগের চেষ্টাও ইয়োরোপে ও আমেরিকায় পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু এইরূপ ভাবে সমস্ত অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাতারাতি রাষ্ট্র-গঠন করিবার প্রচেষ্টা শুধু ফ্রান্সেই দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় দর্শনকে রাষ্ট্রশাসন ও গঠন-ব্যাপারে প্রয়োগ করিবার অদম্য ইচ্ছার ফলে ফ্রান্সে বারে বারে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শেষকালে প্রজাশক্তির প্রভুত্বটাই মানিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ রাজ্যের ব্যবস্থাপক যাঁহারা হইবেন তাঁহারা দেশের সমুদয় লোকের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন স্থির হয়। যতক্ষণ প্রজাশক্তি তাঁহাদের অনুকূল থাকিবে, তাঁহাদের কাজে সায় দিবে, ততক্ষণ তাঁহাদের পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রজাশক্তি তাঁহাদের বিরোধী হইলে অথবা তাঁহারা ঐ শক্তির বিরোধিতা করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কল্পনা করিতে পারেন না।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

ফ্রান্সে গণতন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা।

১৮১৪ সন হইতে ১৮৭০ সন অবধি তিনবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ান যে কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ অটুট ছিল বটে, কিন্তু নাগরিক জনগণের চিন্তার ভিতরে ১৭৯৩ সনের প্রথম বিপ্লবের বাণী কাজ করিতেছিল।

১৮৩০ সনের পর উগ্র সমাজতন্ত্রবাদের (সোশ্যালিজ্‌ম্) কথা লোকের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭১ সনে জার্মানেরা প্যারিস্ পরিত্যাগ করিবার পর ফরাসীদের এই মনোভাব প্যারিস্ বিদ্রোহরূপে দেখা দিল।

১৮৭১ সনে ফ্রান্সের অবস্থাটা বুঝিয়া দেখা দরকার। আগেকার সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে ফ্রান্সকে পুরাপুরি গণতান্ত্রিকও বলিতে পারি না, রাজতান্ত্রিকও না। জাতীয় সংসদ্ একটি মাত্র শাখা লইয়া বর্ত্তমান ছিল। এটা এক-শাখা-বিশিষ্টই থাকিবে অথবা না থাকিলে কিরূপ ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন প্রকার ব্যবস্থা তখনো খাড়া করা হয় নাই। তথাপি এই কথা বলা চলে যে, ফ্রান্সে পূর্ব্বেকার কাঠামোর অনেক বিধি-ব্যবস্থা কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান ছিল। ভোট দ্বারা নির্ব্বাচনের বিশিষ্ট প্রণালী, নির্দ্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা, আর্থিক নীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতিসঙ্গত আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় সংসদ্ খাড়া করা হয়—উহার উদ্দেশ্য ছিল দেশে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা। অথচ কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত সংসদ্‌কে এ ক্ষমতা কে দিল তবে তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। বস্তুত এ বিষয়ে দেশের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ ছিল; এবং এই সংশয় পরে ডেপুটি বা প্রতিনিধিদেরও কারো কারো মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। তিয়েরকে রাষ্ট্র-নেতার পদে বসানোটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছিল। এই গুরুতর কাজের ভার পাইয়া তিয়ের্ রাজদণ্ড হাতে লইলেন বটে, কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। ফ্রান্সে সাম্রাজ্য স্থাপনের কালে এক শক্তিশালী গণতন্ত্রবাদী দল গড়িয়া উঠে। এই দল কোন ক্রমেই সাম্রাজ্যের সঙ্গে রফা করিতে প্রস্তুত ছিল না, সাম্রাজ্যের বিনাশ-সাধন ইহারা মন্ত্ররূপে গ্রহণ করে। ১৮৭১ সনেও এই দলের শক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের যতই দুর্দ্দশা ঘটুক্ না কেন, তখনো সাম্রাজ্যবাদীদের দলই দেশে প্রবল ছিল। জাতীয় সংসদের ৭৬৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২০০ জন গণতন্ত্রবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন। ইহার পর কতকগুলি উপ-নির্ব্বাচনের ফলে এই সংখ্যা বাড়িয়া ২৫০ হইয়াছিল, তথাপি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিলে তাঁহাদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। অথচ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এ অবস্থায় তিয়ের্ কি করিয়া সাম্রাজ্য-বাদীদের মতের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? গণতন্ত্রবাদী দলের নেতা বিচক্ষণ গ্যাম্বেটা এ সময়ে তাঁহার রাজনৈতিক চালে তিয়েরকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের ভিতর দলাদলিতেও তিনি আপন ইচ্ছা ফলবতী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা দলে পুষ্ট থাকিলেও তিনটি দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল বুর্বঁ বংশকে সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। অন্য দল অরলিয়ঁ বংশধরের পক্ষপাতী ছিলেন। তৃতীয় দল বন্দীকৃত সম্রাট নেপোলিয়ানকে ফিরাইয়া আনিয়া ফ্রান্সের রাজা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই তিন দল যথাক্রমে লেজিটিমিষ্ট, অরলিয়ঁমিষ্ট ও বোনাপার্টিষ্ট নামে কথিত হইতেন। ইঁহারা কোন ক্রমেই নিজ নিজ দাবী ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হওয়ায় একযোগে কোন কাজ করা ইঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। প্রজাতন্ত্রবাদীদের দলপতি গ্যাম্বেটা সুযোগ বুঝিয়া অরলিয়ঁমিষ্ট দল হইতে লোক ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিধা বিভক্ত রাজতন্ত্রবাদিগণ।

যুদ্ধের বিষময় ফলে লোকের মনে রাজ্যের প্রতি বিরুদ্ধভাব আগেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। উপ-নির্ব্বাচনগুলির ফলাফল হইতেও বুঝা গেল যে, দেশের লোক প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্যাম্বেটা শুধু সুসময়ের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সংসদে রাজ্যের কর্তৃত্বভার যাঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল, সেই তিয়ের্ ছিলেন নিয়মানুগত রাজতন্ত্রবাদী (কনষ্টিটিউশনাল মনার্কিষ্ট) দলের লোক। যেখানে অধিকাংশ সভ্য রাজতন্ত্রবাদী, সেখানে তিয়েরের মনোনয়নে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কিন্তু প্রজাতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরী করিবার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন, সংসদের না কি ঐরূপ ক্ষমতা নাই, শুধু সন্ধি করিবার জন্য ও যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ পুনর্গঠন করিবার জন্য সংসদ্ খাড়া করা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রবাদীদের মতের বিপক্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরী হইল না, পরবর্ত্তী সময়ের জন্য স্থগিত রহিল।

লোক-নায়ক গ্যাম্বেটা।

১৮৭১ সনের ১০ই মে জার্ম্মাণির সহিত শান্তি-পত্র স্বাক্ষর করা হইল। তাহার কিছু পরে প্যারিস্ বিপ্লবও দমিত হইল। ১২ই আগষ্ট তারিখে তিয়েরের বন্ধু রিভে সংসদে এক আইন উপস্থিত করিলেন। ৩১শে আগষ্ট ৪৯১ জন সপক্ষে ও ৯৪ জন বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় উহা আইনরূপে গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে তিয়ের্ রাষ্ট্র-নেতা উপাধি গ্রহণ করিলেন, তাঁহার মন্ত্রী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিল, সেই মন্ত্রীরা সংসদের নিকট স্ব স্ব কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবে অর্থাৎ সংসদের মতানুসারে রাজকার্য্য চালাইতে পারিবে এবং তদানীন্তন সংসদের সমকাল পর্য্যন্ত তিয়েরের কর্তৃত্ব থাকিবে, ব্যবস্থা হইল। এইরূপে ফ্রান্সে গণতন্ত্রের পুনরুত্থান হইল।

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পুনরুত্থান।

তিয়ের্ রাষ্ট্র-নেতা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজতন্ত্রবাদীদের ভীত ও চিন্তাকুল করিয়া তুলিলেন। তিয়ের্ নিজে রাজতান্ত্রিক হইয়াও যদি প্রজাতান্ত্রিকদের দলে যোগ দিতে পারেন তবে রাজতান্ত্রিকদের আর কি আশা থাকিতে পারে? ১৩ই নবেম্বর তারিখে তিয়ের্ রাষ্ট্র-নেতারূপে প্রজাতন্ত্রের সমর্থন করিয়া তাঁহার ঘোষণা-পত্র পাঠ করিলেন। এই ঘোষণার পর ত্রিধা বিভক্ত রাজতন্ত্রবাদিগণ আপনাদের বিবাদ ভুলিয়া এক কনষ্টিটিউশনাল কমিটি অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাঠামো নির্দ্ধারণের জন্য ৩০ জনকে লইয়া এক সমিতি খাড়া করিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহার কিরূপ শাসন-ক্ষমতা থাকিবে ও মন্ত্রীদের দায়িত্বের সংজ্ঞা কি তাহা পরীক্ষা করিবার ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল। রাজতন্ত্রবাদীদের ভয়ের অন্য এক কারণ এই ছিল যে, তিয়ের্ সপারিষদ্ রাজকার্য্য চালাইলেও মন্ত্রিগণ নামে মাত্র কাজ করিতেছিলেন, তিয়ের্ই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

রাজতন্ত্রবাদীদের তিনটি শাখার একত্রে কাজ করিবার চেষ্টা।

ত্রিশ জনের সমিতি।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের কাজটা আর স্থগিত রাখা চলিল না। প্রজাতান্ত্রিকেরা বলিতে লাগিলেন বটে যে, কাঠামো গঠনের ভারটা নবগঠিত এক সংসদের হাতে দেওয়া হউক, বর্ত্তমান সংসদের দ্বারা সে কাজ হইতে পারে না, কিন্তু সংসদ্ স্থির করিলেন যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে:

(১) ব্যবস্থা-ক্ষমতা ও শাসন-ক্ষমতা নূতন করিয়া গঠন করিবার জন্য আইন;

(২) সেকেণ্ড চেম্বার অর্থাৎ রাষ্ট্র-সভা সম্বন্ধে আইন;

(৩) ভোট বিষয়ক আইন।

পূর্বোক্ত ৩০ জনের সমিতির উপর এই সব বিষয় স্থির করিবার ভার পড়িল। ১৮৭৩ সনের ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে সংসদে ব্যবস্থাপক ও শাসক শক্তি নির্দেশ ও রাষ্ট্র-সভা তৈরী করিবার জন্ম কয়েকটি বিল উপস্থাপিত করা হইল। এই বিলগুলির মর্মকথা সংক্ষেপে এই যে, ফরাসী গণতন্ত্রের একজন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্র-নেতা থাকিবেন, ইনি চেম্বার অব্ ডেপুটিস্ (প্রতিনিধি-সভা), সেনেট (রাষ্ট্র-সভা) এবং প্রত্যেক দেপার্তমাঁ (বিভাগ বা জিলার) জেনারেল কাউন্সেল (পরামর্শ-সভা) হইতে তিনজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একত্রে যে কংগ্রেস (মহাসভা) বসিবে তাহাতে ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; রাষ্ট্র-সভার কার্য্যকাল ১০ বৎসর স্থায়ী হইবে; কিন্তু প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-পঞ্চমাংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন; প্রতিনিধি-সভার ৫৩৭ জন সভ্য ৫ বৎসরের জন্ম নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই রাজতান্ত্রিকগণের সম্মিলিত শক্তিতে তিয়েরের পতন ঘটে, সেজন্ম এই সব বিল কাজে খাটানো স্থগিত থাকে, এবং ইতিমধ্যে এগুলি আবার পরীক্ষা করিবার জন্ম নূতন সমিতি বসে। এই সমিতির নিকট সভ্যেরা অন্যান্য অনেক বিষয়ও বিচারের জন্ম উপস্থিত করেন।

তিয়েরের পতন।

সমিতির কার্য্য।

তিয়েরের পর বোনাপার্টের পক্ষীয় মার্শাল ম্যাক্‌মেহন রাষ্ট্র-নেতা নির্বাচিত হন। রাজতন্ত্র-বাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার কার্য্যকাল ৭ বৎসর করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুত এই সময়ে রাজতন্ত্রবাদীরাই কতকটা প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগনে এই দুই দলে দেখিতে দেখিতে রাজ্যের ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্ম একটা রেষারেষি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি রাজতন্ত্রবাদীদের জেদে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্বিচারের জন্ম যে সমিতি বসিয়াছিল তাহার অধিকাংশ প্রস্তাব প্রজাতন্ত্রের অনুকূলে হইল।

সমিতি ১৮৭৪ সনের ১৫ই জুলাই সংসদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শাসন-ক্ষমতা সংগঠন সম্বন্ধে এক বিলও আনয়ন করে। এই বিল হইতেই ১৮৭৫ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর আইন প্রস্তুত হয়। বিলের কর্তারা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, কাজেই প্রজাতন্ত্রকে স্থায়ী করিবার দিকে কোন ব্যবস্থা রহিল না, সে সম্বন্ধে আলোচনা ম্যাক্‌মেহনের কার্য্যকাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮০ সন অবধি মুলতবি থাকিল।

প্রজাতন্ত্র স্থাপনের দিকে।

আধুনিক ফরাসী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রবর্তন

১৮৭৫ সন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ঐ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র-সভা সংগঠন বিষয়ক, ২৫শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ক্ষমতা সংগঠন বিষয়ক এবং ১৬ই জুলাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটা সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ২।১টি সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত এই আকার আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই জনগণ ব্যবস্থাপক সভার মধ্য দিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু আইনের চোখে ঐ সনের পূর্ব্বে ফ্রান্স গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই এবং ফ্রান্সের কার্য্যনির্বাহকেরাও গণতান্ত্রিক কর্মচারীরূপ পরিগণিত লাভ করেন নাই।

১৮৭৫ সন ফ্রান্সের ইতিহাসে স্মরণীয় কেন?

দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা বুঝিতে রাজতন্ত্রবাদাদের দেরী হয় নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন আজ হোক্ কাল হোক্ ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সংসদ্‌কে ৪ মাসের জন্ত স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব উঠাইলে গ্যাম্বেটাও বলিয়াছিলেন, "আর কেন? গণতন্ত্রকে ত কেহই রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। তবে রাজনীতিবিৎ পাকা খেলোয়াড়ের মত গণতন্ত্রকে বরণ করিয়া লও না কেন।" গ্যাম্বেটা আপনার কাজ ভুলিয়া যান নাই। এই সময়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র প্রচেষ্টা হইল রাজতন্ত্রবাদী দলের সেই সব লোককে প্রজাতান্ত্রিক দলে লইয়া আসা যাঁহারা উগ্র মন ও নিশ্চিন্ততা যাঁহাদের কাম্য। ফলে উভয় দলের মধ্যে একটা আপোষ সম্ভবপর হইয়া উঠিল। দুই দলই নিজেদের দাবী কিছু কিছু ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে দুই দলের পক্ষেই সুবিধাজনক আইন প্রবর্ত্তন করা সহজ হইল।

ইহার পর দুইটি বিল পাশ করা হয়। প্রথম বিলটি রাষ্ট্র-সভার গঠন বিষয়ক আর দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসমূহের সম্বন্ধ বিষয়ক। গণতন্ত্রকে স্থায়ী করিবার জন্ত বিরুদ্ধ-বাদীদের সঙ্গে আপোষের দরকার ছিল। ফ্রান্সে রাষ্ট্র-সভার সৃষ্টি করিয়া গণতন্ত্রবাদীরা প্রজাতন্ত্রকে নিরাপদ্ ও স্থায়ী করিয়া লইলেন।

১৮৭৪ সনের ১৫ই মে উল্লিখিত সমিতি রাষ্ট্র-সভা গঠনের নিমিত্ত এক বিল উপস্থাপিত করেন। এই বিল ফেরৎ দেওয়া হইলে সংশোধিত হইয়া ৩রা আগষ্ট আবার সংসদে আসে। গ্যাম্বেটার কৌশলে এই বিল কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সংসদ্ পাশ করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইল। প্রথমে রাষ্ট্র-সভার সদস্যের সংখ্যা ছিল ৩০০,—অর্দ্ধেক
রাষ্ট্র-সভা গঠন। রাষ্ট্র-নেতা (প্রেসিডেন্ট) মনোনীত করিতেন ও তাঁহারা চিরজীবন সদস্য থাকিতেন, আর বাকী অর্দ্ধেক বিভিন্ন জেলা (দেপার্ত্তমাঁ) কর্ত্তৃক ৯ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন, ইঁহাদের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিতেন। আঁস্তিতুতের (ফ্রান্সের একটি বিদ্বৎ-সভা) ৫ জন সভ্য মনোনীত হইতেন এবং কোন কোন কার্ডিনাল (একশ্রেণীর পদস্থ রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক), মার্শাল (এক শ্রেণীর সেনানায়ক) বিচারকের সদস্য হইবার অধিকার ছিল। কিন্তু এই খসড়া সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি উঠায় পর বৎসরের ১১ই ফেব্রুয়ারী ৩২২ : ৩১০ ভোটে এক সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্র-নেতা ম্যাক্‌মেহন এই পরিবর্ত্তিত বিলে অমত প্রকাশ করায় বিলটি ৩৬৮ : ৩৪৫ ভোটে নাকচ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে গ্যাম্বেটা ও রাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। ইহার ফলে স্থির হয়, রাষ্ট্র-সভায় ৩০০ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে ২২৫ জন বিভিন্ন দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশ কর্ত্তৃক ভোটে নির্ব্বাচিত হইবেন আর ৭৫ জনকে জাতীয় সংসদ্ নির্ব্বাচন করিয়া দিবে। এই প্রস্তাব ৪২১ : ২৬১ ভোটে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র-সভার গঠন বিষয়ক সমগ্র বিলটি অতঃপর বিনা বাধায় ১৮৭৫ সনের ২৪ তারিখে ৪৩৫ : ২৩৪ ভোটে আইনে পরিণত হইয়া যায়।

এইরূপে রাষ্ট্র-সভা গঠিত হইল। আর ইহার একদিন পরে ২৫ তারিখে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসমূহ নির্ণায়ক বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার আগে এজন্য অনেক কাঠখড়

পোড়াইতে হইয়াছিল। এই বিলটি প্রথমত ২১শে জানুয়ারী তারিখে সংসদে উপস্থাপিত করা হয়। দ্বিতীয় বার সংসদে পাঠের সময় প্রজাতন্ত্রবাদীরা বিলটির এই সংশোধন আনেন যে, "প্রজাতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখা ও রাষ্ট্র-নেতার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।" দুঃখের বিষয় এই সংশোধন ৩৫৯ : ৩৩৬ ভোটে পরাজিত হয়। কিন্তু এই সময়েই বোঝা যায় যে, প্রজাতন্ত্রবাদীরা কতটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তখন আর একটি সংশোধন এইরূপ আনা হয় যে, "রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা একত্র জাতীয় সংসদ্ রূপে বসিয়া অধিকাংশ ভোটের দ্বারা রাষ্ট্র-নেতাকে নির্বাচিত করিবে। তাঁহার কার্য্যকাল ৭ বৎসর এবং তিনি পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন।" এই সংশোধন ৩৫৩ : ৩৫২ ভোটে গৃহীত হয়। অতঃপর অল্প পরিবর্তন করিয়া সমগ্র বিলটি ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২৫ : ২৫৪ ভোটে আইনে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-নির্ণায়ক আইন।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে ১৮৭৫ সনের ১৬ই জুলাই তৃতীয় এক আইন পাশ করা হয়। আগের দুইটি আইনে একটি কাঠামো তৈরী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণয় তখনো বাকী ছিল। এই সম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত সরকারের পক্ষ হইতে ১৮ই মে তারিখে এক বিল উপস্থাপিত করা হয়। বিলটিকে পূর্বোক্ত ৩০ জনের সমিতির কাছে দিবার প্রস্তাব হইলে প্রজাতন্ত্রবাদিগণ ঘোরতর আপত্তি করেন। তখন এক নূতন সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতিতে প্রজাতান্ত্রিকদের প্রাধান্য থাকে। সমিতি যে ২১১টি পরিবর্তন উপস্থিত করে তৎসহ বিলটি অতঃপর সংসদে ৫২০ : ৮৪ ভোটে পাশ হইয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণায়ক বিল।

এইরূপে পর পর তিনটি আইন প্রণয়ন দ্বারা ফ্রান্স আপনার নব রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করিল। ১৮৭৯ ও ১৮৮৪ সনেও কাঠামোর পরিবর্তনসূচক দুইটি আইন গৃহীত হয়। কিন্তু এই তিনটি আইনই বর্তমান কাঠামোর মেরুদণ্ড-স্বরূপ।

১৮৭৯ সালের ১৮ই জুন প্রথম সংশোধক রাষ্ট্রীয় আইন পাশ করা হয়। পূর্বে একটি নিয়ম এই ছিল যে, শাসক (এক্‌জিকিউটিব্) ও ব্যবস্থাপক (লেজিস্‌লেটিব্) পরিষদ্‌দ্বয়ের বৈঠক ভার্সাইতে হইবে। প্রজাতন্ত্রবাদিগণ প্যারিসে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে রক্ষণশীলগণ এই যুক্তি দেখান যে প্যারিস বিপ্লবের কেন্দ্র-ভূমি, সেখানে এত বেশী দলাদলি যে, প্যারিস্ হইতে শাসন-কার্য্য চালাইলে সে শাসন-ব্যবস্থা বার বার বাধা পাইবার সম্ভাবনা আছে। প্রতিনিধি-সভা রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাশ করিয়া রাষ্ট্র-সভার কাছে পাঠাইয়া দেয়। রাষ্ট্র-সভার সকলেই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দেন। তখন রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা একত্রে জাতীয় সংসদ্ রূপে বিষয়টি বিচার করিতে বসে। ১৮৭৯ সনের ১৯শে জুলাই এই সংসদ্ ৫২৬ : ২৪৯ ভোটে স্থির করে যে, প্যারিস্ হইতে ফ্রান্সের শাসনকার্য্য চালানো হউক।

প্রথম সংশোধক আইন : ভার্সাইয়ের পরিবর্তে প্যারিসকে সভাস্থল হিসাবে গ্রহণ।

১৮৮৪ সনের ৪ঠা আগষ্ট হইতে ১৬ই আগষ্ট অবধি দুই সভা আবার জাতীয় সংসদ্ রূপে বসিয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কিছু পরিবর্তন করে। কি প্রণালীতে কাঠামোর পরিবর্তন করা হইবে তাহা এই সময়ে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। রাষ্ট্র-সভাসদেরা কতকগুলি বিষয়ের

পরিবর্ত্তনে সম্মত হইলেও অন্য কতকগুলিতে আপত্তি করিতে থাকেন। রাষ্ট্র-সভাসদেরা এই প্রকার যুক্তি দেখাইলেন যে, জাতীয় সংসদ্ হইতেছে রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি। সুতরাং উভয় সভা সম্মত না হইলে কোন বিষয় সংসদের আলোচনাধীনে আসিতে পারে না। রাষ্ট্র-সভার এই প্রকার বিরোধিতা করিবার কারণ এই ছিল যে, প্রতিনিধি-সভা আয়-ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতা সংকোচ করিতে সচেষ্ট ছিলেন ও যাঁহারা যাবজ্জীবনের জন্য রাষ্ট্র-সভার সভ্য তাঁহাদের সংখ্যা কমাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শেষকালে প্রতিনিধি-সভাকে মানিয়া লইতে হইল যে, জাতীয় সংসদে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচিত হইবে অথবা হইবে না তাহা স্থির করিয়া দিবার অধিকার উভয় সভার আছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ইতিহাসের দিক্ হইতে এই দফার বিশেষ একটা মূল্য আছে। জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব (সব্‌রেণটি) ন্যস্ত থাকিলেও সেই সম্পূর্ণ সর্ব্বকর্তৃত্ব কার্য্যকালে দুই সভার মত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইল।

দ্বিতীয় সংশোধক আইন: সংসদ বনাম রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা।

অর্গ্যানিক অর্থাৎ আঙ্গিক আইন বলিয়া কতকগুলি আইনও এই সময়ের মধ্যে পাশ করা হয়। এগুলির স্থান সাধারণ আইনের উপরে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো-বিষয়ক আইনের নীচে। এগুলিকে সাধারণ আইনের মতই পরিবর্ত্তন করা চলে। বিশেষ কোন প্রণালীর দরকার হয় না।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু তখনো মেঘ কাটিয়া যায় নাই। প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থাকে দুই দুইবার বিষম আঘাত খাইতে হইয়াছে। ১৮৮২ সনে গ্যাম্বেটার মৃত্যুর পর প্রজাতন্ত্রবাদীদের দল ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়। ১৮৮৫ সনের নির্ব্বাচন কালে এই বিভেদ ও অন্যান্য কারণে প্রজাতন্ত্রবাদীদের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। নানা কারণে বিভিন্ন মতবিশিষ্ট লোকেরা একত্র হইয়া রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্রের দিকে চালনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল এবং বুলাঙ্গার নামক এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র-নেতা করিয়া প্যারিস ও ফ্রান্স দখল করিবার উপক্রম করে। কিন্তু অবশেষে ইঁহার শক্তিশালী মন্ত্রীর কঠোর ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সভা সর্ব্বোচ্চ আদালতরূপে ইঁহার বিচার করিতে বাধ্য হয়। তখন ইনি বেলজিয়ামে পলাইয়া গিয়া আত্মহত্যা করেন। এইরূপে রাজতন্ত্র স্থাপনের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

ফরাসী গণতন্ত্রের শত্রু: (১) রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ।

ইহার কিছুকাল পরে (১৮৯৯-১৯০২) ফ্রান্সে ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। ফ্রান্সের বড় বড় মহাজন ও কারবারী অনেকেই ইহুদী। ইঁহারা অনেকে খুব অর্থশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেইজন্য ইহুদীর বিরুদ্ধে অনেক লোকের মনে একটা আক্রোশ ছিল। এই আক্রোশ পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হয়। তখন ধর্ম্ম লইয়া হাতাহাতি বাধিবার উপক্রম হইয়া উঠে। ১৮৭৪ সনে ক্যাপ্টেন ড্রেফু নামে একজন ইহুদী কর্ম্মচারীর চরবৃত্তির অপরাধে কোর্ট মার্শালে (সামরিক আদালতে) যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হয়। এই ঘটনায় সমগ্র ফ্রান্স উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-সমাজ ও সৈন্যগণ ইঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন ও প্রজাতন্ত্রবাদীরা ইঁহার হইয়া লড়িতে থাকেন। ১৮৯৯ সনে এই ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতার হুকুমে মুক্তি পান। তাহাতে ফ্রান্সের উপর আসন্ন ঝড়টা কাটিয়া যায়। ১৮৮২ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও এই ঘটনার পর বিদ্যায়তন হইতে যাজকদের প্রভাব দূর করায় ফ্রান্সের পক্ষে ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সহজ হয়।

(২) ধর্ম্মমতকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্করণ।

এই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইবার পর দেখা গেল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের শত্রু কেবল যে রাজা ছিলেন তাহা নয়, বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর রেষারেষির সম্ভাবনা সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র স্থাপনের আশা যখন সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন রাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যেও দলাদলি দেখা দিল। এই দলাদলি কখনো ধর্মের নামে, কখনো বা অন্য কারণে ঘটিল। আধুনিক যুগে শিল্প-নিষ্ঠা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে কল-কারখানা বাড়িল, এবং মজুর ও রাজনৈতিক দল উদ্ভূত হইল। প্রথম বিপ্লব কালে সমূহতন্ত্রবাদের (কমিউনিজ্‌ম) কথা বড় শোনা যায় নাই, সেকালের নেতারা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) ছিলেন। ১৮৩০ সন হইতে যে সমাজতন্ত্রবাদ ফ্রান্সে দেখা দেয়, তাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৪৮ সনে এই মতবাদ বেশ বিস্তার লাভ করে। ১৮৭১ সনে প্যারিস বিদ্রোহেও এই মতের জয়-জয়কার দেখা গিয়াছিল। তখন হইতে সমাজতন্ত্রবাদ ফ্রান্সে ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়া আসিয়াছে।

১৮৭১ সন হইতে বর্ত্তমান কাল অবধি ফ্রান্সের অবস্থাটার এখন একটু পরিচয় লওয়া যাক্। প্রথমত আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ স্থলে জমির মালিক চাষীরা। তাহারা নিজেদের হাতে জমি রাখিয়া চাষবাস করিয়া থাকে। অধিকাংশ মধ্যবিত্তের ন্যায় ইহারা মতে রক্ষণশীল রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ফ্যাক্টরি-বহুল স্থানসমূহে ক্রম-বর্দ্ধমান শিল্প-কারখানার শ্রমিকগণ ওতপ্রোতভাবে সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ফ্রান্সের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে ইহাদের ক্ষমতা অন্য কোন দলের চেয়ে কম নয়।

১৮৭১ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্ত্তন।

পশ্চিম জনপদসমূহ ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র প্রাচীন অভিজাত ভূস্বামি-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর সমাজের দরিদ্র ও নিম্নস্তরের জনগণ জমিদারদের প্রতি এক বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব পোষণ করিয়া থাকে। মধ্যবিত্তদের উপর গরীবদের বিদ্বেষভাবও কমে নাই, উপরন্তু সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের ফলে এই বিদ্বেষ বাড়িয়াছে।

শাসন-ব্যাপারে শাসন-ক্ষমতা অতিশয় কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির শাসন-ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর।

রাজনৈতিক কারণে ফ্রান্সে বহুবার বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতে এইরূপ বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কারণ, যে যুগে বিপ্লব ভিন্ন কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভবপর ছিল না ফ্রান্সের সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তনও জাতীয় সংসদের সাহায্যে অনায়াসে হইতে পারে। এ স্থানে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের স্থলে দেখা দিয়াছে আর্থিক দ্বন্দ্ব—মজুরে ও ধনিকে লড়াই-আর তাহার ফলে ধর্ম্মঘট, মজুরদের বহিষ্কার (লক্ আউট্) ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। এই সব আর্থিক সমস্যা ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ফ্রান্সের রাষ্ট্র-নেতা

রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা। রাষ্ট্র-সভা এবং প্রতিনিধি-সভা একত্র জাতীয় সংসদ্ রূপে বসিয়া অধিকাংশ ভোটের দ্বারা রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। ইনি ৭ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং পুনঃ নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইতে পারেন। শাসন (এক্‌জিকিউটিভ্) বিভাগের কর্ত্তারূপে রাষ্ট্র-নেতার কতকগুলি ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য আছে। সেগুলি এই :

(১) দুই সভার সদস্যদের মত কোন আইন উপস্থাপিত করা।

(২) দুই সভার ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত আইন ঘোষণা করা। সেগুলি যাহাতে যথাযুক্তভাবে প্রযুক্ত হয় তাহা দেখা।

(৩) অপরাধ ক্ষমা করা।

(৪) অসামরিক ও সামরিক বিভাগের সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা।

(৫) সশস্ত্র সৈন্যগণকে যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য বিদায় দেওয়া।

(৬) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে নেতৃত্ব করা।

(৭) বিদেশী রাষ্ট্রের দূতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(৮) আইনত কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই রাষ্ট্র-সভার সম্মতি লইয়া প্রতিনিধি-সভা ভাঙিয়া দেওয়া।

(৯) উভয় সভাকে একত্র জাতীয় সংসদ্ রূপে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করা ও ঐ অনন্যসাধারণ বৈঠকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করা।

(১০) কোন বৈঠক শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করা।

(১১) সভাদ্বয়ের অনন্যসাধারণ বৈঠক আহ্বান করা। প্রত্যেক সভার অধিকাংশ সদস্য যদি ভোট দ্বারা এই প্রকার বৈঠক চায় তবেই তিনি তাহা আহ্বান করিতে পারেন।

(১২) উভয় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা। কিন্তু এক মাসের বেশী স্থগিত রাখা চলে না এবং কোন এক বৈঠক দুইবারের বেশী স্থগিত থাকে না।

(১৩) উভয় সভায় আপনার ঘোষণা পাঠাইয়া দেওয়া। এই ঘোষণা তিনি নিজে পাঠ করিতে পারেন না, তাঁহার হইয়া কোন মন্ত্রী পাঠ করেন।

(১৪) আইন পাশ হইয়া সরকারের কাছে আসিলে সাধারণ আইনের বেলায় এক মাসের মধ্যে ও জরুরী আইনের বেলায় তিন দিনের মধ্যে তাহা ঘোষণা করা। ঐ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র-নেতা ইচ্ছা করিলে এই আইন উক্ত সভার পুনর্ব্বিচারের জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে এইরূপ ফেরৎ পাঠাইবার কারণ দেখাইতে হয়।

(১৫) সন্ধির কথাবার্ত্তা চালানো ও সন্ধি অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) করা। এই সব সন্ধির কথা প্রকাশ করিলে যখন রাষ্ট্রের আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না তখন উভয় সভার তাহাদের মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু শান্তি ও বাণিজ্যিক সমঝৌতা, রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পর্কিত সন্ধি, ফরাসী নাগরিকদের সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ক সন্ধি, দুই সভার অধিকাংশ ভোট ব্যতীত হইতে পারে না।

(১৬) দুই সভার সম্মতি লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করা।

(১৭) রাষ্ট্র-সভার সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘোষণা জারি করা।

রাষ্ট্র-নেতার এই সব ক্ষমতা ও অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-সূচক দলিলে একজন মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকা চাই।

রাষ্ট্র-নেতা উভয় সভার কাহারও নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নহেন, কোন সভা আইনতঃ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অবশ্য, সভাদ্বয় বিরোধী হইলে তাঁহার পদ রাখা দুষ্কর হয়। প্রতিনিধি-সভা তাঁহাকে রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলে রাষ্ট্র-সভা তাঁহার বিচার করে। এই বিচারের ফলে তাঁহার যদি দোষ প্রমাণিত হয় বা তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তাঁহার রাষ্ট্র-নেতার পদ আর বজায় থাকে না। শাসন-কার্য্যের জন্য তাঁহার দায়িত্ব নাই, তাঁহার মন্ত্রীরা সেজন্য দায়ী থাকেন। মন্ত্রীরা নিজ নিজ কাজের জন্য স্ব স্ব সভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্র-নেতার কাছে দায়ী থাকেন না।

বৎসরে ১৮ লক্ষ ফ্রাঁ ভাতা। ব্যয়াদির জন্য আরো ১৮ লক্ষ ফ্রাঁ।

ফরাসী রাষ্ট্র-নেতাকে কোন ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার সহিত তুলনা করা চলে না। যুক্তরাষ্ট্রে জনগণ তাঁহাদের রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচিত করে। সেইজন্য তিনি সরাসরিভাবে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার কর্তৃত্বাধীন হন না, পরন্তু উহার কাজে বাধা দিতে পারেন। তাঁহার মন্ত্রীরা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন। তাঁহাদিগকে নিজ নিজ কাজের জন্য তাঁহার কাছে জবাবদিহি করিতে হয়, কংগ্রেসের নিকট নহে। সুইস্ যৌথরাষ্ট্র (কনফিডারেশন) এর রাষ্ট্র-নেতার সহিতও ফরাসী রাষ্ট্র-নেতার তুলনা চলে না। কারণ সুইট্সারল্যাণ্ডে ৭ জন মন্ত্রী লইয়া যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় সুইস্ রাষ্ট্র-নেতা তাহার সভাপতি মাত্র, তাঁহার ক্ষমতা অন্য মন্ত্রীদের চেয়ে একটুও বেশী নয়। ফরাসী রাষ্ট্র-নেতার তুল্য শাসনকর্ত্তা খুঁজিতে হইলে ইংল্যাণ্ড, ইতালি, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সত্য বটে এই সকল স্থলে এক একজন রাজা আছেন, কিন্তু এই সকল রাজা রাজত্ব করেন, শাসন করেন না। অর্থাৎ তাঁহার নামে রাজকার্য্য চলিয়া থাকে, কিন্তু এই কার্য্য মন্ত্রীরা চালান এবং তজ্জন্য তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকারে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী থাকেন, ভুলচুক্ হইলে তাঁহাদিগকেই সেজন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় ও শাস্তি ভোগ করিতে হয়, রাজাকে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা গণতন্ত্রের কর্ত্তা হইয়াও এই সব রাজাদের মত রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। তাঁহার মর্য্যাদা যথেষ্ট, কিন্তু দায়িত্ব ও ক্ষমতা খুব কম। যে সব ক্ষমতা আইনের বলে তাঁহার আছে সে সবও কচিৎ প্রয়োগ করিতে হয়। সভাদ্বয়ের আরম্ভে বা শেষকালে যে ঘোষণা পাঠাইবার কথা, তাহাও তিনি প্রায়ই পাঠান না। কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দরকার এ পর্য্যন্ত তাঁহার একবার মাত্র হইয়াছে। মাসখানেকের জন্য সভা বন্ধ করার প্রয়োজন কখনো হয় নাই। আর কোন বিল পুনর্ব্বিচার করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন রাষ্ট্র-নেতা সভাদ্বয়কে ডাকেন নাই।

রাষ্ট্র-নেতা শাসন করেন না।

তবে কি বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-নেতার কোন কাজ নাই? নাই বলিলে ঠিক হইবে না। মন্ত্রীদের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহাকে দুইটি গুরুতর কর্ত্তব্য প্রায় সর্ব্বদা সম্পাদন করিতে হয়।

প্রথমত মন্ত্রি-সমিতি (ক্যাবিনেট) গঠন করিতে পারেন এমন এক ব্যক্তিকে সভাদ্বয় হইতে তাঁহার মনোনয়ন করা চাই। যখন কোন মন্ত্রি-সমিতি আইন-সভায় পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করে তখন রাষ্ট্র-নেতার কর্ত্তব্য হইতেছে সমিতি গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র-সভা বা প্রতিনিধি-সভা হইতে উপযুক্ত দলপতিকে আহ্বান করা। কাজটা নেহাৎ সহজ নয়। কারণ ফরাসীরা এত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত যে, স্থায়ী সমিতি গঠন করা অনেক সময় বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। একটা প্রথা এই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-সভার সভাপতি ও প্রতিনিধি-সভার সভাপতিকে ডাকিয়া পরামর্শ করেন কাহাকে দেশের শাসনভার দেওয়া যাইতে পারে। এই দুই ব্যক্তিকে ডাকিবার হেতু এই যে, ইঁহারা সভাপতিরূপে নিজ নিজ সভার বিভিন্ন দলের প্রভাবের খবর রাখেন ও তাহাতে কে প্রধান মন্ত্রী হইলে উভয় সভায় সব চেয়ে বেশী সমর্থন পাইবেন তাহা বলিতে পারেন। রাষ্ট্র-নেতা ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কোন দলের দলপতিকে মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে অনুরোধ করেন। বিভিন্ন দলের নেতারা এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদ্‌গণও তাঁহাকে এ বিষয়ে আসিয়া পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু এই সব পরামর্শ শুনিয়া তিনি যাহা ভাল মনে করেন তাহা করেন।

…ত্রি-সমিতি গঠনে …ষ্ট্র-নেতার হাত

প্রধান মন্ত্রিত্ব কাহাকে দিবেন সে বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও, অন্যান্য মন্ত্রী কে হইবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে কিনা বলা যায় না। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিতে পারেন, অমুক্ অমুক্ ব্যক্তিকে অমুক্ অমুক্ বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করি; ইহাদিগকে এই সব পদ দিও। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার এই পরামর্শ মত কাজ করিতে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। বস্তুত প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছামত তাঁহার সহকর্ম্মীদের মনোনয়ন করিলে তিনি বাধা দিতে পারেন না এবং ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা এরূপ বাধা দেনও নাই,—মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য তাঁহাকে কখনো দায়ী করা হয় না।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মনোনয়নের ব্যবস্থাটা ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ। ইংল্যাণ্ডে কোন মন্ত্রি-সমিতির পতন ঘটিলে রাজা বিরোধী দলের নেতাকে ডাকিয়া মন্ত্রিত্ব গঠনের ভার দেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এই এক সুবিধা রহিয়াছে যে, সেখানে তিনটি প্রধান দল থাকায় কাহার উপর মন্ত্রিত্বের ভার দেওয়া হইবে তাহা সহজে মীমাংসা করা তত কঠিন নয়। কিন্তু ফ্রান্সে দলের সংখ্যা অনেক হওয়াতে রাষ্ট্র-নেতাকে অনেক চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণের পর মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়।

দ্বিতীয়ত সরকারী কার্য্য পরিচালনায় রাষ্ট্র-নেতা সর্ব্বদা মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দেন। সরকারী সকল বিভাগের, বিশেষত পররাষ্ট্র বিভাগের, প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর জানিবার অধিকার তাঁহার আছে। সেজন্য প্রত্যেক বিষয়ে মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দিবার তাঁহার সামর্থ্যও আছে, সুবিধাও আছে। এ বিষয়ে তাঁহার স্থান ইংল্যাণ্ডের রাজা ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার মাঝামাঝি বলা যায়। ইংল্যাণ্ডে রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না; অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা রাজত্বও করেন, শাসনও করেন, কিন্তু সে মাত্র ৪ বৎসরের জন্য। ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা ৭ বৎসর বা ততোধিক সময়কাল রাজ্যের শীর্ষস্থানে থাকিয়া বহুপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন। শুধু তাহাই নয়। মন্ত্রি-সমিতির অধিবেশন দুই প্রকারের; প্রথমটি সাধারণত সপ্তাহে একবার বসে, প্রধান মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং সাময়িক নীতি

…ন কার্য্যে …-নেতার হাত।

সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়। দ্বিতীয়টি সাধারণত সপ্তাহে ২।৩ বার বসে এবং ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা সভাপতি হন। এই অধিবেশনে অনেক গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্নের এবং প্রথম অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা কাজে খাটাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমেরিকার মন্ত্রি-সমিতির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তফাৎটা এই যে, আমেরিকার রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা খুব বেশী, তাঁহার মন্ত্রিগণ পরামর্শদাতা মাত্র, কিন্তু এখানে অধিকাংশ মন্ত্রীর মতের দ্বারা কার্য্য-ব্যবস্থা নির্ণীত হয়।

এই অধিবেশনে রাষ্ট্র-নেতা কি কাজ করেন, তাঁহার প্রভাব কতখানি তাহা সঠিকভাবে জানা দুষ্কর। কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার বা তাঁহার মন্ত্রীদের বাহিরে কোন কথা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। মোটামুটি এই বলা চলে যে, রাষ্ট্র-নেতার প্রভাব তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়চিত্ততা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সকল রাষ্ট্র-নেতা যে সভ্যদের নিকট তুল্যরূপ খাতির পাইবেন বা তুল্যরূপ তাঁহার কথা তাঁহারা শুনিবেন, তাহা আশা করা যায় না। এ সম্পর্কে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। ফ্রান্সে রাষ্ট্র-নেতা সর্ব্বদাই কোন না কোন দলের লোক হইয়া থাকেন। ফ্রান্সে অনেক রাজনৈতিক দল থাকাতে তাঁহার পক্ষে মন্ত্রীদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়াটা সহজও নয়, সমীচীনও নয়। মন্ত্রীরা এইরূপ হস্তক্ষেপে বিরক্ত ত হইতে পারেনই, উপরন্তু তাঁহারা যে সভার সদস্য সে সভাও তাহাতে রাজী না থাকিতে পারে। এ বিষয়ে বংশানুক্রমিক রাজাদের চেয়ে ফরাসী রাষ্ট্র-নেতার অসুবিধা বেশী। সেইজন্য সাধারণত ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা ইচ্ছা করিয়াই ঘরোয়া ব্যাপারে মন্ত্রীদের সহিত মিলিয়া কাজ করেন এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কে কখনো কখনো কার্য্যকরী পরামর্শ দিলেও তিনি সাধারণত সে বিষয়ে নিজের মত বজায় রাখিবার জন্য জেদ করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের মত ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন না। তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবার ভার রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। সেজন্য ফ্রান্সে যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন একটা মস্ত বড় রাজনৈতিক ঘটনা নয়। এই নির্ব্বাচন বেশ শান্ত-ভাবে ও তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়, দেশে কোন আলোড়ন বা চাঞ্চল্য দেখা যায় না। কখনো কখনো বাম-পন্থী অর্থাৎ রাজনৈতিক মতবিষয়ে অগ্রসর দলসমূহ একত্র হইয়া কে রাষ্ট্র-নেতা হইবেন তাহা ঠিক করে। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি ফ্রান্সের রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। মার্শ্যাল ম্যাকমেহনের পর যাঁহারা এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উভয় সভার কোন না কোন দলের নেতা ছিলেন এবং অনেকে রাষ্ট্র-নেতা হইবার পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়ান তখন তাঁহারা দেশের নিকট সুপরিচিত থাকায়, তাঁহাদের সম্পর্কে ভোট ভিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন।

ফ্রান্সে নানা উপলক্ষ্যে বহুপ্রকার সরকারী সভা-সমিতি ও উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এগুলির প্রত্যেকটিতে রাষ্ট্র-নেতাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। এইরূপে ব্যক্তিগত চরিত্র দ্বারা তিনি ফ্রান্সের জন্য নীরবে অনেক কাজ করিয়া যান। তাঁহার এই সব উপস্থিতি দ্বারা ফরাসীর জাতীয় ঐক্য এবং ফরাসী গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকট হইয়া উঠে।

বস্তুত রাষ্ট্র-নেতাকে বাদ দিয়া ফরাসী গণতন্ত্রকে ভাবা চলে না। ফ্রান্সে রাষ্ট্রনেতা বিশেষ সম্মানের পাত্র ও রাষ্ট্রনেতার পদ রাজনীতিবিদ্‌গণের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু ফ্রান্সে কেহ কেহ রাষ্ট্র-নেতার বর্তমান শক্তিহীন অবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহারা আমেরিকার রাষ্ট্র-নেতার মত ফরাসী রাষ্ট্র-নেতাকেও বস্তুত ক্ষমতাশালী দেখিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে ফরাসী রাষ্ট্র-নেতাও তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শ দিবেন ও মন্ত্রিগণ তাঁহা শুনিবেন, ইহাই যথেষ্ট নয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, শক্তি ত্রয়ের বিভাগ (সেপারেশন অব্ পাওয়ার্স্) এর মূলনীতি ফ্রান্সে লঙ্ঘিত হইতেছে, কারণ এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা শাসন ক্ষমতার উপর যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিতেছে ও ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রতীকার করা দরকার। রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

এই মতের বিরোধিগণ বলেন, তাহা হইতে পারে না। রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বাড়াইয়া দিলে তারপর তিনি যে সম্রাট্ হইয়া বসিবেন না তাহার কি প্রমাণ আছে? তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আইন রহিয়াছে রাষ্ট্র-নেতার প্রত্যেক কাজে একজন মন্ত্রীর সহি চাই। এই আইন বর্তমান থাকিতে রাষ্ট্র-নেতার পক্ষে ব্যক্তিগত ক্ষমতা চালানো কি প্রকারে সম্ভব? রাষ্ট্রীয় কাঠামো যাঁহারা খাড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের মনোভাব এই ছিল যে, রাষ্ট্র-নেতা যেন ভবিষ্যতে কোন ক্রমেই গণতন্ত্রকে দূরীভূত করিবার জন্য লালায়িত না হন।

ফ্রান্সের সমস্যা,—রাষ্ট্র-নেতা ইংল্যাণ্ডের রাজার মত নাম মাত্র রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিবেন না যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার মত ক্ষমতাশালী হইবেন।

রাষ্ট্র-সভা

১৮৭৫ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন বিষয়ক প্রথম ধারা এইরূপ: "আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দুই সংসদে (এসেম্‌ব্লি)র হাতে থাকিবে: প্রতিনিধি-সভা ও রাষ্ট্র-সভা।" উপরে বলা হইয়াছে যে ইহার একদিন আগে রাষ্ট্র-সভার গঠন বিষয়ক আইন পাশ করা হয়। কিন্তু ঐ আইনে রাষ্ট্র-সভার অস্তিত্ব ও ক্ষমতাবলী নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার কাঠামো জানিতে হইলে ১৮৭৫ সনের ২রা আগষ্ট ও ১৮৮৪ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ঘোষিত আইন দ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই তিনটি আইনে রাষ্ট্র-সভার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্র-সভা ঘটিত আইন আঙ্গিক আইন।

রাষ্ট্র-সভার সম্বন্ধে গোড়াতেই একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার। ১৮৭৫ সনের আগষ্ট মাসে ও ১৮৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে যে সব আইন রাষ্ট্র-সভা সম্পর্কে পাশ করা হয়, সেগুলি আঙ্গিক আইন। অর্থাৎ এগুলি পরিবর্তন করিতে হইলে উভয় সভার সংসদ্‌রূপে বসিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ আইনের মত পরিবর্ত্তনের জন্য রাষ্ট্র-সভার কাছে উপস্থাপিত করা চলে। তাহাতে রাষ্ট্র-সভার স্থায়িত্ব সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ উভয় সভা সংসদ্‌রূপে বসিলে রাষ্ট্র-সভার ৩১৪ জন সদস্য এবং প্রতিনিধি সভার ৫৮০ জন সদস্য এক মতাবলম্বী হইলে তাহাদের কাছে হারিয়া যাইতে বাধ্য হইত। সুতরাং প্রতিনিধি-সভা ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র-সভাকে জব্দ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-সভা ঘটিত আইন

পরিবর্ত্তনের কথা যে সভাতেই উঠুক, রাষ্ট্র-সভার নিকট বিচারের জন্ত একবার আসিবেই। তাহাতে রাষ্ট্র-সভা নিজের ধ্বংসকর কোন আইনেই সম্মত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য।

এখন রাষ্ট্র-সভা-ঘটিত মাত্র নিম্নলিখিত দুইটি আইন আঙ্গিক বা সাধারণ আইন নহে অর্থাৎ এ দুটির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে জাতীয় সংসদে বিচার করিতে হইবে।

১৮৭৫ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর আইনের অষ্টম ধারা। "প্রতিনিধি সভার তুল্যভাবে রাষ্ট্র-সভায় আইন আনয়ন ও প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় আইন প্রথমত প্রতিনিধি-সভায় আনয়ন করা হইবে ও আনুসঙ্গিক আইন পাশ করা বিষয়ে প্রতিনিধি-সভারই ক্ষমতা বেশী থাকিবে।"

নবম ধারা। "রাষ্ট্রনেতা অথবা মন্ত্রিদের বিচার করিবার জন্ত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আক্রান্ত হইলে তাহা বুঝিবার জন্ত রাষ্ট্র-সভা বিচারালয় রূপে পরিণত হইবে।"

১৮৮৪ সনের আঙ্গিক আইনের প্রথম ধারা অনুসারে রাষ্ট্র-সভার সদস্যের সংখ্যা ৩০০—বিভিন্ন দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশ এই সদস্যদের নির্ব্বাচন করেন। এই আইন আজ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে। ইহা ছাড়া আলসেস্ লোরেন গত যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অন্তর্গত হওয়ায় সেখান হইতে ১৪ জন সদস্য রাষ্ট্র-সভার জন্ত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্র-সভার সদস্য-সংখ্যা ৩১৪।

পূর্ব্বে ৭৫ জন সদস্য জাতীয় সংসদ্ দ্বারা যাবজ্জীবনের জন্ত নির্ব্বাচিত হইতেন, বাকী ২২৫ জনকে দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশসমূহ নির্ব্বাচন করিত। শেষ যাবজ্জীবন সদস্যের ১৯১৮ সনে মৃত্যু হইয়াছে এবং এক্ষণে ১৮৮৪ সনের ৯ই ডিসেম্বরের আইনের পর হইতে ৩১৪ জন সদস্যই ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। নির্ব্বাচনটা সোজাসুজি হয় না। প্রত্যেক দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশে এজন্তে একটি করিয়া ভোট দিবার দল (কলেজ) মোতায়েন রহিয়াছে। ১৯১৯ সনের ১২ই জুলাই ভোট দেওয়া সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদনুসারে ভোট লওয়া হয়। ফ্রান্সে প্রত্যেক দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশ হইতে সমানসংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্র-সভার জন্ত নির্ব্বাচিত হন না। এবিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ফ্রান্সের অনৈক্য রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাষ্ট্র যত বড় বা ছোট হোক্ রাষ্ট্র-সভায় দুইজন করিয়া ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারে। কিন্তু ফ্রান্সে বিভিন্ন দেপার্ত্তমাঁর নির্ব্বাচন-শক্তি বিভিন্ন। সেন হইতে ১০ জন, নর্ হইতে ৮ জন, ১০টি দেপার্ত্তমাঁর প্রত্যেকটি হইতে ৫ জন, ১২টি দেপার্ত্তমাঁর প্রত্যেকটি হইতে ৪ জন, ৫২টি দেপার্ত্তমাঁর প্রত্যেকটি হইতে ৩ জন, ১০টি দেপার্ত্তমাঁর প্রত্যেকটি হইতে ২ জন, বেল-ফোর্ট, আলজিরিয়ার ৩টি দেপার্ত্তমাঁর প্রত্যেকটি ও ৪টি উপনিবেশের প্রত্যেকটি হইতে ১ জন করিয়া রাষ্ট্র-সভার জন্ত নির্ব্বাচিত হন। অর্থাৎ ফ্রান্সের মোট ৮৬টি দেপার্ত্তমাঁ ও উপনিবেশ আলসেস্ লোরেন সহ ৩১৪ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

রাষ্ট্র-সভার কাহারা কিরূপে নির্ব্বাচিত হন।

ভোট দিবার গৌণ নির্ব্বাচন সম্প্রদায় বলিতে এক একটি প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানে থাকেন

(১) ঐ দেপার্ত্তমাঁর প্রতিনিধিগণ (প্রতিনিধি-সভার সদস্য)

(২) কঁসেই জেনেরাল (দেপার্ত্তমাঁর পরামর্শ-সভার) সদস্যগণ

(৩) আরঁদিস্মাঁর সভার (মহকুমার পরামর্শ-সভার) সভ্যগণ

(৪) কমিউনের (পল্লীর) ভোটদাতাগণের মধ্য হইতে প্রত্যেক মিউনিসিপাল সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত ডেলিগেট বা প্রতিনিধি। সকল কমিউনের প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান নহে, কতকগুলি হইতে বেশী ও কতকগুলি হইতে কম লোক নিযুক্ত হয়। প্যারি সহরের প্রতিনিধি-সংখ্যা ৩০ জন, অন্য কতকগুলি বড় সহরের ২৪ জন, কিন্তু অধিকাংশ সহরের একজন। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ঠিক লোকবলের অনুপাতে হয় না, সেজন্য দেখা যাইবে যে, হয়ত একটা বড় সহর ও জনপদের অপেক্ষাকৃত একটা ছোট অংশ—উভয়েরই প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান। লোকবল অনুসারে প্রতিনিধি গ্রহণ না করিবার একটা হেতু ১৮৮৪ সনে এই ছিল যে, জানপদ অঞ্চলের প্রাধান্য খর্ব্ব করা তখন প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল। চাষীরা জমিদারদের বাধ্য ছিল, অন্যদিকে শিল্পকারখানার শ্রীবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন সহরে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিল—আইন-কর্ত্তারা ইহাদিগের হাতে বেশী ক্ষমতার ভার দেওয়া কাম্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্র-সভায় নির্ব্বাচিত হইতে হইলে প্রত্যেক দেপার্ত্তমাঁর গৌণ নির্ব্বাচন সম্প্রদায় কেন্দ্রে অন্তত দুইবার অধিকসংখ্যক ভোট পাওয়া চাই। ভোট সকলকে দিতেই হইবে। যে সব প্রতিনিধি দূরস্থান হইতে ভোটস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন সরকার হইতে তাঁহাদের আসা যাওয়ার খরচ বহন করা হয়। এইরূপে প্রত্যেক বৎসরের একতৃতীয়াংশের নির্ব্বাচনে প্রায় ৯ লাখ ফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় পৌনে ৫ লাখ টাকা খরচ হয়।

ফরাসী রাষ্ট্রিক (সিটিজন) না হইলে কেহ রাষ্ট্র-সভায় নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র-সভাসদ্ পদ প্রার্থীর বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তাঁহার সামরিক, অসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার অর্থাৎ কোন কারণে তিনি এই সব অধিকার-চ্যুত হইয়া থাকিলে নির্ব্বাচন সময়ে তাহা তাঁহার নির্ব্বাচনের পক্ষে বাধা স্বরূপ হইবে। ফ্রান্সে যে সকল ব্যক্তি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বংশের কেহ রাষ্ট্র-সভায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। জল ও স্থল সৈন্য বিভাগের সদস্যগণ রাষ্ট্র-সভায় যাইতে পান না, কিন্তু ফ্রান্সের মার্শাল (স্থল-সেনানায়ক), অ্যাড্মিরাল (জল-সেনানায়ক), সামরিক বিভাগে ভবিষ্যতে কাজে লাগিবার জন্য পৃথক তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে রাষ্ট্রসভার সভ্য হইবার কোন বাধা নাই। প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের মত রাষ্ট্র-সভাসদ্গণও তাঁহাদের কার্য্যের জন্য বৎসরে ৪৫,০০০ ফ্রাঁ করিয়া বৃত্তি পান।

রাষ্ট্র-সভার সদস্য হইবার যোগ্যতা।

রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণ ৯ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। রাষ্ট্র-সভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বিশেষ, কখনো সমগ্র সভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করেন। দেপার্ত্তমাঁগুলি তিন ভাগে সাজান হইয়াছে—নির্দ্দিষ্ট তারিখে এক এক ভাগের নির্ব্বাচন সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতা।

রাষ্ট্রনেতার ক্ষমতার কথা উল্লেখের কালে রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতার কথাও কিছু কিছু বলা হইয়াছিল। রাষ্ট্র-সভা প্রতিনিধি-সভার সহিত একত্রে রাষ্ট্রনেতাকে নির্ব্বাচন করে, প্রতিনিধি-সভা তাঁহাকে দেশদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত করিলে রাষ্ট্র-সভা তাঁহার বিচার করিয়া থাকে; যুদ্ধ ঘোষণার নিমিত্ত প্রতিনিধি-সভার সহিত রাষ্ট্র-সভারও সম্মতি লইতে হয়; সন্ধির

কথাবার্ত্তা চালানো ও অনুমোদন করা রাষ্ট্রনেতার কাজ হইলেও, যখন ঐ সন্ধির কথা প্রকাশ করিলে রাষ্ট্রের আর কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না তখন তিনি উভয় সভাকে সে সম্বন্ধে জানাইতে বাধ্য থাকেন ; যতদিন রাষ্ট্র-সভা এবং প্রতিনিধি-সভা শান্তি ও বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি অনুমোদন না করে, ততদিন সন্ধি হইতে পারে না।

রাষ্ট্র-সভা উপরি উক্ত ক্ষমতাবলী প্রতিনিধি-সভার সহিত একযোগে ভোগ করে। কিন্তু রাষ্ট্র-সভার দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই দুইটি ক্ষমতায় প্রতিনিধি-সভার কোন হাত নাই। (১) আইনত প্রতিনিধি-সভার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই যদি রাষ্ট্রনেতা কোন কারণে ঐ সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নূতন নির্ব্বাচনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে রাষ্ট্র-সভা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দিতে পারে, নাও দিতে পারে। রাষ্ট্র-সভার এই ক্ষমতার গুরুত্ব অনেকখানি। এক হিসাবে এই ক্ষমতা থাকার দরুণ শাসন-ব্যাপার রাষ্ট্র-সভার মর্জ্জির উপর নির্ভর করে—কোন সময়ে রাজনৈতিক কারণে প্রতিনিধি-সভা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়ত বিশেষ দরকার, অন্য সময়ে হয়ত উহা রাখা দরকার, কিন্তু রাষ্ট্র-সভা প্রতিকূল হইলে কাজের বড় অসুবিধা হয়। (২) প্রতিনিধি-সভা যদি রাষ্ট্রনেতা বা মন্ত্রিদিগকে অভিযুক্ত করে তবে রাষ্ট্র-সভা বিচারালয়রূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদের বিচার করিতে বসে। রাষ্ট্রের ধ্বংস করিতে কেহ উদ্যত হইলে রাষ্ট্রনেতা মন্ত্রিগণের সহযোগে তাহার বিচারের জন্য হুকুম জারি করেন ও সেজন্য রাষ্ট্র-সভাকে আহ্বান করেন।

ফিন্যান্স অর্থাৎ টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য সাধারণ আইন প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্র-সভার ঠিক প্রতিনিধি-সভার মত আইন উপস্থাপিত করিবার, পাশ করিবার অথবা নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা আছে। টাকাকড়ির বিল উপস্থিত করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রতিনিধি-সভার রহিয়াছে; রাষ্ট্র-সভা অবশ্য তাহা না-মঞ্জুর করিতে পারে এবং সংশোধন করিবার ক্ষমতা কয়েকবার প্রয়োগও করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রতিনিধি-সভা আপত্তি জানাইয়াছে। ১৮৮২ সনে গ্যাম্বেটা রাষ্ট্র-সভার এই ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মনীষী বিচারকদের মত এই যে, বাজেট পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার ক্ষমতা রাষ্ট্র-সভার আছে।*

দুই সভার পরস্পর সম্বন্ধ আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি বিষয়ে কিছু গণ্ডগোল আছে। মন্ত্রিগণ কাহার কাছে দায়ী তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ১৮৭৫ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর আইনে আছে যে, "মন্ত্রিগণ সাধারণ সরকারী নীতির জন্য একত্রে এবং ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য প্রত্যেকে, উভয় সভার নিকট দায়ী থাকিবেন" (৬ষ্ঠ ধারা)। মন্ত্রিগণের দায়িত্ব। ১৮৭৫ সনের ১৬ই জুলাইয়ের আইন বলিতেছে, "মন্ত্রিগণের উভয় সভাতেই প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং অনুরোধ করিলে তাঁহাদের বক্তব্য শোনা হইবে।" উভয় স্থলেই উভয় সভার নিকট মন্ত্রিদের দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্য গণতান্ত্রিক দেশের মত ফ্রান্সেও প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, মন্ত্রিদের দায়িত্ব বস্তুত প্রতিনিধি-সভার নিকট বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তথাপি ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অনেকবার হইয়াছে যে, রাষ্ট্র-সভা বিরোধিতা করিবামাত্র মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৯৬ সনের ২০শে এপ্রিল রাষ্ট্র-সভা

"মন্ত্রিদের উপর বিশ্বাস নাই" বলিয়া ভোট দিলেন। মন্ত্রিগণ তথাপি পদত্যাগ করিলেন না। কিন্তু পরদিন রাষ্ট্র-সভা বাদানুবাদে সৈন্য প্রেরণের খরচা প্রেরণ নামঞ্জুর করিলে মন্ত্রিগণ অকস্মাৎ পদত্যাগ করিলেন। তাহা ছাড়া মন্ত্রিগণ বহুবার "বিশ্বাস আছে" ভোট পাইবার জন্য রাষ্ট্র-সভার নিকট আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। রাষ্ট্র-সভার মতের যদি মূল্য না থাকে, তবে এই আবেদনের দরকার হইত না। রাষ্ট্র-সভা ১৯০৪ সনে মধ্যবিত্ত (বুর্জোয়া) মন্ত্রি-সমিতি ও ১৯১৩ সনে ব্রিঁয়া মন্ত্রি-সমিতিকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ বিলের বেলা রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতা প্রতিনিধি-সভার সমান। কিন্তু এক বিষয়ে রাষ্ট্র-সভাকে প্রতিনিধি-সভার তুলনায় কম শক্তিশালী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ১৮৭৫ সনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিষয়ক আইনের অষ্টম ধারাটি এইরূপ :

"উভয় সভা বিভিন্ন প্রস্তাব দ্বারা, ঐ প্রস্তাব প্রত্যেক সভাতে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা গৃহীত হইলে পর, নিজেরা উদ্যোগী হইয়া অথবা রাষ্ট্রনেতার অনুরোধে, ঘোষণা করিতে সক্ষম থাকিবেন যে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিষয়ক আইনসমূহ সংশোধন করিবার সময় আসিয়াছে।

উভয় সভার প্রত্যেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পর, তাঁহারা জাতীয় সংসদরূপে একত্রে ঐ সংশোধনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিষয়ক আইনের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সংশোধক নূতন আইনসমূহ জাতীয় সংসদস্থ অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা পাশ হওয়া চাই।"

ইহার অর্থ স্পষ্ট। জাতীয় সংসদরূপে বসাকালে প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ সকলে যদি একমতাবলম্বী হন তবে সমগ্র রাষ্ট্র-সভা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এখানে সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রতিনিধি-সভার মর্য্যাদা অধিক, বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, উপরি উদ্ধৃত ধারাটিতে সভাদ্বয়ের ক্ষমতা কিরূপ তাহা বলা হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণভাবে বলিবেন যে, সংশোধন দরকার না কিরূপ ধরণের সংশোধন দরকার তাহাই বলিবেন, সে কথা আইন হইতে বুঝা যায় না। আইন সংশোধন ব্যাপারে প্রতিনিধি-সভার গুরুত্ব বেশী হইলেও রাষ্ট্র-সভার অমত থাকিলে এ বিষয়ের বিবেচনাই চলিতে পারে না। জাতীয় সংসদে রাষ্ট্র-সভার ভোটে হারিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র-সভা আদপেই যদি সংশোধনের প্রস্তাব কাণে না তুলে তবে তাহা আর সংসদে আলোচনার জন্য আসিতে পারে না।

দ্বিতীয় গণতন্ত্রের (১৮৪৮-৫২) কালে একটি মাত্র সভা ছিল। ১৮৭৫ সনে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরীর সময়ে প্রজাতন্ত্রবাদিগণের ইচ্ছা ছিল যে, একটি মাত্র সভাই থাকে। কিন্তু রাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা করিয়া ও প্রতিনিধি-সভার সার্ব্বজনীন ভোটের যাহাতে অপব্যবহার না হয় সেজন্য রাষ্ট্র-সভা গঠন করিতে জেদ করেন। গ্যাম্বেটাও অবস্থা বুঝিয়া সম্মত হন। রাষ্ট্র-সভা কি ভাবে গঠিত হইবে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ঠিক হয় তিন-চতুর্থাংশ স্থানীয় শাসন-বিভাগ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে আর বাকী এক-চতুর্থাংশ রাষ্ট্র-সভা স্বয়ং যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাচন করিবে। স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক দলকে যথোচিত মর্য্যাদা দিবার পক্ষে গৌণ নির্ব্বাচন সমীচীন বিবেচিত

রাষ্ট্র-সভার স্বরূপ নির্ণয়।

হইয়াছিল। শেষ যাবজ্জীবন সভ্যের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র-সভার এখন সমস্ত সদস্যই নির্বাচিত। ১৮৮৪ সন হইতে যাবজ্জীবন সভ্য নির্বাচন করিবার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ঐ প্রথার বিরুদ্ধে যে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল তাহা নয়। কিন্তু অগ্রগামী গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে ঐ প্রথা আর না রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল। যৌগ নির্বাচন প্রথাও ভাল ফল প্রসব করিয়াছে। রাষ্ট্র-সভার এমন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসিয়াছেন যাঁহারা নিজেদের বিদ্যাবত্তা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অন্যান্য সদ্গুণের দ্বারা রাষ্ট্র-সভাকে একটা বিশেষ গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সভার সদস্য নির্বাচন অনেকটা নীরবে সম্পন্ন হয়, দেশব্যাপী হৈ চৈ করিবার প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ ব্যক্তি মধ্যবিত্ত-শ্রেণী হইতে আসেন—প্রাচীন আমীর-ওমরাহ বা আধুনিক শ্রমিক-শ্রেণীর লোক প্রায় থাকেন না। নিজ নিজ দলের লোককে ভোট দেওয়াই প্রথা। অবৈধ অর্থ প্রদান ইত্যাদি বিরল দেখা যায়। কিন্তু প্রিফে (কেন্দ্রীয় শাসকের মনোনীত শাসক বিশেষ) এর প্রতাপ প্রতিনিধিদের উপর যথেষ্ট রহিয়াছে। আজকালকার অধিকাংশ রাষ্ট্র-সভাসদেরা প্রধানতঃ ডাক্তার ও উকিল শ্রেণীর হইয়া থাকেন, অল্প কয়েকজন কৃষি-ব্যবসায়ী থাকেন। বড় ব্যবসায়ী, জমিদার ও শিল্পীরা সংখ্যায় অনেক কম হন। ফরাসী রাষ্ট্রবিদ্ একেবারে রাষ্ট্র-সভার সদস্যরূপে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, এমন বড় দেখা যায় না। অনেকেই সভায় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সহজ রাষ্ট্র-সভাসদের জীবনে আসিয়া প্রবেশ করেন। প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্র-সভার সদস্যদের একটা পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্র-সভার সদস্যেরা বয়োজ্যেষ্ঠ, অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অর্থশালী হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্র-সভার বিভিন্ন দল।

ফরাসী রাজনৈতিকগণ বহু দলে বিভক্ত, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। প্রায় সব দলের লোকই রাষ্ট্র-সভায় আসেন। কিন্তু প্রতিনিধি-সভার তুলনায় রাষ্ট্র-সভায় চরমপন্থিগণ অর্থাৎ রাজতন্ত্রবাদী ও সমাজ ও সমূহতন্ত্রবাদিগণ শক্তিতে দুর্ব্বল। এই উভয় দলের লোকের পক্ষে ভোট দিবার কলেজে (নির্ব্বাচক সম্প্রদায়) প্রাধান্য লাভ করা সহজ নহে। এই কারণেই ছোট ছোট দল ও উপদলসমূহ প্রতিনিধি-সভায় যতটা প্রবল রাষ্ট্র-সভায় ততটা প্রবল নহে। ফলে রাষ্ট্র-সভায় দলাদলি কম, কথাবার্ত্তা এত উচ্চ হইতে পারে না এবং দুই পক্ষে গালাগালি হাতাহাতি ইত্যাদি ব্যাপারের কথা কম শোনা যায়। রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণ প্রজাতন্ত্রবাদী বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র বা সমূহতন্ত্র তাঁহাদের মনোহরণ করিতে পারে না। ইঁহারা যখন তখন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন পছন্দ করেন না, বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা করা ও একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি বজায় রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। গণতান্ত্রিক তত্ত্বের দিকে শুধু না চাহিয়া ইঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন। নিজেরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বলিয়া অর্থ-সম্পদকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করেন না। ইঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র-সভায় পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, সেজন্য দল বা দলপতির প্রভাব ইঁহাদের উপর অনেকটা কম। বুর্ঁ প্রাসাদে প্রতিনিধি-সভায় বৈঠক হয় আর সেখান হইতে দুই মাইল দূরে রাষ্ট্র-সভাসদদের জন্য লুক্সেমবুর্গের প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং উভয় শ্রেণীর সভাসদদের মধ্যে কচিৎ দেখাশোনা হয়।

রাষ্ট্র-সভার সহিত প্রতিনিধি-সভার কি সম্বন্ধ তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন রাষ্ট্র-সভা প্রতিনিধি-সভার চেয়ে বেশী না হইলেও তুল্য শক্তি-সম্পন্ন। অন্যেরা বলেন রাষ্ট্র-সভা প্রতিনিধি-সভা অপেক্ষা দুর্ব্বল। আমাদের মতে ফ্রান্সের মত গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র সভার স্থান প্রতিনিধি-সভার অনেক নীচে। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিলে ইহার স্থান ত নীচে বটেই। তাহার অর্থ রাষ্ট্র-সভা মন্ত্রি-সমিতিকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে না। সত্য বটে আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্র-সভা দুই একবার মন্ত্রি-সমিতিকে পদ-ত্যাগ করাইতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু ইহা মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণ নির্ব্বাচক-সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাচিত হন বলিয়া তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়ান এবং এইরূপে দূরে সরিয়া যান বলিয়া জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বলিবার ক্ষমতা তাঁহাদের প্রতিনিধি-সভার চেয়ে অনেক কম। রাষ্ট্র-সভা নিজের এই অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। সেই জন্য প্রতিনিধি সভার ক্ষমতার প্রতি যতই ঈর্ষা থাক না, রাষ্ট্র-সভা কখনো শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রতিনিধি-সভাকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করে না। কিন্তু শক্তিতে হীন হইলেও, চাতুর্য্যে হীন নহে। ইহার সদস্যগণ সকলেই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্, অনেকেই প্রতিনিধি-সভার কার্য্যের ধারা ও দুর্ব্বলতার সহিত পরিচিত, সেজন্য বুঝিতে পারেন কখন ঐ সভাকে বাধা দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে। তাঁহারা তদনুসারে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। যখন প্রতিনিধি-সভা কোন বিল বস্তুতই মঞ্জুর করাইতে চান অথবা মন্ত্রিগণ জানান যে, তাঁহারা উহা পাশ করিতে কৃতসংকল্প এবং এ বিষয়ে তাঁহারা দেশবাসীর সমর্থন পাইবেন, তখন রাষ্ট্র-সভা বাধা না দিয়া তাহা পাশ করিয়া দেয়। কিন্তু যখন রাষ্ট্র-সভা বুঝিতে পারে যে, প্রতিনিধি-সভাকে অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ-ভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে অথবা জনগণের সাময়িক ইচ্ছার প্রতি অনাদর দেখাইতে সাহসী না হইয়া কোন বিল প্রতিনিধি-সভা রাষ্ট্র-সভার নিকট পাঠাইয়াছে, তখন রাষ্ট্র-সভা বিলটিকে নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হয় অথবা তাহা এমনভাবে বদলাইয়া দেয় যে, পূর্ব্বের আর কিছু থাকে না,—ঐ বিল যখন আবার প্রতিনিধি-সভায় আসে তখন হয়ত সাময়িক আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত বিলের বেলা রাষ্ট্র-সভার কোন প্রকার জারিজুরি খাটে না কারণ প্রতিনিধি-সভা নির্দ্দিষ্ট সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে এই বিল রাষ্ট্র-সভায় পাঠাইয়া দেয়; তখন আর সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিধি-সভায় পাঠাইবার সময় থাকে না। এই অবস্থাতেও রাষ্ট্র-সভা কোন বিল নাকচ্ বা সংশোধন করিয়া পাঠাইতে পারে, কিন্তু তখন রাজকার্য্যের জন্য নূতন কর-ভার চাপাইতে হইলে, এই কর-ভারের দায়িত্ব রাষ্ট্র-সভাকে লইতে হয়। রাষ্ট্র-সভার কমিশনসমূহ বাজেট সম্বন্ধে সাবধানতা সহকারে রিপোর্ট দেয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে প্রতিনিধি-সভার অমিতব্যয়িতা রোধ করা অথবা ভুল ভাঙ্গা সম্ভবপর হয় না।

রাষ্ট্র-সভার রক্ষণশীলতা।

সাধারণ বিল খুব কমই রাষ্ট্র-সভা কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। ঐ সব বিলকে শোধরাইয়া দেওয়া হইল রাষ্ট্র-সভার কাজ। রাষ্ট্র-সভা নিজের এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এরূপ সতর্ক যে, প্রতিনিধি-সভা অনেক সময় এই বিশ্বাসে কোন বিল পাশ করিয়া দেয় যে, তাহার দোষগুলি রাষ্ট্র-সভার চোখ এড়াইতে পারিবে না। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (ষ্টেট্ সোশ্যালিজ্‌ম্) রাষ্ট্র-সভার মনঃপূত নয় বলিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকর অনেক বিল নামঞ্জুর হইয়াছে, ইহা সত্য।

বস্তুত সামাজিক আইন প্রণয়নের বেলায় রক্ষণশীল রাষ্ট্র-সভা প্রায়ই বাধা দিয়া থাকে। রাষ্ট্র-সভার জন্য বার্দ্ধক্য-পেন্সন ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকের বিশেষ পেন্সনের ব্যবস্থা কাজে পরিণত হইতে দেরী হইয়াছিল; ক্রমবর্দ্ধনশীল কর, ভোট ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, ফ্যাক্টরিতে ছেলেমেয়েদের কাজ নিষেধ ইত্যাদি সর্ব্বদা বাধা পাইয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার পায় নাই।

দুই সভার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে বিরোধ-ভঞ্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে, উভয় সভা হইতে এক একটি "কমিশন" নিয়োগ করা। এই দুই কমিশন একত্র আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু তাহাদের রিপোর্ট বিচারার্থ আসিলে ভোট দিবার সময় দুই সভা আলাদা আলাদা ভোট দেয়। এই প্রথা অবলম্বন করিবার অধিক আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু অবলম্বন করিয়া যখন উভয় সভা ভোট দ্বারা সালিষীটা মানিয়া নেয় তখন আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। কমিশন বসিবার পরও যদি মতভেদ দূর না হয়, তাহা হইলে আর কিছুই করিবার থাকে না। তবে প্রতিনিধি-সভা সাক্ষাৎভাবে জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহার জিদ্ বজায় থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

ফরাসী মন্ত্রি-সমিতির অধিকাংশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি-সভা হইতে বাছিয়া লওয়া হয়, কিন্তু রাষ্ট্র-সভা হইতেও তিন-চারিজনকে লওয়া হয় এবং তিন-চারজন হয়ত পূর্ব্বে বিভিন্ন সভায় প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাষ্ট্র-সভায় ধীর শান্তভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া সাধারণত দেশের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু রাষ্ট্র-সভাসদেরা বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তিও কম নহে। রাষ্ট্র-সভার সদস্যের পদ ফরাসীরা বিশেষ কাম্য মনে করিয়া থাকেন। সভায় বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির যেরূপ সমাবেশ দেখা যায়, তাহা সাধারণত বিরল।

১৮৭৫ সন হইতে আজ অবধি ফরাসী রাষ্ট্র-সভাকে অনেক প্রকার সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রাষ্ট্র-সভার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। গ্যাম্বেটা প্রথমত অনিচ্ছায় দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্র-সভাকে মানিয়া লন; কিন্তু পরে তিনি ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ সনে এই সভা বুলাঁজের বিচার করিয়া ফরাসী গণতন্ত্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তার পরেও কার্য্য দ্বারা ইহা নানা প্রকারে দেশ-সেবা করিয়াছে। এক্ষণে রাষ্ট্র-সভার গুরুত্ব এরূপ যে, উহাকে বাদ দিলে ফ্রান্সের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করা হয়।

প্রতিনিধি-সভা

রাষ্ট্র-নেতা ও রাষ্ট্র-সভার বর্ণনাকালে আমরা প্রতিনিধি-সভার কথাও কিছু কিছু বলিয়াছি। ১৮৭৫ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর আইনের প্রথম ধারাতেই প্রতিনিধি-সভা ও রাষ্ট্র-সভাকে যুগপৎ আইন প্রণয়ণের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তারপর রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে প্রতিনিধি-সভা ও রাষ্ট্র-সভা একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় সংসদরূপে বসিবার ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কোন স্থলে রাষ্ট্র-নেতা

প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতা।

জাতীয় সংসদ্ আহ্বান করিতে পারেন। কিন্তু তাহার আগে প্রতিনিধি-সভায় (ও রাষ্ট্র-সভায়) অতিজন ভোট দ্বারা স্থির হওয়া চাই যে, পরিবর্ত্তন আবশুক। তাহা ছাড়া এই পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আনিবার ক্ষমতা প্রতিনিধি-সভার (ও রাষ্ট্র-সভার) আছে। রাষ্ট্রনেতা সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে বা সন্ধি অনুমোদন করিতে পারেন। কিন্তু প্রতিনিধি-সভাকে (ও রাষ্ট্রসভাকে) তাঁহার সকল কথা জ্ঞাত করাইতে হইবে,—শুধু যতদিন প্রকাশ করিলে রাষ্ট্রের বিপদের সম্ভাবনা আছে, ততদিন তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন। বাণিজ্য সমঝোতা, বিদেশে অবস্থিত ফরাসী নাগরিকের সম্পত্তি-নাশকর বা রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসূচক সন্ধির জন্ম প্রতিনিধি-সভার অনুমোদন আগে চাই। আর্থিক আইন-প্রণয়নে একমাত্র প্রতিনিধি-সভার হাত আছে। অন্যান্ত আইনের বেলাতেও প্রতিনিধি-সভার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা রাষ্ট্র সভার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে সব আইন প্রতিনিধি-সভা পাশ করা অনুপযুক্ত মনে করে কিন্তু লোকমতের বিরুদ্ধে যাওয়াও সমীচীন মনে করে সেই সব আইন রাষ্ট্র-সভায় পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু সেগুলি যে সেখানে নাকচ হইবে ইহা জানিয়াই পাঠাইয়া দেয়।

সদস্য-সংখ্যা ৬২৬। ৬১২ (১৯৩০)

প্রতিনিধি-সভার সদস্যের সংখ্যা ৬২৬। আলসেস্ লোরেন হইতে ২৪ জন, আলজিয়ার্স্ হইতে ৬ জন ও বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে ১০ জন প্রতিনিধি-সভায় নির্ব্বাচিত হন। বাকী ৫৮৬ জন ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

নির্ব্বাচন-প্রথা।

১৮৭১ সন হইতে ফ্রান্সে নির্ব্বাচন-প্রথা লইয়া অনেক প্রকার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আগে আর্রঁদিস্মঁ ছিল নির্ব্বাচনের কেন্দ্র, একণে বারবার পরিবর্ত্তনের পর আবার আর্রঁদিস্মঁ হইতে সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৯১৯ সনে প্রথম হারাহারি (প্রোপোরশনাল) প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়। দেশের ভিতর বিভিন্ন দলের শক্তি যেরূপ প্রতিনিধি-সভাতেও তাহাদের লোক-সংখ্যা তদ্রূপ মনে করিলে ভুল হইবে। হারাহারি ব্যবস্থা একটি মধ্যপথ বিশেষ। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা ভোট রেজিষ্টারি করেন। ইঁহারা কখনো কখনো মিথ্যা রেজিষ্টারি দাখিল করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু সকল কর্ম্মচারী এরূপ নহেন। কোন ব্যক্তির যদি একের অধিক বাসস্থান থাকে তবে তিনি যেখান হইতে খুসী ভোট দিতে পারেন, কিন্তু কেহ একটির বেশী স্থান হইতে ভোট দিতে পারেন না।

ফ্রান্সে ভোট দেওয়ার আয়তন (কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সি) তিন তিন বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনবার দেপার্তমাঁকে নির্ব্বাচন কেন্দ্র করিবার পর পুনরায় চতুর্থ বার আর্রঁদিস্মঁকে কেন্দ্র করা হইয়াছে (১৯২৭, ১২ জুলাই)। প্রত্যেক আর্রঁদিস্মঁ হইতে প্রতিনিধি-সভার সদস্য নিযুক্ত হন। প্রথমবার ব্যালট ভোটে কেবল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন:

যাঁহারা অধিকাংশ ভোট পাইয়াছেন; কিন্তু যত ভোট রেজিষ্টারি করা হইয়াছে অন্ততঃ তার এক-চতুর্থাংশ তাঁহাদের পাওয়া চাই।

দ্বিতীয় বার ব্যালট ভোটে অতিজনের ভোট পাইলেই চলে। যেখানে দুইজন বা ততোধিক নির্ব্বাচনপ্রার্থী সমানসংখ্যক ভোট পান সেখানে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি নির্ব্বাচিত হন।

ব্যালট ভোট দিবসব্যাপী হয়। ফরাসী দেশে সার্ব্বজনীন ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু জল ও স্থল বিভাগের সকল শ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারীরা যখন তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তখন ভোট দিতে পারেন না। কিন্তু নির্ব্বাচনের দিনে যদি তাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে থাকেন, কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্ত ব্যাপৃত থাকিতে না হয় অথবা ছুটিতে থাকেন, তবে তাঁহারা ভোট দিবার অধিকারী হন। কাহারা ভোট দেয়।

প্রতিনিধি-সভার সদস্ত হইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা চাই। প্রত্যেক দেপার্ত্তমাঁ হইতে একজন করিয়া সদস্ত নিযুক্ত হন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত থাকা কালে অথবা যে কোন কারণে কাজ হইতে অপসৃত হইলে প্রতিনিধি-সভার সদস্ত হইতে পারেন না: কাহারা প্রতিনিধি-সভার সদস্ত হইতে পারেন।

(১) আপীল আদালতসমূহের প্রথম-সভাপতিগণ (ফার্ষ্ট প্রেসিডেন্ট), সভাপতি ও সভাগণ।

(২) প্রথম শ্রেণীর ট্রাইবুনালের অর্থাৎ বিচারালয়ের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, জজ ও পরীক্ষক ম্যাজিষ্ট্রেট।

(৩) শান্তিরক্ষক (জাষ্টিস্ অব্ পীস্), কোতোয়ালির (প্রিফেক্তুর) সভ্যগণ।

(৪) পুলিশ কোতোয়াল (প্রেফে), কোতোয়ালির কোতোয়াল ও সেক্রেটারি-জেনারেলগণ।

(৫) আর্‌দিস্‌মাঁর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও অন্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ, প্রধান রাস্তা জরীপকারী (সার্ভেয়ার) ও অন্ত জরীপকারিগণ।

(৬) আকাদেমী অর্থাৎ বিদ্বৎ-পরিষৎসমূহের রেক্টার ও ইন্‌স্পেক্টারগণ।

(৭) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকগণ।

(৮) আর্কবিশপ, বিশপ ও ভিকার-জেনারেলগণ।

(৯) পে-মাষ্টার জেনারেল ও অন্তান্ত অর্থ-গ্রহীতাগণ।

(১০) সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ করের, রেজিষ্ট্রেশনের, সরকারী সম্পত্তির ও পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ।

(১১) বনবিভাগের কমিশনার ও ইন্‌স্পেক্টারগণ।

প্রতিনিধি-সভার কোন সদস্ত সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইয়া মাহিনা পাইতে থাকিলে তিনি ঐ চাকরিতে সম্মত হওয়া মাত্র আর সদস্ত থাকিবেন না। কিন্তু তাঁহার চাকরি ও সদস্তগিরিতে যদি কোন বিরোধ না থাকে তবে তিনি পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার জন্ত দাঁড়াইতে পারেন। কিন্তু যে সব সদস্ত মন্ত্রী বা কোন মন্ত্রীর সহকারী কার্য্য-নির্ব্বাহক (আণ্ডার সেক্রেটারী) হন তাঁহাদের আর পুনর্নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে হয় না।

প্রতিনিধি-সভার সদস্তগণ প্রত্যেক চারি বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। ২৫ বৎসর বয়স্ক হইলে ও ভোট দিবার ক্ষমতায় কোন বাধা না থাকিলে প্রতিনিধি-সভার সদস্ত হইবার জন্ত দাঁড়ানো যায়। ফ্রান্সের পূর্ব্বতন রাজাদের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তি একের অধিক অঞ্চল হইতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নির্ব্বাচনের সময় যেরূপ দেশব্যাপী আলোড়ন ও আন্দোলন উপস্থিত

হয়, ফ্রান্সে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। ফ্রান্সের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা বেশ সরল এবং অল্প খরচে সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য অঞ্চলে অসংখ্য ভোট দিবার স্থান থাকে—বস্তুত প্রত্যেক পল্লীগ্রামে একটি আছে। ভোট সর্ব্বদাই রবিবারে লওয়া হয়। ভোট দেওয়া সংক্রান্ত খরচপত্র সমস্ত সরকার বহন করেন এবং নির্ব্বাচন-প্রার্থীর ঊর্দ্ধতম খরচ করিবার ক্ষমতা বাঁধিয়া দেওয়া নাই। ব্যালট্ ভোট যদিও গোপনে দেওয়া হয় তথাপি গ্রাম্য অঞ্চলসমূহে মেয়ররা সহজেই টের পান চাষীরা কোন্ দিকে ভোট দিতেছে আর চাষীরাও ভাবে যে তাহার ভোটের কথা সাধারণত ধর্ম্মযাজক, ইস্কুলের শিক্ষক ও জমিদারের নিকট অজ্ঞাত থাকে না। সময় সময় গুরুতর প্রবঞ্চনা ধরা পড়িলেও, নির্ব্বাচন সম্পর্কে শঠতা খুব বেশী হয় না। কখনো কখনো যে কর্ম্মচারী অধ্যক্ষতা করেন তাঁহার গোচরে অথবা সহায়তায় ভোটদাতা একটি ভোটের কাগজের ভিতর আরো ৩.৪টি কাগজ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ব্যালট্ বাক্সে ফেলিয়া আসে। দক্ষিণ ফ্রান্সে কখনো কখনো এ রকম ছোটখাটো অনেক ঘটনা ঘটে। একবার কোন স্থানের মেয়রের কেরাণী দেখে যে, তাহাদের অনুমোদিত ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট ভোট পাওয়া যায় নাই। তখন সে তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "সার্ব্বজনীন ভোটের কাজটা সমাধা করিবার ভার তোমাদের ঘাড়েই পড়িতেছে।" কখনো কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ হয় এবং উগ্র-প্রকৃতির লোকেরা ব্যালট বাক্স তুলিয়া লইয়া যায় ও ইচ্ছামত ভোটের কাগজগুলির পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরাইয়া দেয়। এরূপ ঘটনা বিরল হইলেও দক্ষিণ ফ্রান্সে হয়। (ব্রাইস্)

নির্ব্বাচনের সু ও কু।

ব্রাইস্ বলেন, ঘুষের দৃষ্টান্তও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ফ্রান্সের কোন কোন স্থলে ঘুষ না দিলে ভোট পাওয়া যায় না। অন্য কোন কোন স্থলে ঘুষ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, কারণ ইহা দিলেও ফলাফলের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। ফ্রান্সে ইহার রেওয়াজ থাকিলেও ইংল্যাণ্ডে ১৮৮২ সনে আইন করার পূর্ব্বে উহা যত প্রবল ছিল তত প্রবল নহে, অথবা যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার কোন কোন অঞ্চলে এখন যেরূপ আছে সেরূপ নহে। ভোট পাইবার জন্য ভোজ দেওয়ার প্রথা বিশেষ প্রচলিত নাই, যদিও গ্রামের সরাইখানা রাজনৈতিক সমিতিগুলির সম্মিলন-ক্ষেত্র বিশেষ। ফ্রান্সে সম্ভবত ভোটের জন্য অন্যায়ভাবে খরচপত্র করার অভ্যাস ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ব্রাইসের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে অগ্রসর-মতাবলম্বী ব্যক্তিরাই অধিকতর ভোট পাইতেছেন, অথচ ইঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র, নির্ব্বাচনের জন্য টাকা খরচ করিতে অপারগ এবং দলের নিকট হইতেও কোন টাকা-পয়সা সাহায্য পান না। কখনো কখনো বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান কোন কোন দলের জন্য চাঁদা দিয়া থাকে, কিন্তু আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিবার পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপে যে প্রভূত পরিমাণ টাকা খরচ হইত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। কোন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিগণ মাঝে মাঝে সভা ভাঙিবার উদ্দেশ্যে কাজে বাধা দিলেও, ফ্রান্সের অধিকাংশ স্থলে মনিবেরা অথবা জমিদারেরা ভয় প্রদর্শন বা জোর করিয়া ভোট আদায় করেন না। কিন্তু পশ্চিমে কোন কোন অঞ্চলে প্রজার উপর জমিদারের, মজুরদের উপর নিযুক্তকারীর এবং গ্রামবাসীদের উপর পুরোহিতের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আজকাল

সরকারী চাকুরেরা সোজাসুজি কোন নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে দাঁড় করাইয়া ভোট ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় না, কিন্তু যখন যে দলের হাতে মন্ত্রিত্ব থাকে, সেই দলের কোন ব্যক্তি যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন সেজন্য দেপার্তমাঁর শাসক হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তা-সংস্কারক পর্য্যন্ত সকল সরকারী কর্ম্মচারী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সাক্ষাৎভাবে ভোটদাতাদের উপর চাপ দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু জিলা মহকুমায় সরকারের ইচ্ছাটা জানিতে কাহারো বাকী থাকেনা এবং সরকারের ইচ্ছা পূরণ হইলে লোকদের ভোগ্যে যে জলের কল হইতে আরম্ভ করিয়া টাউন হল বা পুল ইত্যাদি পাওয়া শক্ত না হইতে পারে তাহাও অজ্ঞাত থাকে না। ফ্রান্সের পার্ল্যামেণ্টে দলাদলির কোন স্থিরতা নাই, অনেক দল রহিয়াছে বলিয়া এক একটি ভোটেরও কদর অনেক। সেইজন্য মন্ত্রীরা যাঁহাদের নিকট সমর্থন পাইবেন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে যতজনকে সম্ভব সুখী রাখিতে চেষ্টা করেন। কোন নির্ব্বাচন-প্রার্থী নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করিলে জিলা-শাসক বা তাঁহার সহকারীর সাহায্য দাবী করা তাঁহার পক্ষে প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ইস্কুল মাষ্টারের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া তাঁহারও সহায়তা প্রার্থনীয়। কিন্তু পুরাতন মন্ত্রীদের সমর্থন করায় বিপদ্‌ও আছে। নির্ব্বাচনের পরে তাঁহাদের ক্ষমতা বজায় থাকিবে কি না কেহ বলিতে পারে না। তখন ক্ষমতা বজায় না থাকিলে যাহারা তাঁহাদের সমর্থন করিয়াছিল তাহারা নূতন দলের অপ্রীতিভাজন হইতে পারে। সুতরাং অনেক সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা মন্ত্রিদের নির্ব্বাচিত ভোট-প্রার্থীদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা নাও করিতে পারে। তবে সাধারণত সরকারের সমর্থনকারীদের সুবিধাই কিছু বেশী।

নিয়ম না মানা, প্রবঞ্চনা অথবা অন্যায় প্রভাবের জন্য কোন নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করিলে তাহা বিচারার্থ প্রথম প্রতিনিধি-সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক সমিতিতে আসে। এই সমিতির সভ্যগণকে লটারি করিয়া মনোনীত করা হয়। তারপর সমগ্র প্রতিনিধি-সভা বিচার করিতে বসে। কখনো কখনো সমিতি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া সুবিচার করিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিনিধি-সভার অধিকাংশ সভ্য প্রায়ই দলের মতামত অনুসারে নিজেদের মতামত দিয়া থাকেন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এখানে ফ্রান্সের একটা গুরুতর পার্থক্য দেখা যাইবে। ইংল্যাণ্ডে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আনিলে সাধারণ আদালতে তাহার বিচার হয়, এবং সে বিচারকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভা এই বিচার-ক্ষমতাটাকে তাহাদের কর্ত্তৃত্বের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে ও ইহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়।

প্রতিনিধি-সভার সভাপতি।

নব-নির্ব্বাচিত হইলে প্রতিনিধি-সভা জানুয়ারী মাসে বসে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই সভার কার্য্যকাল ৪ বৎসর। এ পর্য্যন্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে একবার মাত্র সভা ভাঙিয়া দেওয়া দরকার হইয়াছিল। আইন অনুসারে প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ ৫ মাস ইহার বৈঠক্ বসা চাই, কিন্তু কার্য্যকালে ইহার বৈঠক পাঁচ মাসের অধিককালও হইয়া থাকে। রাষ্ট্রনেতা প্রতিনিধি-সভার অনন্যসাধারণ বৈঠক আহ্বান করিলেও সাধারণ বৈঠকসমূহ এই সভার নিজ সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হয়।

ফরাসী প্রতিনিধি-সভার সভাপতি ইংল্যাণ্ডের জন-সভা (হাউস্ অব্ কমন্‌স্)র সভাপতির

(স্পীকার'এর) মত একজন দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি নহেন। তাঁহার সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার সভাপতির কতকটা মিল আছে। তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনতা আশা করা যায় না। তিনি কখনো কখনো প্রতিনিধি-সভার সদস্যদিগকে বিদ্রূপে বা কঠোর বাক্যে জর্জ্জরিত করেন। সভাপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি যে দলের লোক ছিলেন তাহার প্রতি তাঁহার টান থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সভাপতি বৈঠকের আলোচনা ইত্যাদিতে যোগ না দিলেও, তিনি নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করেন, গণতন্ত্রের রাষ্ট্রনেতা হওয়া অথবা মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য আহূত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নয়। ৬ জন সহকারী সভাপতি, ৮ জন সম্পাদক ও ৩ জন কেষ্টোর (আর্থিক বিষয় আলোচনার জন্য) লইয়া একটি বিউরো (বা সমিতি) মোতায়েন আছে। বলা বাহুল্য, এই বিউরোর সকলেই প্রতিনিধি-সভা হইত নির্ব্বাচিত হন।

সমিতির সাহায্যে শাসন পরিচালনার প্রথা।

ফরাসী সভাদ্বয় বিউরো নামে কতকগুলি শাখায় বিভক্ত। রাষ্ট্র-সভায় এইরূপ বিউরোর সংখ্যা ৯ ও প্রতিনিধি সভায় ১১। প্রত্যেকটি বিউরোতে সমানসংখ্যক লোক থাকেন এবং প্রত্যেক মাসে লটারীর দ্বারা নিযুক্ত হন কিন্তু কোন সভ্যই একের অধিক বিউরোতে থাকিতে পারেন না। ফ্রান্সের এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন। বিভিন্ন বিউরো পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বসে। ইহাদের কাজ হইল তিনটি। প্রথমত প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের গুণাগুণ পরীক্ষা করা। দ্বিতীয়ত কোন কমিটি বা সমিতিতে পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রতিনিধি-সভায় উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন বিলের আলোচনা করা (বাস্তবিক পক্ষে কোন্ কোন্ সভ্য বিলের পক্ষে এবং কাহারা বিপক্ষে, ইহাই শুধু জানিবার চেষ্টা করা হয়)। তৃতীয়ত সমিতি গঠন করা—উভয় সভার প্রায় সমস্ত সমিতি একই ভাবে গঠিত হয়। প্রত্যেক বিউরো নিজেদের মধ্য হইতে একজন করিয়া সভ্যকে নির্ব্বাচিত করে এবং এইরূপ সভ্যদের সকলকে লইয়া এক একটি সমিতি গঠিত হয়। কোন কোন গুরুতর সমিতিতে বেশী সভ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সেজন্য কখনো কখনো প্রত্যেক বিউরো দুইজন অথবা তিনজন সভ্যও নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। তবে যেখানে একের অধিক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করা হয় সেখানে প্রতিনিধি-সভার ভোট দ্বারা স্থির করা হয় প্রত্যেক বিউরো হইতে কয়জনকে লওয়া হইবে। বাজেট সমিতির জন্য প্রতিনিধি-সভার প্রত্যেক বিউরো হইতে ৩ জন ও রাষ্ট্র-সভার প্রত্যেক বিউরো হইতে ২ জন করিয়া নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং প্রতিনিধি-সভার সমিতিতে থাকেন ৩৩ জন ও রাষ্ট্র-সভার সমিতিতে ১৮ জন। বাজেট সমিতি ও সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষক সমিতি হয় স্থায়ী সমিতি, বৎসর খানেক ধরিয়া তাহাদের আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অন্যান্য কয়েকটি সমিতি (স্থানীয় ব্যাপার, আবেদন, ছুটি, পার্ল্যামেন্টের সভ্যদের বিল উপস্থাপিত করিবার অনুমতি দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধীয়) মাস খানেক কাজ করিবার পর আবার নূতন সমিতি গঠিত হয়। কার্য্যত সৈন্য-বিভাগ, শ্রম-বিভাগ, রেলরোড সম্বন্ধীয় সমিতিগুলি এক বৎসরের জন্য স্থায়ী সমিতিরূপেই কাজ করিয়া থাকে।

ফরাসী সমিতিগুলি বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট ও আমেরিকার কংগ্রেসের সমিতিসমূহের মত হইলেও, গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। একণে প্রত্যেক কমিটিতে বিভিন্ন দল নিজ নিজ লোক-

সংখ্যার অনুপাতে লোক নির্বাচন করিয়া পাঠায়। প্রত্যেক বিল সভায় উপস্থাপিত করা হইলে সমিতির নিকট বিচারার্থ আসে। সমিতি উপস্থাপকের যুক্তিতর্ক শুনিয়া ইচ্ছা করিলে বিলটির আগাগোড়া পরিবর্তন করিয়া দিতে পারে। সমিতির একজন সভ্যকে রিপোর্টার বা বিবরণী-দাতা বলা হয়। তাঁহার কাজ হইল সংশোধিত বিলটিকে সংশোধনের কারণগুলি দেখাইয়া প্রতিনিধি-সভার নিকট দাখিল করা। যখন এই বিল প্রতিনিধি-সভার সম্মুখে আলোচনার জন্ত উপস্থিত হয় তখন তিনিই এই বিলটির ভার লন, বিলের প্রথম উপস্থাপক মন্ত্রী হইলেও এ সময়ে তাঁহার আর কোন হাত থাকে না। রিপোর্টার শক্তিশালী ব্যক্তি এবং এই অবস্থায় শক্তিমত্তা দেখাইবার যথেষ্ট অবকাশ পান।

ইংল্যাণ্ডে অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিগুলি শাসন-কার্য্যের সহায়ক পরামর্শ-সভা মাত্র, কিন্তু ফরাসী সমিতিসমূহের হাতে রাজ্যের কতকটা শাসনভার অর্পিত আছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সের মন্ত্রিগণ এই সমিতি-নিরপেক্ষভাবে কোন কাজই করিতে পারেন না। সমিতি যদি সমর্থন করে তবেই তাঁহারা নিজ নিজ আইন পাশ করিবার জন্ত আনিতে পারেন। বিভিন্ন সমিতিতে সব সময়ে মন্ত্রিদের দলের লোকেরাই থাকেন না। এমন কি প্রতিকূল দলের লোকও বেশী থাকিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কোন আইনের খসড়ার চেহারা বিলকুল বদ্‌লাইয়া দিতে পারেন। মন্ত্রীরা যাহা চান তাহার বিপরীত অর্থযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। বাধা দিবার কেহ নাই। আর তাহা করার অর্থ মন্ত্রীদের বিলটিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া। বাজেট কমিটির কাছে মন্ত্রীদের কম ভুগিতে হয় না। ফলে অনেক সময় এমন হয় যে, সমিতির হাত ঘুরিয়া পরিবর্তিত আকারে যে বিলটি প্রতিনিধি-সভার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা মন্ত্রীদের আনীত বলা চলে না। সে বিলের জন্ত মন্ত্রীদের দায়ী করিলেও সমীচীন হয় না। অথচ সমিতিগুলিকে ধরা ছোঁয়া পার্ল্যামেণ্টের পক্ষে অসম্ভব—সমিতিগুলি সভাদ্বয়ের প্রভাবের অধীন নহে। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, ফ্রান্সে মন্ত্রীদের কাজ করিবার ক্ষমতা ত সঙ্কীর্ণ বটেই, তাঁহারা প্রতিনিধি-সভার সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ দলের প্রতিনিধি হইয়াও নিজেদের প্ররোচনায় কোন আইনকানুন প্রণয়ন করিতে পারেন না, সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত বিল ইত্যাদির জন্তও ততখানি দায়িত্ব বোধ করেন্ না।

ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের পার্থক্য অনেক। মন্ত্রীদিগকে প্রশ্ন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মন্ত্রি-সমিতি কর্তৃক অবলম্বিত কোন নীতি বুঝা সহজ, কারণ তাহা সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি হইতে বুঝা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা মন্ত্রীদের অনুষ্ঠিত কাজের বা অন্ত দরকারী সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহা পাইতে হইলে প্রশ্ন করিয়া জানিতে হয়। অবশ্য প্রশ্নের আগেই নোটিস্ দেওয়া নিয়ম। ইংল্যাণ্ডে জন-সভাতে এই ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া মন্ত্রীদের কাজ-কর্ম্ম বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, অনেক সময় তাঁহাদের অযথা বিরক্তও করা হয়, কিন্তু মন্ত্রীরা উত্তর দিলেই ব্যাপার চুকিয়া যায় (যদিও ঐ সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো নূতন প্রশ্ন তোলা সম্ভবপর), সেই বিষয় লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা ও ভোটাভোটি করা হয় না। ফ্রান্সে প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ মন্ত্রীদিগকে শুধু প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না,

সওয়াল-জবাব।

তাঁহাদের কাছে মন্ত্রি-সমিতিকে অনেক কাজের জবাবদিহি করিতে হয় ও প্রতিনিধি-সভা তাঁহাদের বিচার করিতে পারেন। ইহাকে "ইন্টারপেলেশন" বা সওয়াল-জবাব বলে। কোন প্রশ্ন করিতে হইলে মন্ত্রীদের সম্মতি লইয়া করিতে হয়, কিন্তু সওয়াল-জবাবের বেলায় প্রতিনিধি-সভার যে কোন সদস্য উত্থাপিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মন্ত্রি-সমিতিকে বিব্রত করিতে পারেন। প্রশ্নের বেলায় প্রশ্নকর্ত্তা মন্ত্রীর জবাবের পর পাল্টা প্রশ্ন দিতে পারেন। সওয়াল-জবাবের পর প্রায়ই আলোচনা করা ও প্রস্তাব আনা হয়। ফ্রান্সে অনেকবার এমন হইয়াছে যে, এই সওয়াল-জবাবের ফলে মন্ত্রি-সমিতি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাধারণত প্রস্তাব এই ভাবে আনা হয় যে, পরবর্ত্তী প্রস্তাবের বিবেচনা করা হউক, অথবা "প্রতিনিধি-সভা গবর্ণমেন্টের কার্য্য-প্রণালীর সমর্থন করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে।" এই প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তবে মন্ত্রীদের আর কোন ভয় নাই। কিন্তু গৃহীত না হইলে ও মন্ত্রি-সমিতি সে বিষয়ের বিশেষ গুরুত্ব আছে বিবেচনা করিলে পদত্যাগ করিয়া থাকেন। সওয়াল-জবাবের পর প্রস্তাব অনেক আকারে আনা হইয়া থাকে। মন্ত্রি-সমিতি সাধারণত তাঁহাদের পক্ষে অনুকূল প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যেটা বাছিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাবের উপর ভোট লওয়া হউক, তাহাতেই ভোট লওয়া হয়। কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রস্তাব ভোটে গৃহীত না হইলে তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে পদত্যাগ করিয়া থাকেন।

ফরাসী প্রতিনিধি-সভা অল্পকাল স্থায়ী।

বলা বাহুল্য যে, বহু-দল-বিভক্ত ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভা এই প্রকার সওয়াল-জবাবের ফলে সর্ব্বদা অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। সওয়াল-জবাবের পর দেখা গিয়াছে অনেক সময়ে অবশ্য সামান্য কারণেও মন্ত্রি-সমিতি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকার ব্যবস্থায় মন্ত্রি-সমিতি স্বল্প-স্থায়ী হইলেও তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বস্তুত ফ্রান্সে যে ঘন ঘন মন্ত্রি-সমিতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তার একটি কারণ এই সওয়াল-জবাব।

ফ্রান্সে অল্পসংখ্যক বিলই আইনে পরিণত হয়।

প্রতিনিধি-সভার কাজ হইল তিনটি (১) আইন প্রণয়ন, (২) শাসন-কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগের সমালোচনা, (৩) মন্ত্রীদিগকে স্থানচ্যুত করা। প্রতি বৎসর পাশ হইবার জন্য রাশি রাশি বিল উপস্থাপিত করা হয়, কিন্তু তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র আইনে পরিণত হইতে পারে। নিজ নিজ ভোট দাতাদের খুসী রাখিবার জন্য প্রতিনিধি-সভার সদস্যেরা বৎসর ধরিয়া অসংখ্য বিলের খসড়া আনেন। এই সব বিল সহজেই "প্রথম ও দ্বিতীয় বার পড়া" হইয়া যায়, কিন্তু সমিতিতে উহারা এভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, পূর্ব্বেকার আকৃতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। মন্ত্রীরা কোন গুরুতর বিষয়ে বিল আনিলে তাহা পাশ হইবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাও সমিতি হইতে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ফিরিয়া আসে যে তাহা আর চিনা যায় না। মোটের উপর অল্পসংখ্যক বিলই পাশ হয়। তাহাতে এমন হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক সময় গুরুতর সমস্যাও দিনের পর দিন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশেও যে এরূপ হয় না তাহা নহে, কিন্তু ফ্রান্সে বেশী হয়। ফ্রান্সের সমিতি ও দলাদলি ইহার একটি কারণ। অন্য গুরুতর কারণ হইল ফরাসী সিভিল কোড্ বা দেওয়ানী আইন। এই আইন এরূপ বিস্তৃত যে, ফরাসীরা সহজে ইহার বাহিরে নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয় না।

অথচ নব আর্থিক ব্যবস্থার ফলে অনেক নূতন সমস্যার উদয় হইতেছে, ফরাসী আইনে তাহার জন্য ভাবিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি ফরাসীরা সহজে নূতন আইন তৈরী করিতে দেয় না। ফরাসী চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব এই যে, গুরুতর আইন প্রণয়নের কালেও তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ জাগরিত হয় না, সদস্যেরা দলে দলে গিয়া উপস্থিত হন না। ব্যক্তিগত ব্যাপার ও যে সব কারণে গভর্ণমেণ্ট অদল বদল হইতে পারে সে সব তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোথায় কোন্ মন্ত্রী কি ভুল করিলেন অথবা তাঁহার অবলম্বিত নীতিতে কি গলদ্ রহিল তাহা লইয়া প্রতিনিধি-সভায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাদানুবাদ করিতে তাঁহাদের ভাল লাগে। "ইণ্টারপেলেশন" বা সওয়াল-জবাবের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রতিনিধি-সভায় ব্যবস্থা-প্রণয়ন ও আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিদিগের যত না পতন হয়, সওয়াল-জবাবে তার চেয়ে বেশী পতন হইবার সম্ভাবনা। তবে সুখের কথা এই যে, ফ্রান্সে পররাষ্ট্র লইয়া বাদানুবাদ বা মন্ত্রিদের পতন হয় না। ঘরোয়া ব্যাপারে যাই হোক্, জগতের সাম্নে ফ্রান্স এককাট্টা হইয়া দেখা দেয়।

প্রতিনিধি-সভার সদস্যের কাজ

প্রতিনিধি-সভার সদস্যের কাজ সভাতেই ফুরাইয়া যায় না। সদস্যগিরি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার অঞ্চলস্থ ভোটদাতাগণের জন্য হরেক রকম ফরমায়েস খাটিতে হয়। শাসন-কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না রাখিয়া উপায় নাই। কারণ মন্ত্রীদের কাছ থেকেই সরকারী চাকরী হইতে আরম্ভ করিয়া তামাকের লাইসেন্স পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। "পল্লীর বা মহকুমার রাস্তা বা পুল আবশ্যক হইলে, শিলাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য চাষী ক্ষতিপূরণ চাহিলে, করদাতা করগ্রহীতার ক্ষমতা সম্বন্ধে আপত্তি করিলে, কোন ছাত্রের পিতা তাঁহার পুত্র পরীক্ষায় খারাপ লেখার দরুণ তাহার জন্য সুপারিশ করিলে, মোকদ্দমাকারী তাহার হইয়া বিচারকের নিকট সুপারিশ করিলে, ভোটদাতা সদস্যকে লেখে, সদস্য মন্ত্রীদের নিকট যান এবং তাঁহার এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর তাঁহার সদস্যপদের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে।" (ব্রাইস্)

মন্ত্রী, সদস্য ও দলের পরস্পর সম্পর্ক।

মন্ত্রী ও সদস্যদের এই প্রকার অবস্থাটা বিশেষ সুখকর নহে। সদস্য ভোটদাতাকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না, মন্ত্রী আবার সদস্যের কথা না শুনিলে প্রতিনিধি-সভায় ভোটের কালে তাঁহার বিরুদ্ধে ভোটের ফলে নিজের স্থান বজায় রাখা কঠিন বা অসম্ভব হইতে পারে, কারণ ফ্রান্স বহু দলে বিভক্ত থাকার দরুণ এক একটি ভোটেরও মূল্য অনেক। সদস্য ও মন্ত্রীর আরো এক বন্ধন হইতেছে দল। দলের দিকে চাহিয়াও তাঁহাদের কাজ করিতে হয়। ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থা অতিশয় কেন্দ্রীকৃত বলিয়া সদস্য ও মন্ত্রিগণকে এতটা উদ্ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্থানীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করা, বা স্থানীয় কাজের খরচা বহন করা পর্য্যন্ত প্যারিস্ হইতে হয়।

যে জিলা হইতে প্রতিনিধি-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন, সেখানে তাঁহার বাসস্থান থাকা বাঞ্ছনীয় হইলেও অত্যাবশ্যক নয়। আমেরিকায় কোন ব্যক্তি কোন জিলায় জন্মগ্রহণ না করিলে বা তাঁহার বাসস্থান না হইলে তাঁহার পক্ষে সেই স্থান হইতে সদস্য হইবার জন্য দাঁড়ানো সম্ভবপর নহে। কিন্তু ফ্রান্সে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিজ জিলার বাহিরে অন্য

জিলা হইতেও অনেক সময় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে প্রতিনিধি-সভার অধিকাংশ সভ্যই যে সকল স্থানে তাঁহাদের প্রথম জীবন কাটাইয়াছেন সেখান হইতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকেই প্রথমে স্থানীয়-সমিতিতে প্রবেশ করিয়া পল্লী, মহকুমা ও জিলায় পরিচিত হন; পল্লীর মেয়র রূপে কাজ করেন; এবং স্থানীয় কোন দলের ব্যক্তিরূপে যথাসাধ্য স্থানীয় স্বার্থের দিকে টানিয়া কাজ করেন। ডাক্তার হইলে বিনা পয়সায় রোগ দেখিয়া আর উকীল হইলে বিনা পয়সায় লোকের মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া অনেকে জনপ্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। মোট কথা কোন্ ব্যক্তি কত বেশী ভোট পাইবেন তাহা তাঁহার নিজের উপর নির্ভর করে। ফরাসী সদস্যেরা সাধারণত ভোটদাতাদের জন্য বিশেষ টাকা-পয়সা খরচ করিবার মত অবস্থাপন্ন নহেন, যদিও যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা করিয়া থাকেন। এখানে ইংল্যণ্ডের সহিত ফ্রান্সের কতকটা পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কোন নির্ব্বাচন প্রার্থী-আপনাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাপন্ন করিতে পারিলে তাঁহার দলের জিলাস্থ সমিতি তাঁহাকে দাঁড় করায়, সমাজতন্ত্রবাদী দল ছাড়া আর কোন দল কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে লোক বাছিয়া পাঠায় না, ভোটযুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সাও যোগায় না। ফলে দু'একটি বড় বড় সহর ছাড়া নির্ব্বাচনপ্রার্থিগন সাধারণত স্থানীয় সুখদুঃখের কথা লইয়া বেশী মাথা ঘামাইয়া থাকেন, বক্তৃতা ইত্যাদিতে তাঁহার জিলার জন্য তিনি কি কি করিবেন তাহাই ফলাও করিয়া বর্ণনা করেন, গোটা দেশের জন্য কি করিবেন না করিবেন তাহা কেহ বড় একটা শুনিতে চায় না। দলপতির নাম লইয়াও কেহ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নামেন না। মাঝে মাঝে কোন নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে বেশ উত্তেজনা, এমন কি দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া গেলেও সাধারণ ফরাসী প্রজার ভোট সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ নাই। রবিবারে অনেকে নিজেদের আমোদপ্রমোদ ছাড়িয়া ভোট দিতে আসা দরকার বলিয়া মনে করে না। বৃটেন, সুইট্‌স্যরল্যাণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় যাহারা নির্ব্বাচন সময়ে আসিয়া ভোট দেয় তাহাদের সংখ্যা কম। তবে যাহারা ভোট দিতে পারে তাহাদের ৬০% সর্ব্বদাই ভোট দিয়া থাকে। ১৯১৯ সনের নির্ব্বাচনে ৭০% ফরাসী ভোটদাতা ভোট দিয়াছিল।

সদস্য নির্ব্বাচন ও তাঁহার গুণাবলী।

কোন ভোটপ্রার্থী একবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে, তখন তাঁহার চেষ্টা হয় কি করিয়া সে স্থান বজায় রাখিবেন। তাঁহার অঞ্চলে বিশেষত গ্রাম্য ও আধা-গ্রাম্য অঞ্চলে যে সব লোকের চেষ্টা ও যত্নের ফলে তিনি নির্ব্বাচিত হন তাঁহাদের জন্য তাঁহাকে অনেক প্রকার কাজ করিয়া দিতে হয়—তাঁহাদের ছেলে ও জামাইয়ের জন্য চাকরী করিয়া দেওয়া থেকে আরম্ভ করিয়া ছাতা কিনিয়া দেওয়া বা দাই জোগাড় করা তাঁহার কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার ভোটদাতাদের নানাপ্রকার ফাইফরমাস্ তামিল ত করিতে হয়ই, উপরন্তু প্রতিদিন তাঁহার অনেক সময় তাঁহাদের বাজে বিষয়ে লিখিত চিঠির জবাব দিতে যায়। (ব্রাইস্)

সদস্যের স্থায়ী হইবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে সদস্যদের অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও ফরাসী প্রতিনিধি-সভার সদস্যের পদ সকল ফরাসীর নিকটই বাঞ্ছনীয় বস্তু। যে নয় শতের উপর ব্যক্তি ফরাসী দেশ শাসন করিতেছেন, তিনি তাঁহাদেরই একজন। তাহা ছাড়া একদিকে ভোটদাতাগণ

তাঁহার কর্ত্তা হইলেও, অন্য দিকে তিনি তাঁহাদের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। জিলার সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান খুব বেশী, সর্ব্বত্র তাঁহার খাতির এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই বহু লোককে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন, এইজন্য লোকে তাঁহাকে আপ্যায়িত করে। সুতরাং তিনি যদি জিলার যাহাদের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হন তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া না করেন, অথবা তাঁহার নামে কোন বদ্‌নাম না রটে, তবে তাঁহার পক্ষে পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচিত হওয়া বিশেষ কষ্টকর হয় না। এবং বয়স হইলে প্রতিনিধি-সভা হইতে পরে রাষ্ট্র-সভায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুগম হয়। ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও যে সদস্য পার্ল্যামেণ্টে আছেন পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে সচরাচর তাঁহাকেই সেখান হইতে দাঁড় করানো হইয়া থাকে। কিন্তু ১৯১৯ সনের আইন-সংস্কারের ফলে ৩৪০ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

সদস্যের মান ও প্রতিপত্তি।

একবার প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে সদস্যের চেষ্টা হয় কেমন করিয়া সকলের সঙ্গে বনিবনাও করিয়া চলিবেন। সেজন্য তাঁহার প্রথম কাজ হইল এক বা অধিক কমিশনে স্থান করিয়া লওয়া। দ্বিতীয় কাজ হইল যত জন লোকের সঙ্গে সম্ভব বন্ধুত্ব স্থাপন করা। কারণ, যত বেশী লোক তাঁহার অনুকূল হইবে ততই তাঁহার পদের স্থায়িত্ব বাড়িবে। তিনি সাধারণত কোন না কোন দলে যোগ দিয়া থাকেন।

যদিও প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে নির্ব্বাচিত হন ও তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ মতামত থাকাই সম্ভব, তথাপি প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ তীক্ষ্ণধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ফরাসীগণ অতি সত্বর পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। সেজন্য ফরাসী প্রতিনিধি-সভায়, বিশেষত সঙ্গীন মুহূর্ত্তে, যে সব বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক হয় সেগুলি উৎকৃষ্ট ধরণের। সাধারণত ফরাসী সভার বাদানুবাদ উগ্র হইলেও মারামারি পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায় না। ইংল্যাণ্ডের জনসভায় (হাউস্ অব্ কমনস্) ও আমেরিকার কংগ্রেসে কয়েকবার হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল আগে বুডাপেষ্টে ত দুই পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া রীতিমত হাতাহাতি হইয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এরূপ উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই। সভায় বসিয়া দুই পক্ষ উভয়ে উভয়কে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিলেও, সভার বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্যের পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। এমন কি, কখনো কখনো দেখা গিয়াছে তীব্র বিবাদের পর সভা হইতে বাহির হইয়া সদস্যগণ একে অন্যকে তাঁহার বক্তৃতার সরসতার জন্য প্রশংসাবাদ করিতেছেন।

প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ বৎসরে ৬২,০০০ ফ্রাঁ (প্রায় আট হাজার টাকা) করিয়া পাইয়া থাকেন। আগে এই তঙ্কার পরিমাণ ৬,০০০ ফ্রাঁ ছিল, ১৯০৬ সনে দেশের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ নিজেদের তঙ্কা বাড়াইয়া ১৫,০০০ করেন। তারপর আরো বাড়িয়াছে। উভয় সভার সদস্যেরা সমস্ত রেলওয়েতে বিনা পয়সায় ভ্রমণ করিতে পান, তাঁহাদের খরচা রাষ্ট্র বহন করে। ১৯০৫ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে পূর্ব্বতন সভ্য ও তাঁহাদের বিধবা, সন্তান ইত্যাদির ভরণপোষণের জন্য একটি দাতব্য ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে। কখনো কখনো ইঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে যে, ইঁহারা রাজনীতিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন কি না। কেহ কেহ হয়ত করেন। জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি-সভায়

অল্প লোকই প্রবেশ করিয়াছেন, যদিও অনেকেই একবার প্রবেশ করিয়া নিজের পূর্ব্ব জীবিকার্জ্জনের পথ ত্যাগ করায় এই টাকা ছাড়া আর উপার্জ্জনের পথ থাকে না। টাকা লওয়ার জন্ম যে সদস্যদের আদর্শ খাটো হইয়া গিয়াছে তাহা বলা চলে না, তবে কেহ কেহ যে এজন্য আপনার সদস্যপদ বজায় রাখিতে চেষ্টিত হন ও তজ্জন্য তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সদস্যগণ বৎসরে একবার করিয়া ভোটদাতাগণের নিকট কি করিয়াছেন না করিয়াছেন তাহার তালিকা দাখিল করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্যাপারে যাহা করিয়াছেন তাহারই উপর তাঁহার স্থায়িত্ব সচরাচর নির্ভর করে।

মন্ত্রি-সমিতি

এমন কোন আইন নাই যে ক্যাবিনেট্ অর্থাৎ মন্ত্রি-সমিতির সভ্যগণকে কোন না কোন সভার সভ্য হইতে হইবে। কিন্তু প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, মন্ত্রি-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তি হয় রাষ্ট্র-সভার নয় প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইবেন। যখন তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের অবসান হয় তখন আবার তাঁহারা সরকারের প্রতিপক্ষরূপে তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করেন। ইঁহারা অবশ্য ইঁহাদের দলের হাতে ক্ষমতা আসিলে পুনরায় মন্ত্রী হইতে পারেন। এইখানে ফ্রান্সের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সাদৃশ্য আছে। ঐ সব স্থানের প্রত্যেক মন্ত্রী পার্ল্যামেণ্টে বসেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সেখানে মন্ত্রিগণের পার্ল্যামেণ্টে না বসাই দস্তুর।

গঠন-প্রণালী। কোন দলপতিকে যখন মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিবার জন্ম আহ্বান করা হয় তখন তিনি নিজের দল হইতেই অধিকাংশ সহকারী মনোনয়ন করেন, কিন্তু গণতন্ত্রবাদী অন্য দু একটি দল হইতেও তিনি লোক বাছিতে পারেন। ইঁহাদের সহিত মতভেদ এত কম থাকে যে, সমগ্র মন্ত্রি-সমিতি একপ্রাণ হইয়া প্রতিপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। স্বার্থরক্ষা ইহার একটা কারণ, অন্য কারণ গণতন্ত্রবাদী বিভিন্ন দলের পরস্পর পার্থক্য তেমন গভীর নহে।

কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে লোকে ফরাসী দেশে মন্ত্রিত্ব লাভ করে তাহার সহজ জবাব এই যে, অন্যান্য দেশে যে সব সদ্গুণ দরকার ফ্রান্সেও তাহাই দরকার। কতকগুলি এই: দরকার মত তৎক্ষণাৎ সুন্দর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, সজীব মন, রাষ্ট্রনৈতিক কৌশল, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সকল রকম অপ্রীতিকর অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা। কোন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার সময় সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সুবিধা হয়, বিশেষত আয়ব্যয়, স্থল ও জল-সৈন্য-বিভাগে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার শক্তিই সব চেয়ে কার্য্যকরী হয়। মন্ত্রীদের বিশেষত প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও অক্ষুণ্ণ রাজনৈতিক যশ পরম সম্পদ্, কিন্তু এ দুয়ের ন্যূনতা থাকিলেও লোকে কখনো কখনো রাজনৈতিক জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হয়। (মন্ত্রীদের গুণ।)

আগেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সে যখন তখন মন্ত্রি-সমিতির পতন ঘটিয়া থাকে। বস্তুত মন্ত্রিগণ স্থায়ী হইতে পারেন না। ১৮৭৫ হইতে ১৯১৪ সন অবধি ৪৮ বার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং গড়ে ৯ মাস ২২ দিন হইল এগুলির কার্য্যকাল। ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তন

যতটা গুরুতর ব্যাপার ফ্রান্সে ততটা নয়। ফ্রান্সে জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইবার জন্যই মন্ত্রিত্বের পতন ঘটে না, অনেক সময় মন্ত্রি-সমিতি ঐ বিশ্বাসের উপর গঠিতও হয় না। বার বার এই প্রকার মন্ত্রিত্বের পতনের জন্য অনেক ফরাসী লেখক দুঃখ করিয়াছেন, এই ব্যবস্থা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ মন্ত্রীরা নিজ নিজ কাজ ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই অপসৃত হইতে বাধ্য হন, আইন-কানুন প্রণয়নে বাধা পড়ে এবং লোকে ব্যবস্থাপক সভাকে হীন চক্ষে দেখে।

কিন্তু অন্যান্য দেশে এইরূপ ঘন ঘন মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তনে যত ক্ষতি হইত ফ্রান্সে দুই কারণে তত ক্ষতি হয় না। (১) শাসন-ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য বাধা পাইলেও বিশৃঙ্খল হইয়া যায় না। কারণ শীর্ষদেশে কে বসিল বা না বসিল তাহা দ্বারা ফ্রান্সের শাসন-কার্য্য বিচলিত হয় না। সেখানে এমন এক শক্তিশালী আমলাতন্ত্র (ব্যুরোক্রেসী) গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তনে শাসন-যন্ত্র অচল হয় না। (২) ফ্রান্সের পর-রাষ্ট্র-নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ফরাসীর পর-রাষ্ট্র-নীতি শত্রুর সম্মুখে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত রাষ্ট্র হাজির করিতে সর্ব্বদা সমর্থ হয়।

ঘন ঘন মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে ক্ষতি।

ফ্রান্সের মন্ত্রি-সমিতি স্থায়ী না হইবার কোন কোন কারণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রতিনিধি-সভায় বহু দল ও উপদল, কিন্তু দলের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ও সহজে একদল হইতে অন্য দলে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য, রাজনৈতিক সঙ্কটের আকস্মিকতা, কোন মন্ত্রি-সমিতিকে ভাল না লাগার দরুণ দুই বিপরীত দলের সাময়িক মিলন, প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের পরিবর্ত্তন-প্রীতি বাহ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া কতকগুলি গভীরতর কারণ এই :

মন্ত্রিত্ব পরিবর্ত্তনের কারণ-নির্ণয়।

(১) কৃষিকার্য্যে যাহারা জীবনধারণ করে তাহাদের অধিকাংশই রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। ইহার ভাল ফল এই যে, সমগ্র জাতি রাজনীতির নামে নাচিয়া উঠে না, দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করে না এবং প্রতিনিধি-সভায় বিভিন্ন দলের রেষারেষিটা হাতাহাতিতে পরিণত হয় না। মন্দ ফল এই যে, প্রতিনিধি-সভার সদস্যেরা অনেক সময় স্বাধীনভাবে কাজ করেন, তাঁহাদের কাজের উপর চোখ থাকে না ও তাঁহারা জাতির নিকট নিজেদের দায়িত্ব বিস্মৃত হন। ইংল্যাণ্ড বা ক্যানাডার মত ফ্রান্সে রাজনৈতিক দল কাঠিন্য ও বিশালতা লাভ করে নাই, করিলে এখানেও কোন দলের পক্ষে অধিজনের ভোট পাইয়া দীর্ঘকাল শাসন-দণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হইত ও তাহাতে ন্যায্যভাবে ইহার দোষগুণের বিচার করা চলিত। সম্ভবত ইহার দায়িত্বজ্ঞানও বাড়িত।

(১) উদাসীনতা।

(২) শিল্প-প্রধান স্থানসমূহে, বিশেষত শিল্প-শালায় ও খনিতে, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করে তাহারা সাধারণত নিযুক্তকারীদের ও ধনীদের প্রতি বিরূপ। বাহিরের চাপে ফ্রান্সের অখণ্ড জাতীয়তা বজায় রহিয়াছে, নহিলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইত। পারিতে এবং অন্যান্য শিল্প-প্রধান স্থলেও উভয়ের মধ্যে বিবাদের কথা অনেক শোনা যায়। ইহার উপর, মজুর-শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেও অনেক মতভেদ রহিয়াছে।

(২) সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব।

(৩) বাঙ্গালা দেশে যেমন পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের মধ্যে কিছু ভেদ আছে, ফ্রান্সেও

(৩) স্থানভেদ।

সেইরূপ পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব্বের মধ্যে ভেদ আছে। রাজনৈতিক মতামতে ইহাদের পরস্পর অমিল এত বেশী যে, বড় বড় সমস্যা-বিষয়েও ইহারা একত্র কাজ করিতে পারে না।

(৪) ধর্ম্মমত।

(৪) কোথাও কোথাও লোকেরা উগ্ররূপ রোমান ক্যাথলিক, অন্য কোথাও বা সকল রকম ধর্ম্মবিদ্বেষী।

(৫) দলপতির অভাব।

(৫) গ্যাম্বেটার মৃত্যুর পর হইতে ফ্রান্সে সেরূপ দলপতি আর দেখা দেন নাই। অনেকে মনে করেন, গণতন্ত্রে দলপতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা ভুল। দলকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালনা করিবার জন্য গণতন্ত্রে দলপতির যেমন প্রয়োজন আর কোথাও তেমন নয়। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার প্রসিদ্ধ দলপতিগণ দেশের তাৎকালিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে ভালভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। কিন্তু ফ্রান্সে গ্যাম্বেটার পর এইরূপ দলপতির নাম করা যায় না। বস্তুত ফরাসী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, কেহ অন্য কাহাকেও বড় বলিয়া মানিতে চায় না। প্রত্যেক দলেরই একজন করিয়া দলপতি থাকেন বটে, কিন্তু তিনি দলকে জোরের সহিত নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করিবার সাহস করেন না।

মন্ত্রিগণের অসুবিধা।

যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভায় বসেন না, ফ্রান্সে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভায় বসেন। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ প্রায় নিজেদের কর্ম্মকুশলতার জন্য ততটা নিযুক্ত হন না যতটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলিয়া হন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতা অনেক সময় এই সব রাষ্ট্রকে খুসী রাখিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহাকেও মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করেন। চারি বৎসর কাজ করিবার পর যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী রাজনৈতিক গগন হইতে একেবারে সরিয়া যাইতে পারেন। তাঁহার নাম রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পর্কে আর একবারও না শোনা বিচিত্র না হইতে পারে। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রীর মন্ত্রিত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শেষ হইয়া যায় না। আর ফ্রান্সে ঘন ঘন মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনের ফলে এত লোক মন্ত্রী হইবার সুযোগ লাভ করেন যে, তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী মনোনয়ন করা শক্ত ব্যাপার নয়। ফরাসী রাষ্ট্রের নেতা ও উভয় সভার সভাপতির পদ অতিশয় কাম্য। তাহার পরেই মন্ত্রীর পদ। মন্ত্রীদিগকে সম্মানসূচক "হিজ্ এক্সেলেন্সি" বলা হয়। যখন কোন মন্ত্রী কোন প্রাদেশিক সহরে ভ্রমণ করিতে যান বা কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন তখন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কাগজে কলমে ফরাসী মন্ত্রীর ক্ষমতা খুব বেশী। কিন্তু কার্য্যত তাহার কিছু হ্রাস লক্ষিত হয়। প্রথমত বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান প্রয়োজন সচরাচর তাহা তাঁহার থাকে না। দ্বিতীয়ত কোন্ সময় কোন্ বিভাগে যে তিনি স্থানান্তরিত হইবেন তাহা তিনি জানেন না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দের সমস্ত কর্ম্মব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহারা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইলেও নিজেদের নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করেন না। নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতেই মন্ত্রীকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, তার উপর আবার এক দিকে প্রতিনিধি-সভায় প্রশ্ন ও সমালোচনার জ্বালা আছে, অন্য দিকে প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ নিজ নিজ ভোটদাতাগণের উপকারার্থে 'এটা করিয়া দাও' 'ওটা করিয়া দাও' বলিয়া নিয়ত বিরক্ত করিতেছেন। সুতরাং অনেক সময়

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজের মন্ত্রিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাকে সদস্যদের মন যোগাইতে হয়।

ফরাসী মন্ত্রীর চারিদিকে একটা অনুগত দল শীঘ্র গড়িয়া উঠে। এই দলের লোকেরা মন্ত্রীর ঘরোয়া লোকের মত হইয়া দাঁড়ান, সকলের উপর চোখ রাখেন ও কাহাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে না হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের অপ্রিয়। অন্য দিকে বর্তমান সময়ে ফ্রান্সের সর্বত্র সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সকল বিষয়েই পারি নগরীতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লওয়ার প্রথা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে কাজ বাধা পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়া ঘটনাস্থল হইতে দূরে থাকেন বলিয়া মন্ত্রী কর্মচারীদের শৈথিল্য বা চালাকির কথা ধরিতে পারেন না।

মন্ত্রি-সমিতির মন্ত্রিদের সংখ্যা নানা সময়ে নানা প্রকার হইয়াছে। তবে সাধারণত সদস্যের সংখ্যা ১৭ জনের বেশী হয় না।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল

প্রতিনিধি-সভার সদস্য, মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সমিতি,—এই তিনের উপর ফ্রান্সের শাসনভার অর্পিত আছে। সদস্য ও মন্ত্রীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে দল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ফ্রান্স বহু দলে বিভক্ত। ইংল্যণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে সুস্পষ্ট দুই বা তিন দল নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল দল প্রধান তাহাদের নাম এই:

ডিমোক্র্যাট্ (গণতন্ত্রবাদী)

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট র‍্যাডিকাল (স্বাধীন সমূল-পরিবর্ত্তনবাদী)

লেফ্ট্ রিপাব্লিকান্ ডিমোক্র্যাট্ (বামপন্থী স্বারাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক)

সোশ্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রবাদী)

র‍্যাডিকাল ও র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিষ্ট (সমূল-পরিবর্ত্তনবাদী ও সমূল-পরিবর্ত্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদী)

রিপাব্লিকান সোশ্যালিষ্ট ও ফ্রেঞ্চ সোশ্যালিষ্ট (স্বারাজ্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ও ফরাসী সমাজতান্ত্রিক)

রিপাব্লিকানস্ অব্ দি লেফ্ট্ (বামপন্থী স্বারাজ্যবাদী)

ডিমোক্রাটিক রিপাব্লিকান ইউনিয়ন (যুক্ত গণতন্ত্র ও স্বারাজ্যবাদী)

কনসারভেটিভ্ (রক্ষণশীল)

কমিউনিষ্ট (সমূহতন্ত্রবাদী)

দু একটি দলের লোকসংখ্যা বেশী হইলেও কোন দলই এমন নহে, অন্য দলের সাহায্য না লইয়া শাসন-কার্য্য চালাইতে পারে। যখন কোন দলের হাতে মন্ত্রিত্ব-গঠনের ভার দেওয়া হয় তখন সেই দল অভিজনের দল বলিয়া দেওয়া হয় না, এইরূপ মনে করিয়া দেওয়া হয় যে, ঐ দল অন্যান্য বিভিন্ন দলের সহানুভূতি ও পোষকতা লাভ করিতে পারিবে ও স্থায়িভাবে

শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সে এক বা বহু দলের মতিগতি বদলাইতে বেশী সময় লাগে না বলিয়া মন্ত্রিত্বের পতনও ঘন ঘন হয়।

তবে উপরে যে কম বেশী ১০টি দলের নাম করা গেল, ইহাদিগকে মোটামুটি চারিটি বড় দলের শাখা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই চারিটি বড় দল হইতেছে: (১) রাজতন্ত্রবাদী, (২) নরমপন্থী স্বারাজ্যবাদী, (৩) অগ্রসর স্বারাজ্যবাদী, (৪) সমাজতন্ত্রবাদী। বলা বাহুল্য, ফরাসী দল সম্বন্ধে কোন কথা বলা সহজ নহে, কারণ ভবিষ্যতে এই সব দলের কি প্রকার অবস্থা হইবে, এগুলি সংখ্যায় বাড়িবে বা কমিবে তাহা অনুমান করা যায় না।

বিভিন্ন দলের লোকেরা দুই সভায় আছেন। ইঁহাদের স্বার্থ রক্ষা ও পুষ্ট করা ভিন্ন ভিন্ন দল কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। দলের যে সব লোক সভাতে আছেন কোন না কোন প্রতিনিধি-সভার সমিতি (কমিশন)তে তাঁহাদের প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া দলের কাজ। নূতন প্রধান মন্ত্রীর মতামতের তুল্য মতামত কোন দলের থাকিলে প্রধান মন্ত্রী সেই দলের দুএক জন লোককে মন্ত্রি-সমিতিতে লইয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং শুধু রাজনৈতিক মতামত বা ভোটদাতাদের দিকে চাহিয়াই কোন ফরাসী সদস্য কোন দলে যোগ দেন না, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখেন ঐ দলে যোগ দিলে ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের কি সুবিধা হইবে। যাঁহারা কোন দলের নন তাঁহারাও এইরূপে নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হন। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া সভাপতি ও একটি সমিতি আছে বটে, কার্য্যকালে ভোট লওয়াও হয়, কিন্তু ইংরেজদের মত তাহাদিগকে সভার ভোটের সময় উপস্থিত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। দল হিসাবে একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদিগণ অতিশয় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দলের প্রত্যেককে শাসন মানিয়া চলিতে হয়।

ফরাসী দলে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্য।

অনেকগুলি দল থাকাতে কোন দলে সমগ্র সভ্যের অর্দ্ধেক দূরে থাকুক, এক-তৃতীয়াংশ সভ্যও নাই। সুতরাং কোন দলই নিজের বলে অতিজন দল হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। মন্ত্রি-সমিতিতে স্থায়ী হইতে হইলে অন্য দুই বা অধিক দলকে নিজের পক্ষে টানিয়া আনিতে হয়। যতদিন এই বাহিরের দলের সমর্থন পাওয়া যায় ততদিন মন্ত্রিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু কখন কোন্ কারণে যে কোন্ দলের সমর্থন পাওয়া যাইবে না তাহা বুঝা কঠিন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন কয়েকটি দলের মিলন ভাঙ্গিয়া না গেলেও সামান্য কারণে অনুকূল দল হঠাৎ প্রতিকূল হইয়া মন্ত্রিত্বের পতন ঘটাইয়াছে।

কোন দল অপ্রধান নয়।

বৃটিশ ও আমেরিকান দলের একটা বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন দল সর্ব্বদা নেতার কথা মানিয়া চলে। ঐ দুই দেশে নেতৃত্ব ব্যতীত দলের কাজ চলিতে পারে না। কিন্তু ফ্রান্সে এই প্রকার নেতৃত্বের স্থান নাই। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া সভাপতি আছেন, দলের প্রতিনিধি রূপে তিনিই অন্যান্য দলের ও মন্ত্রি-সমিতির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকেন এবং তাঁহার দল মন্ত্রি-সমিতির দলের সহিত মিলিত হইলে তিনি সমিতিতে স্থান পাইবেন। তথাপি ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার দলের নেতাদের মত সম্মান ও সৌভাগ্য তাঁহার হয় না। ফ্রান্সে সাম্য এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। নিজের বক্তৃতাশক্তি বা ব্যক্তিত্বের ফলে যদি কোন রাজনীতিবিদ্ অন্য সকলকে ছাড়াইয়া যান তবে তিনি অন্য লোকের ঈর্ষা ও

নেতৃত্বের অভাব।

বিদ্বেষের ভাজন হন। দলের স্বার্থের জন্য যতটা দরকার তাহার চেয়ে একটুও বেশী খাতির তিনি পান না। দলের লোকেরা তাঁহার সম্বন্ধে বলাবলি করিতে থাকে, "এই দেখ ইনি সর্বময় কর্ত্তা হইতে যাইতেছেন।" বস্তুত ফ্রান্সে ব্যক্তি-প্রাধান্য কেহ সহ্য করিতে চায় না। গ্যাম্বেটা যে সময় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও নিরাপদ্ হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই সময়েই তাঁহার পতন ঘটে! নির্ব্বাচন-কালে যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন দলের প্রধান রূপে দাঁড়ান তাঁহারা রাজনৈতিক গগনে অসামান্য ব্যক্তি নহেন। এমন কি নির্ব্বাচন-কালে তাঁহাদের নামও হয়ত লওয়ার প্রয়োজন হয় না। ফরাসী প্রতিনিধি-সভায় ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রতি ঈর্ষাবশত দলাদলি ও রেষারেষি অনেক হইয়া থাকে।

ফরাসীর মনে সাম্যের ইচ্ছা এবং অতিশয় শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণা এরূপ প্রবল যে, প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক সদস্য চেষ্টা করেন কিরূপে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। এজন্য তিনি মন্ত্রীদের কার্য্য-কলাপের তীব্র সমালোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। পূর্ব্বে ফরাসী কমিশন ও মন্ত্রি-সমিতির সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া বলিয়াছি যে, কমিশনগুলি মন্ত্রি-সমিতির ক্ষমতা খর্ব্ব করে এবং কাজে বাধা দেয়। তাহার হেতু এই ফরাসী চরিত্রের মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

প্রতিনিধি-সভায় দল-বিভাগটা স্পষ্ট হইলেও সমগ্র দেশের মধ্যে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা দেয় না। আগেই বলা হইয়াছে সমগ্র ফ্রান্সের অধিবাসীকে মোটামুটি নিম্নলিখিত চারিটি দলে বিভক্ত করা যায় (১) দক্ষিণ-পন্থিগণ (ইঁহারা রাজতন্ত্রবাদী), মধ্য-পন্থিগণ (নরমপন্থি-রিপাবলিকবাদী), উগ্র অথবা অগ্রসর রিপাবলিকবাদিগণ, এবং সমাজতন্ত্রবাদিগণ। ইংরেজ এবং আমেরিকানরা দল বলিতে যাহা বোঝে তাহা একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদিগণই গড়িয়া তুলিয়াছে। কারণ, ইহারা সমগ্র দেশে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে ও সভার ভিতরের ও বাহিরের সকল সভ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনের অনুগত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি এবং ইংলণ্ডে তিনটি দল দেশের সর্ব্বত্র আপনাদের কোন না কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া রাখে এবং ভোটের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু ফ্রান্সে এমন জনপদ অনেক আছে যেখানে এক বা অল্পদল আদপেই লোক দাঁড়া করায় না। অর্থাৎ কোন দলই সকল জনপদে অন্য এক বা বহু দলের সঙ্গে ভোট লড়াই করিবার কল্পনা করে না। ইহার একটা কারণ এই যে, ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দ্বারা পুষ্ট। সেই জন্য যেখানে জয় লাভ করিবার কিছু সম্ভাবনা আছে কোন দল মাত্র সেখানে লোক দাঁড়া করায়। পশ্চিম ও উত্তরের জনপদসমূহের গ্রাম্য বা ছোট সহরস্থ ফরাসীরাই রক্ষণশীল অথবা নরমপন্থী রিপাবলিকবাদী হইয়া থাকেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব, মধ্য ও পূর্ব্ব দিকের অথবা ছোট সহরের লোকেরা অগ্রসর অথবা নরমপন্থী রিপাবলিকবাদী হইয়া থাকেন। শিল্প-কেন্দ্র ও খনিযুক্ত সহর-সমূহের অধিবাসীরা অগ্রসর রিপাবলিকবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী হইয়া থাকেন। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি যে দলেরই লোক হোন্ না কেন, সভার বাহিরে তাঁহারা এই চারিটি প্রধান দলের কোন না কোনটায় থাকেন। নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তি দলের কেন্দ্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নিজেই নিজের ভোট-যুদ্ধের রসদ্ যোগাইতে

অবস্থান ভেদে দলের প্রাধান্য।

হয়। তাঁহার দলের অথবা দলের অন্তর্গত অন্য উপদলের লোকও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন। নির্ব্বাচনের খরচা কম বলিয়া নির্ব্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা অনেক হইয়া থাকে। একটি মাত্র পদের জন্য পাঁচ ছয় বা ততোঽধিক ব্যক্তি দাঁড়ান। কখনো কখনো এইরূপে বহু ব্যক্তি ভোটপ্রার্থী হইলেও তাঁহাদের কেহই অতিজন ভোট না পাইলে রিপাবলিক-বাদিগণের মধ্যে যিনি হয়ত সব চেয়ে কম ভোট পাইয়াছেন, তিনি সরিয়া যান ও ফলে অন্য রিপাবলিকবাদী সদস্যের নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়।

বিচার-ব্যবস্থা

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সহিত সমগ্র ইয়োরোপের বিচার-ব্যবস্থা বিষয়ে একটা পার্থক্য রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় আইনজীবীদের মধ্য হইতে কেহ বিচারকের পদে বসেন বস্তুত বিচারকের পদটা তাঁহারা উত্তর জীবনের কাম্য বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ফ্রান্সে বিচারকের পদটা আলাদা করিয়া ধরা হয় এবং তজ্জন্য গোড়া হইতেই শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে লোকে বিচারক হইতে পারে, নচেৎ নহে। ইংল্যাণ্ডে যেমন যে সব ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে বিশেষ কৃতকার্য্যতা দেখান তাঁহারাই বিচারকের পদ পাইয়া থাকেন, ফ্রান্সেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলে একটা গুরুতর অসুবিধা এই হইত যে, এখানে অনেক দল বর্ত্তমান থাকায় দলাদলির প্রভাবে সুবিচারের হানি হইত। বিচারক শাসনকর্ত্তাদের হাতের বাহিরে না থাকিলে তাঁহাদের অপক্ষপাতভাবে কার্য্যচালনা করা দুরূহ হইত।

বিচারক তৈরীর প্রণালী।

ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নতন বিচারক পর্য্যন্ত সকলেই মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই নিয়োগ অস্থায়ী নহে, অর্থাৎ কুর দ সেশেসন নামক সর্ব্বোচ্চ আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন বিচারককে পদচ্যুত করা যায় না। মন্ত্রিগণ কোন কোন ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে ঐ সব পদে অবস্থিত বিচারকদের ঊর্দ্ধতন পদে উন্নীত করিয়া দেন ও তখন ঐ সব খালি পদে নিজেদের মনোনীত লোকদের নিযুক্ত করেন। এই ভাবে মন্ত্রিগণ বিচারকদের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। বস্তুত এক দিকে সরকারের প্রীতিভাজন হওয়া ও অন্য দিকে নিজ জিলা হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সভার সদস্যকে খুসী রাখা হইল বিচারকের কাজ। সরকার অথবা সরকারের পক্ষের লোকেরা অন্য প্রকারে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহারা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে মোকদ্দমা সরাইয়া অথবা কোন বিশেষ বিচারকের হাতে মোকদ্দমা ন্যস্ত করাইয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু ফ্রান্সের সকল আদালতেই এক প্রকার বিচার প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে এবং নিয়মাবলী মানিয়া চলা হয়। প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণ অথবা যাঁহাদের বিচারকদের উপর প্রভাব আছে তাঁহারা বিচারকদের নিকট সুপারিশ পত্র দিয়া থাকেন, এই প্রথা এখনো অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই।

শক্তিত্রয়ের বিভাগ।

ফরাসীরা বিচার-ব্যবস্থার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সেজন্য যাহাতে সুবিচার হয় সেদিকে নজর থাকে। বিচারকেরা অত্যন্ত কম মাহিনা পাইয়া থাকেন, তথাপি বিচারকের

পদ অত্যন্ত সম্মানজনক এবং অনেক উপযুক্ত ভাল লোক এই পদ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন না। যে স্থলে বিচারকেরা বাস করেন সেই স্থলের সামাজিক কার্য্যকলাপে তাঁহাদের স্থান সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিদের মধ্যে দেওয়া হয়।

শাসন-ব্যবস্থা

ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থার দুইটি ভাগ আছে। প্রথমত রাজনৈতিক অর্থাৎ যাহাদের অস্তিত্ব মন্ত্রিত্বের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত। মন্ত্রীদের সহকারিগণ ও অন্যান্য কোন কোন কর্ম্মচারী এই ভাগের অন্তর্গত। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। দ্বিতীয়ত বহুসংখ্যক স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারী। ইঁহারাই দেশের শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকেন।

ফ্রান্সে লোকবলের তুলনায় "সিভিল সারভিস্" অর্থাৎ অসামরিক সরকারী কর্ম্মচারিরূপে যত ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন তত ব্যক্তি অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে নাই। আর স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাজের মাত্রা এত বেশী বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে অন্য কোথাও, এমন কি জার্ম্মাণিতেও, কেন্দ্রীয় সরকার এত পরাক্রমশালী নহে। ফ্রান্সে সরকারী চাকরীর জন্য লোকের ঔৎসুক্য অত্যন্ত অধিক এবং লোকে ছোটখাট চাকরীও ঢের চায় বলিয়া ছোট ছোট চাকরীর সংখ্যাও অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকরী লাভের জন্য প্রতিযোগিতাও খুব বেশী। ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া শাসনকার্য্যের পদ প্রায় কাহাকেও দেওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংল্যণ্ডের মত পরীক্ষার পর প্রার্থীকে কাজে গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক মন্ত্রী ইত্যাদি যে কয়টি পদ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, সেগুলির জন্য অবশ্য কোন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। মন্ত্রিগণ যে সকল পদে নিয়োগ করিয়া থাকেন, সাধারণত গুণ দেখিয়া করিলেও সদস্যের অনুরোধ-উপরোধেও অনেক সময় কাজ হয়। বয়স ও গুণ অনুসারে কাজের উন্নতি হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে বলিবার জন্য লোক থাকিলে গুণ না থাকিলে ও বয়স কম হইলেও কেহ কেহ বেশ উন্নতি করিয়া থাকেন। কিন্তু গুরুতর দোষ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে সহজে পদচ্যুত করা হয় না। প্রধান প্রধান বিভাগের স্থায়ী কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিরা অতিশয় উপযুক্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি হইয়া থাকেন। তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়া রাজ্য চালানো অসম্ভব, আর ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মত তাঁহাদের মনোভাব যাহাই হউক্ না, যখন যে দল শাসনকার্য্য চালান, সেই দলের অনুগতভাবে কাজ করেন। (পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা।)

সরকারী চাকুরেরা জীবনধারণের খরচার অনুপাতে বেতন কম পাইয়া থাকেন। কিন্তু ফ্রান্সে সরকারী চাকুরীর বিশেষ ইজ্জৎ আছে বলিয়া লোকে অল্প মাহিনা স্বীকার করিয়াও চাকুরী করে। আমলাতন্ত্র প্রণালী ও শৃঙ্খলার কঠিন নাগপাশ মানা বিষয়ে ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণির প্রকৃত ঐক্য রহিয়াছে। আর সাধারণত এই সম্বন্ধে নালিশ শুনিতে পাওয়া যায় না। সরকারী হুকুম তামিল করিবার একটা মজ্জাগত অভ্যাস ফরাসী জনগণের মনে আছে। নচেৎ ইংরেজীভাষী দেশে হইলে এত সহজে আমলাতন্ত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত না। সরকারী কাজে অনেক সময় বিলম্ব হয়। এই বিলম্বের জন্য স্থায়ী সরকারী প্রধান কর্ম্মচারীদের (জনগণের আনুগত্য।)

দাবী করা চলে না, কারণ তাঁহাদের সর্ব্বদা মন্ত্রীদিগের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

শিক্ষকদের প্রভাব।

ফ্রান্সে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকেরা শাসন-বিভাগের অঙ্গ বিশেষ। যেকালে ধর্ম্মযাজকদের সঙ্গে ফরাসী গণতন্ত্রের বিরোধ চলিতেছিল, সে কালে গণতান্ত্রিক দল কতকগুলি আইন পাশ করিয়া প্রত্যেক সরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা গণতন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষকগণ সম্প্রতি ইউনিয়ানবদ্ধ হইয়া কখনো কখনো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া থাকেন, উদ্দেশ্য নিজেদের মজুরি বৃদ্ধি করা। যুক্তি এই যে, সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলেই লোকের নাগরিক অধিকার লুপ্ত হইয়া যায় না। বিভিন্ন গ্রামে যে সকল শিক্ষক মোতায়েন রহিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণত সব চেয়ে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়া থাকেন। ছাত্রদের শিক্ষকরূপে তাঁহাদের প্রভাব অনেকখানি, তার উপর অনেকে গ্রাম্য মেয়রের কেরাণী ও পরামর্শদাতারূপে কাজ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না; এখানে শিক্ষকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন,—নিয়োগ বিষয়ে কোনপ্রকার পক্ষপাতিতা দেখানো হয় না।

সরকারের হস্তক্ষেপ।

রেলওয়ে সম্পর্কে সরকারী শাসন সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত রেলপথ বেসরকারী শাসিত। কিছু দিন পূর্ব্বে পশ্চিমের একটি রেলপথের ভার সরকার লইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরিচালনা খরচা এত বাড়িয়া যায় যে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীরা প্রায়ই তাঁহাদের বিরুদ্ধ যুক্তিতে এই রেলওয়ের উদাহরণ দেন। তামাক ও দিয়াশলাই ব্যবসা সরকারের একচেটিয়া। এই দুই খাতে রাজস্ব আদায় হয়।

শাসক।

স্থানীয় প্রধান শাসক কর্ম্মচারী হইতেছেন প্রেফে। ফ্রান্সের ৮৬টি দেপার্ত্মাঁ বা বিভাগে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরূপে ৮৬ জন এইরূপ শাসনকর্ত্তা মোতায়েন রহিয়াছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা বা সুইট্জারল্যাণ্ডে এই প্রকার কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা নাই। ইঁহাকে নিয়োগ করিবার আগে কোন রকম পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না, মন্ত্রীদের দ্বারা ইঁহারা নিয়োজিত অথবা বিতাড়িত হইয়া থাকেন। ইঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি সভা মোতায়েন আছে। এই সভা সামান্য সামান্য কর্ম্মচারীদের কাজের দেখা শোনা করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রেফের অধীনে কয়েক জন করিয়া সাব-প্রেফে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহারা এক একটি আর্‌দিস্‌মাঁতে মোতায়েন থাকেন। ইঁহারাও মন্ত্রীদের দ্বারা নিয়োজিত বা বিতাড়িত হন। মন্ত্রিগণ প্রেফের সাহায্যে স্থানীয় শাসন-কার্য্য চালান অথবা স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করেন। তবে আজকাল প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের প্রভাব মন্ত্রীদের উপর বেশী হইয়াছে।

মন্ত্রীদের ক্ষমতা।

ফ্রান্সে মন্ত্রীদিগের হাতে প্রভূত ব্যবস্থা-ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। আইন-কানুন সাধারণ ভাবে প্রণীত হয়, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় খুঁটিনাটি ব্যাপারে শাসন-কর্ত্তাদের স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই থাকে। ফ্রান্সে মন্ত্রীদের হাতে বিশেষভাবে শাসনভার অর্পিত না হইলেও তাঁহারা শুধু নিজেদের অধস্তন কর্ম্মচারীদের জন্য নয়, সমস্ত নাগরিকদের জন্যও, ইস্তাহার জারি করিতে

পারেন। গুরুতর ইস্তাহারসমূহ অবশ্য রাষ্ট্র-নেতার নামে বাহির হয়। খুব গুরুতর প্রয়োজনের সময় রাষ্ট্র-নেতা কিছু পরিমাণ টাকা ধার লইবার অনুমতি পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশসমূহের বিচার-ব্যবস্থায় গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারী নিজ অধস্তন বা উপরিতন কর্ম্মচারী অথবা জনসাধারণের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তাহার সাধারণ আদালতে বিচার হইয়া থাকে। কিন্তু ফ্রান্সে এইরূপ কর্ম্মচারীর বিচার সাধারণ আদালতে হয় না। অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিব্ ট্রাইবুনাল বা শাসকদের বিচার-সভার নিকট অভিযোগ করিতে হয়। এই বিচার-সভা কয়েক জন সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া গঠিত এবং সাধারণ আদালতে যে সকল বিষয়ের বিচার হয় না সেগুলি এই সভা বিচার করিয়া থাকে। ফরাসীরা শক্তিত্রয়ের (শাসন, ব্যবস্থা ও বিচার) পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলা গণতন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের মতে এক শক্তি সর্ব্ব প্রকারে স্বাধীন হইবে, অন্য কোন শক্তির ইহার উপর হাত থাকিবে না। সরকারী কর্ম্মচারিগণ শাসনের অঙ্গ। সুতরাং বিচার অর্থাৎ সাধারণ বিচারালয়সমূহ ইঁহাদের বিচার করিলে শাসন-শক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্য ফ্রান্সে ইঁহাদিগের বিচার করিবার ক্ষমতা সাধারণ আদালতের নাই। শাসকদের বিচার-সভা।

ফ্রান্সের শাসনের একটি অঙ্গ হইল কাউন্সিল অব্ ষ্টেট বা রাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভা। প্রকৃত পক্ষে এই সভার সভ্যেরা ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক মনোনীত হন ও তিনি ইচ্ছা করিলে কাহাকেও পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন মন্ত্রিগণ, যদিও মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব সময়ে ইঁহাদের অধিকারচ্যুত করা হয় না। রাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভা। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই সভায় বসিয়া থাকেন। ইহার কাজ হইল শাসন-সম্পর্কিত নানা প্রকার আইন-কানুন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও শাসকদের বিচার-সভার সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করিবার জন্য আপীল আদালতরূপে বসা। দ্বিতীয় কাজটিই এক্ষণে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আপীল আদালতে বসিবার যোগ্যতা মন্ত্রণা-সভার সকল সভ্যের নাই, বিশিষ্ট সভ্যেরা বসিতে পারেন। অন্য দেশের লোকেরা ফ্রান্সের মন্ত্রণা-সভার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ফ্রান্স কতকগুলি দেপার্ত্তমাঁ বা জিলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জিলায় ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত একটি করিয়া কাউন্সিল বা সভা আছে। নাম কঁসেই জেনেরাল বা সাধারণ সভা। সার্ব্বজনীন ভোটের দ্বারা প্রত্যেক ক্যান্টন হইতে একজন করিয়া ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর সভার অর্দ্ধেক সভ্য নূতন করিয়া নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর এই সভার দুইটি করিয়া বৈঠক বসে, একটি ঈস্টারের পর ও অন্যটি আগস্ট মাসে। ... জিলা। একটি প্লাসথানেকের জন্য, অন্যটি এক পক্ষ কালের জন্য। যদি আরও বৈঠকের দরকার হয়, তবে তাহা এক সপ্তাহের বেশী বসিতে পায় না। জিলা রাস্তা, ইস্কুল ও পাগলা গারদ পরিদর্শন করা ও রেলওয়েসমূহকে সাহায্য দান করা হইল সভার কাজ। ইহার কর সাধারণ সভা।

চালাইবার ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং সরকার ইচ্ছা করিলেই ইহা ভাঙিয়া দিতে পারে। অনেক বিষয়ে সভার নিষ্পত্তির ক্ষমতা থাকিলেও নানা প্রকারে ইহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথমত ভোট দ্বারা যে কার্য্য করা হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা সম্পাদন করিবার ভার দেওয়া হয় শাসককে (প্রেফে)। শাসক সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা ও টাকা-পয়সা খরচ করিবার আদেশ-পত্রে সহি করেন। শাসকের কাজ-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সভা একটি সমিতি মোতায়েন রাখে, কিন্তু এই সমিতি খাতা-পত্র দেখা ছাড়া অন্য প্রকারে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত সভার কার্য্য শাসক দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়মিত হয়। তিনি ইচ্ছামত সভায় বসিয়া আপন বক্তব্য বলিতে পারেন, বাজেট তৈরী করা ও অন্যান্য ব্যাপারও তাঁহার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। বস্তুত তাঁহার নিকট হইতে না শুনিয়া সভাকে কোন প্রকার কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় না। সভার স্থায়িত্বেরও নিশ্চয়তা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ইহার যে কোন সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিতে পারে এবং কর বসানো বা করের টাকা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি চাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এই সভা যাহা খুসী তাহা করিতে পারে না, কিন্তু যাহা করিতে ইচ্ছা করে না তাহাতে শাসককে বাধা দিতে পারে।

আশা করা গিয়াছিল, জিলা সভাগুলিতে রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব থাকিবে না। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগণ সাধারণ সভার নির্ব্বাচনেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকেন। ১৮৮৪ সনে আইন করিয়া কমিউন বা পল্লী-অঞ্চলের উপর হইতে সভার কর্ত্তৃত্বভার উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মহকুমা। পরবর্ত্তী স্থানীয় বিভাগকে বলে আরঁদিস্‌মঁ বা মহকুমা। শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য এই ভাগ করা হইয়াছে, এবং একজন উপশাসক ও একটি নির্ব্বাচিত সভা প্রত্যেক মহকুমায় থাকিলেও, মহকুমার নিজের কোন সম্পত্তি, রাজস্ব বা ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই।

ক্যাণ্টন। তার পরের বিভাগকে ক্যাণ্টন কহে। বিচার ও সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

কমিউন। কমিউন বা পল্লী হইল সর্ব্বনিম্ন বিভাগ। কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে আয়তন অথবা লোক-সংখ্যায় প্রভেদ অনেক। ২০ একর হইতে ২½ লক্ষ একর বিশিষ্ট পল্লী আছে। অন্য দিকে লোকসংখ্যা ১২ জন হইতে কয়েক লক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কমিউন শুধু ফ্রান্সের বিশেষত্ব নয়, ইহা সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপের গ্রাম্যজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। কমিউন শুধু যে মফস্বলে দেখা যায় এমন নহে, সহরেও ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। জিলার শাসকের মত পল্লীরও একজন কর্ত্তা থাকেন, তাঁহাকে মেয়র বলা হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে ও তাঁহার অঞ্চলের শাসনকর্ত্তারূপে কাজ করেন, কিন্তু প্রেফের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই যে, প্রেফে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আর মেয়র প্রধানত স্থানীয় ব্যাপার দেখাশোনা করিয়া থাকেন। রাষ্ট্র-নেতা তাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন না,

করে পল্লী-সভা, ও ঐ সভার পরমায়ুর তুল্য তাঁহার মেয়র-পদ স্থায়ী হয়। তিনি কোন বেতন পান না। মেয়র নিরঙ্কুশভাবে নিজ ইচ্ছামত শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন মনে করিলে ভুল হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে শাসকের অধীনে কাজ করিতে হয়। পল্লীর পুলিশ, সাধারণের স্বাস্থ্য ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় স্থানীয় শাসনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে মেয়রের বহু কার্য্য শাসক বাতিল করিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নিজের হুকুম জারি করিতে পারেন। তাহা ছাড়া শাসক মেয়র-নিযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের পছন্দ করা চাই ও তিনি দরকার হইলে তাহাদিগকে অপসৃত করেন। ইহাও শেষ নয়। আইনে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে যে, শাসক এক মাসের জন্য এবং আভ্যন্তরিক মন্ত্রী তিন মাসের জন্য মেয়রকে অস্থায়িভাবে পদচ্যুতও করিতে পারেন। রাষ্ট্র-নেতার অবশ্য তাঁহাকে একেবারে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা আছে। মেয়র।

পল্লী-সভা সার্ব্বজনীন ভোটে চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়। সদস্যের সংখ্যা ১০ হইতে ৩৬ জন। ব্যাপকভাবে পুলিশ ছাড়া পল্লীস্থ সকল ব্যাপারের দেখাশোনায় মেয়রের সাহায্য করা হইল এই সভার কাজ। প্রকৃত পক্ষে এই সভার ক্ষমতা খুব বেশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত সভার ক্ষমতা চালাইবার অধিকার আছে বলিয়া আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে: আয়-ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর তৈরী, পল্লী-সম্পত্তি-বিক্রয়। এই সব বাদ দিলে যে ক্ষমতা থাকে তাহারও উপর আবার শাসকের যথেষ্ট হাত আছে, আর রাষ্ট্র-নেতা সভা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া পল্লী-শাসনার্থ দুই মাসের জন্য এক বিশেষ সমিতি নিযুক্ত করিতে পারেন। পল্লী-সভা।

পারি চিরকাল বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি। সেজন্য ফ্রান্সের অন্যান্য জনপদকে যতটুকু আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে পারিকে ততটুকুও দেওয়া হয় নাই। ৮০ জন ভোটে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি লইয়া একটি সভা দ্বারা পারির শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। আরো একটি সভা এই ৮০ জন ও পারির পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের ৮ জন সভ্য লইয়া সাধারণ সভা নামে কোন কোন কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার পারির শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করেন। পারি ২০টি আর্ঁদিস্মঁায় বিভক্ত। প্রত্যেক মেয়র ফরাসী রাষ্ট্র-নেতা নিজে নিয়োগ করেন। অংশত ইঁহাদের হাতে এবং অংশত দুইজন শাসকের হাতে পারির শাসনভার অর্পিত আছে। ইঁহাদের একজন হইলেন সীনের শাসক, ইনি সাধারণ শাসক ত বটেনই, তাছাড়া কেন্দ্রীয় মেয়রের কাজও করেন। অন্য জনের হাতে পুলিসের ভার রহিয়াছে,—ইনি নিজ কার্য্যের জন্য আভ্যন্তরিক মন্ত্রীর নিকট দায়ী। পারি।

ফ্রান্সের পক্ষে নগর শাসন কোন দিন বড় সমস্যা হইয়া দেখা দেয় নাই। কখনো কখনো এইরূপ অভিযোগ শোনা যায় যে, স্থানীয় কোন বাগ্মী ব্যক্তি জিলা বা পল্লীর সভা নিজ করতলগত করিয়া লইয়াছেন। প্রথমে অনেক কার্য্য করিবার আশ্বাস দিয়া পরে দুঃসাহসিক পরীক্ষা চালাইয়াছেন, সঙ্গত সীমা ছাড়াইয়া কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, গুরুতর ঋণ করিয়া এবং নিজ বন্ধু ও দলের লোকদের অযথা পক্ষপাতিতা দেখাইয়া শাসন-কার্য্যের অবনতি ঘটাইয়াছেন। শাসক ও আভ্যন্তরিক মন্ত্রী অনেক সময় নিজ বন্ধুদের চটাইবেন বলিয়া

করিতে চাহিলে মন্ত্রিগণ ও প্রতিনিধিগণ ইঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন না। সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও বিবরণী লেখকগণেরও খাতির যথেষ্ট। কখনো কখনো মন্ত্রীরা সম্পাদক বা সম্পাদক নিয়োজিত লোক লইয়াও সফরে বাহির হন।

পারিতে পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। মন্ত্রিত্বের পতনের সম্ভাবনা ঘটিলে এই সব কাগজ অনেক সময় মন্ত্রিত্বের পতন বা রক্ষার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজধানী পারিতে পরিচালিত খবরের কাগজের প্রভাব বেশী হইলেও লিয়ঁ, লাঁতে, বোর্দো, মার্সেই প্রভৃতি স্থানে যে সব সংবাদপত্র পরিচালিত হয় সেগুলিও উৎকৃষ্ট ধরণের এবং স্থানীয় লোকেরা নিজেদের কাগজগুলিই পড়িয়া থাকে, পারির কাগজের তেমন কদর করে না।

পারির প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

এই সম্পর্কে ফ্রান্সের একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সে দেখা যায় যে, কোন কোন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য নিজেই কাগজ চালান। ইহাতে তাঁহার অন্য কোন সংবাদপত্রকে হাতে করিবার প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমগ্র ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ দেশ ও জাতি হইলেও আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ ও দল একেবারে মিলিত হইয়া যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব্ব, উত্তর-পূর্ব্ব—প্রত্যেক অঞ্চলের লোকের স্বভাব, চালচলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্য অঞ্চল হইতে পৃথক। সকল অঞ্চলের আর্থিক অবস্থাও এক প্রকার নহে। রাজনৈতিক মতবাদ ও ধর্ম্ম লইয়া বিভেদ শুধু বিভিন্ন দল গড়িয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পরস্পরের মধ্যে অনেক বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধনি-দরিদ্রের মধ্যে রেষারেষি ও বিদ্বেষের ভাব পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান। সুতরাং শুধু সংবাদপত্র হইতে ফ্রান্সের জনমত অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফরাসী জনসাধারণের অধিকাংশের মতামত বুঝা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক। কোন দলের লোকের বিশেষ এক মতবাদ আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই বহুপ্রকার মতবাদের কোন একটাকে কোন সময়েই সমগ্র দেশের মতবাদরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দুই বা তিনটি মাত্র দল বর্ত্তমান থাকাতে এ বিষয়ে দেশের লোকের মত স্পষ্টভাবে জানিবার সুবিধা প্রত্যেক নির্ব্বাচনেই হয়। ফ্রান্সে হয় না। ফ্রান্সের মন্ত্রিত্ব দেশের অধিকাংশের মতবাদকে নির্দ্দেশ করে না। কোন একটি দল কখনো একা রাজ্যশাসন করিবার কল্পনা করিতে পারে না বলিয়া অন্য যে এক বা অধিক দলের সহিত মিলিত হয় তাহা মাত্র স্বার্থের খাতিরে এবং এই মিলন যখন তখন ভাঙ্গিয়া যায়। এই কারণে ফ্রান্সের কোন এক বা অধিক দলের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় না।

ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যত অধিক সংখ্যক নাগরিক নির্ব্বাচনের সময় ভোট দিবার জন্য উপস্থিত হয় ফরাসী নির্ব্বাচনে তত উপস্থিত হয় না। বস্তুত ফরাসী নাগরিক, বিশেষত পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণ, রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন। আর যাহারা ভোট দিতে আসে তাহাদেরও অনেকের কোন মতবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না।

ইংরাজীভাষী ভোটদাতাদের মত তত বেশী ফরাসী নাগরিক কাগজ পড়িয়া বিভিন্ন দলের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী বিচার করিয়া ভোট দিতে আসে না। ফরাসী দেশে মেলামেশা ও ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তার দ্বারা ভোটদাতাকে প্রভাবান্বিত করা যত সহজ, বক্তৃতা করিয়া বা সংবাদপত্র দ্বারা দলে টানা তত সহজ নয়। সেজন্য ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তা বেশী পরিমাণে চালানো হইয়া থাকে।

চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ বা অনুগ্রহের সৃষ্টি করিয়া ফরাসী শাসন-ব্যবস্থা নিজেকে স্থায়ী করিয়া রাখে। প্রতিনিধিগণ অনেক সময় ভোটদাতাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, তোমাকে অমুক সুবিধা করিয়া দিব। ইঁহারা প্রতিনিধি হইয়া মন্ত্রীদের সাহায্যে এইরূপ কতকগুলি লোককে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে ভোটের সময় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হন। সেজন্য মন্ত্রীদিগকে এইরূপ অনেক লোকের কথা মত কাজ করিতে হয়। তাহাতে জাতির বৃহৎ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেও, অনেক সময় প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রতিনিধিকে মন্ত্রীর খুসী না করিয়া উপায় নাই। ইহার ফলে অনেক সময় মন্ত্রীরা সমগ্র দেশের মঙ্গলকর অনেক কাজে হাত দিতে পারেন না। বস্তুত বহু দল থাকাতে ফ্রান্সে সর্ব্বদা দলাদলির দিকেই নজর রাখিতে হয়। তাহার জন্য অনেক সময়, ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হয়। আগে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা চাই, তারপর ত কাজ করিবে। ফ্রান্সের মন্ত্রিকুল নিজেদের পক্ষ বজায় রাখিবার চিন্তাতেই বিব্রত।

ফরাসী নাগরিক, ব্যবস্থাপক, শাসক ও বিচারক

একণে বর্ত্তমান কাঠামোতে ফরাসী নাগরিক, ব্যবস্থাপক, শাসক ও বিচারকদের গুণাগুণ কিরূপ বিকশিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। এই সম্পর্কে ফরাসী জাতীয় জীবনের পবিত্রতা ও শক্তি বুঝা যাইবে। নাগরিকের অধিকার ও কর্ত্তব্য।

উভয় সভার সদস্য ও মন্ত্রিগণ দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। সাধারণত কোনরূপ অন্যায় প্রভাব তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে সমর্থ নহে। যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য বা শিল্প-সাহায্যের জন্য অথবা বেসরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ সুবিধা ও টাকা দিবার জন্য যে সব বেসরকারী বিল উপস্থাপিত করা হয়, ফ্রান্সে সে ধরণের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। সদস্য ও মন্ত্রিগণ। রেলপথ তৈরী বা বিশালকায় শিল্প-সজ্ঘ গড়িয়া তোলায় যুক্তরাষ্ট্র ওস্তাদ, ফ্রান্সে তাহা নাই। সুতরাং সেজন্য বিশেষ সুবিধা পাইতে ব্যবসা-ধুরন্ধরগণ লালায়িত হন না। মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদেরও অন্যায় প্রভাবের তত কারণ উপস্থিত হয় না। তথাপি বড় বড় পয়সাওয়ালা ব্যক্তিগণ বিদেশে অথবা উপনিবেশে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য মন্ত্রী বা প্রতিনিধিদের উপর চাপ দিয়া থাকেন ও কখনো কখনো যাহা চান তাহাই পান।

ফ্রান্সে প্রতিনিধি বা মন্ত্রী কোন কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টার হইলে সে কোম্পানির নানা প্রকার সুবিধা হয়। কিন্তু আগে ইঁহাদের যোগদানে যেরূপ গৌরব বাড়িত এখন সেরূপ বাড়ে না।

আগেই বলিয়াছি যে, শাসন ও দেশরক্ষা-সম্পর্কিত সরকারী চাকুরেরা সাধারণত বেশ কর্ম্মঠ ও সৎ। ফ্রান্সের সিভিল সার্ভিসের লোকেরা, বিশেষত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, সরকারী চাকুরে। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং নিজেদের কর্ত্তব্য ভালভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট।

উচ্চ আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে সাধারণত কোন অভিযোগ শোনা যায় না, যদিও কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে। অনেক সময় সরকারের হুকুম মত চলিতে অস্বীকার করিয়া পাঠাইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। বিচারকদের নিকট মামলা-মোকদ্দমার বিষয় লইয়া চিঠিপত্র লেখা ও নীচু আদালত হইতে উচু আদালতে সরকার কর্তৃক উন্নীত হওয়ার প্রথায় বিচারবিভাগে কিছু গলদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা সরকারের সহায়তা করিবে তাহারা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হইবে বলিয়া বিচারকদের স্বাধীন কার্য্যকলাপ কখনো কখনো বাধা পায়।

বিচারক।

ফ্রান্সে গণতন্ত্রের সার্থকতা

গণতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা দরকার এই গণতন্ত্র কতটা বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়াছে এবং ফ্রান্সকেই বা কি দান করিয়াছে।

ফরাসী গণতন্ত্রের খতিয়ান।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফ্রান্সে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন পর্য্যন্ত "ভূ-স্বামী"গণের (ফিউদাল) যুগ চলিতেছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকিলেও ফরাসী রাষ্ট্র ১৮৭৪ সনের তৃতীয় বিপ্লবের পর হইতে বর্ত্তমান কাঠামো অবলম্বন করিয়াছে (১৮৭৫)। সুতরাং ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বয়স আজ মাত্র ৫৫ বৎসর।

গণতন্ত্র সর্ব্বদোষহারী নহে।

এই ৫৫ বৎসরের খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে, গণতন্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ বিপুল আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া লোকে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিল ও বহু লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও ইতস্তত করে নাই, সে আশা পূরণ হয় নাই। স্বরাজের মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় বহু ক্ষেত্রে ঐ মন্ত্রকে খর্ব্ব করা হইয়াছে।

ফ্রান্সে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম ও আর্থিক স্বার্থ লইয়া দলাদলি ও রেষারেষির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্রের প্রচলনের পরও ফরাসীর জাতীয় চরিত্রের এই বিশিষ্টতা নষ্ট হয় নাই।

মন্ত্রিদের ক্ষমতা প্রতি পদে বাধা পায়।

যতটুকু সময় মন্ত্রিত্ব বজায় থাকে তাহার মধ্যেও নিরঙ্কুশভাবে কাজ করিবার উপায় নাই। প্রতি পদে বাধা রহিয়াছে। ফ্রান্সে কমিশন-প্রথা মন্ত্রীদের হাত-পা বাঁধিয়া দিয়াছে। নিজের ইচ্ছামত বিল পাশ করাইবার সৌভাগ্য কচিৎ কাহারো হয়। যে কারণে ফ্রান্সের শাসন ঘোরতর কেন্দ্রীকৃত এবং উপযুক্ত দলপতির অভাব, সেই কারণেই ফরাসী মন্ত্রীকে চারি দিক্ হইতে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ জন্য দরকারী আইনও পাশ করিবার অযথা বিলম্ব ফরাসীরা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে।

নাগরিক স্বাধীনতার অল্পতা।

প্রতিনিধিদের সহিত তুলনায় মন্ত্রিত্ব তথা ফ্রান্সের শাসনযন্ত্র দুর্ব্বল হইলেও সাধারণ নাগরিকের কাছে তাহা দুর্ব্বল নয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় নাগরিক স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় ফ্রান্সে তাহা অল্প মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। যে কোন শাসক যখন তখন যে কোন ফরাসীকে আটক করিয়া রাখিতে পারে ও অন্য প্রকারে তাহাকে খানাতল্লাস করিতে পারে। এইরূপ ভাবে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতায় হাত দিলে ইংল্যাণ্ডে হৈ চৈ বাধিয়া যায়। কিন্তু ফ্রান্সে এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।

ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থাতেও একটু বিশেষত্ব আছে। যখন সাধারণ নাগরিকে ও সরকারী কর্ম্মচারীতে মামলা হয় তখন তাহা সাধারণ আদালতে হয় না, এ জন্ত বিশেষ আদালত মোতায়েন আছে। ইহাতে সরকারী কর্ম্মচারীরা যে বিশিষ্ট সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী তাহা বুঝা যায়। ইংল্যণ্ডে ও আমেরিকায় রাজাপ্রজায় মামলা বাধিলেও উহা সাধারণ আদালতে নিষ্পন্ন হয়, এ জন্ত বিশেষ কোন আদালত নাই। ফ্রান্সের জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে ইহাতে খর্ব্ব হয়, তাহা লইয়া সেখানে কোন প্রকার আন্দোলন হয় না। শাসকদের জন্ত বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা।

তবে কি গণতন্ত্র ফ্রান্সকে কোন দিক্ দিয়াই সমৃদ্ধ করিয়া তুলে নাই? এতক্ষণ দুর্ব্বলতার কথা বলিলাম, এক্ষণে ইহার শক্তি-সামর্থ্যের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

শাসন-ব্যাপারে, গ্রামে ও নগরে, ফ্রান্স বিলক্ষণ কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছে। গণতন্ত্রের পূর্ব্বের চেয়ে এখন যে অনেক বেশী নির্দ্দোষভাবে শাসনযন্ত্র চালিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের দৃঢ়-চিত্ততার ফলে শাসনের বহু দোষ বিদূরিত হইয়াছে। সুশাসন।

ফ্রান্সের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমগ্র রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। ফ্রান্সের পুলিশের ক্ষমতা খুব বেশী থাকিলেও ফরাসী পুলিশ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে না। সেইজন্ত লোকে নিরাপদে নিজ সম্পত্তি বা পারিবারিক সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ফ্রান্সে ইংল্যণ্ড ও আমেরিকার চেয়ে কম খরচায় বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়। শৃঙ্খলা।

প্রতি বৎসর ব্যবস্থাপক সভা-দ্বয়ের সাহায্যে ফ্রান্স যে সকল আইনকানুন পাশ করে সেগুলি সংখ্যায় খুব বেশী নয়। অধিকাংশ বিষয় তর্কমূলক নহে। শিক্ষা, রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয়, মজুরদের সঙ্ঘ, বার্দ্ধক্য পেন্সন, স্বাস্থ্য, ফ্যাক্টরি, কর (বিশেষ করিয়া আয়কর) ইত্যাদি ধরণের বিষয়সমূহ উভয় সভায় বেশী পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। সভায় কমিশন-প্রথা বর্ত্তমান থাকায় ফ্রান্সে কোন আইন পাশ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা আগেই বলা হইয়াছে। তথাপি দেশের মঙ্গলকর অনেক আইন ফ্রান্সে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যা তা আইন পাশ করা হয় না।

ফ্রান্সের সম্বন্ধে এই এক ভয় ছিল যে বারম্বার বিপ্লবের ফলে ফরাসী জনগণের বশ্য স্বভাবের অভাব হইয়াছে। কিন্তু সে ভয় অমূলক। মন্ত্রীরা আত্মরক্ষার জন্ত সৈন্ত-ব্যয়ের মঞ্জুরি চাহিয়া উভয় সভায় তাহা পাশ করিতে বিশেষ বেগ পান নাই। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাতেও ফরাসী সৈন্ত প্রশংসনীয়। বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধে ফ্রান্স এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল। ফরাসী প্রজার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

উপনিবেশ বিস্তারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরেই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থান। সত্য বটে, ইংরেজের মত সাম্রাজ্য-শাসনের প্রতিভা ফরাসীর নাই এবং বহু বিস্তীর্ণ জনপদ ফ্রান্সের করতলগত থাকিলেও সেগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থ দেশগুলির মত ধনধান্যপূর্ণ নহে, তথাপি ফ্রান্সের উপনিবেশ-শাসন-ব্যবস্থা উপেক্ষনীয় নয়। সাম্রাজ্য বিস্তার।

ফরাসী গণতন্ত্র অনেক পরীক্ষা ও বিপদের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতেও ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাসবান্। রাষ্ট্রনৈতিক জগতে গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের দানের পরিমাণ সামান্ত নহে। বস্তুত ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশের বহু রাষ্ট্র ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে গণতন্ত্রের দিকে প্রবুদ্ধ ও প্ররোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত দেখা যায়। এ বিষয়ে ফ্রান্সকে অন্যতম পথ-প্রদর্শকরূপে গণনা করা যাইতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

যৌথরাষ্ট্রের পত্তন

স্বাধীনতার পথে : ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মর্য্যাদা।

তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের সহিত তৎকালীন উত্তর আমেরিকাস্থ উপনিবেশসমূহের বিবাদ বাধে। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ বলিতে তখন বুঝাইত আটল্যাণ্টিকের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ১৩টি ছোট রাষ্ট্র। এই সমগ্র ভূভাগের লোকবল ৩০ লক্ষের বেশী ছিল না, আর ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেশ ভার্জিনিয়ায় ছিল ৫ লক্ষ লোক। সেই আমেরিকা যে আজিকার স্বাধীন, বৃহৎ আমেরিকায় পরিণত হইবে, তখনকার দিনে তাহা আন্দাজ করা শক্ত ছিল।

এই সমগ্র ভূভাগের রাজা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা। কনেক্‌টিকাট ও রোড আইল্যাণ্ড ছাড়া অন্য প্রত্যেক জনপদে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা ইংলাণ্ড-রাজ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আসিতেন। আপীল করিতে হইলে বিভিন্ন জনপদস্থ বিচারালয় হইতে ইংরেজের উচ্চতম বিচারালয়ে (প্রিভি কাউন্সিল) মোকদ্দমা লইয়া যাওয়া হইত। বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট আইন পাশ করিলে তাহা প্রত্যেক জনপদে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, এই সব উপনিবেশের তখন পর্য্যন্ত পরস্পর কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রত্যেকটি দেশে স্বায়ত্ত-শাসন বর্ত্তমান ছিল, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড হইতে কেহ হস্তক্ষেপ করিত না। প্রত্যেক জনপদে আইন-সভা (লেজিস্‌লেচার) ছিল, তাহাতে আইন-কানুন তৈরী হইত। প্রত্যেকে ইংরেজের রাজত্বের অন্তর্গত বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত বটে, কিন্তু একের সহিত অন্যের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে উপনিবেশগুলি বুঝিতে পারিল যে, সকলে একত্র না হইলে ইংল্যাণ্ডের সহিত যুঝা অসম্ভব। সুতরাং ১৭৬৫ সনে নিউ ইয়র্কে এক কংগ্রেসে এ বিষয় আলোচিত হইল। সে সময়ে ৯টি উপনিবেশ হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। ১৭৭৪ সনে ফিলাডেলফিয়ায় আবার একটি কংগ্রেসে ১২টি উপনিবেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের এক-জাতীয়ত্বের কথা প্রচার করিলেন। তখন ইংল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কংগ্রেসে সকল উপনিবেশ যোগদান করে ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়িতে প্রতিশ্রুত হয়। এই কংগ্রেস ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই উপনিবেশসমূহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :

"এই একত্রীভূত উপনিবেশসমূহ স্বাধীন ও স্বরাট্, স্বাধীনতা ও স্বারাজ্যের দাবির অধিকার ইহাদের ন্যায্য ; বৃটিশ সিংহাসনের জন্য কোন প্রকার রাজভক্তির দায় ইহাদের রহিল না, ইহাদের সহিত গ্রেট বৃটেন রাষ্ট্রের সকল রকম রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল ও হওয়া উচিত ; এবং স্বাধীন ও স্বরাট্ রাষ্ট্র রূপে ইহাদের যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি স্থাপন, সামরিক মিত্রতা, বাণিজ্য

সম্পর্ক স্থাপন করিতে এবং অন্যান্য স্বাধীন ও স্বরাট্ রাষ্ট্রের যে সব কার্য্য করিবার অধিকার আছে তাহা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।"

এইরূপে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত ১৩টি দেশ ইংল্যাণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিল।

	আয়তন বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা	কাঠামো কবে মঞ্জুর হয়
দেলাওয়ের	২,০৫০	২২৩,০০৩	ডিসেম্বর ৭,১৭৮৭
পেনসিল্‌ভেনিয়া	৪৫,২১৫	৮,৭২০,০১৭	ডিসেম্বর ১২,১৭৮৭
নিউ জার্সি	৭,৮ ৫	৩,১৫৫,৯০০	ডিসেম্বর ১৮,১৭৮৭
জর্জিয়া	৫৯,৪৭৫	২,৮৯৫,৮৩২	জানুয়ারি ২,১৭৮৮
কনেক্টিকাট	৪,৯৯০	১,৩৮০,৬৩১	জানুয়ারি ৯,১৭৮৮
ম্যাসাচুসেট্‌স্	৮,৩১৫	৩,৮৫২,৩৫৬	ফেব্রুয়ারি ৬,১৭৮৮
মেরিল্যাণ্ড	১২,২১০	১,৪৪৯,৬৬১	এপ্রিল ২৮,১৭৮৮
দক্ষিণ ক্যারোলিনা	৩০,৫৭০	১,৬৮৩,৭২৪	মে ২৩,১৭৮৮
নিউ হ্যাম্পশায়ার	৯,৩০৫	৪৪৩,০৮৩	জুন ২১,১৭৮৮
ভার্জিনিয়া	৪২,৪৫০	২,৩০৯,১৮৭	জুন ২৬,১৭৮৮
নিউ ইয়র্ক	৪৯,১৭০	১০,৩৮৫,২২৭	জুলাই ২৬,১৭৮৮
উত্তর ক্যারোলিনা	৫২,২৫০	২,৫৫৯,১২৩	নবেম্বর ২১,১৭৮৯
রোড আইল্যাণ্ড	১,২৫০	৬০৪,৩৯৭	মে ২৯,১৭৯০

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর উপরোক্ত ১৩টি রাষ্ট্র নিজেদের মিলনটাকে আইনসঙ্গতভাবে ঐক্যবদ্ধ ও চিরন্তন করিবার জন্য কতকগুলি ধারা (আর্টিকুলস অব্ কনফিডারেশন অ্যাণ্ড পারপিচুয়েল ইউনিয়ন) প্রণয়ন করিল। তাহার প্রথম তিনটি ধারা নিম্নরূপ : স্বাধীনতার প্রথম ফল।

ধারা ১। এই সম্মেলনের নাম হইবে "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র"।

ধারা ২। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, এবং যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা এই সম্মেলন দ্বারা কংগ্রেসে সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রাবলীকে স্পষ্টত না দেওয়া হইল সেই সব অধিকার ও ক্ষমতা, অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ধারা ৩। আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রসমূহ দৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে এবং অঙ্গীকার করিতেছে যে ধর্ম্ম, সর্ব্বকর্তৃত্ব, বাণিজ্য অথবা অন্য যে কোন অজুহাতে ইহাদিগকে অথবা কোন একটিকে কেহ আক্রমণ করিলে বা বাধা দিলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করিবে।

১৭৮১ সনের আগে সমস্ত রাষ্ট্র এই ধারাগুলি মঞ্জুর করিয়া লয় নাই। কিন্তু তখনো এই সব রাষ্ট্র একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয় নাই। একটা সম্মেলন মাত্র খাড়া করা হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। আন্তররাষ্ট্রিক ব্যাপার দেখিবার জন্য কংগ্রেস ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে শাসনযন্ত্র বলা চলে না। কংগ্রেসে ছোট বড় প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট ছিল, কিন্তু ব্যক্তির উপরে কংগ্রেসের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাহা ছাড়া, যৌথ-

শাসক (ফেডারেল এক্সিকিউটিব্), ও যৌথ-বিচারক (ফেডারেল কোর্ট) তখনো হয় নাই। টাকা তুলিবার কোন উপায়ও স্থির করা হয় নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্র যে টাকা দিত তাহাতেই ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু সাধারণত রাষ্ট্রগুলি টাকা দেওয়া বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। কংগ্রেসেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, কোন রাষ্ট্রকে টাকা দেওয়া বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে। উপনিবেশগুলি ইংল্যণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একত্র হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা শুধু ইংল্যণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, অন্য কোন স্বনির্ব্বাচিত শাসনযন্ত্রেরও অধীন না হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিল। অর্থাৎ তখনকার অবস্থায় ১৩টি বিভিন্ন রাষ্ট্র আপনাদের আত্মকর্তৃত্ব কোন ক্রমেই বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত ছিল না।

বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যবস্থা সুফল প্রসব করে না। ইংল্যণ্ডের সহিত যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখনই অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। ১৭৮৩ সনে যুদ্ধ বিরতির পর এই সব রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যখন স্বীকৃত হইল ও বাহির হইতে আক্রমণের ভয় রহিল না, তখন অসুবিধা আরো বাড়িয়া গেল। ওয়াশিংটন বলেন, তখন এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রগুলির একত্র কাজের সুবিধার জন্য যে মহাসমিতি (কংগ্রেস) ছিল তাহার প্রতি কোন দরদ ছিল না, সকলের কিসে হিত হয় বা না হয় তাহা বিবেচনা করিত না, অনেক সময় সমিতি ডাকিয়াও দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস সভ্যগণের ন্যূনসংখ্যা (কোরাম) পূর্ণ হইত না। ফলে ধনাগার শূন্য হইয়া যাওয়ায় সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে। দেশগুলি নানা প্রকারে জড়াইয়া গেল, কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদেশেও ইহাদের সম্মান-প্রতিপত্তি কমিয়া যায়।

তখন পাঁচটি রাষ্ট্র হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ ১৭৮৬ সনে মেরিল্যাণ্ডস্থ আন্নাপোলিস্ নামক স্থানে মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন কি করিয়া মহাসমিতিকে আরো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, কি করিয়াই বা বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুসৃত নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বাণিজ্যের উন্নতি করা যায়। এই সম্মেলন এক বিবরণী (রিপোর্ট) দাখিল করে। তাহাতে তৎকালীন অবস্থার নিন্দাবাদ করিয়া সংস্কারের প্রয়োজন ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্ত্তী বৎসরে আরও একটি বৈঠকে দরকারী সংশোধনী (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিবেচনা করিবার কথা থাকে। এই বিবরণী মহাসমিতিতে উপস্থাপিত করিলে, মহাসমিতি ১৭৮৭ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘোষণা করে যে, "রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য শাসন-সুগমতার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই," অতএব স্থির হয় যে "বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের লইয়া পরবর্ত্তী মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফিলাডেলফিয়ায় এক বৈঠক বসিবে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে সম্মেলনের (কনফেডারেশন) ধারাগুলি সংশোধন করিবার পর মহাসমিতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দাখিল করা; যে সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন মহাসমিতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা মানিয়া লইবে সেগুলি সমেত যে যৌথ-কাঠামো (ফেডারেল কনষ্টিটিউশন) গঠিত হইবে, তাহাতে শাসন-সুগমতা সম্ভবপর হইবে।"

সংস্কারের প্রচেষ্টা।

১৭৮৭ সনের ১৪ই মে তারিখে ফিলাডেলফিয়ায় উপরি লিখিত বৈঠক বসে, কিন্তু কাজ আরম্ভ করিতে ২৫শে তারিখ হইয়া যায়। প্রথমত ৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া

জর্জ ওয়াশিংটনকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। পরে রোড আইল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন। বৈঠক বসিতে না বসিতে অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বৈঠকের ক্ষমতা ইত্যাদি বিলকুল বদ্‌লাইয়া গেল। কথা ছিল পূর্ব্ববর্ত্তী ধারাগুলির দরকার মত পরিবর্ত্তন করা হইবে, কিন্তু স্থির হয় যে একেবারে একটা নূতন কাঠামো তৈরী করা হউক। আগে পরিবর্ত্তনগুলিকে মহাসমিতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় পাশ করাইবার কথা হইয়াছিল, এক্ষণে ঠিক হইল যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের সম্মুখে নূতন কাঠামো উপস্থাপিত করা হইবে। তাহাদের মতামত অনুসারেই কাঠামো স্থিরীকৃত হইবে।

নূতন কাঠামো। জনগণের সর্ব্বকর্তৃত্ব স্বীকার।

এইখানে একটা কথা বুঝিয়া দেখা দরকার। অনেক সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব কোথায় স্থাপিত রহিয়াছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোলে পড়িতে হয়। ১৭৮৭ সনের বৈঠকের পর কাঠামোর খসড়া তৈরী করা হয়, তাহা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনের পর গৃহীত হয়, তাহার পর ইহা আজ অবধি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনগুলি সহজসাধ্য হয় নাই। সাধারণত মনে করা হয় যে, এই কাঠামোর আধিপত্যই চরম অর্থাৎ ফ্রান্সে অথবা ইংল্যাণ্ডে যেমন কাঠামো সহজে পার্ল্যামেন্টে বদ্‌লাইতে পারা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে তাহা পারা যায় না। ফ্রান্সে বা ইংল্যাণ্ডে পার্ল্যামেন্টের উপরে কোন শক্তি নাই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মহাসমিতির স্থান কাঠামোর উচ্চে নহে। সমগ্র যৌথ-রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির কোন একটি অথবা কোন ব্যক্তি কাঠামোর কোন ধারা অমান্য করিলে বিচারালয়ে তাহা সংশোধন করিবার সুবিধা আছে। এইরূপে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র জনগণের হাতেই সর্ব্বকর্তৃত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। মহাসমিতির পক্ষে কাঠামোর পরিবর্ত্তন সম্ভব বটে, কিন্তু জনগণ সকলে চাহিলে উহা মহাসমিতির বিরুদ্ধেও করিতে পারে। জনগণের এই সর্ব্বকর্তৃত্বের কথা প্রথম বৈঠকেই স্বীকৃত হইতেছে দেখা যাইবে। সেই জন্য ঐ বৈঠকে স্থিরীকৃত কাঠামো অনুমোদন করিবার জন্য মহাসমিতি বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় পেশ না করিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের নিকট পেশ করা স্থির হয়। জনগণের এই সর্ব্বকর্তৃত্বের কথা মনে রাখিলে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যাও সহজে বুঝা যাইবে।

বৈঠকে ৫৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা পাঁচ মাস কাজ করিবার পর ১৭৮৭ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক কাঠামো খাড়া করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ৩৯ জন প্রতিনিধি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সেই দিনই উহা দুইটি প্রস্তাব সমেত মহাসমিতির নিকট পেশ করা হয়। প্রস্তাব দুটির মর্ম্ম নিম্নরূপ :

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো প্রণয়ন।

১। কংগ্রেসে সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রাবলীর নিকট উহা উপস্থাপিত করা হইবে, এবং পরে প্রত্যেক রাষ্ট্রে জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বৈঠকে উহা উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেকের সম্মতি লওয়া হইবে।

২। ১৩টির মধ্যে ৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের বৈঠকে এই কাঠামো মঞ্জুর হইলে মহাসমিতি একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, সেদিন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচনের জন্য ভোট-দাতাদের নির্ব্বাচন করিয়া দিবে, মহাসমিতি অন্য একটি দিন স্থির করিয়া দিলে সেইদিন ঐ

ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচন করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে এই কাঠামো অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে, রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইবে। ইত্যাদি।

কাঠামোর খসড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে মঞ্জুর হইবার জন্ম প্রেরিত হইল। ১৩টি রাষ্ট্র পর পর এই কাঠামো মঞ্জুর করিয়া লয় (উপরে দ্রষ্টব্য)। ১৭৮৯ সনের ৪ঠা মার্চ্চ হইতে এই কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়িভাবে অবলম্বিত হয়। আজিকার দিনে যুক্তরাষ্ট্রের এক-জাতীয়ত্ব ও ঐক্যবদ্ধতার দিকে চাহিয়া বুঝা কঠিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো প্রণয়ন ও স্থাপনের ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন তাঁহাদের কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তৎকালে কাঠামো প্রণয়নের ২।১টি সুবিধা ও অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি তখনও একটা জাতিরূপে পরিগণিত হয় নাই। ঐক্যের অনুকূল অনেক অবস্থা বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাও কম ছিল না। নিউ ইয়র্ক ও দেলাওয়েরের ওলন্দাজ ও সুইডিশ্‌গণ, পেন্‌সিলহ্বেনিয়ার জার্ম্মাণগণ, নিউ ইংল্যাণ্ড ও মধ্য রাষ্ট্রসমূহস্থ ফরাসীগণ সংখ্যায় বেশী ছিল না,—জনগণের অধিকাংশ এক ভাষায় কথা কহিত। প্রায় সকল লোক এক জাতির অন্তর্গত ছিল। মেরিল্যাণ্ডে কয়েক ঘর রোমান ক্যাথলিক ছিল। তাছাড়া সকলেরই ধর্ম্ম প্রটেষ্টাণ্ট। ইংরেজের আচার-ব্যবহারই সকলে মানিয়া চলিত। নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্বশীল হইয়া সকলেই এক রাজার রাজত্বে বাস করিত। এইগুলি ছিল এক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পক্ষে অনুকূল।

(২) অন্য দিকে এই সব রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য পরস্পর আদান-প্রদান সহজ ছিল না। শীতকালে সাগর তরঙ্গসঙ্কুল থাকিত। রাস্তাঘাট এত খারাপ ছিল যে, সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আসিতে যত সময় লাগিত আমেরিকা হইতে ইয়োরোপে যাইতেও তত সময় লাগিত না। পথঘাট বিশেষ বিপজ্জনক ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতি বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত ছিল, বাণিজ্যের প্রসার তখনও তেমন হয় নাই। কোন কোন রাষ্ট্রে লোক-সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ ও কার্য্য বিভিন্ন ছিল। ছোট রাষ্ট্রের সহিত বড় রাষ্ট্রের মিলিত হওয়া ছোট রাষ্ট্র ভয়ের কারণ মনে করিত। তদুপরি অনেক রাষ্ট্রের জনগণ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া নিজেদের সৃষ্ট কোন শাসনযন্ত্রের হাতেও সর্ব্বকর্তৃত্বের ভার তুলিয়া দিতে রাজী ছিল না।

কোন কোন রাষ্ট্র কাঠামোটিকে মঞ্জুর করিবার কালে কতকগুলি সংশোধনীও সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিল। জনগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রার্থনাই তাহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠে। কাঠামো সংশোধনীর নিয়ম এই স্থির করা হয় যে, সেই সংশোধনী কোন রাষ্ট্রে তিন-চতুর্থাংশ অতিজন ভোট দ্বারা ও মহাসমিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট দ্বারা পাশ হওয়া চাই। তদনুসারে ১৭৯১ সনে রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ১০টি সংশোধনী গৃহীত হয়। ইহার পর আজ অবধি আরও ৯টি সংশোধনী গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩টি আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধের পর অবলম্বিত হয়।

সংশোধনীর সংখ্যা ১৯।

যৌথরাষ্ট্রের স্বরূপ

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর এই একটা পার্থক্য

দৃষ্ট হইবে যে, উভয়ই লিখিত হইলেও ফ্রান্সের কাঠামো একটিমাত্র দলিলে সীমাবদ্ধ নহে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলিল-পত্র তৈরী হইয়াছিল, পরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামো একবারে একটি দলিলে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। বস্তুত ১৭৮৭ সনে প্রণীত কাঠামোকে বিশেষ মর্য্যাদার চোখে দেখা হইয়া থাকে। ফলে ফ্রান্সের কাঠামোর পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর পরিবর্ত্তন করা যে কঠিন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। সাধারণ আইনের চেয়ে কাঠামো-সম্পর্কিত আইনকে অনেক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। কাঠামোর সংশোধনী সম্পর্কে শুধু গণতান্ত্রিক নিয়মকেই মানা হইয়াছে তাহা নয়, সেই গণতন্ত্রে যাহাতে অতিজন মাত্রেই ইচ্ছা করিলে ঊনজনকে অতিক্রম করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাঠামোর প্রণেতাগণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের দিকেও খরদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-সম্পর্কিত আইনের পরিবর্ত্তন সহজ নহে।

আজ অবধি সমস্ত সংশোধনী সমেত সমগ্র কাঠামো আইন আকারে নেহাৎ ছোট, অন্য কোন দেশের লিখিত কাঠামো আইন আকারে এত ছোট নয়। প্রথম ধারার (আর্টিক্‌ল) দশটি উপধারায় রাষ্ট্র-সভা, প্রতিনিধি-সভা, মহাসমিতি কি ভাবে গঠিত হইবে ও কি কি ক্ষমতা-বিশিষ্ট হইবে এবং রাষ্ট্রগুলিরই বা কি ক্ষমতা থাকিবে তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারার চারিটি উপধারায় রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন ও ক্ষমতা বিবৃত আছে। তৃতীয় ধারার তিনটি উপধারায় বিচারালয়, চতুর্থ ধারার চারিটি উপধারায় নাগরিকদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, পঞ্চম ধারায় কাঠামো আইনের পরিবর্ত্তন, ষষ্ঠ ধারায় সন্ধি ও ঋণ গ্রহণ, সপ্তম ধারায় কাঠামো মঞ্জুরির প্রথা আলোচিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো সংক্ষিপ্ত হইবার একটি কারণ, শাসন-যন্ত্রের একটা পূরা খসড়া খাড়া করা প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৩টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সেগুলিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে সকল কাজ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে একা একা সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না বা উচিত ছিল না অথবা সম্পন্ন করিলেও ভাল করিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না সেই সব কাজের ভারই যৌথরাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়। সুতরাং সমগ্র রাষ্ট্রের কাঠামোকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত কাঠামোর সহিত একেবারে সম্পর্ক-রহিত বলিয়া বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। বস্তুত একদিক হইতে দেখিলে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামোগুলির পরিপোষক মাত্র। যে সব ক্ষমতা বা অধিকার রাষ্ট্রগুলির ছিল না সেগুলিই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর প্রণেতাদের চোখের সামনে নিম্নলিখিত দুইটি উদ্দেশ্য ছিল:

সমগ্র দেশ বনাম বিভিন্ন রাষ্ট্র।

(১) একটি কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের (গবর্ণমেণ্ট) সৃষ্টি।

(২) বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সহিত ঐ কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের সম্বন্ধ নির্ণয়। "অর্থাৎ তখনকার সমস্যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও কি করিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা যায়। বলা বাহুল্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচারকালে এই উদ্দেশ্য দুটিকে মনে রাখা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যাবলী।

সমগ্র দেশের পক্ষে প্রযোজ্য শাসন, ব্যবস্থা ও বিচার-সম্পর্কিত কার্য্যাবলী যৌথরাষ্ট্রের কাঠামোর অন্তর্গত করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই :

(১) যুদ্ধ ও শান্তি : বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী স্থাপন।

(২) স্থল ও জল-সৈন্য।

(৩) যৌথ-বিচারালয়।

(৪) বিদেশী এবং রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য।

(৫) সিক্কা (কারেন্সি)।

(৬) মুদ্রণস্বত্ব (কপিরাইট) ও শিল্পোদ্ভাবন-অধিকার-পত্র (পেটেন্ট)।

(৭) ডাকঘর ও ডাক-সংক্রান্ত রাস্তা।

(৮) উপরোক্ত কার্য্যাবলীর জন্য ও শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য করভার চাপাইবার ক্ষমতা।

(৯) কোন রাষ্ট্র নাগরিকদের বিরুদ্ধে অন্যায় অথবা পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করিলে সেই নাগরিকদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি-সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতি (কংগ্রেস) আইন প্রণয়ন করিতে, শাসন পরিচালনা করিতে ও বিচারের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। অন্য সমস্ত আইন প্রণয়ন ও শাসন-ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে, যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা বা শাসন-কর্ত্তাগণ ঐ গুলিতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহেন।

বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন বিভাগগুলি এই :

রাষ্ট্রীয় সংস্থানের বিভিন্ন অঙ্গ।

(ক) রাষ্ট্র-নেতা।

(খ) মহাসমিতি নামে অভিহিত ব্যবস্থাপক সভা।—ইহার দুই শাখা। একটির নাম রাষ্ট্র-সভা, অন্যটির নাম প্রতিনিধি-সভা।

(গ) বিভিন্ন শাসন-বিভাগের কর্ত্তাগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

(ঘ) বিচার-ব্যবস্থা। একটি উচ্চতম আদালত এবং ইহার তাঁবে অবস্থিত বিভিন্ন আদালত।

যুক্তরাষ্ট্রের সেকাল ও একাল।

কোথায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ আর কোথায় ১৯৩১! ১৭৮৭ সনে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কাঠামো রচিত হইয়াছিল আজ আর সে যুক্তরাষ্ট্র নাই। এই দুই বিভিন্ন সময়কার দেশটিকে একবার তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

১৭৮৭ সনে—

(ক) ১৩টি মাত্র রাষ্ট্র একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। ঐ ভূভাগের শ্বেত-অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ আর জনগণ বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র ১ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া।

(খ) ঐ জনগণের পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ গ্রাম্য আয়তনে অথবা ছোট শহরে বাস করিত।

(গ) অধিকাংশ দেশবাসী বৃটিশ ছিল।

(ঘ) তখনকার দিনে ধনী এবং দরিদ্রের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য উগ্রভাবে দেখা দেয় নাই।

(ঙ) দেশস্থ অধিকাংশ লোক কৃষি, গবাদিপালন ও ছোটখাট শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল।

১৯৩১ সনে—

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা ৪৮। পূর্ব্বোক্ত ১৩টি রাষ্ট্র ব্যতীত নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে :—

	আয়তন বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা ১৯২০ সন	কাঠামো কবে মঞ্জুর হয়
ভারমোণ্ট	৯,৫৬৫	৩,৫২,৪২৮	১৭৯১
কেণ্টাকি	৪০,৪০০	২৪,১৬,৬০০	১৭৯২
টেন্নেসি	৪২,০৫০	২৩,৩৭,৮৮৫	১৭৯৬
ওহিও	৪১,০৬০	৫৭,৫৯,৩৯৪	১৮০২
লুসিয়ানা	৪৮,৭২০	১৭,৯৮,৫০৯	১৮১২
ইণ্ডিয়ানা	৩৬,৩৫০	২৯,৩০,৩৯০	১৮১৬
মিসিসিপি	৪৬,৮১০	১৭,৯০,৬১৮	১৮১৭
ইলিওনয়	৫৬,৬৫০	৬৪,৮৫,২৮০	১৮১৮
অ্যালাবামা	৫২,২৫০	২৩,৪৮,১৭৪	১৮১৯
মেইনে	৩৩,০৪০	৭,৬৮,০১৪	১৮২০
মিসৌরি	৬৯,৪১৫	৩৪,০৪,০৫৫	১৮২১
আরকানসাস্	৫৩,৮৫০	১৭,৫২,২০৪	১৮৩৬
মিসিগান	৫৮,৯১৫	৩৬,৬৮,৪১২	১৮৩৭
ফ্লোরিডা	৫৮,৬৮০	৯,৬৮,৪৭০	১৮৪৫
টেক্সাস্	২৬৫,৭৮০	৪৬,৬৩,২২৮	১৮৪৫
আইওয়া	৫৬,০২৫	২৪,০৪,০২১	১৮৪৬
উইস্কন্সিন্	৫৬,০৪০	২৬,৩২,০৬৭	১৮৪৮
কালিফোর্ণিয়া	১৫৮,৩৬০	৩৪,২৬,৮৬১	১৮৫০
মিন্নেসোটা	৮৩,৩৬৫	২৩,৮৭,১২৫	১৮৫৮
ওরগণ	৯৬,০৩০	৭,৮৩,৩৮৯	১৮৫৯
কংসাস	৮২,০৮০	১৭,৬৯,২৫৭	১৮৬১
পশ্চিম ভার্জিনিয়া	২৪,১৭০	১৪,৬৩,৭০১	১৮৬৩
নেভাদা	১১০,৭০০	৭৭,৪০৭	১৮৬৪
নেব্রাস্কা	৭৭,৫১০	১২,৯৬,৩৭২	১৮৬৭
কোলোরাডো	১০৩,৯২৫	৩,৩৯,৬২৯	১৮৭৬
উত্তর ডাকোটা	৭০,৭৯৫	৬,৪৬,৮৭২	১৮৮৯
দক্ষিণ ডাকোটা	৭৭,৬৫০	৬,৩৬,৫৪৭	১৮৮৯
মোণ্টানা	১৪৬,০৮০	৫,৪৮,৮৮৯	১৮৮৯

	আয়তন বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা ১৯২০ সন	কাঠামো কবে মঞ্জুর হয়
ওয়াশিংটন	৬৯,১৮০	১১,৫৬,৫২১	১৮৮৯
ওয়াইওমিং	৯৭,৮৯০	১,৯৪,৪০২	১৮৯০
ইডাহো	৮৪,৮০০	৪,৩১,৮৬৬	১৮৯০
উটাহ্	৮৪,৯৭০	৪,৪৯,৩৯৬	১৮৯৫-৬
ওক্লাহোমা	৭০,০৫৭	২০,২৮,২৮৩	১৯০৭
আরিজোনা	১১৩,০২০	৩,৩৪,১৬২	১৯১১
নিউ মেক্সিকো	১২২,৫৮০	৩,৬০,৩৫০	১৯১১

ইহা ছাড়া এক্ষণে নিম্নলিখিত দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় অবস্থিত, যদিও এগুলিকে রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হয় না।

হাউয়াইয়ান দ্বীপ	৬,৪৪৯ (লোকবল প্রায় ২ লক্ষ)
আলস্কা	৫৯০,৮৮৪
কলম্বিয়া জিলা	৭০
ফিলিপাইন দ্বীপ	১২৭,৮৫৩ (লোকবল প্রায় ৮০ লক্ষ)
পোর্টোরিকো	৩,৪৩৫ (লোকবল প্রায় ১২ লক্ষ)

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটি আর সমগ্র ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল—ঐ আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ ঘন বসতি-বিশিষ্ট।

(খ) সমগ্র অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ শহরে বাস করে—কোন শহরেরই জনবলের পরিমাণ ২৫,০০০ এর কম নয়।

(গ) সমগ্র অধিবাসীর অর্দ্ধেকেরও কম বৃটিশ-রক্তজাত। আর প্রায় এক-দশমাংশ আফ্রিকান্।

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রে যত ধনশালী ব্যক্তি রহিয়াছে পৃথিবীর আর কোথাও তত নাই। আর এমন ধনশালী ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয় যাহাদের প্রত্যেকের ধনের পরিমাণ পৃথিবীর অন্য দেশের প্রত্যেক ধনীর ধনের পরিমাণের চেয়ে বেশী।

(ঙ) জনগণের অর্দ্ধাংশের বেশী শিল্প-কারবার, খনি, বাণিজ্য ও যানবাহনের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

১৮৪০ সনের পর যুক্তরাষ্ট্র।

১৮৪০ সন অবধি যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশ হইতে ঔপনিবেশিকগণ আসিতে আরম্ভ করে নাই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন অধিবাসিগণ উর্বর জমি আবিষ্কার করিতে করিতে ক্রমাগত নূতন ভূভাগ নিজেদের করতলগত করিতে আরম্ভ করে। সোণা, রূপা, তামা, লোহা, কয়লা, তৈল প্রচুর পরিমাণে ছিল, অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানেরও অভাব ছিল না। সুতরাং জনবলের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার লোকসংখ্যাও বাড়িয়া প্রায় দেড় কোটি দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪০ সনের পর হইতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে ঔপনিবেশিকেরা আসিতে আরম্ভ করে। আজ ইহাদের বংশধরদের সংখ্যাই খাস্ অধিবাসীদের বংশধরদের সংখ্যায়

চেয়ে বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণ ইয়োরোপের বড় বড় দেশ হইতে আসাতে গ্রাম্য জনগণের সহিত মিশিয়া ভাল কলই উৎপাদন করিয়াছে। অন্য দিকে, বাণিজ্যিক বন্দরগুলিতে আমদানি-রপ্তানি যেমন খুব বাড়িতে লাগিল এবং শিল্প-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল, অমনি ইয়োরোপের অনুন্নত দেশগুলি হইতে দলে দলে লোক কাজের জন্য আসিতে লাগিল। ইহাদের অনেকে অনুপযুক্ত হইলেও প্রচলিত নিয়মকানুন সহজ ছিল বলিয়া ইহাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা কঠিন হয় নাই। ইহা ছাড়া ১৮৬১-৬৫ সন ধরিয়া নিগ্রো সমস্যা লইয়া অন্তর্যুদ্ধের অবসানের পর বহু নিগ্রো স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রস্বত্ব লাভ করে। অথচ এই সব নিগ্রোর অনেকেরই শিক্ষা-দীক্ষা এরূপ ছিল না যে, তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজনৈতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে দেখিতে দেখিতে যুক্তরাষ্ট্রে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

এই সময়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কৃষি, খনি ও অন্যান্য শিল্পের বিস্তার, বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারের ফলে যান-বাহনের সুগমতা অত্যধিক বাড়ায় বহির্বাণিজ্য ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্য এবং দেশস্থ রেলরোড ইত্যাদি বিপুল আকার ধারণ করিল। ফলে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির অপরিমেয় ধন লাভ করিবার সুযোগ হয়। শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বে যে যুক্তরাষ্ট্রে ধনের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আজ তাহাই সর্ব্ববিষয়ে মহাপ্রভাবশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ এখন খুব বেশী। নাগরিকদের মধ্যে পরস্পর প্রীতির বন্ধন আগেকার মত রাখা সম্ভবপর হয় নাই। অর্থের অতি প্রাচুর্য্য ঘটিলে যে সব দোষ উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার অনেকগুলি আমেরিকার সমাজে দেখা দিয়াছে। রেলরোড প্রভৃতি বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা ব্যক্তির কখনো কখনো অর্থের সাহায্যে ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অর্থোপার্জ্জনের দিকে লোকে বেশী মনোযোগ দেওয়ায় তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, আমেরিকানেরা ভাল কাজের জন্য অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ না হইলেও, লোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। এক্ষণে সেই প্রকার অধিকাংশ ব্যক্তিকে আর রাষ্ট্রের সেবার জন্য পাওয়া যায় না।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে আজিকার যুক্তরাষ্ট্র কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৭৮৭ সনের যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যাঁহারা কাঠামো তৈরী করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান দেশের কথা ভাবিতে পারেন নাই। অথচ সেই কাঠামোই (কয়েকটি সংশোধনী সমেত) আজও বলবৎ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই জন্য সেই পুরাতন যন্ত্রকে কাজে খাটাইতে গিয়া বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রকে নানা দিকে প্রসার করিতে হইয়াছে, আইনকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তাদেরও বিশেষ বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। তথাপি এই কাঠামো সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহার ক্ষমতা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজও অক্ষুণ্ণ। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। অথবা প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তে একেবারে নূতন কাঠামো প্রণয়ন করা হয় নাই।

কাঠামোর ক্রমবর্দ্ধন

১৭৮৭ সনের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ১৯৩১ সনের যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এই দেশের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে। কোন দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে নূতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদয় হইয়া থাকে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য আইন প্রণয়ন দরকার হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের মত এরূপ উন্নতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল দেশ এক অপরিবর্ত্তনীয় (প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়, কারণ কোন প্রকার সংশোধনী কিরূপ কঠিন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) কাঠামো লইয়া কি করিয়া ইহার নিজের অভাব মিটাইতে পারে, সে প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো ১৭৮৭ সনে যে অবস্থায় ছিল আজ সে অবস্থায় নাই। ইহার অনেক পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে। যে প্রধান তিনটি কারণে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে সেগুলি এই: (১) সংশোধনী (অ্যামেণ্ডমেন্ট), (২) ব্যাখ্যা (ইন্টারপ্রিটেশন), (৩) প্রথা (ইউসেজ্)। এই তিন প্রণালীতে ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

সংশোধনীর প্রণালী।

কাঠামোর পঞ্চম ধারাটিতে কাঠামো সংশোধনের প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। তাহার কতকাংশ এইরূপ:

"যখন উভয় সভার দুই-তৃতীয়াংশ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবে, তখন মহাসমিতি এই কাঠামোর সংশোধনী প্রস্তাব করিবে, অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবস্থাপক সভাসমূহ আবেদন করিলে পর মহাসমিতি সংশোধনীর প্রস্তাব করিবার জন্য এক বৈঠক (কনভেনশন) আহ্বান করিবে; যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ মঞ্জুর করিবে অথবা তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের বৈঠকে মঞ্জুর হইবে (মঞ্জুরির ব্যবস্থাটা মহাসমিতি হইতে স্থিরীকৃত হইবে) তখন ঐ সব পরিবর্ত্তন উভয় ক্ষেত্রেই কাঠামোর অঙ্গরূপে গণ্য হইবে।"

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে, সংশোধনীর খসড়া তৈরী করিবার ও পেশ করিবার উপায় হইতেছে দুইটি:

(ক) প্রত্যেক সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা মহাসমিতি নিজে নিজে সংশোধনীর খসড়া তৈরী করিতে ও পেশ করিতে পারে।

(খ) দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ মহাসমিতিকে কাঠামো পরিবর্ত্তনার্থ বৈঠক ডাকাইতে বাধ্য করিতে পারে। মহাসমিতি ইচ্ছা করিলেও অস্বীকার করিতে পারে না। বৈঠক আহূত হইবার পর সংশোধনীর খসড়া তৈরী ও পেশ করিবে। বৈঠকের লোকেরা কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে ও উহা কি ভাবে গঠিত হইবে তাহা মহাসমিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সংশোধনীর খসড়া তৈরী হইবার ও প্রস্তাবিত হইবার পর মহাসমিতিতে দুই প্রকারে আইন প্রণয়ন হইতে পারে:

(১) তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তাহাদিগের নিকট উপস্থাপিত সংশোধনী মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) বিভিন্ন রাষ্ট্রে বৈঠক আহূত হইতে পারে ও এই সব বৈঠকের তিন-চতুর্থাংশ মত সংশোধনী মঞ্জুর করিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যত সংশোধনী আনা হইয়াছে অথবা যতগুলি আইনে পরিণত হইয়াছে সকল গুলির পক্ষেই উপরি উক্ত ক ও ২ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

কাঠামো সংশোধনীর জন্য রাষ্ট্র-নেতার সম্মতি লইবার দরকার হয় না। সম্মতি লওয়া হইলেও তাহা নিরর্থক হইত। কারণ মহাসমিতির দুই-তৃতীয়াংশ একজোট না হইলে সংশোধনীর প্রস্তাব আনয়ন করা সম্ভবপর নহে, পরন্তু মহাসমিতির দুই-তৃতীয়াংশ এক মতাবলম্বী হইলে রাষ্ট্র-নেতার নাকচ্-ক্ষমতা (ভিটো) ব্যর্থ হইয়া যায়।

উপরি উক্ত পঞ্চম ধারার শেষ অংশে উক্ত হইয়াছে একটি মাত্র স্থলে উপরের প্রণালীতে সংশোধনী উপস্থাপিত করা যাইবে না। তাহা এই: কখন সংশোধনী সম্ভব নহে।

"রাষ্ট্র-সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের যে সমান সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার নিজের সম্মতি ব্যতীত তাহাকে সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত করা হইবে না।" কোন রাষ্ট্র স্ব ইচ্ছায় যদি এই অধিকার ত্যাগ করে তবে এ বিষয়ে সকল রাষ্ট্রের একমতাবলম্বী না হইলেও চলে, তিন-চতুর্থাংশ রাজী হইলে সে বিষয়ে আর কোন বাধা থাকে না।

কাঠামোর সংশোধনী সম্পর্কে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। সত্য বটে, এ পর্য্যন্ত সংশোধনীর সংখ্যা খুব কম হইয়াছে, কিন্তু আইনত এমন কোন বাধা নাই যাহাতে যৌথ-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশোধনী আনয়ন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সংশোধন করিবার ক্ষমতার বলে যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশগুলি লইয়া নূতন নূতন রাষ্ট্র গড়া অথবা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বারাজ্য দেওয়া সংশোধনী-ক্ষমতার বাহিরে নহে। সুতরাং কার্য্যত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর পরিবর্ত্তন যতই কঠিন হোক্ আইনত তাহা তত কঠিন নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি সংশোধনী হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৯। আজ পর্য্যন্ত ১৯টি সংশোধনী। কোন্ সময়ে কয়টি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

১৭৯১ সন	...	১০
১৭৯৮ সন	...	১
১৮০৪ সন	...	১
১৮৬৫ সন	...	১ (দুইটি পল্লব)
১৮৬৮ সন	...	১ (পাঁচটি পল্লব)
১৮৭০ সন	...	১ (দুইটি পল্লব)
১৯১৩ সন	...	২ (একটিতে ৩টি শাখা)
১৯১৯ সন	...	১ (তিনটি শাখা)
১৯২০ সন	...	১ (দুইটি শাখা)

প্রথম দশটি বাস্তবিক পক্ষে মূল কাঠামোর পুনর্লেখ (পোষ্টস্ক্রিপ্ট) রূপে গণনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপের আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সব সংশোধনী বিধিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল সেগুলি এই দশটিতে স্থান পাইয়াছে। নিম্নলিখিত দুইটি ধারা হইতে এই সব সংশোধনীর প্রকৃতি কতকটা বুঝা যাইবে :

নবম ধারা। কাঠামো-আইনে কোন কোন অধিকার বর্ণিত ও নির্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া এইরূপ বিবেচনা করিবার কোন হেতু নাই যে তদ্দ্বারা জনগণের অন্যান্য অধিকার অস্বীকার করা হইতেছে।

দশম ধারা। কাঠামো দ্বারা যে সব ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে দান করা হয় নাই, অথবা যে গুলি রাষ্ট্রের নয় বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই, সেগুলি হয় রাষ্ট্রের, নয় জনগণের।

এই দশটি ধারাকে কখনো কখনো স্বাধিকার-সংরক্ষণ-আইন (বিল্ অব্ রাইট্স) নামে অভিহিত করা হয়। এই ধারাগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার অব্যবহিত পরে বিধিবদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৭৮৭ সনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন কোন অংশের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব আনে। তাহারই কতকগুলি এই দশটি ধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী তেমন গুরুতর নহে। প্রথমটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনীত মামলা-মোকদ্দমাবিষয়ক, আর দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। কাঠামো কাজে খাটাইতে গিয়া যে সব ত্রুটি ধরা পড়িয়াছিল এই দুই সংশোধনীর সাহায্যে সেগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

নিগ্রোদের স্বাধীনতা দানের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দেশগুলির মধ্যে পরস্পর যে যুদ্ধ বাধে (১৮৬১-৬৫), তাহার নিবৃত্তির পর কতকগুলি দরকারী সংশোধনী আনা আবশ্যক হয়। ১৩, ১৪ ও ১৫ নং সংশোধনীত্রয় যুক্তরাষ্ট্রের এক যুগ-পরিবর্ত্তনের কথা জ্ঞাপন করে। বস্তুত ১৩ (দাসত্বের উচ্ছেদ ও সে বিষয়ে মহাসমিতির ক্ষমতা), ১৪ (নাগরিক অধিকার, প্রতিনিধি কে হইতে পারে তাহার বিচার, রাজনৈতিক অনুপযুক্ততা, সরকারী ঋণ ও মহাসমিতির ক্ষমতা) এবং ১৫ নং (নিগ্রোর ভোটাধিকার ও সে বিষয়ে মহাসমিতির ক্ষমতা) ধারা দ্বারা নিগ্রো-দিগকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। এজন্য উত্তর দেশস্থ লোকেরা স্বজাতীয় শ্বেত বাসিন্দাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই ঘটনা আমেরিকার ইতিহাসে বড় স্থান পাইবার যোগ্য। প্রথমটি ১৮৬৫ সনে, দ্বিতীয়টি ১৮৬৮ সনে ও তৃতীয়টি ১৮৭০ সনে আইনে পরিণত হয়। কোন সংশোধনীর প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়া কিরূপ কঠিন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯১৩ সনে দুটি সংশোধনী গৃহীত হইয়াছে। একটিতে করভার চাপানো সম্বন্ধে মহাসমিতিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অন্যটিতে রাষ্ট্র-সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের এই নিয়ম করা হয় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদের নির্ব্বাচন না করিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণ তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিবে।

আমেরিকার ভোলস্টেড্ অ্যাক্ট বা মদ্যপান-নিবারণী আইনের কথা সকলেই জানেন। এই আইন অষ্টাদশ সংশোধনীর ফল। ঊনবিংশ সংশোধনী দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের নারীগণ ভোটাধিকার পাইয়াছেন।

উপরের সংশোধনীগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, (ক) শুধু যে পূর্ব্বের আইনই সংশোধন করা হইয়াছে তাহা নয়, সংশোধনীর অধিকাংশই নূতন সংযোজিত; (খ) সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া তাহা আইনরূপে পাশ করা তিনটি ক্ষেত্রে সম্ভবপর হইয়াছে: (১) যেখানে কোন দলের স্বার্থ জড়িত নয় এবং সংশোধনীর গুরুত্ব অল্প (যেমন ১১, ১২ ও ১৩ নং), (২) যখন দেশের মধ্যে এমন বিপ্লব দেখা দেয় যে, যৌথরাষ্ট্রের ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় (যেমন ১৩, ১৪ ও ১৫ নং), (৩) যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের উভয় রাজনৈতিক দল সংশোধনী চায় (যেমন ১-১০ নং ও ১৬-১৯ নং)।

বলা বাহুল্য, কোন কোন রাষ্ট্র-নেতা অথবা সদস্য বিভিন্ন সময়ে সমিতির নিকট বহু সংশোধনী উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি না পাওয়ায় তাঁহাদের প্রস্তাব-গুলি আইনে পরিণত হইতে পায় নাই। কখনো কখনো মহাসমিতির সম্মতি থাকিলেও তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদন না পাওয়ায় ঐ সব প্রস্তাব বাতিল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়, ইহা যেমন সত্য কথা, তাহা একেবারে অসম্ভব নয়, তাহাও তেমনি সত্য কথা। শুধু তাই নয়। ১৯১৩ সনে যে দুইটি সংশোধনী হইয়াছে, কাঠামোর দিক্ হইতে সে দুইটি বিশেষ মূল্যবান্। এই দুইটি সংশোধনী দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে মহাসমিতি ও রাষ্ট্রসমূহ ইচ্ছা করিলে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে বেশ গুরুতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংশোধনীর দ্বারা বর্ত্তমান কাঠামোর যতটা বিকাশ হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার চেয়েও বেশী হইবার অবকাশ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব সর্ব্বদাই হইয়াছে ও হইতেছে। এই সব সমস্যা সমাধানের ফলে কতকগুলি সংশোধনী আইনরূপে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। এইজন্য বিভিন্ন সময়ে সংশোধনী ছাড়াও অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে ব্যাখ্যা (ইণ্টারপ্রিটেশন)। সংশোধনী আনা যত কঠিন ব্যাখ্যা তত কঠিন নহে। আইনজীবিগণের কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ব্যাখ্যা।

অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশও অচল নহে,—১০০।১৫০ বৎসরে ঐ দেশেরও এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে যে, অনেক নূতন আইনকানুন প্রণয়নের দরকার হয়। আমেরিকার মত দ্রুতগতিশীল দেশের ত কথাই নাই। সংশোধনী সহজসাধ্য নহে বলিয়া কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা উহাকে নানাপ্রকারে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রথমত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার: (১) কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা করিবার কর্ত্তা কে বা কাহারা; (২) যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে কোন ক্ষমতার কথা উল্লিখিত আছে কি না তাহা স্থির করিতে হইলে কোন্ কোন্ মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিতে হইবে; (৩) কাহার বা

যাহাদের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আছে, সেই শক্তির অপব্যবহার করিলে তাহাকে বা তাহাদিগকে বাধা দিবার উপায় আছে কি না। ক্রমে ক্রমে এই তিনটি প্রশ্ন নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্যাখ্যা কে করে।

(১) যৌথ (ফেডারেল) ও রাষ্ট্রীয় প্রত্যেক আদালতই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কাঠামো-সম্পর্কিত কোন আইনের প্রশ্ন উঠিলেই তাহা নিষ্পত্তির ভার যুক্তরাষ্ট্রের আদালতসমূহের। কিন্তু যে সব সমস্যা গুরুতর, সেগুলির জন্য উচ্চতম যৌথ-আদালতে আপীল করা দস্তুর বলিয়া ঐ আদালতের বিচার-ফল ও ব্যাখ্যা চরম বলিয়া মানা হয়।

যৌথ-আদালত যখন কোন আইনের নির্দিষ্ট অর্থ করিয়া দেয়, তখন প্রত্যেক রাষ্ট্রিকের কর্তব্য হইতেছে ঐ অর্থ মানিয়া লওয়া ও তদনুসারে চলা। কিন্তু সময় সময় এমন হয় যে, আইনের কোন অর্থ লইয়া বিচারালয়ে নিষ্পত্তি করা হয় নাই অথবা নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্ন আসে নাই। তখন যৌথ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষগণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের দায়ে ঐ আইনের যাহা সব চেয়ে সদর্থ বিবেচনা করেন তদনুসারে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু পরে ঐ আইন বিচারের জন্য আদালতে উপস্থাপিত করিলে তাঁহাদের অর্থ নাও থাকিতে পারে।

অন্য কতকগুলি বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করে না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা ও শাসকগণ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা খাটাইবার অবকাশ পান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত আইনকানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে।

দেখা যাইতেছে ব্যাখ্যা-ক্ষমতা যে শুধু বিচারালয়ের আছে তাহা নহে, শাসকেরা ও ব্যবস্থাপকেরা এই ক্ষমতা রাখেন। তবে সাধারণত তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতার ব্যবহার কম করেন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকমত উহা পছন্দ করে না। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সেই সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে না মানিয়া উপায় নাই।

কাঠামো-আইনের অর্থ নিরূপণ।

(২) ভাবগ্রহণ (কনষ্ট্রাকশন) দ্বারা কাঠামো-আইনের প্রসার দুই প্রকারে হয়: (১) কখনো কখনো রাষ্ট্র-নেতা, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ব্যবস্থাপক সভা, কোন বিধান (ষ্ট্যাটিউট) পাশ করিবার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে উহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি না অর্থাৎ ঐ বিধান পাশ করিয়া কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না। তখন কোন মোকদ্দমা বিচারালয়ে বিচারের জন্য উপস্থাপিত হইলে সে বিষয়ে বিচারালয়ের রায়ে যাহা বলা হয় তাহাই বলবৎ হয়। (২) বিচারের ফলে কোন রাষ্ট্রের প্রবর্তিত আইন কাঠামো-আইনের বিরুদ্ধে অথবা কাঠামো-আইনের ধারা লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া স্বীকৃত হইলে সেই রাষ্ট্র আর ঐ আইন মত ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে না।

কখনো কখনো এরূপ হয় যে কাঠামো-আইনের এক বা বহু শব্দ লইয়া গোল বাধিয়াছে। ঐ শব্দ দ্ব্যর্থবোধক হইতে পারে। সুতরাং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ শব্দ কাঠামো-প্রণয়নকারীরা কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অনুমান করা শক্ত। এ স্থলে বিচারালয় তাহার অর্থ করিয়া দিলে তাহাকে বলে ব্যাখ্যা (ইন্টারপ্রিটেশন)। আর যদি এমন প্রশ্নের উদয় হয়,

যে সম্বন্ধে কোন কথা কাঠামো-আইনে নাই অথবা যাহা আছে তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে কোন কাজের ধারা স্থির করা সম্ভব নয়, তবে বিচারালয়কে বিশেষ বিবেচনার সহিত একটা অর্থ খাড়া করিতে হয়। ইহাই হইল ভাবগ্রহণ (কনষ্ট্রাকৃশন)।

কিন্তু যখন তখন নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা বা ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নয়। প্রধান বিচারপতি মার্শ্যাল (১৮০০-৩৫) এ বিষয়ে যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত তাহাই অনুসরণ করা হইতেছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) জাতীয় শাসন-যন্ত্রের বা তাহার কোন অংশের অমুক ক্ষমতা আছে বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, বাস্তবিক ঐ সব ক্ষমতা শাসন-যন্ত্র আইনত ভোগ করিবার অধিকারী। ক্ষমতা আছে বলিয়া কোন ক্ষেত্রেই ধরিয়া লওয়া হইবে না, যাহারা ঐ ক্ষমতা আছে বলিয়া দাবী করে তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, কাঠামো-আইনে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, অন্তত কাঠামোর ভাষা হইতে ঐ প্রকার অর্থ করা সম্ভবপর। মহাসমিতি বাস্তবিক পক্ষে জনগণের প্রতিনিধি (এজেন্ট) মাত্র। জনগণের হুকুম ছাড়া কোন কাজ করিতে পারে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা অথবা শাসকগণ যদি মনে করেন তাঁহারা কাঠামো-আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট হইবে না। বিচারালয় তাঁহাদের কাজ সমর্থন করা চাই।

(খ) কিন্তু এরূপ যদি প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ক্ষমতা শাসন-যন্ত্রের উপর অর্পিত হইয়াছে, তবে ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ ও আইনের অর্থগ্রহণ সম্বন্ধে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন ক্ষমতা আছে কি নাই তাহা প্রমাণ করাই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাহা আছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কাঠামো-আইন মহাসমিতির ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার বাহিরে কিছু করিবার ক্ষমতা মহাসমিতির নাই। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে মহাসমিতির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার বাধা নাই। ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ লইয়া কোন বিচারালয় বিরুদ্ধ রায় দিবে না। এ বিষয়েও মতভেদ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই মতই মানা হইয়া থাকে যে, কোন ক্ষমতার উল্লেখ যদি কাঠামো-আইনে না থাকে, অথচ ঐ ক্ষমতা যদি এমন হয় যে তাহা জাতীয় শাসন-যন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ, তবে যৌথরাষ্ট্রের ঐ ক্ষমতা আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বিদ্রোহিতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ দণ্ডনীয় বলিয়া কাঠামো-আইনে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাবধিই ধরিয়া লইয়া হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনুল্লিখিত ঐ ধরণের অপরাধও তুল্যরূপ দণ্ডনীয়। বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্রের আছে। সুতরাং কাঠামো-আইনে নির্দ্দেশ না থাকিলেও বাণিজ্যে বাধাপ্রদানকারীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইত্যাদি।

এইরূপে যে তিন বিভাগে শাসন-যন্ত্রের অলিখিত ক্ষমতাবলী সব চেয়ে বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে সেগুলি হইতেছে : (১) কর বসানো ও ঋণগ্রহণ, (২) বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) যুদ্ধ চালানো।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে এমন কোন ধারা অথবা সংশোধনী নাই যাহা হইতে

কাঠামো-আইন ব্যাখ্যায় বিচারপতি মার্শ্যাল।

বিচারালয়সমূহ বিভিন্ন আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন নূতন সিদ্ধান্ত খাড়া করে নাই। কোন কোন ধারার (যেমন প্রথম ধারার অষ্টম ও নবম পল্লব) ঠিক অর্থ নিরূপণের জন্য অনেক ব্যাখ্যা ও ভাবগ্রহণ প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে কাঠামো-আইনের সব চেয়ে বেশী বিকাশ হইয়াছে প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া, বিশেষতঃ প্রধান বিচারপতি মার্শ্যাল যতদিন উচ্চতম বিচারালয়ের অধিনায়ক ছিলেন। মার্শ্যালকে কাঠামোর দ্বিতীয় প্রণয়ন-কর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বস্তুত তাঁহার দীর্ঘ কার্য্যকালে (১৮০০-৩৫) তিনি এরূপ বিচক্ষণতা, ধীরতা ও দূরদৃষ্টির সহিত বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কেবল বিচার-বিভাগের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু কাঠামো-আইনও সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বিচারালয়ে বসিয়া সিদ্ধান্তগুলি খুব ভাল হয় ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। প্রত্যেক বিচার-ফলের সহিত তিনি সুন্দরভাবে তন্নিহিত মূলসূত্রগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন; তাহাতে কাঠামো-আইনের বিকাশ-লাভের বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল।

কাঠামো-আইন অপব্যবহারের প্রতীকার।

(৩) যাহারা ব্যাখ্যা বা ভাবগ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহারা যে কাঠামো-আইনের অযথা পরিবর্ত্তন করিবে না তাহার স্থিরতা নাই। ইহাদের অপব্যবহার শক্তির প্রতিরোধ করিবার কি ব্যবস্থা আছে তাহা এখন বলা হইতেছে।

(ক) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়া অন্যান্য সমস্যার সমাধানের ভার বিচারালয়গুলির উপর রহিয়াছে। বিচার-বিভাগ এবং শাসন ও আইন-প্রণয়ন-বিভাগের স্বার্থ এক প্রকারের হইতে পারে না। তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিত্রয়ের বিভাগ সুস্পষ্ট। সুতরাং শাসন বা ব্যবস্থাপক বিভাগ কাঠামো-আইন লঙ্ঘন করিয়া চলিলে যে বিচার-বিভাগ তাহা শোধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বহুদিনের অভ্যাস ও শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনজীবিগণের এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবার সম্ভাবনা।

(খ) একথা মনে রাখিতে হইবে শাসক, ব্যবস্থাপক বা বিচারকই যুক্তরাষ্ট্রের শেষ কর্ত্তৃপক্ষ নয়। ইহারা সকলেই জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের হইয়া কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রে জনগণ ইহাদের কাজের অনুমোদন করিলে, ইহাদের অস্তিত্ব থাকে। তাহাদের অসম্মতিতে কোন কাজ করিলে তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় অথবা জনগণের ইচ্ছামত কাজ করিতে হয়।

প্রথা দ্বারা কাঠামো-আইনের পরিবর্ত্তন।

কোন কোন ছোটখাটো বিষয়ে কাঠামো-আইনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু কোন কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোন কথাই কাঠামো-আইনে দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সুশাসনের জন্য ঐ সব বিষয়ে নির্দ্দেশ থাকা উচিত ছিল। না থাকার কারণ এই গুলি,—(ক) কাঠামো-আইন প্রণয়ন-কালে সেগুলি প্রণয়ন-কর্ত্তাদের মনে পড়ে নাই, (খ) ইচ্ছা করিয়া সেগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাদ দেওয়ার হেতু আবার নানা রকম হইতে পারে: (ক) সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি পাওয়া যায় নাই, (খ) মঞ্জুরি করিবার সময় উপস্থিত হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্র অসম্মতি জানাইয়াছে, (গ) কাঠামোকে খুব সংক্ষিপ্ত ও ভবিষ্যতে অপরিবর্ত্তনীয় রাখা দরকার বিবেচিত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহার ফলে কাজ চালাইতে গিয়া মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে। ব্যাখ্যা বা ভাবগ্রহণের

সম্ভাবনা কোন কোন স্থানে ছিল না, সেখানে কোন নূতনত্ব আনিয়া চলা কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রেই প্রথার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যৌথ-করের ব্যবস্থা, উচ্চতম আদালতের নীচে যৌথ-আদালতসমূহ স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর আদালতের অধিকার সাব্যস্তকরণ, দেশের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের যথাযথ নিয়োগ, রাষ্ট্র-নেতা ও রাষ্ট্র-সভার সদস্যদের নির্বাচন করিবার প্রণালী, ঔপনিবেশিক নিয়ম ইত্যাদি বহু বিষয়ে মহাসমিতির বিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। বিচারালয়ে যে সব কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা বা ভাবগ্রহণ হয় সেগুলিকে কাঠামো-আইনের অন্তর্গত বা অঙ্গরূপে গণ্য করা হইলেও মহাসমিতির বিধানসমূহ কাঠামো-আইনের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ইহাদের ফলে পরোক্ষভাবে কাঠামো-আইনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সময় সময় কাঠামোর প্রণেতাগণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহার উল্টা ফলও দেখা দিয়াছে। মহাসমিতি ইচ্ছা করিলেই বিধান পরিবর্তিত করিতে পারিলেও, এ পর্যন্ত অধিকাংশই বলবৎ আছে।

প্রত্যেক দেশেই শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য আইন ছাড়া এমন কতকগুলি প্রথা গড়িয়া উঠে যে, সেগুলি প্রায় আইনের মত বলবৎ হইয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রিগণ বা রাজনীতিবিদ্‌গণ সেগুলিকে লঙ্ঘন করেন না। অবশ্য এইরূপ প্রথা ইংল্যাণ্ডে যত দাঁড়াইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রে তত দাঁড়ায় নাই। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি প্রথার উল্লেখ করা যাইতেছে: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথার উদাহরণ।

(১) রাষ্ট্র-নেতা নির্বাচন করিবার জন্য ভোটদাতাগণ যে নির্বাচকদিগকে নির্বাচিত করিয়া দেয় তাঁহারা রাষ্ট্র-নেতার নির্বাচন বিষয়ে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন না, কিন্তু দলের অনুজ্ঞা মানিয়া চলেন।

(২) কাঠামো-আইনে কোন বিধি নাই, তথাপি কোন রাষ্ট্র-নেতা দুইবারের বেশী নির্বাচিত হন না।

(৩) রাষ্ট্র-নেতা আগের চেয়ে অনেক বেশী নাকচ্ (ভিটো) ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

(৪) রাষ্ট্র-নেতা কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রি-সমিতিকে রাষ্ট্র-সভা বাতিল করে না।

(৫) রাষ্ট্র-সভার সম্মতি না লইয়াও রাষ্ট্র-নেতা অনেক কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিতে পারেন।

(৬) উভয় সভা বিভিন্ন সমিতির (কমিটি) সাহায্যে আইন প্রণয়ন করে।

(৭) ঐ সব সমিতি অনেক কাল পর্য্যন্ত প্রতিনিধি-সভার সভাপতি কর্তৃক নির্বাচিত হইত, এক্ষণে আর্থিক সমিতি দ্বারা হয়।

(৮) কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রূপে মহাসমিতিতে নির্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইতে হইলে নির্বাচন-প্রার্থীকে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে। ইত্যাদি।

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যাইবে, প্রথা দ্বারা কাঠামো-আইনের কিরূপ অভিব্যক্তি ঘটিতেছে। এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে সংশোধনী আনা দুরূহ বলিয়া, প্রথার আধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না এবং তাহাতে প্রথার সহিত আইনের সংঘর্ষ হইতে পারে কি না। আইন বনাম প্রথা।

প্রথমত, যে সব বিষয় কাঠামো-আইনে আলোচিত হইয়াছে, সেই সব বিষয়ে কাঠামো-আইনের প্রতিকূল কোন মামলা উপস্থিত করিলে, বিচারালয় নিশ্চয় বিরুদ্ধ রায় দিবে। দ্বিতীয়ত, যে সব বিষয়ের উল্লেখ কাঠামো-আইনে নাই, সেগুলি সম্বন্ধে কোন প্রথা দাঁড় করানো বেশী সহজ। কারণ, এ বিষয়ে শাসকদের ও ব্যবস্থাপক সভাগুলির অনেক স্বাধীনতা আছে। তবে, প্রথা দ্বারা যে আইন প্রচলিত হয় তাহার গুরুত্বের উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। কোন প্রথা প্রচলিত থাকার দরুণ যদি এমন কোন আইন বিধিবদ্ধ করা হয় যাহা বিচারালয়ে কাঠামো-আইনের প্রতিকূল বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে ঐ প্রথার গুরুত্ব না থাকিলে অর্থাৎ ঐ প্রথা-অনুসৃত আইন তেমন গুরুতর না হইলে মহাসমিতি ও রাষ্ট্র-নেতা বিচারালয়ের রায় চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লন। ইহাতে বুঝিতে হয় যে, মহাসমিতি বা রাষ্ট্র-নেতার পিছনে জনমত তেমন প্রবল নহে। কিন্তু যখন প্রথার গুরুত্ব বেশী অথবা প্রবল জনমত কোন প্রথা অনুসরণ করিয়া আইন করিতে চাহে, তখন বিচারালয়কে ঐ প্রথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের শক্তি অসীম এবং উহা অমান্য করিবার সাহস শাসন-যন্ত্রের নাই।

রাষ্ট্র-নেতা

১৭৮৯ সনে রাষ্ট্র-নেতা মনোনয়নের কারণ।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাষ্ট্র-নেতার পদ ছিল না। সমগ্র জাতির কর্তৃত্বভার কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘের হাতে ন্যস্ত ছিল না, মহাসমিতির জন্য একজন করিয়া সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন মাত্র। ইহার একটা কারণ এই ছিল যে, ১৭৮৭ সনে রাজতন্ত্র তথা শক্তিশালী শাসন-যন্ত্রের ভয় জনগণের মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তথাপি ১৭৮৮ সন হইতেই একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, গণতন্ত্রের কর্তৃত্বভার কোন ব্যক্তি বিশেষের উপরেই অর্পিত হইবে। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কি ক্ষমতা থাকা উচিত বা অনুচিত তাহা লইয়া মতভেদের ও বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-নেতার পদটাকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, উঠাইবার কথা কখনো উঠে নাই। ইহার কারণ প্রধানত তিনটি: (১) যুদ্ধকালে ও শান্তির সময়ে মহাসমিতি রাষ্ট্রের কাজ ভালভাবে চালাইতে সমর্থ হয় নাই; (২) মহাসমিতি যখন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না, তখন মনে হইল যে বিশেষ, একটি লোক ভারপ্রাপ্ত হইলে বিচক্ষণতা ও শক্তির সহিত কাজ করিতে পারিবেন; (৩) একটি লোকের হাতে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিলে অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু প্রথম রাষ্ট্র-নেতা জর্জ ওয়াশিংটন নিজের চরিত্র ও ব্যবহারের দ্বারা জনগণের এই ভয় দূর করিয়া দিয়াছিলেন; (৪) সে সময়ে যুদ্ধের ভয় একেবারে দূর হইয়া যায় নাই, যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে একজনের হাতে কর্তৃত্বভার থাকাই সমীচীন বিবেচিত হইয়াছিল; (৫) চোখের সামনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদাহরণ ছিল, ঐ সব রাষ্ট্রে এক একজন শাসনকর্তা বা রাষ্ট্র-নেতা মোতায়েন থাকিয়া ব্যবস্থাপক সভার যথেচ্ছাচারিতাতে বাধা দিতে সমর্থ ছিলেন।

দেশের চরম কর্তৃত্বভার রাষ্ট্র-নেতার উপর অর্পিত হইবে, ইহা স্থির হওয়ার পর প্রশ্ন হইল তাঁহাকে কি ভাবে নির্ব্বাচিত করা হইবে। কাঠামো-আইনের দ্বিতীয় ধারার প্রথম পল্লবের আটটি উপ-পল্লবে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে। প্রথম দুটি উপ-পল্লব নিম্নরূপ:

রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের প্রণালী।

"(১) যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার উপর অর্পিত থাকিবে। ইনি চারি বৎসরের জন্য নিজ পদে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ঠিক ঐরূপ কালের জন্য নির্বাচিত সহকারী রাষ্ট্র-নেতার সহিত একযোগে নিম্নলিখিত প্রকারে নির্বাচিত হইবেন :—

"(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা যে ভাবে নির্দেশ করিয়া দিবে ঠিক সেইভাবে সেই রাষ্ট্র কতকগুলি নির্বাচক নিযুক্ত করিবে ; মহাসমিতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র যতজন করিয়া রাষ্ট্র-সভাসদ্ (সেনেটার) ও প্রতিনিধি-সভার (হাউস্ অব্ রিপ্রেজেন্টেটিব্) সভ্য পাঠাইবার অধিকারী প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে ততজন নির্বাচক নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু কোন রাষ্ট্র-সভাসদ্, প্রতিনিধি-সভার সভ্য অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসী বা লাভজনক চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচক হইতে পারিবেন না।"

রাষ্ট্র-নেতা নির্বাচনের জন্য নির্বাচক।

রাষ্ট্র-নেতার নির্বাচনে একটু বিশেষত্ব রাখা হইয়াছে। সমগ্র দেশের ভোটদাতাগণ একত্র ভোট দিয়া রাষ্ট্র-নেতার নির্বাচন করিবেন এরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহার একটা কারণ এই যে, নির্বাচনের সময়ে দেশব্যাপী আলোড়ন উপস্থিত হয় ও কোন জনপ্রিয় ব্যক্তি অন্যান্য গুণ না থাকিলেও সহজে নির্বাচিত হইতে পারেন। অন্য দিকে মহাসমিতির হাতে রাষ্ট্র-নেতা নির্বাচনের ভার দুই কারণে দেওয়া হয় নাই : (১) তাহা হইলে শক্তি-ত্রয়ের বিভাগ মানা চলিত না, শাসন-ব্যবস্থাকে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অধীন করা হইত, (২) মহাসমিতির কোন একটা দল প্রবল হইয়া রাষ্ট্র-নেতার নির্বাচন করিত ; সুতরাং তাঁহাকে আর সমগ্র দেশের প্রতিনিধি বলা চলিত না।

উপরে দ্বিতীয় ধারার প্রথম পল্লবের যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধান-যোগ্য :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে চরম কর্তৃত্বভার একজনের উপর ন্যস্ত আছে।

(খ) এক কালে কোন রাষ্ট্র-নেতা চারি বৎসরের বেশী সময়ের জন্য নির্বাচিত হইতে পারেন না। কিন্তু কাঠামো-আইনে এমন কোন কথা নাই যে, রাষ্ট্র-নেতা বহুবার নির্বাচিত হইবার পক্ষে বাধা পাইবেন। অথচ প্রথা এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে দুইবারের বেশী রাষ্ট্র-নেতার পদ দেওয়া হয় না। এ পর্য্যন্ত এই প্রথা মান্য করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র-নেতার কার্য্যকাল ৪ বৎসর।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র কি ভাবে নির্বাচক নিযুক্ত করিবে সে সম্বন্ধে কাঠামো-আইনে কোন কথা বলা হয় নাই। এ বিষয়ে আইনত প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং নির্বাচক নিয়োগের প্রণালী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হওয়া বিচিত্র নহে। বস্তুত পূর্ব্বে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই নির্বাচনের কার্য্য ব্যবস্থাপক সভার হাতে ন্যস্ত রাখিয়াছিল। প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচক নিয়োগ করিবার প্রথা প্রথমে ভার্জিনিয়া, পেনসিলভেনিয়া ও মেরিল্যাণ্ডে প্রচলিত হয়। পরে এই প্রথা ধীরে ধীরে এরূপ ছড়াইয়া পড়ে যে, ১৮৩২ সনে এক দক্ষিণ ক্যারোলিনা বাদে অন্য সমস্ত দেশ ইহা গ্রহণ করে। ১৮৬৮ সনে এই রাষ্ট্রও নির্বাচক মনোনয়নের ভার জনগণের হাতে দেয়। পূর্ব্বে কোন কোন রাষ্ট্রে নির্বাচকগণ সমগ্র রাষ্ট্র হইতে নির্বাচিত না হইয়া বিভিন্ন জিলা

নির্বাচক কাহারা হয়।

হইতে হইতেন। ১৮২৮ সনে একমাত্র মেরিল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রে সমগ্র প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচক নিযুক্ত হন। ১৮৩২ সনে ঐ রাষ্ট্রও অন্যান্য রাষ্ট্রের পথ অনুসরণ করে। ইহার পর দু' একটি দেশ আবার জিলা ধরিয়া ভোটের ব্যবস্থা করিলেও পুনরায় সমগ্র রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচন করিবার প্রথায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

(ঘ) রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন ব্যাপার মহাসমিতি এবং জনগণ উভয়ের প্রত্যক্ষ আয়ত্তের বাহিরে রাখিয়া আশা করা গিয়াছিল যে, গৌণ নির্ব্বাচনে ফল ভাল হইবে। কাঠামো-আইন-প্রণেতারা ভাবিয়াছিলেন যে, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা যাহাকে রাষ্ট্র-নেতা রূপে নির্ব্বাচন করিবেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। ভোটাভোটির ব্যাপারটা দল অনুসারে হইয়া থাকে। তাহাতে ব্যক্তির গুণাগুণকে সর্ব্বদা বিশেষ করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কারণ দলের পক্ষে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লোক, তিনি ব্যক্তি হিসাবে উঁচু দরের নাও হইতে পারেন। কিন্তু দলের অন্তর্গত থাকিয়া নির্ব্বাচক বা জনগণকে দলের মর্জিমতই ভোট দিতে হয়, নিজের বিবেচনা মত নহে।

(ঙ) প্রত্যেক রাষ্ট্র কতজন করিয়া নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কোন রাষ্ট্রের নির্ব্বাচক-সংখ্যা মহাসমিতিতে রাষ্ট্রসভাসদের সংখ্যা ও প্রতিনিধি-সভায় সভ্যের সংখ্যার সমান। ধরুন নেভাদা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভাসদ্ দুইজন এবং ঐ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার সভ্য একজন। অতএব নেভাদার নির্ব্বাচক-সংখ্যা ৩। নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্র-সভাসদের সংখ্যা ২, আর ঐ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার সভ্যের সংখ্যা ৪৬। অতএব নিউ ইয়র্কের নির্ব্বাচকের সংখ্যা মোট ৪৮। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভাসদের সংখ্যা ৯৬ এবং প্রতিনিধি-সভার সভ্যের সংখ্যা ৪৩৫। অতএব যে সব নির্ব্বাচক রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচন করেন তাঁহাদের সংখ্যা মোট ৫৩১।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচক-সংখ্যা ৫৩১।

(চ) আগেই স্থির ছিল যে, রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে মহাসমিতির কোন হাত থাকিবে না। সুতরাং মহাসমিতির দুই শাখার কোন সভ্যই নির্ব্বাচক হইতে পারেন না। সরকারী কর্ম্মচারীদেরও এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, তাঁহাদের সাহায্যে যেন কোন রাষ্ট্র-নেতা নিজের পদ চিরস্থায়ী করিয়া লইতে না পারেন। কিন্তু আইনত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার সভ্যগণের অথবা সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচক হইবার কোন বাধা নাই।

কাঠামো-আইনের প্রণেতাগণ সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকেও যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই। গোড়াতে রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা এক সঙ্গে নির্ব্বাচিত হইতেন অর্থাৎ একবারের ভোটে যিনি সব চেয়ে বেশী ভোট পাইতেন তিনি রাষ্ট্র-নেতা হইতেন ও তাঁহার ঠিক নীচে যিনি থাকিতেন তিনি সহকারী রাষ্ট্র-নেতা হইতেন। কিন্তু একণে রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাচিত হন। দ্বিতীয় ধারার প্রথম পর্ব্বের তৃতীয় উপপর্ব্বটি ১৮০৪ সনের সংশোধনীর ফলে বিলকুল বদলাইয়া গিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই:

(ক) নির্ব্বাচকেরা নিজ নিজ রাষ্ট্রে মিলিত হইয়া গুপ্ত (ব্যালট্) ভোট দ্বারা রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকে মনোনীত করে। একই দিনে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচকেরা নিযুক্ত হন। তারপর আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট একটি দিনে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্ব্বাচকেরা একত্র হইয়া রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার জন্য ভোট দেন। বলা বাহুল্য, নির্ব্বাচকেরা দলের দ্বারা নিযুক্ত হন, সুতরাং নির্ব্বাচকদের মনোনয়ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় নির্ব্বাচন-ফল কিরূপ হইবে। নির্ব্বাচক নিযুক্ত হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে গুপ্ত ভোট আরম্ভ হয়।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন।

নির্ব্বাচকের কাজ।

(খ) নির্ব্বাচকেরা নিজ নিজ ভোট-কাগজে যাঁহাকে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন করিতে চান তাঁহার নাম লিখিয়া দেন, আর যাঁহাকে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা করিতে চান তাঁহার নাম ভিন্ন ভোট-কাগজে লিখেন। যাঁহাদের নাম রাষ্ট্র-নেতার পদের জন্য ভোট করা হইয়াছে তাঁহাদের এক তালিকাভুক্ত করা হয়, আর যাঁহাদের নাম সহকারী রাষ্ট্র-নেতার পদের জন্য ভোট করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক তালিকাভুক্ত করা হয়।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় নির্ব্বাচকেরা দস্তখত করেন, সভ্য বলিয়া স্বীকৃতি দেন এবং গালামোহর করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে পাঠাইয়া দেন। রাষ্ট্র-সভার সভাপতির নামে ঐ তালিকাগুলি আসে।

(ঘ) রাষ্ট্র-সভার সভাপতি রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার সম্মুখে ঐ সব খুলিলে পর ভোট গণনা করিয়া দেখা হয়।

(ঙ) যে ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতার পদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন, তিনিই রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু মোট নির্ব্বাচকের সংখ্যা যত তাহার অতিজন ভোট তাঁহার পাওয়া চাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচকের সংখ্যা মোট ৫৩১। সুতরাং কোন রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থীকে অন্তত ২৬৬ ভোট পাইতে হইবে।

রাষ্ট্র-নেতার অতিজন ভোট পাওয়া চাই।

(চ) কিন্তু যদি কেহ অতিজন ভোট না পান অর্থাৎ কেহ যদি ২৬৫ ভোট পান, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইলেও তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র-নেতা মনোনীত হন না। তখন তিনি ও তাহার পরে আর যে দুইজন ব্যক্তি পর পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি-সভা গুপ্ত ভোট দ্বারা রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচন করেন।

সমগ্র সংখ্যার অতিজন ভোট না পাইলে কি হয়।

(ছ) প্রতিনিধি-সভায় রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভোট লওয়া হয়,—প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোট একটি মাত্র।

(জ) রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনের জন্য সকল রাষ্ট্রের অধিকাংশ উপস্থিত থাকা চাই। দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের সভ্য বা সভাগণ উপস্থিত হইলে ন্যূন-সংখ্যা (কোরাম্) হয়।

(ঝ) পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসের চতুর্থ দিনের পূর্ব্বে যদি প্রতিনিধি-সভা রাষ্ট্র-নেতা মনোনীত না করে, তবে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-নেতার কাজ করেন, রাষ্ট্র-নেতার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটিলেও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা ঐরূপ করেন।

সহকারী রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন।

(ঞ) সহকারী রাষ্ট্র-নেতার পদের প্রার্থী হইয়া যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পান, তিনি সহকারী রাষ্ট্র-নেতা হন। কিন্তু মোট নির্ব্বাচকের অতিজন ভোট তাঁহার পাওয়া চাই।

(ট) কোন ব্যক্তি যদি এরূপ অতিজন ভোট না পান, তবে রাষ্ট্র-সভা যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন পুনরায় ভোট দিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা মনোনীত করে।

(ঠ) সমগ্র রাষ্ট্র-সভাসদের দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিলে ন্যূন-সংখ্যা হয় ও নির্ব্বাচনের জন্য মোট রাষ্ট্রের অধিকাংশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা চাই।

(ড) কাঠামো-আইনে যে ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা হইতে অপারগ বলিয়া লিখিত আছে তিনি সহকারী রাষ্ট্র-নেতাও হইতে পারেন না।

নির্ব্বাচক নিয়োগের সময়।

নির্ব্বাচকদের কাজ হইল রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন করা। দ্বিতীয় ধারার প্রথম পল্লবের চতুর্থ উপ-পল্লবে বলা হইয়াছে, "কোন্ তারিখে নির্ব্বাচকদের মনোনীত করা হইবে এবং কোন্ তারিখে তাঁহারা ভোট করিবেন, তাহা মহাসমিতি স্থির করিয়া দিবে,—নির্ব্বাচকেরা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই দিনে ভোট করিবেন।" ১৮৭২ সনের পূর্ব্বে মহাসমিতি নিজের এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে নাই, বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ নির্ব্বাচন-দিবস ঠিক করিয়া দিত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিত। কিন্তু ১৮৭২ সনে আইন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, "প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরের নবেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরবর্ত্তী মঙ্গলবারে" প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্ব্বাচকগণ নিযুক্ত হইবেন, এবং পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবারে তাঁহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে মিলিত হইয়া ভোট দিবেন। গালামোহরযুক্ত ভোটের কাগজপত্র রাজধানীতে পৌঁছিলে রাষ্ট্র-সভার সভাপতি (অর্থাৎ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্র-নেতা) তাহা রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার সম্মুখে খোলেন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নির্ব্বাচকদের ভোটের ফলে যাঁহার রাষ্ট্র-নেতা হইবার সম্ভাবনা তিনি রাষ্ট্র-নেতা নাও হইতে পারেন। তিনি যদি অতিজন ভোট না পান, তবে তিনি আর তখনি রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন না। তখন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের ভার পড়ে প্রতিনিধি-সভার উপর। যে তিন ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন, প্রতিনিধি-সভায় তাঁহাদের একজনকে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন করিবার কথা। কিন্তু এইরূপ ভোট লইবার ফলে প্রতিনিধি-সভায় অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপস্থিতি চাই অর্থাৎ অন্তত ২৫টি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ভোট লওয়ার দরকার হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র হইতে যত জন নির্ব্বাচকই আসুন না, তাঁহাদের সমষ্টিগত ভোট একটি মাত্র। কিন্তু এমন হইতে পারে, কোন রাষ্ট্রের নির্ব্বাচকেরা বিভিন্ন পক্ষীয়। উভয় পক্ষে যদি সমান সংখ্যক ব্যক্তি থাকেন, তবে তাঁহাদের ভোট পরস্পর কাটাকাটি হইয়া যায় এবং ঐ রাষ্ট্রের ভোটের মূল্য শূন্য হয়। যদি ২৪টি রাষ্ট্রের অবস্থা এইরূপ হয়, অথবা যদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র কতিপয় রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থীর মধ্যে এরূপভাবে ভোট ছড়াইয়া দেয় যে, কাহারো পক্ষে ২৫টি ভোট পাওয়া সম্ভব নহে, তবে প্রতিনিধি-সভাতেও কোন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের অবকাশ হয় না। কিন্তু সমগ্র দেশকে রাষ্ট্র-নেতা-শূন্য রাখা যায় না। তখন যিনি সহকারী রাষ্ট্র-নেতা তিনিই রাষ্ট্র-নেতা রূপে কাজ চালাইতে থাকেন। দ্বিতীয় ধারার প্রথম পল্লবের ষষ্ঠ উপ-পল্লবে বলা হইয়াছে,— "রাষ্ট্র-নেতাকে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত করিলে, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তিনি পদত্যাগ

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-ভার অর্পণের ব্যবস্থা।

করিলে অথবা তিনি ঐ পদের ক্ষমতাগত কাজ করিতে বা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে, ঐ পদ সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকে দেওয়া হইবে এবং রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার অপসারণ, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অসামর্থ্য ঘটিলে মহাসমিতি আইন দ্বারা ব্যবস্থা করিবে কোন্ কর্ম্মচারী রাষ্ট্র-নেতার কাজ করিবেন। তখন অসামর্থ্য ইত্যাদি দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা নূতন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতারূপে কাজ করিবেন।"

রাষ্ট্র-নেতার অভাবে কাহারা তাঁহার পদে বসিবেন।

সুতরাং কোন কারণে যদি সহকারী রাষ্ট্র-নেতাও রাষ্ট্র-নেতার কার্য্য না চালাইতে পারেন, তথাপি শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে না। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার অভাবে, রাষ্ট্র-সভার তৎকালীন সভাপতি রাষ্ট্র-নেতার পদে বাহাল হইতেন,—এটা কাঠামো-আইনে উল্লিখিত হয় নাই, বিধানরূপে পাশ করা হইয়াছিল। তাঁহার অভাবে প্রতিনিধি-সভার সভাপতির (স্পীকার) রাষ্ট্র-নেতার পদ পাইবার কথা ছিল। কিন্তু এই নিয়মের বিরুদ্ধে বলিবার কথা এই ছিল যে, রাষ্ট্র-নেতার পর যাঁহার হাতে রাজ্য-ভার অর্পিত হইবার কথা তিনি রাষ্ট্র-নেতার বিরুদ্ধ পক্ষীয় হইতে পারেন। সেইজন্য ১৮৮৬ সন হইতে এই আইন পাশ করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার অভাবে আভ্যন্তরিক রাষ্ট্র-সচিব রাষ্ট্র-নেতার পদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার অভাবে অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদের মর্য্যাদার ক্রম অনুসারে রাষ্ট্র-নেতার গদীতে বসিবেন। পাঁচ জন রাষ্ট্র-নেতা নিজ পদে থাকা কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন (হ্যারিসন, টেলর, লিঙ্কন, গারফিল্ড, ম্যাককিন্‌লে)। ইঁহাদের কাহারো কাহারো মৃত্যুর পর সহকারী রাষ্ট্র-নেতা পূর্ব্বেকার নীতি বিলকুল বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন।

রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ব্বাচন করিবার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। আগেকার কাঠামো-আইনের বলে রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা একযোগে নির্ব্বাচিত হইতেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ১৮০০ সনে টমাস জেফারসন্ ও আরন ব্যার্ উভয়েই ৭৩টি করিয়া ভোট পাইয়াছিলেন। উভয় ব্যক্তিই একই দলের অন্তর্গত ছিলেন, সেই দলের ইচ্ছা ছিল যে জেফারসন রাষ্ট্র-নেতা ও ব্যার্ সহকারী রাষ্ট্র-নেতা হইবেন। তখনকার নিয়ম ছিল এই যে, দুই ব্যক্তি সমান সমান ভোট পাইলে প্রতিনিধি-সভা ভোট দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে কে রাষ্ট্র-নেতা হইবেন। সে সময়ে এই ঘটনায় তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল এবং জেফারসনকে তাঁহাদের দল অনেক কষ্টে রাষ্ট্র-নেতার পদে বসাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার প্রতীকারের জন্যই ১৮০৪ সনের সংশোধনী পাশ করা হয় ও তখন হইতে নির্ব্বাচকেরা এক সঙ্গে দুইটি নির্ব্বাচন-কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। এই সংশোধনী আইনে পরিণত হইবার পর আর একবার মাত্র প্রতিনিধি-সভার সভাগণের পক্ষে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের জন্য ভোট করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৮২৪ সনে অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন একা ৯০টি ভোট পান, আর তাঁহার তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাডাম্‌স্, ক্রফোর্ড ও ক্লে একত্রে ১৬২টি ভোট পান। প্রতিনিধি-সভায় ১৩টি রাষ্ট্র অ্যাডাম্‌সের পক্ষে, ৭টি জ্যাকসনের পক্ষে ও ৪টি ক্রফোর্ডের পক্ষে ভোট দেয়। অ্যাডাম্‌সই রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হন। এইরূপ নির্ব্বাচনে জনগণের মত সর্ব্বদা জয়লাভ করে বলা চলে না। কারণ ২৫টি ছোট রাষ্ট্র একত্র হইয়া ২৩টি বড় রাষ্ট্রকে

প্রতিনিধি-সভার রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত।

প্রার্থী হইবেন না। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে রাষ্ট্র-নেতার পদ গ্রহণ হয়। সেদিন উচ্চতম আদালতের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে শপথ লওয়াই দস্তুর। সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকে কোন পদ গ্রহণ করিতে হইলে, তিনি সে সময়ে যেখানে থাকেন সেখান হইতেই শপথ গ্রহণ করিতে পারেন।

রাষ্ট্র-নেতা ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পান।

সপ্তম উপ-পল্লবে রাষ্ট্র-নেতা তাঁহার কাজের জন্য বৃত্তি পাইবেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি যতদিন রাষ্ট্র-নেতার পদে বাহাল থাকিবেন ততদিনের মধ্যে ঐ বৃত্তি বাড়িবে না, কমিবেও না। ১৭৮৯ সনে প্রথম মহাসমিতি রাষ্ট্র-নেতার তঙ্কা বাৎসরিক ২৫,০০০ ডলার (প্রায় ৭৫ হাজার টাকা) স্থির করেন। ১৮৭৩ সনে উহা বাড়াইয়া বাৎসরিক ৫০,০০০ ডলার (প্রায় ১½ লক্ষ টাকা) করা হয়। ১৯০৯ সন হইতে ঐ বৃত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৫,০০০ ডলার ও ভ্রমণ ইত্যাদির জন্য ২৫,০০০ ডলার (অর্থাৎ মোট প্রায় ৩ লক্ষ টাকা)।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে দল।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন সম্পর্কে, এ স্থলে দলের কাজের কথা কিছু না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রথাটা নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে: পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচকের সংখ্যা, সেই রাষ্ট্রের প্রেরিত সভাসদের সংখ্যা ও উহার প্রতিনিধি-সভার সভ্যের সংখ্যার সমান। কিন্তু নির্ব্বাচকেরা কাহার জন্য ভোট দিবে? পূর্ব্ব হইতে একজন পদপ্রার্থী ঠিক থাকা চাই। আর সেই ব্যক্তিকে সকলে মিলিয়া ভোট দেওয়া চাই। সকলে মিলিয়া ভোট না করিলে দলের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি জয়লাভ করিতে পারেন না। যৌথ-রাষ্ট্রের পত্তন কালে মহাসমিতির সদস্যেরা একত্র হইয়া কে রাষ্ট্র-নেতা হইবেন তাহা ঠিক করিয়া দিতেন। নির্ব্বাচকেরা তাঁহাকে ভোট দিতেন। কিন্তু অল্পকাল পরে এই ভোটের ব্যাপার মহাসমিতির বাহিরে জনগণ দ্বারা সাধিত হইত। সকলে মিলিত হইয়া রাষ্ট্র-নেতা বাছিবার জন্য ভোট দিত। কিন্তু এক্ষণে বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর দিয়া রাষ্ট্র-নেতার অনুসন্ধান চলে। এজন্য কতকগুলি প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান।

নূতন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনের সময় আসিবার দুই বৎসর বা ততোঽধিক পূর্ব্বে দুই দলের কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তাহা লইয়া দেশের মধ্যে নানা আলোচনা ও বিতর্ক আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যদি এরূপ হন যে, তিনি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহার এই গুণ প্রায় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে, তবে তাঁহার পক্ষে অনায়াসে রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এরূপ লোক সাধারণত পাওয়া দুষ্কর। প্রত্যেক দলেরই চোখ থাকে দুই বা ততোঽধিক ব্যক্তির উপর অর্থাৎ প্রত্যেক দল কতকগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়। এবং এই সব প্রতিযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে বাছিবার ভার পড়ে জাতীয় মনোনয়ন-বৈঠকের (ন্যাশনাল নমিনেটিং কন্‌ভেনশন) উপর।

জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক এক বিপুল প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক রাষ্ট্র যতজন নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবার অধিকারী তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধিকে এই বৈঠকে পাঠাইতে সমর্থ। অর্থাৎ

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক দল হইতে হাজারের উপর প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এই জাতীয় বৈঠকের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্থানীয় বৈঠক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাচনের নিয়ম এই: প্রত্যেক মহাসমিতি-নির্দ্দিষ্ট জিলার জন্য ঐ জিলাস্থ দলের বৈঠক দ্বারা যদি দুইজন নির্ব্বাচিত হয়, তবে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্র-বৈঠক দ্বারা চারিজন হইবে। প্রত্যেকটি বৈঠক প্রাথমিক সভা (প্রাইমারি)র প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয় বলিয়া, ঐ সব প্রতিনিধি যে দিকে ঝুঁকে স্থানীয় বৈঠক সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। আর স্থানীয় বৈঠক জাতীয় বৈঠকের হাবভাব নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জাতীয় মনোনয়ন বৈঠকে শুধু যে প্রত্যেক দলের হাজারের উপর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তাহা নহে। স্থানীয় বৈঠক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কালে সঙ্গে সঙ্গে একজন "বদলী" (অলটারনেট) নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; কোন কারণে প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে ইনি তাঁহার স্থলে কাজ করেন। আর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে ইনি যোগদান করেন, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া জাতীয় বৈঠক যখন বসে তখন যে কত হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈঠক বসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন শহরে বসিতে পারে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দল নানা কারণে সাধারণত বড় শহর বাছিয়া থাকে। বৈঠকের প্রত্যেক প্রতিনিধির সঙ্গে ৪০০।৫০০।৬০০ লোকের আসিতে কোন বাধা নাই। তাহা ছাড়া শত শত রাজনীতিবিদ্, সংবাদপত্রসেবী ও দর্শকবৃন্দে শহরের হোটেলগুলি একেবারে ভরিয়া যায়। মস্ত বড় একটা ঘর নির্ম্মিত হয় ও তাহাতে এই হাজার হাজার লোকে আসিয়া বসে। বলা বাহুল্য, চেঁচামেচি, হৈচৈ ইত্যাদি কম হয় না। তাহাছাড়া বহুক্ষণ ধরিয়া হাততালি, সাফল্যে নানা প্রকার বাদ্যের ঐক্যতান ইত্যাদি মিলিয়া স্থানটাকে সরগরম করিয়া রাখে। জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে নাড়া দেয় বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন-কাল উপস্থিত হইলে নির্ব্বাচকেরা নবেম্বর মাসে মিলিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক গ্রীষ্মকালে, সাধারণত জুন, জুলাই মাসে বসে। এই বৈঠকের কার্য্যাবলী তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) বৈঠক বসিবার পূর্ব্বের কাজ; (খ) আইন-কানুন, প্রস্তাব পাশ ও মনোনয়নবিষয়ক বক্তৃতাদি দান; (গ) ভোটগ্রহণ। দুই বৎসর আগে রাষ্ট্র-নেতার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখন হইতে বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাজ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈঠক চালাইবার জন্য কতকগুলি আইনকানুন পাশ করিয়া লইতে হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দলের প্রস্তাবও উপস্থিত করা হয় ও বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তারপর আসল কাজ আরম্ভ হয়। বৈঠকের সভাপতি স্থিরীকরণ ও প্রস্তাবাদি পাশের সময়ে বৈঠকে উপস্থিত জনগণের মতিগতি অনেকটা বুঝা যায়।

ভোটগ্রহণের অর্থ প্রথমত কোন্ দল কোন্ ব্যক্তিকে খাড়া করিতেছেন। রাষ্ট্রসমূহের নাম একে একে ডাকা হয়, এবং যখন কোন মনোনীত ব্যক্তির রাষ্ট্রের নাম ডাকে, তখন ঐ রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি প্ল্যাটফর্মে উঠিয়া সেই ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিয়া তাঁহার গুণগান করেন। অন্য একজন তাঁহার সমর্থন করেন। কখনো কখনো তৃতীয় ব্যক্তিকেও সমর্থন

করিতে দেখা যায়। এইরূপে সমস্ত রাষ্ট্রের নাম ডাকা হইতে থাকে ও রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থিগণ সকলে মনোনীত হন। মোট মনোনয়নের সংখ্যা গড়ে ৭ অথবা ৮। ১২র বেশী কখনো হয় না। তারপর ভোটগ্রহণ আরম্ভ হয়। কেরাণীরা অ্যালাবামা হইতে ওয়াইয়োমিং পর্য্যন্ত রাষ্ট্রগুলির নাম ইংরাজী বর্ণমালা অনুসারে ডাকিয়া যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নাম ডাকিবার পর সেখানকার প্রতিনিধিদের নেতা ডাকিয়া বলিয়া দেন উহার কত ভোট আছে। সকলের ভোট লইবার পর ভোট গণনা হয়। স্বারাজ্য (রিপাবলিকান) দলের নিয়মানুসারে, কোন ব্যক্তি সমগ্র ভোটদাতার সংখ্যার অতিজন ভোট পাইলে তিনি রাষ্ট্র-নেতার একমাত্র পদপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হন। আর গণতান্ত্রিক (ডেমোক্রাটিক) দলের নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তি উপস্থিত ভোটদাতাগণের ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাইলে রাষ্ট্র-নেতার একমাত্র পদপ্রার্থিরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ অতিজন বা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পান, তবে আবার রাষ্ট্রসমূহের নাম ডাকা হইতে থাকে। কখনো দুইবারের অনেক বেশী ডাকারও প্রয়োজন হয়। এইরূপ বার বার ডাকার উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিনিধিগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা দল শুদ্ধ তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থী কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে যতগুলি ভোট পাওয়া দরকার ততগুলি না পান সে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের নাম ডাকা চলিতে থাকে। ১৮৫২ সনে গণতন্ত্রবাদিগণ ৪৯ বার ভোট গ্রহণের পর ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্সকে ও উদারমতাবলম্বিগণ ৫৩ বার ভোট গ্রহণের পর জেনারেল স্কটকে মনোনীত করিতে সমর্থ হন। ১৮৮০ সনে ৩৬ বার ভোট লইবার পর গারফিল্ড মনোনীত হন। কিন্তু ১৮৩৫ সনে মার্টিন হ্ব্যান বুরেন, ১৮৪৪ সনে হেনরি ক্লে, ১৮৬৮ ও ১৮৭২ সনে ইউলিসিস্ এস্ গ্র্যাণ্ট, ১৮৮৮ সনে ক্লীব্‌ল্যাণ্ড সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিলেন,—প্রথম তিনজন কোন ভোটগ্রহণের পূর্ব্বে একবাক্যে, আর চতুর্থজন প্রথমবার ভোট লইবার পরেই। (ব্রাইস্) ভোটগ্রহণ করিতে যে সময় লাগে তাহারই উপর জাতীয় মনোনয়ন-বৈঠক কতদিন ধরিয়া চলিবে তাহা নির্ভর করে। ভোটগ্রহণ কখনো কখনো এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়, কখনো বা দিনের পর দিন চলিতে থাকে।

রাষ্ট্র-নেতার অনুসন্ধান কার্য্য সমাপ্ত হইলে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা মনোনয়ন হয়। রাষ্ট্র-নেতার মনোনয়নের মত একাজ তত কঠিন নয়। সহকারী রাষ্ট্র-নেতা সহজেই স্থিরীকৃত হন। এইরূপে রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা স্থির হইবার পর তাঁহারা দলের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরূপে গণ্য হন, এবং সমগ্র দেশের লোকদের নিকট সমর্থন পাইবার অধিকারী। অবশ্য কেহ সমর্থন না করিলে তাঁহার ভোট পাইবার উপায় নাই। তবে দলের লোকেরা সাধারণত তাঁহার বিরুদ্ধে যায় না।

মোটামুটি জাতীয় বৈঠকের উদ্দেশ্য দুইটি, :—(১) দলের মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রস্তাব ইত্যাদি জ্ঞাপন করিবার সুযোগ দেওয়া। কখনো কখনো বিশেষ প্রশ্ন লইয়া সমগ্র দেশব্যাপী আলোড়ন-আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে সময়ে বিভিন্ন দলের মতামত ও প্রস্তাব জানিবার দরকার হয়। (২) দেশের চরম কর্ত্তৃত্বভার কাহার হাতে অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা স্থির করা। বলা বাহুল্য, সাধারণত এইটাই প্রধান কাজ।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি কে? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে অথবা দোষ না থাকিলে কোন ব্যক্তির রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থিরূপে নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা আছে? রাজনীতি সম্বন্ধে যাহার একটুও জ্ঞান আছে সেই জানে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানে, শক্তিতে, বুদ্ধি-বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য নহেন। দল চায়, ভাল পদপ্রার্থীকে, ভাল লোককে নহে। সুতরাং দলের কর্ত্তৃপক্ষদের চোখ থাকে সেই ব্যক্তির উপর যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমর্থন ও সর্ব্বাপেক্ষা কম বিরোধিতা পাইবেন। তাঁহাকে রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থিরূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য রাজনীতিবিদ্‌সুলভ কর্ম্মকুশলতা, লোকচক্ষে কতদিন ধরিয়া আছেন, বক্তৃতা শক্তি, লোক আকর্ষণের ক্ষমতা, পারিবারিক সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবেচনা করা দরকার হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্র-নেতা হইবার উপায়।

যে জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা লোকের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে ব্যক্তিত্ব। লোকে এমন লোক চায় যিনি সদ্‌গুণের আধার মাত্র নন, কিন্তু যিনি দরকার হইলে লোককে সুকৌশলে চালাইতে সমর্থ ও যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সাহস ও শক্তি সকলের আগে আবশ্যক। আর আবশ্যক ধীশক্তি, কিছু পরিমাণ চতুরতা ও ভাষার উপর দখল। রাজনীতিবিদ্‌সুলভ জ্ঞান অথবা বাগ্মিতা উন্নতির একমাত্র সোপান নয়। বাগ্মিতা দ্বারা অনেক লোককে বশ করা সম্ভব হইলেও, তাহা না হইলে চলে না এমন নয়। বস্তুত লিঙ্কন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের কাহাকেও বাগ্মী বলা চলে না।

সাধুতা, অন্তত সাধু বলিয়া যশ থাকা, দরকার। কোন কোন রাষ্ট্র-নেতা অসাধু লোকদের দ্বারা হয়ত বেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্র-নেতারা এ পর্য্যন্ত অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হন নাই। অমায়িকতা বা লোকরঞ্জন করিবার ক্ষমতাও তাঁহার একটা বড় গুণ। তিনি যত বেশী লোককে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি অথবা সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সাহায্যে বশীভূত রাখিতে পারেন তত তাঁহার নির্ব্বাচনকালে সুবিধা হয়।

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতা হইলে যে সামর্থ্যের পরিচয় দিবেন তাহার লক্ষণ আগে দেখাইতে পারিলে ভাল হয়। মহাসমিতিতে কোন রাষ্ট্রের শাসকরূপে, বড় সহরের মেয়ররূপে, মন্ত্রি-সমিতির একজন হইয়া, বিদেশে দূতরূপে অবস্থান করিয়া, বিচারকরূপে অথবা বড় সাংবাদিক-রূপে তিনি নিজের শক্তি দেখাইতে পারিলে সুবিধা হইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটিতেই রাষ্ট্র-নেতা হইবার যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণিত হইয়া থাকে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। লিঙ্কনের পর চারিজন মহাসমিতির সভ্য রাষ্ট্র-নেতারূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন (হেস্, গারফিল্ড, হ্যারিসন, ম্যাক্‌কিনলি), আর হেস্, ক্লীবল্যাণ্ড, রুজভেল্ট, উইলসন রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন।

নির্ব্বাচন-কাল উপস্থিত হইলে জনগণের মনের অবস্থার উপরে অনেকটা নির্ভর করে কিরূপ ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতার পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। যে রাষ্ট্র হইতে পদপ্রার্থীকে নির্ব্বাচন করা হয় সেই রাষ্ট্রের মর্জি ত দেখিতে হয়ই, পরন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেশের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত করে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণ কোন্ প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত থাকিবে ও তাহার সমাধানের জন্য কিরূপ লোক

চাহিবে তাহার ঠিক নাই। এই দিকে চাহিয়া রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন করিতে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অনেক ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত না হইবার কারণ।

যে সকল রাষ্ট্র-নেতা যুক্তরাষ্ট্রের গদীতে বসিয়াছেন তাঁহাদের কথা পর্য্যালোচনা করিয়া একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়: দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই পদে কেন নির্ব্বাচিত হন নাই? যুক্তরাষ্ট্রের নেতার পদের মত এরূপ মর্য্যাদা ও ক্ষমতাবিশিষ্ট পদ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। অথচ এরূপ দায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের জন্য অধিকাংশ সময়ে শ্রেষ্ঠ লোকগণকে বাছা হয় না। ইহার কতকগুলি কারণ সংক্ষেপে এই:

(১) ব্যবসা-বাণিজ্যের আকর্ষণ।

(১) ইয়োরোপে প্রথম শ্রেণীর লোক রাজনীতি ক্ষেত্রে যত আসেন আমেরিকায় তত আসেন না। লোকসংখ্যা ধরিয়া তুলনা করিলে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড এ বিষয়ে আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। অন্য দিকে আর একটি ক্ষেত্র ইয়োরোপে সঙ্কীর্ণ হইলেও আমেরিকায় বেশ বিস্তৃত, তাহাতে বহু যোগ্য লোক ঝুঁকিয়া পড়েন। তাহা হইতেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র।

(২) রাজনৈতিক জীবনে যশের অভাব।

(২) মহাসমিতির সভ্যরূপে অথবা রাজনৈতিক জীবনে কোন ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা, বাক্য বা কার্য্য দ্বারা যশস্বী হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইয়োরোপে এ বিষয়ে যে সুযোগ আছে আমেরিকায় তাহা লক্ষিত হয় না।

(৩) শ্রেষ্ঠ লোক শত্রু বৃদ্ধি করেন।

(৩) প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ লোকদের শত্রুসংখ্যা অনেক। তাঁহাদের বন্ধু ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা অনেক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার শত্রুদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী লোকও থাকিতে পারে। তাঁহার স্বাধীন বাক্য, চিন্তা ও কার্য্যকলাপ তাঁহাকে ইঁহাদের অপ্রিয়ভাজন করিতে পারে। দলের পক্ষে এরূপ লোক বাছা নিরাপদ্ নয়। যে লোক বেশী লোকের প্রিয়ভাজন ও যাঁহার শত্রুসংখ্যা কম তাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা সঙ্গত মনে হয়।

(৪) অবান্তর কারণ।

(৪) উপরের কারণগুলি ব্যক্তিগত। ইহা ছাড়া রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী বা খৃষ্টানধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইলে কোন ব্যক্তির রাষ্ট্র-নেতার পদ পাওয়া কঠিন হয়। বর্ত্তমান সময়ে মদ্যপানের সপক্ষভুক্ত ব্যক্তিরও ঐ প্রকার মুস্কিল। তবে এ সব অবান্তর। শুধু এগুলির জন্য কাহাকেও অপছন্দ করা হয় না।

রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতাবলী ও কর্ত্তব্য।

রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতাসমূহের কথা কাঠামো-আইনের দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পল্লবে সন্নিবিষ্ট আছে। সমগ্র দেশের কর্ত্তারূপে তাঁহার নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি আছে:

(১) তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থল ও জল সৈন্য-বিভাগের প্রধান সেনাপতি (কমাণ্ডার-ইন্-চিফ), এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনানীকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের কাজের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করা হইবে তাহারও প্রধান সেনাপতি হইবেন।

(২) তাঁহার সন্ধি করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাঁহার এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রথমত ঐ সম্পর্কে তিনি যে সকল লোক নিয়োগ করেন, রাষ্ট্র-সভা তাঁহাদিগকে বাতিল করিতে পারে। দ্বিতীয়ত তাঁহার কাজে দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র-সভাসদের অনুমোদন থাকা চাই।

(৩) তিনি শাসন, পররাষ্ট্র ও বিচার-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে

পারেন। দূত ও কনসালগণ, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকেরা, এবং অন্য সমস্ত যৌথ কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ ও সম্মতি দরকার।

(৪) যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাঁহার তাহাকে ক্ষমা করিবার বা দণ্ড রহিত করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিচার (ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট) আরম্ভ হইলে তিনি কিছু করিতে পারেন না।

(৫) বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার উভয় সভাকে তিনি আহ্বান করিতে পারেন।

(৬) মহাসমিতি কোন বিল পাশ করিলেও তাহাতে তিনি স্বাক্ষর না করিতে পারেন। ইহাই তাঁহার নাকচ্ ক্ষমতা। এ ক্ষমতা তিনি প্রায় প্রয়োগ করেন। তিনি কোন বিলে স্বাক্ষর না করিয়া উভয় সভার নিকট পুনর্বিচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। উভয় সভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা উহা পাশ করিতে না পারিলে ঐ নাকচ্ বলবৎ থাকে।

তাঁহার কয়েকটি কর্ত্তব্য এই :

(১) মহাসমিতিকে যৌথরাষ্ট্রের অবস্থা জ্ঞাপন করা ও কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্দ্দেশ করা।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের সকল কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করা।

(৩) বিদেশী রাজদূতদের অভ্যর্থনা করা।

(৪) আইন যাহাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা।

উপরে রাষ্ট্র-নেতার যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের কথা লিখিত হইল সেগুলি মোটামুটি চারি শ্রেণীতে পড়ে। যথা : চতুর্বিধ কার্য্য।

(১) পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

(২) আভ্যন্তরিক শাসন-সম্পর্কিত।

(৩) আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত।

(৪) নিয়োগ-সম্বন্ধীয়।

১৮৯৮ সন অবধি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। ইহারই নাম মনরো নীতি। তারপর ক্রমে ক্রমে এই দেশ অন্য বহু দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র-নেতাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন অনুসারে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার নাই, মহাসমিতির আছে। কিন্তু তিনি দেশ মধ্যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন যে, তখন মহাসমিতির পক্ষে আর যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সন্ধি সম্বন্ধেও তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। "রাষ্ট্র-সভার সম্মতি ও অনুমতিক্রমে তাঁহার সন্ধি করিবার ক্ষমতা আছে।" কিন্তু রাষ্ট্র-সভার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য তাঁহার সহিত একমত হওয়া চাই, নচেৎ তিনি যদি কোন সন্ধি করিয়াও থাকেন তাহা বলবৎ হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্র-সভার মতামত যথাযথভাবে জ্ঞাত থাকিবার জন্য রাষ্ট্র-নেতাকে সর্ব্বদা ঐ সভার পররাষ্ট্র সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্র-নেতার কাজে প্রতিনিধি-সভা

রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-সভার সম্মতি লইয়া পররাষ্ট্র-নীতি স্থির করেন।

প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে বাধা দিতে পারে। প্রথমত ইহা কোন অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে নিজেদের অসমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব পাশ করিতে পারে। কখনো কখনো ঐ প্রস্তাব রাষ্ট্র-সভার অনুমোদনের জন্যও পাঠাইয়া দিয়া থাকে। রাষ্ট্র-নেতা এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা অবহেলা করিতেও পারেন। কিন্তু তাঁহার ঈপ্সিত নীতি কাজে খাটাইবার জন্য যদি আইন পাশ করা দরকার হয় অথবা টাকা চাওয়া দরকার হয়, তবে তাঁহার প্রতিনিধি-সভার নিকট না আসিয়া উপায় নাই। প্রতিনিধি-সভা আইন পাশ করিতে অথবা টাকা দিতে অসম্মত হইতে পারে। সমস্ত সভ্য দেশেই ব্যবস্থাপক সভা ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে। পররাষ্ট্র ব্যাপারে কখনো কখনো খুব শীঘ্র কোন নীতি স্থির করিয়া তদনুসারে কাজ করা দরকার হইতে পারে, অথচ অবলম্বিত নীতির কথা প্রকাশ করা বিপজ্জনক হইতে পারে, অন্য দিকে জনগণের জানা দরকার কোন্ নীতি অবলম্বিত হইতেছে এবং দেখা দরকার যেন গণতান্ত্রিক অধিকার না খর্ব্ব হয়। কার্য্যক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-নেতা সাধারণত রাষ্ট্র-সভার দিকে চাহিয়া কাজ করেন না এবং যদিও তাঁহার পক্ষে উহার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা কঠিন, তথাপি তাঁহার পক্ষে রাষ্ট্র-সভার তথা সমগ্র দেশের অনেক কাজ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে।

যুদ্ধ-কালে রাষ্ট্র-নেতার আভ্যন্তরিক শাসন-ক্ষমতা।

শান্তির সময়ে আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বিশেষ কিছু নাই। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন ও শাসন-কার্য্য প্রধানত সেই সেই রাষ্ট্রের সরকারের হাতে ন্যস্ত আছে এবং বিবিধ বিধান পাশ করিয়া তাহার সাহায্যে যৌথ-শাসন-যন্ত্র চালানো হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়, বিশেষত অন্তর্যুদ্ধে, রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বিপুল হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্থল ও জল সৈন্যের সেনাপতি করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং বিপৎকালে তিনি কিরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত তাঁহারই উপর যখন "বিশ্বস্তভাবে আইন প্রয়োগের" ভার রহিয়াছে। কোন প্রকার বিধান না পাশ করিয়াও আইনত তিনি আপনার ক্ষমতা কতদূর প্রয়োগ করিতে সমর্থ তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই, কিন্তু মহাসমিতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিয়ন্তার (ডিক্‌টেটর) পদে বসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার সকল প্রকার কাজকে ন্যায্য বলিয়া অনুমোদন করিতে পারেন।

বিদ্রোহী রাষ্ট্রের শাসন।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের চতুর্থ ধারার চতুর্থ পল্লবটি এইরূপ: "যুক্তরাষ্ট্র এই সঙ্ঘের (ইউনিয়ান) অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা স্বরাজ্যমূলক (রিপাবলিকান্) রাখিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে এবং উহাদের প্রত্যেককে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং ব্যবস্থাপক সভা অথবা শাসনযন্ত্র (যখন ব্যবস্থাপক সভা ডাকা সম্ভবপর নহে) আবেদন করিলে আভ্যন্তরিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে।" প্রত্যেক রাষ্ট্রের গণতন্ত্র অব্যাহত রাখিবার দায় মহাসমিতির ও রাষ্ট্র-নেতার। তৃতীয় পল্লবে আছে বটে যে, মহাসমিতি কোন নূতন রাষ্ট্রকে সঙ্ঘের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু এই নূতন রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক না হয় তবে তাহা গণতন্ত্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে কিনা তাহার উল্লেখ নাই। ঐ পল্লবে আরও বলা হইয়াছে যে, অন্য রাষ্ট্র হইতে অংশ কাটিয়া লইয়া অথবা দুই বা অধিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশ

যোগ করিয়া কোন নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে না। মোট কথা, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আইন যতদিন থাকিবে, ততদিন বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সীমা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে মহাসমিতির এবং এক বা বহু রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি থাকিলে অবশ্য নূতনভাবে সীমা নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে বাধা থাকিবে না। কিন্তু শুধু মহাসমিতির মত অনুসারে অথবা রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতাতে রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘনীয় নহে। দুই রাষ্ট্র যখন পরস্পর বিবাদ করে, কোন রাষ্ট্রে যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয় অথবা যখন বিদ্রোহীরা জোর করিয়া ট্রেণ-চলাচল থামায়, তখন রাষ্ট্র-নেতা যৌথ সৈন্য চালনা করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহাই চূড়ান্ত হয়।

রাষ্ট্র-নেতার দেশবাসীর সম্মুখে নিবেদন।

সমগ্র দেশকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা বা বাণী পড়িবার বা পাঠাইবার ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার আছে কিনা বলা শক্ত। অন্তত রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে রাষ্ট্র-নেতা এই ক্ষমতার ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাতে আপত্তি হয় নাই। কার্য্য-গ্রহণকালে তাঁহার পক্ষে বিবিধ সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সম্বলিত বাণী ঘোষণা করা স্বাভাবিক। ওয়াশিংটন বিদায়কালেও এরূপ করেন, কিন্তু জ্যাকসন তাঁহার পদানুসরণ করিতে গিয়া নিন্দিত হন। নিজের পদপ্রাপ্তির সমর্থন করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হওয়াও তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। কিন্তু অন্য দশজন রাষ্ট্রিকের মত তাঁহার রাজনৈতিক বক্তৃতা দিবার, যৌথ নির্ব্বাচনে ও নিজ রাষ্ট্রের নির্ব্বাচনে তাঁহার ভোট দিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। অসাম্প্রদায়িক উৎসবাদিতে তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য কখনো কখনো আহ্বান করা হয়। নিজ দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিবার ও তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবার স্বাধীনতা তাঁহার থাকে।

রাষ্ট্র-নেতার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা।

আমেরিকার রাষ্ট্র-নেতা না রাষ্ট্র-সভার না প্রতিনিধি-সভার সভ্য। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে তাঁহাকে সমগ্র দেশবাসীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহাসমিতির সদস্যগণ জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন বটে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা যাহাদের প্রতিনিধি তাহাদের মতামত অনুসারে চলা ও তাহাদের স্বার্থরক্ষা করা। কিন্তু তাঁহারা যদি কোন কারণে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করেন, তবে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিহত করিবার কি উপায় আছে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়াই মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিরপেক্ষ ভাবে রাষ্ট্র-নেতাকে খাড়া করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নাকচ্ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। পরন্তু রাষ্ট্র-নেতা নিজে সাক্ষাৎ ভাবে অথবা তাঁহার মন্ত্রীদের সাহায্যে কোন সভাতে কোন বিল উপস্থাপিত করিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় তাঁহার মন্ত্রিগণও কোন সভার সভ্য নহেন। এইখানে বিলাতী মহাসমিতির সহিত পার্থক্যটা প্রণিধানযোগ্য। সেখানে সমস্ত সরকারী বিলের খসড়া মন্ত্রিগণ আনয়ন করেন, অবশ্য (নামমাত্র) রাজার পরামর্শ অনুসারে। রাষ্ট্র-নেতা লিঙ্কন ১৮৬২ সনে তাঁহার ঘোষণার ভিতর দিয়া দাসত্বের উচ্ছেদবিষয়ক এক বিল আনিয়া বসেন ও উহা রাষ্ট্র-সভায় রাষ্ট্র-সভার সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত হয়। দ্বিতীয়বার "পড়া" হইবার পর তর্ক উঠে রাষ্ট্র-নেতার এই প্রকার বিল আনয়ন করিবার ক্ষমতা আছে

কি না। বস্তুত এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি মহাসমিতিকে দেশের সমসাময়িক অবস্থা কিরূপ এবং নিজ অভিজ্ঞতার ফলে কোন্ কোন্ আইন প্রণয়ন করা দরকার বলিয়া মনে করেন তাহা জানাইতে পারেন। তিনি এ কাজ বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা পাঠাইয়া করেন।

রাষ্ট্র-নেতা যে সব ঘোষণা পাঠাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রথমটির গুরুত্ব সাধারণত সব চেয়ে বেশী। জর্জ ওয়াশিংটন মহা আড়ম্বরে ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসিয়া মহাসমিতিতে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু ১৮০১ সন হইতে জেফারসন নিজে মহাসমিতিতে উপস্থিত না থাকিয়া লিখিত অভিভাষণ পাঠাইতেন। তখন হইতে লিখিত ঘোষণা পাঠানো রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ঘোষণাতে সাময়িক সমস্যাসমূহ, বিভিন্ন ক্ষতি ও অমঙ্গল নিবারণের উপায়, এবং প্রয়োজনীয় আইন আলোচিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা আইন-প্রণয়ন নয়, রাষ্ট্র-নেতা নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও পরামর্শ দেন কি করিতে হইবে। মহাসমিতি তাঁহার কথা না শুনিলে না শুনিতে পারে এবং না শুনিলে তাহাকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার নাই। তথাপি একেবারে নাই বলিলে ঠিক বলা হইবে না। কারণ প্রত্যেক বিলই শেষকালে তাঁহার নিকট স্বাক্ষরিত হইবার জন্য উপস্থিত হয়। সে সময়ে তিনি উহাতে স্বাক্ষর করিলে উহা আইনে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নাম নাও সহি করিতে পারেন। তিনি যদি সহি না করেন তবে সহি না করিবার কারণ দেখাইয়া দশ দিনের মধ্যে যে সভায় ঐ বিলের উৎপত্তি হইয়াছে সেই সভাকে উহা ফিরাইয়া দেন। ইহার পর রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার প্রত্যেকে যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা ঐ বিল পাশ করে, তবে উহা রাষ্ট্র-নেতার সম্মতি না পাইলেও আইনে পরিণত হইয়া যায়। এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবার পক্ষে দুই সভা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট দ্বারা কোন বিলকে সমর্থন করা চাই। এইরূপভাবে সভাদ্বয়ের কাছে কোন বিল পাঠাইবার জন্য রাষ্ট্র-নেতাকে দশ দিনের (রবিবার ধরা হয় না) সময় দেওয়া হইয়াছে। যদি এই দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্র-নেতা কোন বিল নাকচ্ করিয়াও কোন সভার নিকট প্রেরণ না করেন তবে তাহা তাঁহার অসম্মতি সত্ত্বেও দশদিন পরে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, রাষ্ট্র-নেতার হাতে যে দশ দিনের সময় আছে তাহারই মধ্যে মহাসমিতির বৈঠক শেষ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে বিলটি সভাদ্বয়ের নিকট উপস্থাপিত হইবার সুযোগ ঘটে না। উহা মাঠে মারা যায়। ইহাকে পকেট নাকচ্ (পকেট ভিটো) বলা চলে। অন্য দিকে পূর্ব্বোক্ত বিল দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট না পাইলে তাহা আর আইনে পরিণত হইতে পারে না। [রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার পঞ্চম পল্লবের দ্বিতীয় অনুপল্লব দ্রষ্টব্য।]

রাষ্ট্র-নেতা নাকচ্ ক্ষমতা কচিৎ ব্যবহার করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বাধীনতাপ্রিয় দেশে নাকচ্ ক্ষমতা দিয়া রাষ্ট্র-নেতাকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী করা হইয়াছে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হন। সুখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ রাষ্ট্র-নেতা কচিৎ এই ক্ষমতার ব্যবহার করিয়াছেন,—যখন মনে হইয়াছে বিলখ করা বিধেয় অথবা মহাসমিতির মত না থাকিলেও সমগ্র দেশের সমর্থন পাওয়া যাইবে, সাধারণত তখন রাষ্ট্র-নেতারা কোন বিলে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আর

কখনো কোন রাষ্ট্র-নেতা যদি অথবা কোন বিল নাকচ্ করিয়াছেন ত তিনি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট পাইতে সমর্থ হন নাই। ওয়াশিংটন দুইটি মাত্র এবং তাঁহার পরবর্তী রাষ্ট্র-নেতাগণ ১৮৩০ সন পর্য্যন্ত সাতটি মাত্র বিল ফেরৎ পাঠান বা নাকচ্ করেন। জ্যাক্‌সন নিজের ক্ষমতা বেশী ব্যবহার করিলেও ১৭৮৯ হইতে ১৮৮৫ সন অবধি ৯৬ বৎসরে নাকচ্ করা বিলের সংখ্যা (পকেট নাকচ সুদ্ধ) মাত্র ১৩২, কাহারো কাহারো মতে ১২৮। বিভিন্ন রাষ্ট্র-নেতার নাকচ্ সংখ্যা এই : জনসন ২১, গ্রাণ্ট ৪৩, জন আডামস্ ০, জেফারসন ০, জে কিউ আডাম্‌স ০, ভ্যান্ বিউরেন ০, টেলর ০, ফিলমোর ০, ম্যাককিন্‌লি ১৪, রুজবেল্ট ৩৪। ১৮৯২ হইতে ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত নাকচের সংখ্যা ১০৮। ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত মোট নাকচ্ ৫৪১ (কারণ, ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে ৩০১টি নাকচ্ হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঘরোয়া যুদ্ধে লিপ্ত লোকদের পেন্সন সম্পর্কে)। ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নেতারা যে সকল বিল নাকচ্ করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন তাহার একটাও পরে পাশ হয় নাই। ১৮৮৫ সন পর্য্যন্ত ২৭টি মাত্র বিল রাষ্ট্র-নেতার নাকচ্ সত্ত্বেও আইনে পরিণত হইয়াছে, তন্মধ্যে একা জনসনের সময়ে ১৫টি। ১৮৮৫ সনের পর ক্লীবল্যাণ্ড ৩০১টি বিল নাকচ্ করিলেও মাত্র দুইটি আইনরূপে পরিণত হইতে সমর্থ হয়। [ব্রাইস]

রাষ্ট্র-নেতা জনসাধারণের প্রতিনিধি অতএব তাঁহার নাকচ্ ক্ষমতার প্রয়োগ জনগণের কাছে অপ্রীতিকর নহে।

মহাসমিতির সদস্যগণ জনসাধারণের প্রতিনিধি হইলেও তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ নিজ দলের আদেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য থাকেন। কোন সময়ে কোন প্রবল সম্প্রদায়ের তুষ্টিবিধান করিতে সচেষ্ট হওয়া অথবা দলের অন্তর্গত কোন বিশেষ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সদস্যগণের পক্ষে অসম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ও দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ এক প্রকার নাও হইতে পারে। এজন্য এমন একজন লোক চাই যে দরকার হইলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিরুদ্ধে জনগণের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। মহাসমিতির সদস্যেরা যাহাতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আইন অমান্য করিতে না পারে এবং মহাসমিতিও যাহাতে শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া না ফেলে, তাহার জন্য রাষ্ট্র-নেতাকে নাকচ্ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। মনে হইতে পারে যে, রাষ্ট্র-নেতা এই ক্ষমতার ব্যবহার করিলে লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে পারেন, কারণ এই ক্ষমতার ব্যবহার করা মানে জনগণের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যাওয়া, কিন্তু তাহা হয় নাই। বরং রাষ্ট্র-নেতার এইরূপ আচরণে লোকে মনে করে তাঁহার নিজস্ব মত বলিয়া একটা পদার্থ আছে ও সেজন্য তাঁহার উপর প্রীত হয়। বস্তুত রাষ্ট্র-নেতা মহাসমিতির সদস্যদের মুখপাত্র নহেন, তিনি সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হন। প্রতিনিধিগণ ভুল ত্রুটি করিলে বা কোন প্রলোভনে বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে, তাঁহার পক্ষে সায় দেওয়া অন্যায় হইবে। তাঁহাকে দেশবাসীর মঙ্গল কিসে হয় তাহাই সর্ব্বদা দেখিতে হয়। তারপর রাষ্ট্র-নেতার নাকচ্ ক্ষমতা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হওয়া সহজ নহে। উভয় সভা দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট দ্বারা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, তিনি এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহায়তায় অথবা ইঁহারা সকলে নিজ দায়িত্বে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি গুরুতর কারণ ব্যতীত এরূপভাবে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে লইবেন না, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

তাহা ছাড়া, এইরূপে অতিজনের অত্যাচারও কতকটা নিবারিত হইয়া থাকে ও উনজনের অধিকার, দাবী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়।

সমগ্র যৌথ শাসনভার রাষ্ট্র-নেতার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় পল্লবের দ্বিতীয় অনুপল্লবের এক অংশে রাষ্ট্র-নেতার সন্ধি করিবার ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, অন্য অংশে বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই প্রকার: "রাজদূত, অন্যান্য সরকারী মন্ত্রী ও কন্‌সাল, সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারকগণ এবং অন্য যে সকল যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীর নিয়োগের কথা এখানে বলা হয় নাই কিন্তু যে সকল নিয়োগ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এই সব তিনি [রাষ্ট্র-নেতা] মনোনয়ন করিবেন এবং রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ ও সম্মতি সহ নিযুক্ত করিবেন; কিন্তু উচিত বিবেচনা করিলে মহাসমিতি আইন পাশ করিয়া অধস্তন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করিবার ভার একা রাষ্ট্র-নেতার উপর, বিচারালয়ের উপর অথবা বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাদের উপর ন্যস্ত করিতে পারে।" এই আইনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মন্ত্রিগণের নিয়োগ সম্বন্ধে এখানে কোন কথা বলা হয় নাই। বস্তুত রাষ্ট্র-নেতা নিজ মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু অন্য কোন নিয়োগে রাষ্ট্র-নেতার এই স্বাধীনতা নাই; পাছে রাষ্ট্র-নেতা নিজের ক্ষমতা অপব্যবহার করেন কিংবা এমন সব লোককে নিযুক্ত করেন যাহারা তাহাদের পদের উপযুক্ত নয় সেজন্য রাষ্ট্র-সভা নিজের পছন্দমত ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিয়োগ অনুমোদন করেন না। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্র-সভার পক্ষে এ বিষয়ে নানা কারণে বিরোধিতা করা অসম্ভব নহে এবং রাষ্ট্র-সভার সকল "পরামর্শ ও সম্মতি" ন্যায়সঙ্গত নাও হইতে পারে। অন্য দিকে, যাহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র-নেতা তাঁহার পদ লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন তাহাদের যতজনকে সম্ভব কোন না কোন প্রকারে খুসী করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। এই খুসী করার অর্থ কাজ দেওয়া এবং এই প্রকারে যাহাদের কাজ দেওয়া হয় তাহারা জাতীয় স্বার্থরক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি নাও হইতে পারে। তারপর, কোন রাষ্ট্রে কোন যৌথ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা দরকার হইলে সেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্র-সভার সদস্যদ্বয়কে কর্ম্মচারীর গুণাগুণ বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাঁহাদের দাবী এই যে, কর্ম্মচারীকে বাহাল করা হইবে কি না তাহা রাষ্ট্র-সভার ভোটে স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মতামত আগে জানা দরকার। রাষ্ট্র-সভার অন্য সদস্যেরা এই প্রস্তাবের যুক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া রাষ্ট্র-নেতার উপর চাপ দিতে পারেন যে, উঁহাদের সহিত আগে পরামর্শ করা হউক। অবশ্য সদস্যদ্বয় তাঁহার দলের লোক হইলেই তিনি তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন, অন্য দলের হইলে এরূপ করিবার তাঁহার কোন দায় নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানা যৌথ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা দরকার হয়। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তা পাইবার আশা রাখে। রাষ্ট্র-সভার উভয় সদস্যই যখন রাষ্ট্র-নেতার দলের লোক হন তখন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে স্থির করেন কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কর্ম্ম দেওয়া হইবে, এবং সাধারণত অন্য সদস্যেরা তাঁহাদের সমর্থন করেন। ইহাকে বলা হয় 'রাষ্ট্র-সভার সৌজন্য' (কার্টসি অব্ দি সেনেট)। রাষ্ট্র-নেতার পক্ষে কোন সদস্য বা

যৌথ কর্ম্মচারী নিয়োগে রাষ্ট্র-নেতার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা।

উভয় সদস্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করা নিরাপদ্ নহে। কারণ তাঁহাকে জব্দ করিবার অস্ত্র তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে। তিনি যদি তাঁহাদের মনোমত ব্যক্তিকে গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তবে রাষ্ট্র-সভা তাঁহার সেই নিয়োগ না-মঞ্জুর করিতে পারে। রাষ্ট্র-নেতার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে তিনি কতটা রাষ্ট্র-সভার ইচ্ছামত চলিবেন, আর কতটা নিজের ইচ্ছামত চলিবেন। কোন কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র-নেতা কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্র-সভার সহিত বারে বারে দ্বন্দ্ব করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্র-সভার মতের কাছে নত হইয়া চলা সুবিধাজনক বটে, এবং রাষ্ট্র-নেতারা সাধারণত তাহাই করিয়া থাকেন। 'রাষ্ট্র-সভার সৌজন্য' বিকাশ পাইতে পাইতে 'অনুরক্ত লোকদের চাকুরী দেওয়ার প্রথায়' (স্পয়েল্‌স্ সিষ্টেম) পরিণত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, নূতন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হইবামাত্র বিভিন্ন যৌথ কর্ম্মচারীদের সরাইয়া দেওয়া হয় ও তাঁহাদের স্থানে নূতন লোকেরা নিযুক্ত হন।

উপরে যে উপপল্লবটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দুই প্রকার নিয়োগের কথা আছে। কতকগুলি রাষ্ট্র-নেতা স্বয়ং একাকী করিতে পারেন। অবশ্য কোন্ কোন্ কাজে তিনি লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহা মহাসমিতি আইন পাশ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আর কতকগুলির বেলায় তিনি রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ ও অনুমতি লইতে বাধ্য। এই সব নিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ ও অনুমোদন না লইয়া ইহাদের কাহাকেও পদচ্যুত করিতে পারেন কি না। হ্যামিণ্টন বলিতেন যে, এত অধিক ও বিপজ্জনক ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার হাতে দেওয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন-প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁহার এ ক্ষমতা থাকিলে তাঁহার যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার কেহ থাকিবে না। কিন্তু ম্যাডিসনের মত এই ছিল যে, ঐ প্রকার ক্ষমতা রাষ্ট্র-নেতার হাতে দেওয়া আইনের অভিপ্রেত ছিল; দেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তারূপে তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য কর্ম্মচারী ভিন্ন চলা অসম্ভব। কিন্তু কোন কর্ম্মচারীকে রাষ্ট্র-সভার অনুমোদন পাইয়া নিয়োগ করিবার পর যদি দেখেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য নহেন, তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মার্স্যালেরই এই মত ছিল। ওয়াশিংটন রাষ্ট্র-নেতা থাকা কালে ও তাহার পর ১৮৬৬ সন অবধি এই মত অনুসারেই কাজ হইয়াছে। ১৮৬৭ সনে মহাসমিতির সহিত রাষ্ট্র-নেতার বিরোধ উপস্থিত হইলে মহাসমিতি চাকুরীর স্থায়িত্ব-বিষয়ক এক আইন (টেনিওর অব্ অফিস্ অ্যাক্ট) পাশ করেন। তদনুসারে স্থির হয় কোন কর্ম্মচারীকে, এমন কি মন্ত্রীদিগকেও পদচ্যুত করিতে হইলে, রাষ্ট্র-সভার সম্মতি লইতে হইবে এবং যখন মহাসমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকে তখন রাষ্ট্র-নেতা তাঁহাকে মাত্র কিছুকালের জন্য বরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু ১৮৬৯ সনে এই আইন পরিবর্ত্তিত হয় এবং ১৮৮৭ সনে ইহাকে রহিত করা হয়।

কর্ম্মচারী নিয়োগ রাষ্ট্র-নেতা বনাম মহাসমিতি।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বলা হইয়াছে যে, বিচারালয়সমূহ অথবা বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা অধস্তন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করিতে পারেন। এখানেও মহাসমিতির নির্দ্দেশ দরকার, কিন্তু এই আইনের ফলে অনেক কর্ম্মচারীর নিয়োগ রাষ্ট্র-নেতার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে।

পরীক্ষায় পাশ হইলে চাকুরী দেওয়ার প্রথা।

১৮৮৩ সনে সিবিল সার্ভিস্ সংস্কার আইন পাশ করিয়া ১৪,০০০ কাজের জন্ত পরীক্ষা-গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০৯ সনে এইরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩,৬৭,৭৯৪। তাহার দুই-তৃতীয়াংশকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। অত্যাবধি যে সকল নিয়োগ রাষ্ট্র-নেতার হাতে আছে সেগুলির সংখ্যা কম নহে, এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র-নেতাকে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হয়।

মন্ত্রি-সমিতি

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ।

যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র-নেতার মন্ত্রীদিগকে একত্রে মন্ত্রি-সমিতি বলিয়া উল্লেখ করিলেও, এই মন্ত্রি-সমিতি কোন প্রকারেই ইংরেজী বা ফরাসী কেবিনেটের তুল্য নহে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় পল্লবের প্রথম উপপল্লবের প্রথমাংশে রাষ্ট্র-নেতার সেনাপতিত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ : [রাষ্ট্র-নেতা] প্রত্যেক শাসন-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তদীয় বিভাগ-সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে লিখিত মতামত চাহিতে পারেন। শুধু এই অংশটুকু হইতে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র-নেতা মন্ত্রীদের সহায়তায় রাষ্ট্র-শাসন করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া মন্ত্রীদের আর বড় উল্লেখ নাই। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগসমূহ মহাসমিতি বিভিন্ন আইন পাশ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৭৮৯ সনে ওয়াশিংটনের সময়ে চারিটি মাত্র বিভাগ ছিল। এই চারি বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন রাষ্ট্র-সচিব, কোষ-সচিব, সমর-সচিব, আইন-সচিব (এটর্নি জেনারেল)। ১৭৯৮ সনে নৌ-সচিব, ১৮২৯ সনে ডাক-সচিব (পোষ্টমাষ্টার জেনারেল), ১৮৪৯ সনে অভ্যন্তর-সচিব, ১৮৮৮ সনে কৃষি-সচিব, ১৯০৩ সনে বাণিজ্য ও শ্রম-সচিব এবং ১৯১৩ সনে শ্রম-সচিবের পদ সৃষ্ট হইয়াছে। আইন ও ডাক ছাড়া অন্ত সচিবদিগকে 'সেক্রেটারি' নামে অভিহিত করা দস্তুর। প্রকৃত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি-সমিতি বলিতে এই দশ জন মন্ত্রীকে বুঝিতে হইবে। মহাসমিতির আইনের বলে কতকগুলি সমিতিও (কমিশন) সৃষ্ট হইয়াছে। যথা, আন্তর-রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সমিতি,—১৮৮৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে মোতায়েন হয় ও রেলওয়ের উপর প্রভূত ক্ষমতা আছে; সিবিল সার্ব্বিস সমিতি (১৮৮৩)। মৎস্য-সমিতি, লোক-গণনা ও উপকূল জরীপ বাণিজ্য-বিভাগের, শিক্ষা অভ্যন্তর-বিভাগের এবং লোক-চলাচল শ্রম-বিভাগের অন্তর্গত। প্রত্যেক মন্ত্রীর বাৎসরিক বেতন ১২,০০০ ডলার বা প্রায় ৩৬,০০০৲ টাকা।

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্র-নেতার কর্ম্মচারী।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ রাষ্ট্র-নেতার মন্ত্রী; রাষ্ট্র-নেতা ইঁহাদিগকে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। অবশ্য আইনে আছে যে, রাষ্ট্র-সভার সম্মতি পাইলে তিনি ইঁহাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র-সভা এ বিষয়ে তাঁহাকে কখনো বাধা দেয় নাই। আর ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্র-নেতারই আছে। রাষ্ট্রের শাসন-ব্যাপারে পরামর্শ লইবার জন্ত রাষ্ট্র-নেতা ইঁহাদিগকে মাঝে মাঝে নিজের কাছে ডাকেন। ইহা ছাড়া ইঁহাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত কর্ম্মচারীদের কোন পার্থক্য নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার ষষ্ঠ পল্লবের দ্বিতীয় উপপল্লবটি এই : "কোন রাষ্ট্র-সভাসদ্ অথবা প্রতিনিধি-সভার সদস্য, যত কালের জন্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন উক্ত কালের

মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে সৃষ্ট কোন সরকারী চাকুরীতে অথবা ঐ সময়ের মধ্যে বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না; আর যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কোন পদ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে দুই সভার কোনটাতেই প্রবেশ করিতে পারিবেন না।" এই আইনের দ্বারা শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কর্মচারী কোন সভার সভ্য হইতে পারেন না, তাহা নয়, উপরন্তু দুই সভার কোন সভ্যই সভ্য থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রের কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন না। মন্ত্রীরা যুক্তরাষ্ট্রের চাকুরী করেন। সুতরাং তাঁহারা কোন সভার সদস্য নহেন। এইখানে ইংরেজী ও ফরাসী মন্ত্রি-সমিতির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি-সমিতির পার্থক্য খুব গভীর। ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে মন্ত্রিগণের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপক সভার মর্জির উপর নির্ভর করে। তাঁহারা উভয় সভার কোন না কোনটাতে বসিয়া তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জবাবদিহি করিতে বাধ্য এবং ব্যবস্থাপক সভার অসন্তোষে এক দিনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীরা না কোন সভার সভ্য, না তাঁহাদের পদের স্থায়িত্ব সভার সদস্যদের মর্জির উপর নির্ভর করে। মন্ত্রিগণকে এইরূপে ব্যবস্থাপক-সভা-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি করিবার একটা হেতু এই ছিল যে, মনে করা হইয়াছিল মহাসমিতির কাহাকেও পদের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া আনা সম্ভবপর হইবে না এবং রাষ্ট্র-নেতাকেও অন্যায়ভাবে প্রভাবান্বিত করা হইবে না। মন্ত্রিগণ মহাসমিতির নিকট দায়ী নহেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের এক বা অন্য সভায় উপস্থিত থাকা সম্বন্ধে কাঠামো-আইনে কোন প্রকার নিষেধ নাই। ইংরেজ ও ফরাসী মন্ত্রীর মত তাঁহারাও মহাসমিতির যে কোন শাখায় উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের বক্তব্য বলিতে পারেন। অন্তত সে বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। রাষ্ট্র-নেতা ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মচারীরা জনগণের প্রতিনিধিদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে কাঠামো-আইন একেবারে নীরব।

তাঁহারা মহাসমিতির নিকট দায়ী নহেন।

কি প্রকার লোককে রাষ্ট্র-নেতা মন্ত্রিত্বের পদ প্রদান করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। রাষ্ট্র-নেতার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র-নেতা নিজ নিজ মর্জি অনুসারে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। সাধারণত কোন রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচিত হওয়ার পর একেবারে নূতন মন্ত্রি-সমিতি গঠন করেন। এমন কি, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাষ্ট্র-নেতার দলের লোক হইলেও পূর্ব্বের মন্ত্রি-সমিতিকে বাহাল রাখেন না। তিনি কখনো কখনো এমন সব লোককে মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করেন যাঁহারা কোন কালে মহাসমিতির সভ্য হন নাই, এমন কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাতে বসেন নাই অথবা সামান্য কোন চাকুরী পর্য্যন্ত করেন নাই। সাধারণত অবশ্য যাঁহারা মন্ত্রীর পদ পান তাঁহারা জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। রাষ্ট্র-নেতা যাঁহাদের সাহায্যে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন অথবা ভবিষ্যতে নিজ নীতির সাফল্যের জন্য যাঁহাদের সাহায্য আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করিতে পারেন। কখনো বা নির্ব্বাচন কালে যে এক বা অধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত রাষ্ট্র-নেতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, রাষ্ট্র-নেতা তাঁহাদের বড় বড় মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাধারণত তাঁহার দলের হইলেই ভাল হয়।

রাষ্ট্র-নেতা কিরূপ লোকদের মন্ত্রী রূপে নির্ব্বাচন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণের পদমর্য্যাদা :

(১) রাষ্ট্র-সচিব।

মন্ত্রি-সমিতিতে রাষ্ট্র-সচিবের স্থান পদে ও মর্য্যাদায় সকলের উর্দ্ধে। প্রধানত যাঁহার চেষ্টায় রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচনে জয়ী হন তাঁহাকে অথবা তাঁহার দলের প্রধান নেতাকে এই পদ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে, এই পদ গ্রহণ রাষ্ট্র-নেতা হইবার উপায় স্বরূপ ছিল। কারণ জেফারসন, ম্যাডিসন, মনরো, জে কিউ আডাম্‌স্ ও ভ্যান ব্যুরেন সকলেই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাষ্ট্র-নেতাগণের রাষ্ট্র-সচিবরূপে কাজ করিয়াছেন। রাষ্ট্র-বিভাগের প্রধান কার্য্য হইল ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও তৎসম্বন্ধে কার্য্য পরিচালনা। রাষ্ট্র-সচিব বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, ও খ্যাতি লাভ করিবার অনেক সুযোগ পান। রাষ্ট্র-নেতা তাঁহার কাজে চোখ দিবার বেশী অবকাশ পান না বলিয়া, তাঁহার অবলম্বিত রাষ্ট্র-নীতি যুক্তরাষ্ট্রে সহজে গৃহীত হয়। অবশ্য রাষ্ট্র-সভার সম্মতি থাকা দরকার। রাষ্ট্র-নেতা বিশেষ শক্তিশালী না হইলে, তাঁহার পক্ষে রাষ্ট্র-সচিব দ্বারা চালিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

(২) কোষ-সচিব।

কোষ-সচিব হইতেছেন টাকাকড়ির মন্ত্রী। মহাসমিতি সম্মতি দিলে সিক্কা ও জাতীয় ঋণ পরিচালনার ভার ইঁহার হাতে ন্যস্ত থাকে। ইনি মহাসমিতির নিকট নিয়মিতভাবে বিবরণী দাখিল করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে মহাসমিতির সভ্য না হওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার করভার চাপাইবার অথবা বিভিন্ন বিভাগে টাকা খরচ করিবার কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে।

(৩) অভ্যন্তর-সচিব।

ফ্রান্স বা ইতালির অভ্যন্তর-মন্ত্রী বলিতে যে প্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে বুঝায়, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তর-সচিব বলিতে তাহা বুঝায় না। তার কারণ এই যে, ঐ দুই দেশে অভ্যন্তর-সচিবেরা যে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার অধিকাংশ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকার অথবা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী জমির রক্ষণাবেক্ষণ (বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ রেলওয়ে কোম্পানিগুলিকে দেওয়া হইলেও বর্ত্তমানে সরকারী জমির দাম অনেক), রেড ইণ্ডিয়ানদের দেখাশোনা, পেটেণ্ট ও পেন্সন, জলবায়ু-পরীক্ষা গৃহ (মিটিওরোলজিক্যাল অফিস্), ভূ-জরীপ এবং (নদী-বা-সমুদ্র) উত্তোলিত ভূভাগ লইয়া তাঁহাকে সাধারণত ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

(৪) আইন-সচিব।

আইন-সচিব শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী উকীল নহেন, তিনি বিচার-সচিবও (মিনিষ্টার অব্ জাষ্টিস্) বটেন। তিনি যৌথ-বিচার-বিভাগসমূহের উপর খর দৃষ্টি রাখেন এবং রাষ্ট্র-নেতাকে অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ে আইনের পরামর্শ দেন। শাসন-বিভাগের ক্ষমতা কতদূর ; যৌথ ও রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বে কাহার পক্ষ ন্যায্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি রাষ্ট্র-নেতাকে যে সকল পরামর্শ দেন সেগুলি অনেক সময়ে ছাপানো হয়। উদ্দেশ্য, রাষ্ট্র-নেতা যে আইন মত কাজ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করা। তাঁহার মতামতকে চূড়ান্ত বলিয়াই বিবেচনা করা হয়। তবে যৌথ-বিচারালয় তাঁহার মতামতকে উল্টাইয়া দিতে পারে।

বর্ত্তমান কালে বাণিজ্য ও শ্রম-সচিবের প্রয়োজনীয়তা যে যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বাণিজ্যিক বিভাগ রেল রোড বাদে অন্যান্য যৌথ-প্রতিষ্ঠান, বাতিঘর, উপকূল-জরীপ, জাহাজ, লোক-গণনা, বাণিজ্যের সূচী-সংখ্যা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়। আর ঔপনিবেশিকদের সম্বন্ধে আইন-কানুন শ্রম-বিভাগের অন্তর্গত

উপরে মোটামুটি কোন কোন মন্ত্রীর কর্তব্য কর্ম ব্যাখ্যা করা গেল। অন্য কতকগুলি নামেই বুঝা যায়। যেমন সমর-সচিব ইত্যাদি। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কার্য্য বিভাগের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি পদের জন্য কোন মন্ত্রী বাহাল করা হয় না। যেমন, শিক্ষাবিভাগ। আর নূতন কতকগুলি কাজের সৃষ্টি হইলেও সব সময়ে নূতন মন্ত্রীর সৃষ্টি হয় নাই। তাহা ছাড়া ইয়োরোপে যে সকল কাজ মন্ত্রীদের নিত্যকর্ম, তাহার অনেকটা দুই সভায়, বিশেষত প্রতিনিধি-সভায়, বিভিন্ন সমিতি সম্পাদন করিয়া থাকে। ফ্রান্সে সমিতি-শাসন প্রচলিত থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের মত নয়।

ইংল্যাণ্ডে বা ইতালিতে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে রাজার দায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। সেখানে মন্ত্রিগণই সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব মন্ত্রিগণের নহে, রাষ্ট্র-নেতার। বস্তুত মন্ত্রিগণ তাঁহার ভৃত্য মাত্র। মহাসমিতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহারা আইনত রাষ্ট্র-নেতার হুকুম তামিল করিয়া চলিতে বাধ্য। সুতরাং তাঁহাদের কাজ রাষ্ট্র-নেতার কাজ। তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন-কালে কোন মন্ত্রী যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিচার হইতে পারে। রাষ্ট্র-নেতাকে কুপরামর্শ দিলে কোন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতখানি তাহা আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, কিন্তু তিনি যদি রাষ্ট্র-নেতার সহিত একযোগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন বা ঐরূপ কোন অপরাধ করেন, তবে তাঁহার পৃথক বিচার হইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্র-নেতার দায়িত্বচ্যুত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার ন্যায় দায়িত্বহীন, তাঁহার হইয়া মন্ত্রিগণ কাজ করেন।

জনগণের নিকট দায়ী রাষ্ট্র-নেতা, তাঁহার মন্ত্রিগণ নহেন। মন্ত্রি-দের দায়িত্ব রাষ্ট্র-নেতার নিকট।

কাঠামো-আইন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়েক বৎসর অবধি যুক্তরাষ্ট্রের নেতাগণ যোগ্যতা অনুসারে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতেন। কিন্তু তৃতীয় রাষ্ট্র-নেতা জেফারসন নিজের দলের লোক ছাড়া কাহাকেও মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন নাই। তাঁহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র-নেতা নিজ দলের লোক লইয়াই মন্ত্রি-সমিতি গঠন করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি-সমিতি সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে পারে যে, বৃটিশ মন্ত্রীদের মত ইঁহারাও বিশেষ একটি দলভুক্ত ও সেই দল নির্ব্বাচনে অতিজন ভোট পাইয়াছে।

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্র-নেতার দলীয় লোক।

কিন্তু সাদৃশ্যটা এই পর্য্যন্তই। ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালি প্রভৃতি দেশে প্রচলিত পার্ল্যামেন্টীয় শাসন-প্রণালীর মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত চারিটি নীতি: (ক) প্রধান শাসনকর্ত্তা তাঁহার কাজের জন্য দায়ী নহেন, দায়ী মন্ত্রি-সমিতি। মন্ত্রি-সমিতি তাঁহাকে যেরূপ পরামর্শ দেন, তিনি সেইরূপ করেন। তাঁহার যদি ভুল হয় ত তজ্জন্য মন্ত্রিরাই ভুগিবেন, তিনি ভুগিবেন না। 'রাজার হুকুমে করিয়াছি' বলিয়া মন্ত্রীরা কোন কাজের দায় হইতে নিষ্কৃতি পান না। যদি রাজা তাঁহাদের এমন উপদেশ দেন যাহা তাঁহাদের অনুমোদিত নয়, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে পদত্যাগ করা। (খ) মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভায় বসেন। বস্তুত কাজকর্ম চালাইবার জন্য পার্ল্যামেন্টের অতিজন পক্ষ যে সমিতি নির্ব্বাচন করিয়া দেন তাহাই মন্ত্রি-সমিতি। (গ) মন্ত্রিগণের দায়িত্ব ব্যবস্থাপক সভার নিকট এবং ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদের উপর বিশ্বাস হারাইলে, হয় তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে হয়, নচেৎ তাঁহারা পার্ল্যামেন্ট ভাঙ্গিয়া আবার

নূতন পার্ল্যামেন্ট গড়িবার পরামর্শ দিতে পারেন। (ঘ) মন্ত্রীদের দায়িত্ব যুক্ত-দায়িত্ব অর্থাৎ যদি কোন মন্ত্রী নিজ দায়ে কোন কাজ না করেন তবে তাঁহার কাজ একা তাঁহার নয়, তাহা সমগ্র মন্ত্রি-সমিতির বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং পার্ল্যামেন্ট তাঁহার কাজে বাধা দিলে শুধু তাঁহার পদত্যাগ করিলে চলিবে না, সমগ্র মন্ত্রি-সমিতিকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-নেতা ও মন্ত্রিগণ মহাসমিতির নিকট দায়ী নহেন।

এই চারিটি নীতির একটিও যুক্তরাষ্ট্র মানিয়া চলে না। রাষ্ট্রীয় সকল কাজকর্মের জন্ত রাষ্ট্র-নেতা স্বয়ং দায়ী। মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করিয়াছেন বলিলেও তাঁহার দায়মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্ত্রীরা তাঁহার ভৃত্য মাত্র, তাঁহারা তাঁহার কথানুসারে চলিতে বাধ্য। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা মানিতে বাধ্য নহেন। কোন মন্ত্রী যদি তাঁহার কথামত না চলেন, তবে তাঁহার পদত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অন্ত দিকে, রাষ্ট্র-নেতার দায়িত্ব মহসমিতির নিকটে নহে, জনগণের নিকটে। মহাসমিতি জোর করিয়া তাঁহাকে কোন কাজ করাইতে পারেন না। তাঁহাকে শাসন করিবার একমাত্র পথ বিচার (ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট)। মন্ত্রীরা মহাসমিতিতে স্থান পান না ইহা আগেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মহাসমিতির সমক্ষে নিজেদের অথবা রাষ্ট্র-নেতার কার্য্যকলাপের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে মহাসমিতির অনুরোধে তাঁহারা বিভিন্ন সমিতির সমক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইয়া অনেক কথা বলিবার সুযোগ পান। মহাসমিতিও প্রতিকূল ভোট দ্বারা তাঁহাদের স্থানচ্যুত করিতে পারেন না। মহাসমিতি যত না কেন তাঁহাদের উপর বিশ্বাস নাই বলিয়া ভোট পাশ করুন, তাহাতে তাঁহাদের বা রাষ্ট্র-নেতার বিচলিত হইবার কারণ নাই। তাঁহারা পূর্ব্ববৎ নিজ কাজে বাহাল থাকিবেন। কেবল রাষ্ট্র-নেতাই তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। তবে মহাসমিতি তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার ক্ষমতা রাখেন। কোন কাজ করিবার জন্ত হয়ত টাকার দরকার। মহাসমিতি সেই টাকা পাশ না করিতে পারেন। তাহা হইলেই কোন মন্ত্রীর পক্ষে সে কাজে আর টাকা খরচ করা সম্ভব হয় না। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্র-নেতার নিকট নিজ নিজ কাজের জবাবদিহি করিতে বাধ্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের দায়িত্ব যুক্ত-দায়িত্ব নহে। প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁহার নিজ বিভাগের জন্ত রাষ্ট্র-নেতার নিকট দায়ী। মন্ত্রীদের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধ রাষ্ট্র-নেতার সঙ্গে। যখন রাষ্ট্র-নেতা কোন বিভাগ কোন মন্ত্রীকে অর্পণ করিয়া সব কাজকর্ম্ম তাঁহারই হাতে ছাড়িয়া দেন, তখন জনগণ মন্ত্রীর অবলম্বিত নীতি ও কার্য্যাবলীকে রাষ্ট্র-নেতারই নীতি ও কার্য্যাবলী বলিয়া গ্রহণ করে। বিভিন্ন মন্ত্রীকে তাঁহার সঙ্গে জবাবদিহি করিতে হইলেও সমগ্র জাতির নিকট একমাত্র রাষ্ট্র-নেতাই মন্ত্রীদের সকল কাজের জন্ত জবাবদিহি করিয়া থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণের দায়িত্ব যুক্ত-দায়িত্ব।

রাষ্ট্র-সভা

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে মহাসমিতি (কংগ্রেস) নামে অভিহিত করা হয়। মহাসমিতির দুই শাখা: রাষ্ট্র-সভা (সেনেট) ও প্রতিনিধি সভা (হাউস অব,

রিপ্রেজেন্টেটিব্‌স্)। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের প্রথম ধারায় প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ : "এতদ্দ্বারা প্রদত্ত সমুদয় আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতিতে অর্পিত হইতেছে। ঐ মহাসমিতি রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা লইয়া গঠিত হইবে।"

১৯১৩ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। কিন্তু ঐ সময় হইতে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণ ছয় বৎসরের জন্য দুই জন করিয়া সদস্য রাষ্ট্র-সভার জন্য নির্ব্বাচন করিবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্র-সভার জন্য ৯৬ ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে এইরূপ ৯৬ জনকে লইয়া রাষ্ট্র-সভা। প্রত্যেক রাষ্ট্র-সভাসদের একটি মাত্র ভোট আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার যে শাখায় সদস্য-সংখ্যা বেশী সেই শাখার সদস্যদের যাহারা নির্ব্বাচন করে তাহাদের কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে তাহারা নির্ব্বাচনে সমর্থ হয় তাহা নির্দ্দেশ করা থাকে। রাষ্ট্র-সভার সদস্যদের যাহারা নির্ব্বাচন করিবে তাহাদেরও সেই সব গুণ থাকা দরকার। রাষ্ট্র-সভায় কোন এক বা অধিক সদস্যের পদ খালি থাকিলে যে রাষ্ট্রের সদস্য রাষ্ট্র-সভায় নাই সেই রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন। অল্পকালের জন্য ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃপক্ষকে সদস্য নিয়োগের ভার দিতে পারে, ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী জনগণ সদস্য নির্ব্বাচন না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সদস্য রাষ্ট্র-সভায় বসিতে পারেন। [সপ্তদশ সংশোধনী]।

রাষ্ট্র-সভাসদগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

রাষ্ট্র-সভার সদস্য হইতে হইলে কোন ব্যক্তির বয়স অন্তত ৩০ বৎসর পূর্ণ হওয়া দরকার। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি যদি অন্তত ৯ বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক না হইয়া থাকেন অথবা যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন নির্ব্বাচনকালে তাহার অধিবাসী না হন তবে তাঁহার রাষ্ট্র-সভাসদ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় রাষ্ট্র-সভাসদের পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে বাধা নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাষ্ট্র-সভাসদগণ ছয় বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। কিন্তু প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্যের মিয়াদ্ ফুরাইয়া যায়। এইরূপে ছয় বৎসরে সমগ্র সভার লোকেরা নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হন অথবা নূতন লোকেরা নির্ব্বাচিত হন, আর যে কোন সময়ে পুরাতন সভ্যের সংখ্যা নূতন সভ্যের সংখ্যার দ্বিগুণ থাকে।

রাষ্ট্র-সভাসদ্ হইবার গুণাবলী।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে রাষ্ট্র-সভার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্ভব যে প্রকারে হইয়াছিল তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

(১) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র যে এক অখণ্ড যৌথ-রাষ্ট্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সহজে হয় নাই। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও স্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে প্রত্যেককে সমান অধিকার প্রদান করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র বড়ই হোক্ বা ছোটই হোক্, তাহাতে কিছু যায় আসে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র আকার-নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র-সভায় দুই জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ। এখানে আইনের চোখে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য নিউ ইয়র্কের মত অত বড় দেশ ও ডেলাওয়ারের মত অত ছোট দেশ,

উভয়েই দুই জন করিয়া প্রতিনিধি রাষ্ট্র-সভায় পাঠাইলেও তাহা লইয়া কোন কথা উঠে না। বলা বাহুল্য, এই নীতি একদিনে স্বীকৃত হয় নাই। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি অনেক দিন অবধি এই ব্যবস্থায় (সপ্তদশ সংশোধনীর আগেও প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে দুই জন প্রতিনিধি আসিত) প্রতি-কূলাচরণ করিয়াছিল। ছোট রাষ্ট্রগুলির বরাবর ভয় ছিল যে, বড় রাষ্ট্রগুলির মত দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইতে না পারিলে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই জন্য বড় রাষ্ট্রগুলি কোন প্রবোধ দিয়াই ছোট রাষ্ট্রগুলিকে শান্ত করিতে পারে নাই। একণে যে কাঠামো-আইনে শুধু এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নয় ; অধিকন্তু, কোন রাষ্ট্রকেই একণে সেই রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্র-সভায় দুই জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার হইতে চ্যুত করা যায় না [পঞ্চম ধারার শেষ অংশ]।

রাষ্ট্র-সভায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা সমান বলিয়া স্বীকৃত।

এই নীতি অনুসরণ করার কতকগুলি ফল প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, প্রতিনিধি-সভা যে ভাবে গঠিত হয় তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে রাষ্ট্র-সভা গঠন করিবার উপায় বাহির হইয়াছে। যে সকল সভ্যদেশে ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখা বর্ত্তমান আছে, সেই সকল দেশে দুই স্পষ্টরূপে বিভিন্ন অথচ কার্য্যকরী নীতি অনুসরণ করিয়া দুই শাখার গঠন-কার্য্য প্রায়শ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি শাখা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হওয়ায় এরূপ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায় যে, দ্বিতীয় শাখাটির অস্তিত্ব প্রায় অনুভূতই হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। তথাপি, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজের পক্ষে কম শক্তিশালী নহে। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভার ন্যায় প্রতাপশালী ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ইহার একটা কারণ এই যে, রাষ্ট্র-সভার গঠনে একটা স্পষ্ট, ভিন্ন অথচ জরুরী নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে,—প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, অন্য বহু সভ্য দেশে ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখাটি কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহা এক বিশেষ সমস্যার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা ইংল্যাণ্ড, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশের মত বংশপরম্পরায় ওমরাহদের লইয়া গঠিত নহে। ইহার সভ্যগণ মনোনীত হয় না। জনসাধারণ সাক্ষাৎভাবে প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আগে পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচনের প্রথা ছিল, জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা ইঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইত, একণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং একণে ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখাতেই প্রতি-নিধিগণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্র-সভায় প্রেরিত প্রতিনিধি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি আর প্রতিনিধি-সভায় প্রেরিত প্রতিনিধি জনগণের প্রতিনিধি। সেই জন্য প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্র লোক-সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে,—ডেলাওয়ার কখনো নিউইয়র্কের সমান প্রতিনিধি পাঠাইবার কল্পনাও করিতে পারে না,—কিন্তু রাষ্ট্র-সভায় উভয়ে তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন ও উভয়ে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী। ফলে রাষ্ট্র-সভাকে স্বাভাবিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো সম্ভব হইয়াছে ও তাহাতে ইহা বিশেষ শক্তিশালী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

(২) এমন একটি পরামর্শ সভার প্রয়োজন ছিল যাহা আকারে ছোট হইবে অথচ যাহার

সভ্যগণ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হইবেন। ইঁহাদের কাজ হইবে কর্মচারি-নিয়োগ ও সন্ধি-বিগ্রহাদির কালে রাষ্ট্র-নেতার উপর খর-দৃষ্টি রাখা।

(৩) প্রতিনিধি-সভা জনসাধারণের সভা। উহার পক্ষে সাময়িক আন্দোলনে উত্তেজিত হওয়া বা হঠাৎ যাহা খুসী আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোকের এইরূপ আকস্মিক মতপরিবর্ত্তনকে নিরোধ করিতে পারে এমন একটি সভার দরকার ছিল।

(৪) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের নিকট যথোচিত মর্য্যাদা পাইতে হইলে জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দেশ-বিদেশে অনুসৃত নীতির পারম্পর্য্য রক্ষা করা দরকার। সেজন্য এমন একদল লোক প্রয়োজন যাঁহারা বেশী দিন ধরিয়া অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং প্রতিনিধিরূপে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ভোগ করেন।

(৫) দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসকগণ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারেন। কাঠামো-আইনে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিচারার্থ প্রেরিত লোকদের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন বিচারালয় প্রয়োজন।

উপরে লিখিত প্রত্যেকটি কাজ রাষ্ট্র-সভাকে সম্পাদন করিতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রথমে ১৩টি মাত্র রাষ্ট্র লইয়া যৌথ-রাষ্ট্রের পত্তন। সুতরাং তখন রাষ্ট্র-সভার মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬। তারপর ক্রমাগত অনেকগুলি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীনে আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে রাষ্ট্র-সভাসদের সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী হইলেও (৯৬),অধিকাংশ সভ্য-দেশের ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখা ইহার চেয়ে ঢের বেশী সভ্য লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। ইংরেজদের ওমরাও-সভায় ৭০০এর উপর, ইতালির সভায় ৪০০র নীচে, ফরাসী রাষ্ট্র-সভায় ৩১৪, ক্যানাডায় ৯৬, জার্ম্মাণিতে ৬৬, অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৫, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪০ জন আছেন। কোন কোন দেশে সভ্য-সংখ্যা কম হইলেও, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লোকবলের দিক্ হইতে যুক্তরাষ্ট্র ইহাদের ঢের উর্দ্ধে। সুতরাং লোক-সংখ্যা ধরিয়া বিচার করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তুলনায় এত কম লোক লইয়া আর কোন সভ্য দেশের ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখা গঠিত হয় নাই। অধিকন্তু, বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইতে পারে এমন ভূখণ্ডও আর অবশিষ্ট নাই। অবশ্য বর্ত্তমানে যে সকল রাষ্ট্র আছে, তাহাদের এক বা অনেকগুলিকে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করিলে রাষ্ট্র-সভাসদের সংখ্যা বাড়িতে পারে। কিন্তু সে কাজ বড় সহজ নহে। যে রাষ্ট্রকে বিভক্ত করা হইবে তাহার ব্যবস্থাপক সভার ও মহাসমিতির এবিষয়ে মত থাকা দরকার [চতুর্থ ধারার তৃতীয় পল্লবের প্রথম উপ-পল্লব]। রাষ্ট্রের বা মহাসমিতির সম্মতি যে পাওয়া যাইবে না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভার বর্ত্তমান আকারকে স্থায়ী আকার বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইহার বিচার করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-সভার ক্ষুদ্রায়তন।

উপরে (২), (৩), (৪) ও (৫) রূপে রাষ্ট্র-সভার যে সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেগুলি আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার এই তিন বিভাগে পড়ে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা শুধু ব্যবস্থাপক সভা নহে, ইহা রাষ্ট্র-নেতার সহিত শাসনকার্য্যও চালাইয়া থাকে এবং সময় বিশেষে বিচারালয়রূপে পরিণত হয়।

আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা তুল্যমূল্য। সেই একটি মাত্র ক্ষেত্র হইতেছে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত বিল। এই প্রকার বিল একমাত্র প্রতিনিধি-সভায় আনীত হইতে পারে। প্রথম ধারার সপ্তম পল্লবের প্রথম উপপল্লবটি এই: "রাজস্ব সংগ্রহার্থ সমুদয় বিলের উদ্ভব প্রতিনিধি-সভা হইতেই হইবে, কিন্তু রাষ্ট্র-সভা অন্যান্য বিলের বেলা যেমন এই বিলের বেলাও তেমনি সংশোধনীর প্রস্তাব করিতে অথবা সংশোধনীর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে।" জনসাধারণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিগণই কর-ভার চাপাইবার ক্ষমতা রাখেন, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনেও স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্র-সভাকে কর-সম্পর্কিত বিল আনয়ন করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে রাষ্ট্র-সভা যে ক্ষমতা ভোগ করে তাহা অন্য দেশে বিরল। রাষ্ট্র-সভা টাকাকড়ি-বিষয়ক বিল উপস্থাপিত করিতে পারে না বটে, কিন্তু উহার পক্ষে সে বিল সংশোধন করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্র-সভা এই ক্ষমতার প্রয়োগ বহুল পরিমাণে করিয়া থাকে। কর লইয়া দুই সভার মধ্যে প্রত্যেক বার নানাপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ হইয়া থাকে। অন্যান্য বিলের সঙ্গে টাকাকড়ি-বিষয়ক বিলের এইটুকু মাত্র পার্থক্য যে, অন্যান্য বিল ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখাতেই সমভাবে আনীত হইতে পারে। অন্য দিকে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ও অন্য সকল প্রকার বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সভার সংশোধন প্রস্তাব আনিবার তুল্যরূপ ক্ষমতা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে দুই সভার মধ্যে অনৈক্য হইলে সমিতি গঠন করিয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করা হয়। এই সমিতিতে উভয় সভা হইতে রাষ্ট্র-সভার সভাপতি ও প্রতিনিধি-সভার সভাপতি (স্পীকার) কর্তৃক সভ্যগণ মনোনীত হন। সাধারণত এই সমিতির বিবরণী উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। উভয় সভা যে পর্য্যন্ত ঠিক এক আকারে কোন বিল পাশ না করে সে পর্য্যন্ত উহা রাষ্ট্র-নেতার নিকট প্রেরিত হইতে পারে না। (ম্যারিয়ট্)।

রাষ্ট্র-সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা।

এমন হইতে পারে যে, ব্যবস্থাপক সভার এক শাখায় কোন বিল পাশ হইলেও, অপর শাখাটি সেই সময়কার বৈঠকে (সেশন) উহা আলোচনা করিতে অস্বীকার করে। এই বিল যে পর্য্যন্ত আসিয়া থামে, সেইখান হইতে পরবর্ত্তী বৈঠকে ঐ শাখায় আলোচিত হয়, কিন্তু বিলটি ব্যবস্থাপক সভার যে দুই শাখার বৈঠকে পাশ হইবে তাহা তৎকালীন মহাসমিতির পুনর্নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে হওয়া আবশ্যক। ইতিমধ্যে নূতন মহাসমিতি নির্ব্বাচিত হইলে, বিলটিকে আবার প্রথম হইতে বিবেচনা করিবার জন্য উপস্থিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-নেতার কর্ম্মচারী নিয়োগ ও সন্ধি-বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আলোচনা কালে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাঁহাকে রাষ্ট্র-সভার সম্মতি ও পরামর্শ লইতে হয়। পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা বিষয়ে রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর নহে। রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্রসমূহের সহিত নানাপ্রকার চুক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্র-সভা ইচ্ছা করিলে এই প্রকার এক বা বহু চুক্তি অনুমোদন না করিতে পারে। সৈন্য, নৌচালনা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে শাসন-সম্পর্কিত কাজ। সুতরাং রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-সভার মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া যদি এই সব কাজে লিপ্ত হন, তবে, রাষ্ট্র-সভা সেই সময়ে তাঁহাকে বাধা দিতে না পারিলেও রাষ্ট্র-নেতাকে শেষ পর্য্যন্ত রোধ করিবার উপায় রাষ্ট্র-সভার হাতে আছে। কারণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ

শাসন সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতা।

এই যে, রাষ্ট্র-সভার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি পাইলেই তাঁহার সন্ধি-বিগ্রহাদি সফল হইবার সম্ভাবনা। সাধারণত, রাষ্ট্র-সভা যদি রাষ্ট্র-নেতার প্রতিকূল না হয়, তবে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বাহ্নে রাষ্ট্র-সভার মতামত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল। এ সম্বন্ধে একটি আপত্তি এই যে, রাষ্ট্র-নেতাকে এমন অনেক শাসন ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হইতে হয় যাহা প্রকাশ্যে আলোচিত হইবার যোগ্য নহে অথবা প্রকাশ্যে আলোচিত হইলে দেশের অনিষ্ট হইতে পারে। অন্য দিকে, গোপনে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, শাসক নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে শাসন করিবার উপায় থাকে না অথবা শাসন করিবার সময় যখন পাওয়া যায় তখন তাঁহার দ্বারা অনিষ্টকর কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক দিকে যেমন পররাষ্ট্রব্যাপারে ক্ষিপ্রকারিতা ও গোপনতা বিশেষ দরকার, অন্য দিকে শাসন কর্তৃপক্ষের কাজের যথোচিত বিচার হওয়াও দরকার। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়াই নানাপ্রকার সমস্যার উদয় হয়। রাষ্ট্র-সভার গোপন বৈঠক বসাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়া রাষ্ট্র-সভা রাষ্ট্র-নেতার পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সকল চিঠিপত্র তলব করিতে পারেন। আর সন্ধি ইত্যাদির কথা খোলা বৈঠকে আলোচিত হইলেও বিশেষ জরুরী ব্যাপারসমূহ রাষ্ট্র-সভার পররাষ্ট্র-সমিতিতে গোপনে আলোচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার ব্যবস্থায় পররাষ্ট্রনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত থাকায় তাহার পক্ষে সাধারণত কোন জটিলতার উদ্ভব হয় নাই।

পররাষ্ট্রনীতি লইয়া ইংল্যণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে নূতন করিয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃশ্য বিরল নহে। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র-সভার আয়ু কখনো শেষ হয় না, প্রতিনিধি-সভাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। তথাপি এখানেও অন্য দিক্ দিয়া পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্র-নেতার সহিত রাষ্ট্র-সভাকেও যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরূপে কতকটা স্বীকার করিয়া রাষ্ট্র-নেতার যথেচ্ছাচারিতার পথ বন্ধ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অযথা বিব্রত করিবার বা তাঁহার কাজে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করার সহায়তাও হইয়াছে। বস্তুত পররাষ্ট্র ব্যাপার তাড়াতাড়ি সমাধা করা রাষ্ট্র-নেতার কার্য্য, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, সমস্ত মনোযোগ পররাষ্ট্রের দিকে রাখিলে স্বদেশের উন্নতি ব্যাহত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-সভা,—সমগ্র রাষ্ট্র-সভা নহে, রাষ্ট্র-সভার অধিকাংশও নহে,—কোন বৈঠকে উপস্থিত লোকদের উনজন অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের একজন বেশী হইলেও রাষ্ট্র-নেতার সকল কাজ পণ্ড করিয়া দিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-সভার এইরূপ বাধা দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাষ্ট্র-নেতা উইলসনের অনেক পোষিত স্বপ্নই রাষ্ট্র-সভার বিরোধিতায় সফল হইতে পারে নাই। সেইজন্য জাতিসঙ্ঘ (লীগ অব্ নেশনস্) স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী হইয়াও যুক্তরাষ্ট্র উহার সভ্য নহে। এইরূপ ব্যবস্থার একটা ফল এই হয় যে, রাষ্ট্র-নেতা যদি যথেষ্ট সবল প্রকৃতির না হন, তবে তাঁহাকে রাষ্ট্র-সভার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি পাইবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক বিধি পাশ করিয়া লইতে দিতে তিনি বাধা দিতে সক্ষম হন না।

রাষ্ট্র-নেতা বনাম রাষ্ট্র-সভা।

কর্মচারী নিয়োগে রাষ্ট্র-সভার হস্তক্ষেপ,

কর্মচারী নিয়োগে রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতার কথা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। তাহাতে রাষ্ট্র-সভার ক্ষমতাও প্রসঙ্গত আলোচিত হইয়াছিল। অপ্রধান কর্ম্মচারী সম্পর্কে রাষ্ট্র-সভা কোন প্রকার বাধা দেয় না। রাষ্ট্র-নেতা একা, অথবা বিচারালয়সমূহ অথবা বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ মহাসমিতির অনুমতি লইয়া এই সব কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারেন, আর বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষা-প্রথা দ্বারা এরূপ অনেক কর্ম্মচারী বাছাই করা হয়, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। অধস্তন কর্ম্মচারী নিয়োগে রাষ্ট্র-নেতা বা রাষ্ট্র-সভা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারেন, কিন্তু আইন দ্বারা যে বিভাগ বা সমিতির উপর এই সব কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার দেওয়া হয় সেগুলি রাষ্ট্র-নেতার পরিবর্ত্তে কাজ করে মাত্র। অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক প্রভাব হইতে দূরে লইয়া যাওয়া এই প্রকার আইনের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্র-নেতা ইহাদের নিয়োগ করিবার ক্ষমতা হইতে চ্যুত হন না অথবা রাষ্ট্র-সভার তত্ত্বাবধান ও মঞ্জুরির ক্ষমতা চলিয়া যায় না। রাষ্ট্র-নেতা ও রাষ্ট্র-সভা ইচ্ছা করিলেই নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে সংশোধনী ব্যতীত তাঁহাদিগকে এই ক্ষমতা হইতে চ্যুত করা সম্ভবপর নহে।

মন্ত্রিগণ রাষ্ট্র-নেতার চাকুরী করেন বলিয়া সাধারণত রাষ্ট্র-সভা রাষ্ট্র-নেতার মন্ত্রি-মনোনয়নে বাধা দেয় না। রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচিত মন্ত্রি-সমিতিকে মঞ্জুর করা রাষ্ট্র-সভার দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্র-দূত, বাণিজ্যদূত, বিচারপতি, বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাব্যক্তি ও প্রধান প্রধান স্থল ও জল সৈনিক কর্ম্মচারী নিয়োগের বেলায় রাষ্ট্র-সভা কিছু না কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই সকল উচ্চ ও পূর্ব্বোক্ত অধস্তন কর্ম্মচারীর মাঝামাঝি অনেক যৌথ কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহাদের নিয়োগসম্পর্কে "রাষ্ট্র-সভার সৌজন্যে"র কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র-সভার বা রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা পরিত্যক্ত হয় নাই।

এখন প্রশ্ন এই: কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্র-সভাকে রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতার অংশীদার করাতে ফল ভাল বা মন্দ হইয়াছে? এবিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্র-সভাকে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী করায় দল ও বিভিন্ন স্বার্থের প্ররোচনায় অনেক স্থলে অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। রাষ্ট্র-নেতার মতন এরূপ ক্ষমতাশালী একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে তাঁহার ইচ্ছামত শুধু তাঁহার স্বার্থপুষ্টিকারী লোকদের নির্ব্বাচন করিবার ভার না দেওয়ায় একদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রক্ষা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর দিকে রাষ্ট্র-সভার পক্ষে এবিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা অধিক হইয়াছে। এক সময়ে রাষ্ট্র-নেতার কাজের উপর এরূপ চোখ রাখিবার ও তাঁহাকে শাসন করিবার আবশ্যকতা হয়ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর নাই। রাষ্ট্র-নেতা যে কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করিয়া চলিবেন ও জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করিবেন, এরূপ আশঙ্কা নাই। তাঁহার কর্ম্মচারি-নিয়োগ-ক্ষমতা ও পররাষ্ট্রনীতি পদে পদে রাষ্ট্র-সভা দ্বারা বাধা পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে সুষ্ঠু-ভাবে কার্য্য সম্পাদন করা সহজ হইত। তিনি রাষ্ট্র-সভার মতামতের দিকে না চাহিয়া

উপযুক্ত লোকদের নির্বাচন করিতে পারিতেন। অন্যেরা বলেন, রাষ্ট্র-নেতা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের প্রতিনিধি, তাঁহার কার্য্যকাল মহাসমিতির উপর নির্ভর করে না, ইহার উপর তাঁহার কার্য্যাবলী অন্তত আলোচিত হইবারও যদি কোন উপায় না থাকিত, তবে তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ করা সহজ হইত না। বস্তুত রাষ্ট্র-সভায় পররাষ্ট্রনীতি ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ প্রকাশ্যভাবে আলোচিত হওয়ায় রাষ্ট্র-নেতাকে লোকমত দ্বারা শাসন করা সম্ভবপর হয়।

মোটামুটি, পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এই কথা রাষ্ট্র-সভায় স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র-নেতা একা এমন সকল কাজে লিপ্ত হইতে পারেন যাহার ফল জাতির পক্ষে গুরুতর হইতে পারে। সন্ধি-বিগ্রহাদিতে রাষ্ট্র-সভার সহিত একযোগে দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁহার নিজের পক্ষেও সুবিধাজনক। রাষ্ট্র-সভার সম্মতি পাইলে তিনি যেমন জোরের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে জাহির করিতে পারেন, একাকী সেরূপ পারেন না। সত্য বটে, যে সময়ে রাষ্ট্র-সভা অল্প কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল, সে সময়ে রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ লওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, আর তাহা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইত; বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-সভার আকার বহু গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় যখন তাড়াতাড়ি কোন নীতি অবলম্বন করা দরকার তখন রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ লওয়া অসুবিধাজনক হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-সভা বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত থাকায় এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। টাকাকড়ি-সংক্রান্ত, পররাষ্ট্র-নীতিসম্বন্ধীয়, রেলসম্পর্কিত ইত্যাদি নানাপ্রকার সমিতি মোতায়েন রহিয়াছে। এই সকল সমিতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা রাষ্ট্র-নেতার পক্ষে কঠিন নহে। বিশেষ করিয়া এই সব সমিতির সভাপতির মারফৎ রাষ্ট্র-সভা রাষ্ট্র-নেতার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে ও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ও তাহার ফলাফল।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের দ্বিতীয় ধারা চতুর্থ পল্লবে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা, সহকারী রাষ্ট্র-নেতা ও সমস্ত অসামরিক কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের জন্য অত্যভিযুক্ত হইবার পর (ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট) চাকুরী হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন: রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ঘুষ লওয়া, অন্য গুরুতর অপরাধ। অবশ্য তাঁহাদের দোষ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। আর প্রথম ধারার তৃতীয় পল্লবের ষষ্ঠ ও সপ্তম উপপল্লব যথাক্রমে নিম্নরূপ: "একমাত্র রাষ্ট্র-সভার সকল প্রকার অভিযোগ (ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট) বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। রাষ্ট্র-সভা যখন ঐ উদ্দেশ্যে বসিবে, তখন সভ্যেরা শপথ বা সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা বিচারিত হইবেন, তখন প্রধান বিচারপতি নেতৃত্ব করিবেন: আর কোন ব্যক্তিই উপস্থিত সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি ব্যতীত শাস্তি পাইবেন না।" "অত্যভিযোগের বিচারে চাকুরী হইতে অপসারণ ও যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কোন সম্মান, বিশ্বাস বা লাভজনক চাকুরী করিতে অসামর্থ্য ছাড়া অন্য প্রকার শাস্তি হইবে না; কিন্তু এইরূপে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেরা আইনানুসারে বিচার, শাস্তি ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।" রাষ্ট্র-সভার বিচার-ক্ষমতা।

ইতিপূর্ব্বে রাষ্ট্র-সভার আইন-প্রণয়ন ও শাসন-ক্ষমতা আলোচনা করিয়াছি। উপরি উক্ত আইনে রাষ্ট্র-সভার বিচার-ক্ষমতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অত্যভিযোগের (ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট)

রাষ্ট্র-সভা অত্যভি-যোগের বিচার করে।

বিচার রাষ্ট্র-সভা করে। এ প্রকারে রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতা ও সমস্ত অসামরিক কর্ম্মচারীর বিচার হইতে পারে। সমস্ত অসামরিক কর্ম্মচারী বলিতে মন্ত্রি-সমিতির সভ্যগণ, রাষ্ট্রদূতগণ, যৌথ বিচারালয়সমূহের বিচারকগণ, এমন কি পোষ্টমাষ্টারদের পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা মহাসমিতির সভ্যগণকে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে বুঝায় না। রাষ্ট্র-সভার ও প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ আইন-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী নহেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ সম্ভবপর নহে। বিশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি লইয়া কোন সভ্যকে তাড়াইয়া দিতে পারেন। [প্রথম ধারার পঞ্চম পল্লবের দ্বিতীয় উপপল্লব দ্রষ্টব্য।] কি কি কারণে রাষ্ট্র-সভা রাষ্ট্র-নেতা,সহকারী রাষ্ট্র-নেতা ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বিচার করিতে ও শাস্তি দিতে পারে, তাহা আইনে নির্দ্দেশ করা আছে। ষড়যন্ত্র ও ঘুষ সহজে বোধগম্য। কিন্তু গুরুতর (ক্রাইম্) ও লঘু অপরাধ (মিস্‌ডিমিনার) বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা নির্দ্দেশ করা এখানে সহজ নহে।

মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, গুরুতর দুঃস্বভাব (মিস্‌কণ্ডাক্ট) ও চাকুরীসংক্রান্ত দুষ্কর্ম্মের (ম্যালফিস্যান্স) জন্য অত্যভিযোগ হইতে পারে। কর্ম্মচারী কার্য্যদক্ষতা না দেখাইলে, বিচারে ভুল করিলে অথবা বুদ্ধিবিবেচনা সম্যক্‌রূপে না খাটাইলে অত্যভি-যোগের কারণ ঘটে না। অত্যভিযোগের শাস্তি জরিমানা বা জেল নহে, চাকুরী হইতে অপসারণ ও ভবিষ্যতে ঐ চাকুরী আর না পাওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য কোন কর্ম্মচারী যদি এমন অপরাধ করেন যে, তাঁহার জেল বা জরিমানা হইতে পারে, তবে অত্যভিযোগ হইলেও তিনি সাধারণ বিচারালয়ের হাতে জেল বা জরিমানা হইতে মুক্তি লাভ করেন না।

অত্যভিযোগ করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রতিনিধি-সভার আছে। কিন্তু সেই অত্যভিযোগ বিচারের জন্য রাষ্ট্র-সভার নিকট আসে। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিচারকেরা যে ভাবে শপথ গ্রহণ করেন, রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণও সেভাবে শপথ নেন। কোন রাষ্ট্র-সভাসদের যদি শপথ লওয়া সম্বন্ধে আপত্তি থাকে তবে তিনি সত্য-প্রতিজ্ঞা (এফার্ম্মেশন) করেন। অত্যভি-যোগের বিচার জুরীর বিচারের মত। সাক্ষীদের জবানবন্দী লওয়া হয় এবং আসামী কাউন্সেল খাড়া করিয়া নিজের সাফাইয়ের চেষ্টা করেন। সাক্ষ্য শেষ হইলে বিভিন্ন পক্ষীয় কাউন্সেলগণ রাষ্ট্র-সভাকে সম্বোধন করিয়া নিজেদের বক্তব্য বলেন। তারপর রাষ্ট্র-সভা শাসন-বৈঠক বসাইয়া নিজের রায় দেয়। দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য উপস্থিত সভ্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের এক প্রকার রায় দেওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্র-নেতার অত্যভিযোগ ছাড়া অন্য সমস্ত অত্যভিযোগে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা নেতৃত্ব করেন। কিন্তু রাষ্ট্র-নেতার বেলায়, উচ্চতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নেতৃত্ব করেন, সে সময়ে সহকারী রাষ্ট্র-নেতাকে নেতৃত্ব করিতে না দিবার একটা কারণ এই যে, রাষ্ট্র-নেতার শাস্তি হইলে তাঁহারই রাষ্ট্র-নেতা হইবার কথা। এ পর্য্যন্ত মোট ৯ জনের অত্যভিযোগের বিচার হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ জন যৌথ বিচারক,—তিনজন মুক্তি পান, তিনজনকে শাস্তি দেওয়া হয়, একজনকে মাত্‌লামির জন্য, একজনকে ১৮৬১ সনে সঙ্ঘবিরোধীদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য ও একজনকে ঘুষ লওয়ার জন্য। একজন রাষ্ট্র-সভাসদ কর্ম্মচারী নহেন বলিয়া মুক্তি পান। একজন সমর-সচিব অত্যভিযোগের উপক্রম

হইতেই পদত্যাগ করিয়া নিজেকে রক্ষা করেন। রাষ্ট্র-নেতা অ্যাণ্ড্রু জনসনের বিরুদ্ধে বহু দোষের আরোপ হইলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের অভাবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন নাই।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের নির্দেশ মতে মহাসমিতিকে বৎসরে অন্তত একবার অধিবেশন করিতে হয়। আর মহাসমিতি আইন করিয়া অন্য কোন দিন সময় নির্দিষ্ট করিয়া না দিলে ডিসেম্বরের প্রথম সোমবারে এই অধিবেশন হইবার কথা। পাছে কোন অধিবেশনের পর অনেক সময় অতীত হইয়া যায় ও কাঠামো-আইন ব্যর্থ করা হয়, সেজন্য একেবারে অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাসমিতি আপনাআপনি বৈঠক বসায়, রাষ্ট্র-নেতা সভা আহ্বান করেন না। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সোমবারে বৈঠক করিয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রত্যেক মহাসমিতির একটি দীর্ঘ ও একটি হ্রস্ব বৈঠক বসে। দুইটি বৈঠক দুই বৎসরে শেষ হইবার কথা। *রাষ্ট্র-সভার বৈঠকের সময়।*

রাষ্ট্র-সভা (ও প্রতিনিধি-সভা) যদি কোন ব্যক্তির নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে রায় দেয় বা তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে, তবে রাষ্ট্র-সভার (ও প্রতিনিধি-সভার) নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। কোন বিচারালয় তাহা রদ্ করিতে পারে না। রাষ্ট্র-সভার ও প্রতিনিধি সভার সমগ্র সভ্য-সংখ্যার অতিজন উপস্থিত থাকিলে কোরাম্ হয়। এইরূপ অধিকসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি আর কোন দেশের ব্যবস্থাপক সভার বেলা দরকার হয় না। বিলাতের জন-সভায় সভ্য-সংখ্যা ছয় শতের উপর হইলেও ৪০ জন উপস্থিত থাকিলেই কাজ চালান যায়। ওমরাও-সভায় সভ্যের সংখ্যা প্রায় ৭০০। কিন্তু ৩ জন উপস্থিত থাকিলেই কোরাম্ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কোরাম্ না হইলেও রাষ্ট্র-সভার (ও প্রতিনিধি-সভার) কাজ চলিতে পারে। কারণ কেহ সভ্য-সংখ্যা গণনার দাবী না করিলে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয় না। [প্রথম ধারার পঞ্চম পল্লবের প্রথম উপপল্লব।] *রাষ্ট্র-সভার কোরাম্।*

রাষ্ট্র-সভা (ও প্রতিনিধি-সভা) উহার কার্য্যপ্রণালী-সম্পর্কিত নিয়মাবলী স্থির করিতে পারে। বিশৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য কোন সভ্যকে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের মত লইয়া বিতাড়িত করিবার ক্ষমতার কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। সভ্যগণ সভার বাহিরে কৃত কোন কাজের জন্যও বিতাড়িত হইতে পারেন। যাঁহারা সভ্য নহেন, এরূপ ব্যক্তিকেও রাষ্ট্র-সভা অবজ্ঞার অজুহাতে শাস্তি দিতে পারে। কাঠামো-আইনের বলে রাষ্ট্র-সভাকে (বা প্রতিনিধি-সভাকে) কোন অনুসন্ধানের জন্য বাহিরের সাক্ষী ডাকিবার বা কেহ সমিতির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের জবাব না দিলে তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার স্পষ্টত না দিলেও রাষ্ট্র-সভা (ও প্রতিনিধি-সভা) আইন-প্রণয়নকারী সভা হিসাবে ঐ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই শাস্তি সরাসরি দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্র-সভার (ও প্রতিনিধি-সভার) নাই। কোন আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র-সভা (ও প্রতিনিধি-সভা) সেই আইনের ঔচিত্য-অনৌচিত্য ও উহা কিরূপে গৃহীত হওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করিবার জন্য অনুসন্ধান চালায়। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাহিরের সাক্ষী ডাকা হইতে পারে, সাক্ষিগণ শপথ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মতামত দেন। কোন সাক্ষী প্রশ্নের জবাব না *সভ্যকে বিতাড়িত করিবার ক্ষমতা।*

দিয়ে, রাষ্ট্র-সভার সভাপতি (অথবা প্রতিনিধি-সভার স্পীকার) কলম্বিয়া জিলার জিলা এটর্ণির কাছে সে কথা জ্ঞাপন করিলে সে ব্যক্তির অপরাধের বিচার জুরী দ্বারা হইবে।

রাষ্ট্র-সভা (ও প্রতিনিধি-সভা) প্রতিদিনকার কার্য্যাবলীর বিবরণী রাখিয়া থাকে। রাষ্ট্র-সভা যদি মনে করে যে, কোন বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বন করা আবশ্যক তবে সেই বিষয় তথনকার মত বাহিরে প্রকাশ করা হয় না। ইহা ছাড়া 'কংগ্রেসনাল রেকর্ড' (মহাসমিতি সঙ্কলিত বিবরণী) নামক পত্রিকায় রাষ্ট্র-সভার প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা বলেন তার প্রত্যেক কথা টুকিয়া লইয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা আছে।

মহাসমিতির অধিবেশন কালে ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখা এক সময়ে কাজ করে, আইন-প্রণেতাদের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। দুই শাখা একই স্থলে কাজ করে ইহাও তাঁহারা চাহিয়াছিলেন। সে কথা কাঠামো-আইনে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন। আর অন্ত শাখার সম্মতি না লইয়া কোন শাখা ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন স্থলে অধিবেশন বসাইতে পারে না; কোন শাখা তিন দিনের বেশী বৈঠকও মুলতুবী রাখিতে পারে না। [প্রথম ধারার পঞ্চম পল্লবের চতুর্থ উপপল্লব।]

রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণ বৃত্তি পান।

কাঠামো-আইনে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সদস্তদিগকে তাঁহাদের কাজের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার হইতে টাকা দিবার কথা লিখিত আছে। তদনুসারে এক্ষণে রাষ্ট্র-সভার সভ্যেরা প্রত্যেকে বৎসরে ১০ হাজার ডলার বা প্রায় ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া যানবাহন ইত্যাদি বাবদ্‌ও টাকা পান। [প্রথম ধারার ষষ্ঠ পল্লব।]

যৌথ রাষ্ট্ররূপে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তনের পর ১৪৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র-সভার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে রাষ্ট্র-সভা সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইহা ব্যবস্থাপক সভার একটি শক্তিশালী শাখারূপে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সকল দেশে ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখা বর্ত্তমান, তাহার অনেকগুলিতে দ্বিতীয় শাখাটি নামমাত্র ব্যবস্থাপক সভা মাত্র, তাহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নাই। সেজন্ত উহাকে পরিবর্ত্তিত অথবা রহিত করিবার নানা কথা উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা অন্তান্ত দেশের ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখার মত নহে। সেজন্ত রাষ্ট্র-সভা সম্বন্ধে উক্তরূপ কথা উঠে না। বর্ত্তমানে রাষ্ট্র-সভা টাকাকড়ি-সম্পর্কিত কোন আইনের বিল আনিতে পারে না, যদিও প্রতিনিধি-সভা দ্বারা আনীত এইরূপ বিল পরিবর্ত্তন বা না মঞ্জুর করিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্ত সকল প্রকার আইন প্রণয়নে রাষ্ট্র-সভা প্রতিনিধি-সভার তুল্য ক্ষমতাপন্ন। অবশ্য এ ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু শাসন-পরিচালনা বিষয়ে পৃথিবীতে আর এমন শক্তিশালী একটিও ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখা নাই। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা অদ্বিতীয়।

রাষ্ট্র-সভার শ্রেষ্ঠতা।

যুক্তরাষ্ট্র-সভার কার্য্যাবলি আলোচনা করিলে মোটামুটি বলা চলে যে, যে উদ্দেশ্তে ইহা গঠিত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্ত সফল হইয়াছে। প্রতিনিধি-সভার গণতান্ত্রিক আতিশয্য ও রাষ্ট্র-নেতার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যাহত হইয়াছে। রাষ্ট্র-সভার অনুমোদন না থাকিলে প্রতিনিধি-সভা কোন কাজই সম্পন্ন করিতে পারে না, আর রাষ্ট্র-সভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা

রাষ্ট্র-নেতার যে কোন কাজ পণ্ড করিয়া দিতে পারে। প্রতিনিধি-সভার সহায়তায় রাষ্ট্র-সভা যে আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহার সংখ্যা অধিক হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্র-সভার কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রাষ্ট্র-সভা যশ অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামেন তাঁহাদের অগ্রগণ্যগণ রাষ্ট্র-সভায় প্রবেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় ও অন্যান্য প্রকারে ইঁহারা প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের চেয়ে অধিকতর কার্য্যদক্ষতা দেখান।

রাষ্ট্র-সভার সাফল্য-লাভের কারণ।

রাষ্ট্র-সভার এইরূপ সাফল্যলাভের কতকগুলি কারণ সংক্ষেপে নীচে বিবৃত করা যাইতেছে: (১) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহ বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকা বশত সেগুলি বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন। সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা রাষ্ট্র-সভায় উপস্থিত হন তাঁহারা মান্যগণ্য ব্যক্তি। কোন কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লক্ষ লক্ষ লোকের হইয়া কথা বলেন। সুতরাং বংশানুক্রমিক কোন ওমরাওর যে তাঁহার মত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা জন্মিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। (২) রাষ্ট্র-সভার আকার বৃহৎ নহে। ইহার আকার ছোট বলিয়া সভ্যদের পরস্পরকে জানা ও তাড়াতাড়ি কার্য্যব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। শুধু যে বিভিন্ন সমিতির কাজই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় তাহা নহে, সমগ্র সভার কাজেও সদস্যগণ মনোযোগ দিবার জন্য আকর্ষণ অনুভব করেন। (৩) রাষ্ট্র-সভা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। প্রতিনিধি-সভা প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র-সভার মিয়াদ্ ছয় বৎসর। কিন্তু প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র অপসৃত হওয়ায় রাষ্ট্র-সভাকে কখনো ভাঙ্গিয়া দিতে হয় না। (৪) ক্ষুদ্র আকার ও স্থায়িত্বের জন্য রাষ্ট্র-সভায় সদস্যগণের অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইবার অবকাশ ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র-সভার সদস্যের প্রতিনিধি-সভার সদস্যের চেয়ে ক্ষমতা, মর্য্যাদা, কার্য্যকাল অধিক। তিনি অধিকতর স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন। সুতরাং লোক যে রাষ্ট্র-সভায় প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত হইবে, তাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বস্তুত প্রত্যেক যৌথ-রাষ্ট্রনীতিবিদের লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র-সভার সভ্য হওয়ার দিকে ও প্রতিনিধি-সভার সদস্যপদকে রাষ্ট্র-সভায় পৌছিবার সোপানস্বরূপ জ্ঞান করা হয়। (৫) একে ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সাধারণত রাষ্ট্র-সভায় প্রবেশ করিয়া থাকেন, তার উপর রাষ্ট্র-সভায় ইঁহাদের যে রাজনৈতিক শিক্ষানবিশীর সুযোগ ঘটে তাহা সামান্য নহে। এইরূপ একটি ছোট সভায় কয়েক বৎসর ধরিয়া কাজ করিলে আপনা হইতেই একটা দক্ষতা জন্মিয়া যায়। গত শতাব্দীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে রাষ্ট্র-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রায় প্রত্যেক মহাসমিতিতে যে সকল রাষ্ট্র-সভার সভ্য থাকেন তাঁহাদের অনেকে হয় পূর্ব্বে প্রতিনিধি-সভার, নয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। পূর্ব্বে বিচারক বা রাষ্ট্রের শাসক (গবর্ণর) ছিলেন, এরূপ সভ্যের সংখ্যাও কম নহে। প্রায় সকলে পূর্ব্বে কোন না কোন সরকারী কাজে লিপ্ত ছিলেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র-সভায় প্রবেশ করিতে হইলে, মানুষ ও মানুষের দলগত স্বভাব সম্বন্ধে বহু প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে

হয়। এই অভিজ্ঞতা ব্যতীত কাহারও রাষ্ট্র-সভার সভ্য হইবার অধিকার না জন্মিবার কথা। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা দ্বারা যেমন দেশের উপকার করা যায়, তেমনি অপকারও করা যায়, —কিন্তু সে হইল স্বতন্ত্র কথা।

প্রতিনিধি-সভা

রাষ্ট্র-সভা বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত, আর প্রতিনিধি-সভা সমগ্র জাতির সভা। কিন্তু তথাপি রাষ্ট্র-সভার মত প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের মনোনয়নেও রাষ্ট্রকেই মূলত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার দ্বিতীয় পল্লবের কতকাংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ: (১) "প্রতিনিধি-সভা প্রত্যেক দ্বিতীয় বৎসরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যদের লইয়া গঠিত হইবে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্ব্বাচকদের সেই সকল গুণ থাকিবে যে সকল গুণ সেই ব্যবস্থাপক সভার অধিক-লোকবিশিষ্ট শাখার সভ্যদের আছে। (২) যাঁহার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই ও যিনি সাত বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক নহেন, আর নির্ব্বাচিত হইবার পর যিনি যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সেই রাষ্ট্রে বাস করেন না, তিনি প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।" উদ্ধৃত অংশে তিনটি স্থলে রাষ্ট্রের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, প্রত্যেক রাষ্ট্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপনার সত্তা বজায় রাখিতেছে। রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ নিজেদের মধ্য হইতে বিভিন্ন সভ্যকে নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিনিধি-সভায় পাঠায় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার একটি বিশেষ শাখার সদস্যগণের যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, প্রতিনিধি-সভার সভ্য-নির্ব্বাচকদেরও সেই গুণ থাকা দরকার। তৃতীয়ত, প্রতিনিধি-সভায় কোন ব্যক্তি যে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই রাষ্ট্রেই বাস করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। রাষ্ট্রসমূহ শুধু যে নির্ব্বাচক হইবার যোগ্যতার নিয়ম করিয়া দেয়, তাহা নহে; কি প্রণালীতে ভোট দিতে হইবে তাহাও তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে সংশোধনী-সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সময় চতুর্দ্দশ সংশোধনী বর্ণনা করিয়াছি। কাঠামো-আইনের প্রথম ধারায় দ্বিতীয় পল্লবের তৃতীয় উপপল্লব এক্ষণে চতুর্দ্দশ সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় স্থির হইয়াছে: (১) যুক্তরাষ্ট্রে যাহারা জন্মিয়াছে অথবা রাষ্ট্রিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীনে রহিয়াছে, তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের এবং যে রাষ্ট্রে বাস করে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক। কোন রাষ্ট্র এমন আইন তৈয়ার বা প্রয়োগ করিবে না যে, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের কোন ক্ষমতা বা অধিকার খর্ব্ব হয়; রীতিমত আইনসঙ্গত বিচার ব্যতীত কোন রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিবে না, অথবা আইনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। (২) রাষ্ট্রসমূহকে রাষ্ট্রসমূহের জন-সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি-প্রেরণের ও করদানের ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল রেড ইণ্ডিয়ান কর দেয় না তাহাদের ছাড়া আর সকলকেই গণনা করা হইবে। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি-সভায় বিভিন্ন রাষ্ট্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠায়:

কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রকে ভিত্তি করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রিক কে?

জন-সংখ্যা গণনার ধারা।

রাষ্ট্রিক কখন নির্ব্বাচিত হন না।

বিদ্রোহ করিবার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র-নেতা, মহাসমিতির সভ্য ইত্যাদি কিছুই হইতে পারিবেন না। তবে উভয় সভা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা তাঁহার অসামর্থ্য দূর করিয়া দিলে তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার আর কোন বাধা থাকে না। (৪) আইনসঙ্গত সরকারী ঋণ (বিদ্রোহ ইত্যাদি দমন করিবার জন্য প্রেরিত লোকদের পেন্সন ও বৃত্তির দরুণ ঋণ সমেত) অস্বীকার করা হইবে না। কিন্তু বিদ্রোহ ইত্যাদির সাহায্যার্থ ঋণ অথবা দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদজনিত ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্র পূরণ করিবে না। এই সংশোধনী আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, নির্ব্বাচন সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সমূহকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পূর্ব্বেকার দশকে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা যেরূপ থাকে সেই অনুসারে কোন্ রাষ্ট্র কত জন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে তাহা মহাসমিতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহ ইচ্ছামত বিভিন্ন জিলায় বিভক্ত হইয়া প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে, তাহাতে কেহ বাধা দিবার নাই। এক একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত জিলাসমূহ আজকাল সমান অথবা প্রায় সমান, কিন্তু জিলাগুলিকে কোন অধিকতর ক্ষমতাশালী দলের পক্ষে এমনভাবে সাজান বিচিত্র নহে যে, তাহাতে সেই দলই বিশেষ লাভবান্ হয়। যেখানে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঐ রাষ্ট্র অতিরিক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পায় অথচ সেই অধিকার মত কাজ করে না, সেখানে সমগ্র রাষ্ট্র হইতে ঐ অতিরিক্ত সভ্য বা সভ্যগণকে নির্ব্বাচন করা হয়। বলা বাহুল্য, সকল রাষ্ট্র একই ভাবে প্রতিনিধি-সভার জন্য সভ্য নির্ব্বাচন করে না। কোনখানে হয়ত সকল সভ্য সমগ্র রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত হন, কোনখানে এক এক জিলা হইতে সমান নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, আবার কোনখানে কতক জিলা দ্বারা ও কতক সমগ্র রাষ্ট্র দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। ভোট দিবার ক্ষমতার সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু এক্ষণে পঞ্চদশ সংশোধনীর বলে জাতি, রঙ্ বা পূর্ব্বেকার দাসত্বের জন্য কেহ ভোটাধিকার হারায় না, আর উনবিংশ সংশোধনীর বলে স্ত্রীলোকেরাও ভোটাধিকার পাইয়াছেন। কোন প্রতিনিধি-সভার সভ্যের পদ খালি হইলে রাষ্ট্রের শাসক (গবর্ণর) নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন। কেহ পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি শাসককে চিঠি লিখিয়া তাহা জানান। এখানেও রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী ঋণের শুচিতা।

প্রতিনিধি-প্রেরণের বর্ত্তমান ব্যবস্থা।

প্রতিনিধি-সভার দুই বৎসর পরিমাণ আয়ু একটি রফার ফল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্ত্তনের সময়ে একদল ইহাকে বৎসরব্যাপী ও অন্য দল চারি বৎসরব্যাপী করিতে চাহিয়াছিলেন। উভয় দল আপোষে দুই বৎসর মেয়াদ স্থির করেন। এইরূপে প্রতিনিধি-সভার কার্য্যকাল আইন দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স অথবা জার্ম্মাণিতে জন-সভা, প্রতিনিধি-সভা বা সাম্রাজ্য-গৃহকে এইরূপ ভাবে বৎসরের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। ঐ সকল দেশে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেও প্রধান শাসনকর্ত্তা এগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তাহা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক যুগ্ম বৎসরে (যেমন ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২২ ইত্যাদি) প্রতিনিধি-সভার নির্ব্বাচন আরম্ভ হয়। সুতরাং প্রতিনিধি-সভার দ্বিতীয় নির্ব্বাচন ও রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন এক সময়েই পড়ে।

প্রতিনিধি-সভার কার্য্যকাল।

ইহাকে কেহ কেহ কাঠামো-আইনের ব্যবস্থার উৎকর্ষ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, এই ব্যবস্থায় নূতন রাষ্ট্র-নেতার পক্ষে তাঁহার অনুকূল ও বশীভূত লোকদের দ্বারা পূর্ণ একটি প্রতিনিধি-সভা পাওয়া সম্ভব হয়। দুই বৎসর পরে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেশের জনসাধারণ অনুমোদন করে বা করে না তাহা জানাইবার অবকাশ পায়। রাষ্ট্র-নেতার কাজ মনঃপূত না হইলে প্রতিনিধি-সভা তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। এই প্রতিনিধি-সভা পদে পদে তাঁহার কাজের বিরোধিতা করিয়া থাকে। প্রতিনিধি-সভা নির্ব্বাচিত হইবার পর এক বৎসরের পূর্ব্বে কোন বৈঠক সাধারণত বসায় না। অর্থাৎ ১৯৩০ সনের নবেম্বর মাসে যে প্রতিনিধি-সভা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বৈঠক করে। অবশ্য রাষ্ট্র-নেতা কোন কোন ক্ষেত্রে "বিশেষ অধিবেশনের" হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু সে অধিবেশনও ১৯৩১ সনের ৪ঠা মার্চ্চের পূর্ব্বে হইতে পারে না, কারণ ঐ সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধি-সভার আয়ু শেষ হয়। ১৭৮৯ হইতে আজ অবধি এ পর্য্যন্ত ১৫বার এইরূপ বিশেষ বৈঠক হইয়াছে। কিন্তু যে রাষ্ট্র-নেতাই এইরূপ বিশেষ অধিবেশন ডাকিয়াছেন তাঁহার কপালে অনেক দুঃখ-ভোগ ঘটিয়াছে। সেইজন্য এইরূপে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে একটা ভয় ও কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের ছয় মাস পরে নূতন মহাসমিতির অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে প্রচলিত আইনের ফলে নূতন প্রতিনিধি-সভা নির্ব্বাচিত হইবার পর চারি মাস অবধি পুরাতন প্রতিনিধি-সভার বৈঠক বসে। ইহাতে সময়ে সময়ে এমন হইয়াছে যে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাসমিতির কার্য্যপ্রণালী অপছন্দ করিয়া প্রতিনিধি-সভায় নূতন লোকদের পাঠাইয়াছেন, তখনও পুরাতন প্রতিনিধি-সভা কোটি কোটি ডলার খরচ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছে। বর্ত্তমান আইনের সংশোধন ব্যতীত এই অবস্থার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই।

প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক দ্বিতীয় নির্ব্বাচন ও রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন এক সময়ে হওয়ার সার্থকতা।

১৭৮৯ সনে যে প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইয়াছিল তাহার সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫। তখন ৩০,০০০ লোক একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোক-সংখ্যা বাড়া ও নূতন নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গোড়ায় মহাসমিতি স্থির করিয়া দেন যে, প্রতিনিধি-সভার সদস্যগণের সংখ্যা লোক-সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হইবে, কিন্তু পরে, প্রতিনিধি-সভার সদস্য-সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায়, লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি স্থির না করিয়া, সোজাসুজি প্রতিনিধিদের সংখ্যা স্থির করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯০ সনের লোক-গণনার পর আইন করিয়া স্থির হয় যে, ১,৭৪,০০০ ব্যক্তি একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে; ফলে তৎকালে প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৬। ১৯০৯ সনে ৩৯১ জন ও ১৯১১ সনে ৪৩৫ জন প্রতিনিধি-সভার সদস্য ছিলেন। বর্ত্তমানেও প্রতিনিধি-সভার সদস্যের সংখ্যা ৪৩৫। ডেলাওয়ার, নেবাদা, উওমিঙ, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো—এই কয়টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি একজন করিয়া প্রতিনিধি-সভার সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; পাঁচটি রাষ্ট্র দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠায়; কিন্তু নিউ ইয়র্ক হইতে ৪৩ জন ও পেন্সিলভেনিয়া

৪৩৫ জন প্রতিনিধি-সভার সদস্য।

হইতে ৩৬ জন নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি-সভার সম্পূর্ণ সভ্য হইলেন ৪৩৫ জন। কিন্তু ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন জনপদসমূহের (যেগুলি একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নহে) প্রত্যেকটি হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই সকল প্রতিনিধি প্রতিনিধি-সভায় বসিতে ও কথা বলিতে অধিকারী, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রতিনিধি-সভার সমুদয় সদস্যের অর্দ্ধেক উপস্থিত থাকিলে নূন্যতম সংখ্যা বা কোরাম্ হয়। ১৮৯০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল সদস্য নাম ডাকিবার কালে উত্তর না দিতেন তাঁহারা অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু ঐ সন হইতে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের গণিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। গণনা প্রতিনিধি-সভার সভাপতি (স্পীকার) করিতেন। পরবর্ত্তী মহাসমিতিতে ইহা পরিত্যক্ত হইলেও ১৮৯৪ সন হইতে আবার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে এক্ষণে সভাপতির পরিবর্ত্তে দুইজন গণনাকারী গণনার কার্য্য করেন। প্রতিনিধি-সভায় ভোট গ্রহণকালে প্রথমত সভাপতির দক্ষিণ ও বাঁ দিকে যাওয়া দস্তুর ছিল। কিন্তু ১৭৮৯ সনের ৯ই জুন হইতে বর্ত্তমান নিয়ম প্রচলিত হয়। এক্ষণে সদস্যেরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া দাঁড়ান ও প্রথমত সভাপতি গণিয়া দেখেন কোন্ দিকে কতজন সভ্য ভোট দিতেছেন। কিন্তু সভাপতি যদি নিঃসন্দেহ না হন বা উপস্থিত সভ্যগণের এক-পঞ্চমাংশ দাবী করেন, তবে সভাপতি দুইজন গণনাকারীর নাম করেন। এই দুইজন গণনাকারী মধ্যপথে দাঁড়াইলে পর সভ্যেরা একে একে তাঁহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া যান। যখন এইরূপ "হাঁ" ও "না" জানিবার জন্ত দাবী করা হয়, তখন প্রতিনিধি-সভার জনৈক কর্ম্মচারী সভ্যদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন এবং প্রত্যেকে "হাঁ," বা "না" বা "ভোট দিতেছি না" বলিয়া উত্তর দেন। একবার নাম ডাকা হইলে পর, দ্বিতীয় বার নাম ডাকা হয়। তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজেদের পূর্ব্ব মত বদ্‌লাইতে পারেন। প্রথম বার নাম ডাকার সময় কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিলে দ্বিতীয় বার নাম ডাকার সময়ে তিনি ভোট দিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লাগে। সভ্যেরা কাজে বাধা দিবার অথবা সেদিনকার বৈঠক নিষ্ফল করিবার জন্ত অনেক সময় এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার পঞ্চম পল্লবে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা আছে যে, কাঠামোর সংশোধনী ব্যতীত প্রতিনিধি-সভা এই প্রথা বদ্‌লাইতে পারিবে না।

কোরাম্ ও ভোটের প্রথা।

যাহারা প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায় তাহাদের গুণাগুণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন এক কথায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এবিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার যে শাখাটিতে সভ্য-সংখ্যা অধিক অর্থাৎ প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণের যে গুণাগুণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার সভ্য-নির্ব্বাচকদেরও সেই গুণাগুণ থাকা দরকার। গোড়ায় এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল। এক্ষণে রাষ্ট্রসমূহে প্রায় প্রত্যেক পুরুষ ভোট দিবার অধিকারী। উপরে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর মর্ম্ম দিয়াছি। এই দুই সংশোধনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের ভোটাধিকার দেওয়া। বলা বাহুল্য, ভোটাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া সে উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে সফল হইতে পারে নাই। কোন

প্রতিনিধি-সভার সভ্য-নির্ব্বাচকদের গুণাগুণ।

দুই জিলার নির্বাচন খরচা একরূপ নহে। কোথাও, বিশেষত বড় বড় শহরে অন্যায় খরচ বেশী হয়, ১০,০০০ ডলার বা তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করা হইয়া থাকে; কোথাও, বিশেষত গ্রাম্য দেশে, সামান্য মাত্র খরচে নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়। তবে সাধারণত ইংল্যাণ্ডের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন-খরচা কম। ঘুষের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তথাপি খুব কম নির্বাচনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়। প্রথমত, ঘুষের বিচার প্রতিনিধি-সভার করিবার কথা, কিন্তু প্রতিনিধি-সভা নির্বাচনের একবৎসর পর বসে। সুতরাং অনেক দেরী হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধি-সভার আয়ু মাত্র দুই বৎসর। সুতরাং কোন সভ্যের বিরুদ্ধে সমগ্র প্রথম বৈঠক জুড়িয়া অভিযোগ চালাইয়া দ্বিতীয় বৈঠকে স্থানচ্যুত করিয়া বিশেষ লাভ হয় না। (ব্রাইস)।

নির্বাচনের খরচ।

বিশেষ অধিবেশনের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেক মহাসমিতির দুইটি করিয়া বৈঠক হয়—প্রথম বা দীর্ঘ বৈঠক, দ্বিতীয় বা হ্রস্ব বৈঠক। মহাসমিতির নির্বাচনের পরবর্ত্তী বৎসরে ডিসেম্বর মাস হইতে দীর্ঘ বৈঠক আরম্ভ হয়। মাঝখানে বড় দিনের ছুটি পড়ে। তারপর এই বৈঠক জুলাই বা আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলে। হ্রস্ব বৈঠক জুলাইয়ের বৈঠক ভঙ্গের পর ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। সুতরাং প্রতিনিধি-সভার দুই বৎসরের মোট কার্য্যকাল ১০ হইতে ১২ মাস। বিলাতী পার্ল্যামেণ্টে প্রত্যেক বৈঠকের শেষে বিলের সমাপ্তি না ঘটিলে সে বিল ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিল দীর্ঘ বৈঠক হইতে হ্রস্ব বৈঠকে আলোচনার জন্য আসিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু ৪ঠা মার্চ্চের ভিতর যে সকল বিল পাশ হয় না সেগুলির বিনাশ অনিবার্য্য। সেজন্য হ্রস্ব বৈঠকের শেষের দিকে তাড়াতাড়ি বিল পাশ করিবার ধুম পড়িয়া যায়। প্রতিনিধি-সভা সাধারণত বেলা ১২টার সময় বসে ও ৬টা পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া থাকে। বৈঠকের শেষাশেষি আরো দীর্ঘ সময় ধরিয়া হয়, কখন কখন সারারাত্রি ধরিয়া কাজ চলে।

প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন।

ব্রাইস্ বলেন, প্রতিনিধি সভায় যুবকের সংখ্যা অধিক নহে, বৃদ্ধদের সংখ্যা আরও কম। অধিকাংশ ব্যক্তির বয়স ৪০ হইতে ৬০-এর মধ্যে। ব্যবহারাজীবের সংখ্যা প্রত্যেক সভাতেই দুই-তৃতীয়াংশ হয়। আমেরিকায় ব্যারিষ্টার ও এটর্ণির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই, সুতরাং ব্যবহারাজীব বলিতে উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। বলা আবশ্যক, নির্ব্বাচিত হইবার পর ইঁহাদের অনেকেই আইনের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ব্যবহারাজীবের পর যথাক্রমে ব্যবসায়ী, কৃষিবিৎ, ব্যাঙ্ক-দক্ষ ও সংবাদপত্র পরিচালকদের স্থান। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও মধ্য হইতেই এক-তৃতীয়াংশ সভ্যও নির্ব্বাচিত হন না। ধর্ম্মোপদেষ্টারা কচিৎ দেখা দেন। স্থল বা জল সৈনিক কর্ম্মচারী, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারী কেহই প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না। রেলওয়ে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণ যুক্তরাষ্ট্রে অতিশয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও প্রায় মহাসমিতিতে দেখা যায় না। ব্যবহারাজীব সভ্যের সংখ্যা অনেক বটে, কিন্তু ইঁহাদের কেহই নিজ নিজ রাষ্ট্রের বিচারালয়ে নেতৃত্ব করিতে সমর্থ হন না। বস্তুত, রেলওয়ে-কর্ম্মাধ্যক্ষ বা পুঁজিপতিগণ নিজের কাজে এরূপ লিপ্ত থাকেন যে, অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা তাঁহাদের

প্রতিনিধি-সভার সভ্য কাহারা হন।

পক্ষে সম্ভবপর হয় না; অন্য দিকে যে সকল ব্যবহারাজীব নিজ রাষ্ট্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁহারা নিজেদের লাভজনক ব্যবসা ছাড়িয়া প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন না। রেলওয়ের লোকেরা প্রতিনিধি-সভার সভ্য হন না বলিয়া এমন মনে করিবার কোন হেতু নাই যে, তাঁহারা মহাসমিতির বাহিরে থাকিয়া আইন-প্রণয়ন বিষয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা চলে যে, প্রায় সকলে ইস্কুলের বিদ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন ও অর্দ্ধেক ব্যক্তি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বলা উচিত যে, আমেরিকার অনেক কলেজ ইয়োরোপের ইস্কুলের সামিল। সুতরাং খুব উচ্চ শিক্ষিত সভ্যের সংখ্যা অধিক নহে। অর্দ্ধেকের কিছু কমসংখ্যক ব্যক্তি নিজ নিজ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষানবিশী করিয়া আসেন। অনেকেই ধনী নহেন। একেবারে গরীবও নাই বলিলেই চলে। নানা কারণে শ্রমিকদের প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করা সম্ভবপর হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণ, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় উচ্চ কর্ম্মচারিগণ, বিচারকগণ এবং প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ সকলকেই "অনারেবল" অর্থাৎ সম্মানিত বা মাননীয় এই উপাধি দেওয়া হয়। তিনি সভার বাহিরেও এই উপাধিতে সম্বোধিত হন। প্রত্যেক সভ্যকে, কেরাণীকে, প্রহরীকে (সার্জ্জেণ্ট অ্যাট আর্ম্মস্), দ্বার-রক্ষককে ও পোষ্টমাষ্টারকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি বিশ্বস্ততামূলক শপথ বা সত্য অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হয়। প্রহরী প্রতিনিধি-সভার কোষাধ্যক্ষ স্বরূপ ও প্রত্যেক সভ্যের বৃত্তি ও ভ্রমণের জন্য টাকা দেন। প্রত্যেক সভ্য শুধু সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া নিজ বক্তব্য বলিতে পারেন। অন্য কোন সভ্যকে উল্লেখ করিতে হইলে তিনি তাঁহার নাম করিতে পারেন না, "অমুক স্থানের মাননীয় ভদ্রলোক মহোদয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন প্রস্তাবের প্রস্তাবক ব্যতীত কোন ব্যক্তি এক প্রশ্ন লইয়া দুইবার বক্তৃতা করিতে পারেন না। কোন প্রস্তাবক সকল সভ্যের বলা শেষ হইয়া গেলে জবাব দিবার অনুমতি পাইতে পারেন। এক ঘণ্টার বেশী কেহ বক্তৃতা দিতে পারেন না, দিতে হইলে সভার সমুদয় সভ্যের সম্মতি আবশ্যক। সমগ্র প্রতিনিধি-সভা যখন সমিতিরূপে বসে তখন প্রত্যেকের বক্তৃতার সময় পাঁচ মিনিট করিয়া দেওয়া হয়।

তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়ন ও আইন-প্রণয়নে বাধার কথা।

তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়নে বাধা দিলে তাহা দূর করিবার উপায় আছে। তাহাকে "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন" বলে। একটি প্রস্তাব আনা হয় যে "এখন প্রধান প্রশ্নটি কি ভোটে দেওয়া হইবে?" প্রতিনিধি-সভায় প্রস্তাবের অনুমতি পাইলে সকল প্রকার আলোচনার অবসান হয় ও প্রতিনিধি-সভায় প্রধান প্রশ্নটি লইয়া ভোট আরম্ভ হয়। প্রধান প্রশ্ন ভোটে দেওয়া হইবে কি না তাহা লইয়া আলোচনা হয় না, কিন্তু যে সভ্য কোন সমিতি হইতে "বিবেচনাধীন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবরণী দাখিল করেন" তাঁহার শেষ জবাব দিবার অধিকার চলিয়া যায় না। প্রতিনিধি-সভার সভাপতির অনুমতি না লইয়াও যে কোন সভ্য আলোচনা বন্ধ করিবার প্রস্তাব আনিতে পারেন। যাঁহারা উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের অতিজন ভোট পাইলেই আলোচনা বন্ধ হইয়া যায়। প্রতিনিধি-সভা সমিতিতে পরিণত হইয়া গেলে প্রস্তাব আনা চলে না। কিন্তু প্রতিনিধি-সভা সমিতি হইয়া বসিবার পূর্ব্বে আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব পাশ করাইয়া লওয়া

যাইতে পারে। তাহার পর কোন সংশোধনের প্রস্তাবক পাঁচ মিনিট ও যে সভ্য ঐ প্রস্তাবের সংশোধনের প্রতিবাদের জন্য প্রথম "মেঝে দখল করেন" অর্থাৎ দণ্ডায়মান হন (বক্তৃতা করিবার অবকাশ পান) তাঁহাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়, আর কাহাকেও আলোচনা করিতে দেওয়া হয় না। "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নের" দ্বারা আলোচনা বন্ধ করিবার প্রণালী ১৮১১ সন হইতে চলিয়া আসিয়াছে; এমন দিন প্রায় যায় না যখন এই প্রথার সাহায্য লওয়া হয় না। তথাপি ইহার বড় একটা অপব্যবহার যে হয় না, তাহার একটি কারণ এই যে অন্যায়ভাবে আলোচনা বন্ধ করা হইলে লোকমত তাহা অনুমোদন করে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার এত বড় যন্ত্র প্রতিনিধি-সভার হাতে থাকা সত্ত্বেও কাজে বাধা পাওয়া অসম্ভব নহে। (১) বারে বারে আলোচনা মুলতবী রাখিবার, (২) কার্য্য করিতে অবসর লইবার ও (৩) ভোট গণনা করিবার প্রস্তাব আনিয়া কাজে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা বা আলোচনা নিষিদ্ধ হইলেও ঐগুলি দ্বারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বিশেষত উনজন দল যদি বিশেষ শক্তিশালী হয়, তবে সময় সময় তাহার সফলতা লাভ অসম্ভব হয় না। দুইটি প্রধান কারণে এইরূপভাবে কাজ পণ্ড করিয়া দেওয়া নিবারিত হয় না: (১) প্রতিনিধি-সভা এ বিষয়ে নিজের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, এই প্রণালী কাঠামো-আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (২) উনজন দলকে অপ্রীতিভাজন করিবার উপায় থাকা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেদের মনের ধারণা এই যে, উনজন এ বিষয়ে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাতে বাধা দিবার দুইটি উপায় আছে: (১) এইরূপ বাধা দেওয়া কখনো সফল হয় না যদি না উনজন দলের প্রত্যেকে এ কাজে যোগ দেয়। কিন্তু বাস্তবিক কোন সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ না করিলে, উনজনের সকলে মিলিয়া বাধা দিবে, এরূপ আশা করা যায় না। (২) জাতি যদি পুনঃ পুনঃ দেখে যে, গুরুতর কারণ ব্যতীত কোন দল কাজ পণ্ড করিতেছে ও দরকারী আইন প্রণয়ন করিতে দিতেছে না, তবে এইরূপ দলের নেতারা ও প্রত্যেক ব্যক্তি জনগণের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। জনমতকে বিপক্ষে রাখিয়া কোন দল ভবিষ্যতে সুফল লাভের আশা করিতে পারে না।

প্রতিনিধি-সভায় বিলের সংখ্যা।

প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক বৎসর অনেক বিল (নিম্নে দ্রষ্টব্য) আনা হয়। আর প্রতি বৎসর বিলের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ১৮৬১-৬৩ সনের মহাসমিতিতে বিলের সংখ্যা ছিল ১০২৬,—তন্মধ্যে প্রতিনিধি-সভার বিলের সংখ্যা ৬১৩; ১৮৮৯-৯১ সনে মোট বিল হইয়াছিল ১৯,৬৪৬—তন্মধ্যে প্রতিনিধি-সভার ১৪,০২৮; ১৯১১-১৩ সনে প্রতিনিধি-সভায় ২৯,০০০ ও রাষ্ট্র-সভায় ৯,০০০ বিল আসে। বিলাতের জন-সভায় ১৮৯২ সনে ৩৩৫ ও ১৯০৮ সনে ৪৮২ বিল আসিয়াছিল। বস্তুত প্রতিনিধি-সভায় উপস্থাপিত বিলের সংখ্যা বিলাতের জন-সভায় আনীত বিলের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, উভয় দেশের বিলের প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশ গভীর। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাপক সভায় প্রভূত পরিমাণ আইন প্রণীত হইয়া থাকে। মহাসমিতিতে আনীত অনেক বিল প্রকৃত পক্ষে বেসরকারী বা ব্যক্তিগত প্রস্তাব মাত্র। প্রত্যেক বৎসর যত বিল উপস্থিত করা হয় তাহার খুব কম অংশই, প্রায় ত্রিশ ভাগের একভাগ আইনে পরিণত হয়। সোজাসুজি

কোন বিলকেই প্রতিনিধি-সভার আদিতে বাধা দেওয়া হয় না, কিন্তু বহুসংখ্যক বিল ক্রমে ক্রমে বাতিল হইয়া যায়। অধিকাংশ বিলকেই তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করা হয় না। প্রতিনিধি-সভার সভ্যেরা হয়ত নিজ নিজ নির্বাচকদের খুসী করিবার জন্ত কোন বিল আনয়ন করেন; অথবা কোন সভ্য হয়ত কখনো কোন বড় কোম্পানিকে প্রদত্ত কোন বিশেষ সুবিধা রদ্ করিবার প্রস্তাব আনেন,—উদ্দেশ্য এইরূপে তিনি তাঁহার রাষ্ট্রের জনগণের নিকট প্রিয় হইবেন অথবা ঐ বড় কোম্পানির নিকট পরোক্ষভাবে কোন সুবিধা আদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান প্রতিনিধি-সভা-গৃহ এরূপ বৃহৎ যে, ইহাতে বিলাতের জন-সভার মত তিনটি গৃহ স্থান পাইতে পারে। এখানে সভ্যগণ ব্যতীত আরো ২,৫০০ লোক বসিবার স্থান আছে। গৃহের আয়তন ও বিভিন্ন সভার অবস্থান এরূপ যে, কোন ক্ষমতাশালী বাগ্মী ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেও তাঁহার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুত অনেক সভ্য পরস্পরের বক্তৃতা শুনিবার জন্ত আগ্রহান্বিত নহেন, তাঁহারা এই সব বক্তৃতার মর্ম্ম মহাসমিতির দলিল বইয়ে পড়িতে পারেন। কোন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার কালে উহা শুনিবার জন্ত সভ্যেরা নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আসেন। কোন গুরুতর বিষয় লইয়া উচ্চস্বরে অধিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতে হইলে বিষয়কে লঘু না করিয়া উপায় নাই। ইহাতে বক্তৃতা-শক্তির বিকাশ হয় না। বিশেষত, শ্রোতারা যদি বক্তৃতার দিকে মন না দেন তবে বক্তৃতা দিবার ইচ্ছাও চলিয়া যায়। বক্তৃতা-শক্তি বিকশিত হইবার পক্ষে আরো একটি বাধা আছে। অন্যান্ত দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বিরোধী দলের লোকেরা আলাদা হইয়া বসেন না, যাঁহার যেখানে ইচ্ছা বসেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষে সরকার বা বিরোধী পক্ষকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার সুবিধা হয় না। সভ্যেরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া ধূমপান করিতে পারেন। বিলাতের জন-সভার মত কাহারও বক্তৃতার মাঝখানে প্রশ্ন করা বা বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তি এখানে কম। সভ্যেরা প্রায়ই তাঁহাদের বক্তৃতার সবটা সভায় পড়েন না, কতকাংশ মাত্র চীৎকার করিয়া পড়েন, সমস্ত বক্তৃতাটি বিবরণীকারকের হাতে আগে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা সহজেই মহাসমিতির দলিল বইয়ে নিজ নিজ বক্তৃতা ছাপাইবার অনুমতি পান ও তাহাতে সম্পূর্ণ বক্তৃতা ছাপাইয়া থাকেন। তারপর সেই বক্তৃতার নকল তাঁহার জিলার লোকদের বিতরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়। এইরূপে বিভিন্ন সভ্যের পরস্পর আলোচনার অভাবের ফলে ঐ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্ত প্রতিনিধি-সভার সমিতিগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। সমগ্র সভা যখন সমিতিরূপে বসে ও সভ্যেরা প্রত্যেকে মাত্র পাঁচ মিনিট করিয়া বলিবার সময় পান তখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় কথা বলিতে হয় বলিয়া বিলের আলোচনা কার্য্যকরী হয়। নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি প্রতিনিধি-সভার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও ভালভাবে আলোচিত হয়: কর-ভার ও টাকা খরচ—বিশেষত পূর্ত্তবিভাগের কাজ, নদী ও বন্দরের উন্নতি, যৌথ-রাষ্ট্রের ঘরবাড়ী ইত্যাদির ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয়। (ব্রাইস্)

প্রতিনিধি-সভার দোষ-গুণ।

ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে প্রতিনিধি-সভার কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বড় একটা বাহির হয় না। যাহা বাহির হয়, তাহাও বিশেষ উত্তেজনার সময়ে ব্যতীত পঠিত হয় না; জনমতের উপর তাহার প্রভাব খুব বেশী নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রতিনিধি-সভা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইতে না পারে, কিন্তু তাহাতে আইন-প্রণয়নের কাজ বাধা পাইবার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, প্রতিনিধি-সভা যে আইন প্রণয়ন করে তাহা পরিমাণে বেশী নহে, গুণেও বেশীর ভাগ প্রথম শ্রেণীর নহে। গুরুতর বিষয়ের সমস্যার জন্ত অনেক স্থলে প্রতিনিধি-সভাকে রাষ্ট্র-নেতা ও রাষ্ট্র-সভার উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রতিনিধি-সভার বিশেষত্ব এই যে এখানে কেবল অর্থের সাহায্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। অশিক্ষিত কোন বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে তাহার সম্পত্তির ও বংশানুক্রমিক ভোট পাওয়ার জোরে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। প্রতিনিধি-সভার নামজাদা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অনেক না থাকিলেও সাধারণত প্রতিনিধি-সভার অনেক সভ্য প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যান্য প্রকারে বহু প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখাতে জমিদার, ব্যবহারাজীব, ডাক্তার, শিল্পী, লেখক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক দেখা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য নাই, তাঁহাদের শতকরা ৮০ জন শুধু রাজনীতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। এইজন্ত যুক্তরাষ্ট্র বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির বাসস্থান হইলেও উহার প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের মধ্যে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্য বেশী। প্রতিনিধি-সভার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সভ্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইলেও সরকারী বা বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা বলিয়া কেহ নাই। ১৯০০ সনের পূর্ব্বে সম্মেলক-সভ্য (হুইপ্) ও ছিল না। যৌথরাষ্ট্রের চাকুরী করিয়া কেহ প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারেন না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রিগণ সভ্য না হওয়াতে সভাতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি কেহ থাকেন না। তেমনি মন্ত্রিগণের কার্য্য সমালোচনা করিবার জন্ত কোন দল নাই। প্রতিনিধি-সভার সভ্যেরা অতিজন ভোট দ্বারা যে বিল পাশ করেন তদনুসারে মন্ত্রিগণ কার্য্য না করিলে প্রতিনিধি-সভা একাকী তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে না। সেইজন্ত মন্ত্রিগণ অতিজন দলের মতানুসারে নিজেদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন না, আর প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের মধ্যেও ভোটের জন্য দলের শাসন প্রবল নহে, প্রতিনিধি-সভায় বিভিন্ন দলে কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব বা অতিজন উপস্থিত করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাষ্ট্র-নেতা ও তাঁহার মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকেরা প্রতিনিধি-সভায় প্রবল রহিয়াছেন, এরূপ দৃশ্য বিরল নহে। প্রতিনিধি-সভার অতিজন দলের কোন নেতা আছেন বলা যায় না। উহার সভাপতিকে নেতা বলা চলে, কারণ অতিজন দলের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি এই পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু সভাপতি কোন আলোচনায় যোগ দিতে পারেন না, যোগ দিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার আসনে আর কাহাকেও বসাইয়া

নামিয়া আসিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সমিতি অর্থাৎ অর্থসংস্থান সমিতির (ওয়েজ্‌ অ্যাণ্ড মিন্‌স্‌ কমিটি) সভাপতি প্রতিনিধি-সভায় দলের নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। জনগণ রীতিমতভাবে কোন ব্যক্তিকে দলপতি নির্ব্বাচিত করে না, অথবা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য কোন ব্যক্তিও নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান না।

প্রতিনিধি-সভার সভাপতি (স্পীকার) বিলাতের জন-সভার সভাপতির আদর্শে গঠিত হইলেও কালক্রমে এই পদে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিলাতে তাঁহাকে অভিজন দল হইতেই নির্ব্বাচিত করা হয়। কিন্তু নির্ব্বাচনের পর সভাপতিরূপে তাঁহার সঙ্গে দলের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁহার পক্ষে গোপনে নিজের দলকে সাহায্য করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। পরামর্শ দিতে হইলে সকলকে প্রকাশ্যভাবে দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে সভাপতির রাজনৈতিক ক্ষমতা চলিয়া যায় না, বরং দলের লোকেরা আশা করেন যে, তিনি সর্ব্বদা দলের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবেন। সভ্যদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্ত অনুরোধের কালে তিনি নিজের দলের লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন। আইনে যে সব বিষয়ের পরিষ্কার নির্দ্দেশ নাই, সে সব বিষয়ে তিনি নিজের দলের লোকের পক্ষে টানিয়া কথা কহেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই কোন বিল বা প্রস্তাব এমনভাবে মুলতুবী রাখিতে পারেন যে, তাহাতে ঐ বিল বা প্রস্তাবের দফারফা হইয়া যায়। কোন সভ্য বিল উপস্থিত করিলে পর, তিনি যদি তাঁহাকে অনুমতি না দেন তবে তাঁহার পক্ষে সে বিল উপস্থাপিত করা সম্ভবপর হয় না। সভাপতি প্রতিনিধি-সভায় সাধারণত কোন প্রকার বক্তৃতা করেন না, কিন্তু সভার বাহিরে তাঁহার দলের অন্যান্ত নেতাদের পরামর্শ দিতে পারেন। কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্ত যখন দলের লোকেরা সভা করেন, তখন সভাপতি তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯১০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিনিধি-সভার সভাপতির ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী ছিল। তিনি বিভিন্ন সমিতিগুলিকে ইচ্ছামত গঠন করিতে পারিতেন। তিনি যে শুধু সমিতিগুলির সভ্য মনোনয়ন করিতেন তাহা নহে, প্রত্যেক সমিতির অধ্যক্ষ কে হইবেন তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি নিজের দলের লোকদের ও বন্ধু বান্ধবদের চাকুরী-বাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ সম্মান ও সুবিধা যোগাড় করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু ১৯১০ সনের পর হইতে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও কম নহে ও আইন পরিবর্ত্তন দ্বারা লুপ্ত ক্ষমতা পুনরায় তাঁহার হাতে আসিতে পারে। সুতরাং প্রতিনিধি-সভার সভাপতি মনোনয়ন যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা হইয়া দাঁড়ায় তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সময় সময় অভিজনের যে দল নিজেদের লোককে প্রতিনিধি-সভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয় সেই দল সমগ্র মহাসমিতির কার্য্য-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এক্ষণে অভিজন দল হইতে লইয়া গঠিত এক সমিতির হাতে প্রতিনিধি-সভা হইতে সভ্যদের বাছিয়া বিভিন্ন সমিতি গঠনের ভার রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন সমিতির অধ্যক্ষ নির্ব্বাচনে প্রতিনিধি-সভার সভাপতির প্রভাব কম নহে। আর আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সমিতির অধ্যক্ষগণের একটি বিশেষ স্থান আছে; সে সম্বন্ধে পরে বিশদ বর্ণনা করা যাইবে। সভাপতি

প্রতিনিধি-সভার সভাপতির ক্ষমতা।

নিজের দলকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন সত্য, কিন্তু এই সাহায্যদানের জন্য তিনি অবাঞ্ছনীয় উপায় অবলম্বন না করিলেই ভাল হয়। আলোচনা পরিচালনায় ও সমিতি গঠনে তিনি যদি বিপক্ষদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার না করেন, তবে তাঁহাকে বিশেষ নিন্দা-ভাজন হইতে হয়। সভাপতি বৎসরে ১২,০০০ ডলার বা প্রায় ৩৬,০০০ টাকা বেতন পান। পদমর্য্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সভাপতির নীচেই তাঁহার স্থান, তিনি উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকগণের সমস্থানীয়। তাঁহার স্থায়িত্ব, ক্ষমতা বা উভয় পক্ষে ভোটে সমান হইলে নিজের ভোট সম্বন্ধে কোন কথা কাঠামো-আইনে উল্লেখ নাই। এই সকল বিষয় প্রতিনিধি-সভা আইন করিয়া স্থির করিতে পারে।

রাষ্ট্র-সভার বর্ণনা কালে অত্যভিযোগের কথা বলা হইয়াছে। কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ অনুসারে অত্যভিযোগ আনিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রতিনিধি-সভার আছে। অর্থাৎ প্রতিনিধি-সভা দোষ সাব্যস্ত করিলে পর রাষ্ট্র-সভা অত্যভিযোগের বিচার করিতে পারে। বিলাতে অনেক কাল প্রথা এই ছিল যে, জন-সভা দোষ সাব্যস্ত করিবে ও ওমরাও-সভা জবানবন্দী লইবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমত প্রতিনিধি-সভার কোন সভ্য প্রতিনিধি-সভায় সরকারী কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। যদি প্রতিনিধি-সভার মনে হয় যে, ঐ সকল অভিযোগের অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য, তবে সেগুলি একটি বিশেষ সমিতির হাতে অর্পণ করা হয়। প্রতিনিধি-সভার এই বিশেষ সমিতি সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক সমগ্র সভার নিকট আবেদন পেশ করিতে পারে যে, দোষসমূহ অত্যভিযোগের ধারারূপে গৃহীত হউক ও রাষ্ট্র-সভার নিকট বিচারার্থ প্রেরিত হউক। ইহার পর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় রাষ্ট্র-সভার হাতে গিয়া পড়ে, রায় সম্পর্কে প্রতিনিধি-সভার কোন হাত নাই। (মানরো)

প্রতিনিধি-সভা অত্যভি-যোগ আনয়ন করে।

সমগ্র প্রতিনিধি-সভা যখন সমিতিরূপে বসে, তখন বিলাতের জন-সভার প্রণালীতে ইহার কার্য্যাবলী নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু এইরূপ সমিতির অধ্যক্ষ প্রত্যেক বার প্রতিনিধি-সভার সভাপতি কর্ত্তৃক মনোনীত হন। যখনি সভাপতি খবর পাঠান অথবা কোন সভ্য জানান যে, গোপনীয় বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনি প্রতিনিধি-সভা গোপন বৈঠক বসাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা আর প্রয়োগ করা হয় না।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মাণির ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় শাখার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভার অনেক বিষয়েই মিল নাই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভা আইন-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু শাসন করা ইহার কাজ নয়। বিলাতী জন-সভার মত শাসন ও আইন-প্রণয়ন উভয় কার্য্য চালাইতে হইলে দলের নেতা ও সম্মেলন-সভ্য ছাড়া চলিত না। কিন্তু ইহা শুধু তর্কবিতর্ক ও আলোচনার স্থান। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা জনগণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাঁহারই উপর সমগ্র রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা নির্ভর করে; সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভা দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন অসম্ভব। প্রতিনিধি-সভা পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহা উহার অন্তর্গত বিভিন্ন সমিতির সাহায্যে। প্রতিনিধি-সভার আনীত কোন বিল এই প্রকার সমিতিতে উপস্থিত করিবামাত্র

প্রতিনিধি-সভা আলোচনা-গৃহ।

প্রতিনিধি-সভার চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ইহার আলোচনা চলিতে পারে। সমিতিসমূহ যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছে সমগ্র প্রতিনিধি-সভা মাত্র সেগুলিকে অনুমোদন করে। প্রতিনিধি-সভা একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করে, তাহা রাজস্ব অর্থাৎ করস্থাপন ও ব্যয় সম্পর্কে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় যদি ফ্রান্স বা জার্মানির মত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেশী হইত তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্য চলা ভার হইত, কারণ এখানে দলপতি ইত্যাদি নাই। কিন্তু এখানে দুইটি মাত্র অতি স্পষ্ট ও প্রায় সমান শক্তিশালী দল রহিয়াছে। সুতরাং ফ্রান্সের মত কোন দলই পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হইয়া থাকিতে চায় না। সকল জাতীয় সমস্যার বেলায় অতিজন ও উনজন দল একত্র হইয়া ভোট দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাবস্থাপক সভার উভয়-শাখাতেই একমাত্র বেসরকারী সভ্যদের দ্বারা বিল আনীত হয়, কারণ কোন শাখাতেই সরকারী সভ্য নাই। বিশিষ্ট বিলসমূহ বিভিন্ন সমিতিতে বিবেচিত হয়, সমগ্র সভা সমিতিরূপে বসিয়া কচিৎ কোন বিলের বিচার করে। এই সকল বিলের ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করা যাইতে পারে: (১) ব্যবস্থাপক সভায় আনীত কোন বিলের আকার ও আসল বক্তব্য বিষয়ের গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে আনয়নকারী ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্র-সভায় অনেক ব্যবহারাজীব আছেন বলিয়া তথাকার বিলসমূহ সাধারণত সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রতিনিধি-সভায় তাহা হয় না। (২) বিভিন্ন বিলের মধ্যে সমিতিসমূহ সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে পারে। এক ধরণের বিলগুলি একটি সমিতির হাতে ন্যস্ত থাকে। ঐ সমিতির শুধু যে সে বিল পরীক্ষা করিবার বা সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা নহে; উহা একেবারে নূতন করিয়া আনিবার ক্ষমতাও আছে। (৩) সমিতিসমূহের কাজ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না বলিয়া কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ঘটিলে তাহা জানিবার উপায় থাকে না। (৪) বিভিন্ন মন্ত্রীকে কোন কোন সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা হইলেও ব্যবস্থাপক সভার কোন শাখায় মন্ত্রিগণ কোনপ্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন বা নিজ বক্তব্য বলিবার অবকাশ পান না বলিয়া বিলগুলির যথোচিত আলোচনা হয় না। (৫) আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব স্পষ্টরূপে কাহারও ঘাড়ে চাপান যায় না। যে সভ্য বিল আনেন, তাঁহার দায়িত্ব প্রায় থাকে না, কারণ সমিতিতে তাঁহার বিলের পরিবর্তন হওয়া অনিবার্য্য। দুই দলের দায়িত্ব সামান্য, কারণ কোন দলের কোন লোক দলের মুখপাত্ররূপে মতামত প্রকাশ করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় আনীত বিলের গুণাগুণ।

ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন সমিতি

প্রশ্ন হইতে পারে মন্ত্রি-সমিতি যদি ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে কোন বিল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রে কি উপায়ে টাকা তোলা বা টাকা খরচ করা সম্ভবপর হয়? যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা নীচে বর্ণনা করা যাইতেছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থসচিবগণ প্রতি বৎসর একটি আয়ব্যয়ের খসড়া ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শোনান। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সচিব লিখিত দলিল পাঠাইয়া থাকেন। উভয় সভার নিকট প্রেরিত এই বিবরণীতে জাতীয় আয় ও ব্যয় এবং সরকারী ঋণের অবস্থার কথার সঙ্গে সঙ্গে করপ্রথা

সম্বন্ধে মন্তব্য, কিরূপে উহার উন্নতি হইবে, তাহার প্রস্তাব ইত্যাদি থাকে। অর্থ-সচিব প্রতি বৎসর একটি চিঠিতে বিভিন্ন শাসন-বিভাগ আগামী বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কাজ চালাইবার জন্য যে খরচের খসড়া প্রণয়ন করে তার বিশদ বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করেন। টাকা তুলিবার ভার অর্থ-সংস্থান সমিতি (কমিটি অব্ ওয়েজ অ্যাণ্ড মিন্‌স) নামক একটি সমিতির উপর থাকে। ইহা প্রতিনিধি-সভার ১৯টি সভ্য লইয়া গঠিত হয়। এই সমিতি স্থির করেন কোন্ কোন্ আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি নূতন করিয়া বসান হইবে অথবা চলিত থাকিবে ও তদনুরূপ এক বিবরণী প্রতিনিধি-সভার নিকট দাখিল করে। প্রতিনিধি-সভা এই সমিতির নিকট অর্থ-সচিবের বিবরণী পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু সমিতি সেই বিবরণীকে ভিত্তি করিয়া কোন প্রকার বিল তৈরী করিতে বাধ্য নহেন। সাধারণত খরচের জন্য যত দরকার তাহার চেয়ে ঢের বেশী অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আর শুধু প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়াও বিল তৈরী হয় না, দলের স্বার্থ-পুষ্টির চেষ্টাও চলে। রাষ্ট্র-সভার অর্থ-সংস্থান সমিতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রতিনিধি-সভার অর্থ-সংস্থান সমিতির সভাপতির সহিত কোষাগারের কোন সম্পর্ক নাই। অর্থ-সচিবের কর্ম্মচারীদের সহিত তিনি কোন প্রকার পত্র ব্যবহার পর্য্যন্ত না করিলেও করিতে পারেন। অন্য দিকে, তিনি যে প্রতিনিধি-সভায় অধিকজনকে নিজ পক্ষে পাইবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

অর্থসংস্থান সমিতি।

অর্থ ব্যয় করিবার ভার পূর্ব্বে ব্যয় সমিতির (কমিটি অব্ এপ্রোপ্রিয়েশন্‌স) হাতে ছিল। কিন্তু ১৮৮৩ সনে নদী ও বন্দর সমিতি নামে এক নূতন সমিতি গঠিত হইয়া খরচের মোটা টাকা আত্মসাৎ করে। ১৮৮৬ সনে বিবিধ সমিতি অর্থ ব্যয়ের বিল তৈরী করিতে থাকে। অর্থ-সচিব খরচের যে খসড়া পাঠান ব্যয়-সমিতি তাহা অনেক কাটছাট করিয়া বিল প্রস্তুত করে। নদী বা বন্দর সমিতি নামত নদীতে চলাচলের সুবিধার জন্য টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিলেও বস্তুত এইরূপে রাশি রাশি টাকা এক বা অধিক রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয়। এইরূপে ব্যয়-সমিতি যাহা বাঁচায় তাহা অন্য দিক্ দিয়া খরচ হইয়া যায়। অন্যান্য সমিতি-সমূহ, কোন্ সমিতি কিরূপ অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া খরচের ব্যবস্থা করে।

ব্যয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন সমিতি।

প্রত্যেক রাজস্ব বিল প্রতিনিধি-সভার নিকট আলোচনার্থ আসে। ঐ সভা যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে ঐ বিলের আলোচনা করে ও সেই সময়ে কোন কোন সভ্য তাহাতে নূতন দফা জুড়িয়া দিতে পারেন। তারপর এই বিল রাষ্ট্র-সভার নিকট প্রেরিত হয় ও রাষ্ট্র-সভা উহার একটি সমিতিতে আলোচনা করিবার জন্য বিলটিকে পাঠায়। রাষ্ট্র-সভার অর্থ-সম্পর্কিত সমিতি রাজস্ব-আদায় সূচক বিলের এবং ব্যয়-সম্পর্কিত সমিতি অর্থ-ব্যয় সূচক বিলের আলোচনা করে। তারপর উভয় প্রকার বিলসমূহ রাষ্ট্র-সভার নিকট আসে। সমগ্র রাষ্ট্র-সভা রাজস্ব-আদায় সূচক কোন বিল উপস্থাপিত করিতে না পারিলেও, ব্যয় সম্বন্ধীয় বিলের সংশোধন করিবার ক্ষমতা ইহার আছে, আর উহা প্রায়ই নূতন নূতন খরচের দফা নির্দ্দেশ করিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। এই সকল বিল প্রতিনিধি-সভায় ফিরিয়া আসিলে পর প্রতিনিধি-সভা সাধারণত সংশোধনসমূহ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু রাষ্ট্র-সভা

যুক্তরাষ্ট্রে আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা।

সেগুলির জন্য বিল্‌ করিয়া বসে। তখন রাষ্ট্র-সভা হইতে তিনজন ও প্রতিনিধি-সভা হইতে তিনজন লইয়া উভয় সভার এক সম্মিলিত বৈঠক হয়। এই বৈঠক তাড়াতাড়ি এক রফা নিষ্পন্ন করে ও এই রফা শেষ মুহূর্তে প্রতিনিধি-সভা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করে। অনেক সময় ব্যয়াধিক্যের ব্যবস্থা হইলেও বৎসরের শেষে টাকার টানাটানি পড়িয়া যায়। তখন প্রতিনিধি-সভার দ্বিতীয় বৈঠকে বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালাইবার জন্য টাকা চাহিয়া এক নূতন বিল (ডিফিসিয়েন্সি বিল) আনিতে হয়। (ব্রাইস্‌)

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এক অপরিবর্ত্তনীয় আর্থিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নহে। এক বৎসরের নীতির সহিত অন্য বৎসরের নীতির সামঞ্জস্য থাকে না। আর প্রত্যেক বৎসর যে টাকা খরচ হইবে তাহার সহিত যে টাকা তোলা হয় তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ যে টাকা তোলা হয় তাহা যাহা খরচ হইবে তাহার চাইতে অনেক বেশী। দুই বিপরীত মতাবলম্বী লোকদের দ্বারা গঠিত হইয়া দুই সমিতি দুই প্রকারের ব্যবস্থা করিতে পারে। প্রতিনিধি-সভা কোন বিভাগে ব্যয়-সংক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র-সভায় তাহার প্রতীকার হইবে বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-সভা বিমুখ হইলে নূতন বিল না আনিয়া উপায় থাকে না। মন্ত্রিগণের অনুপস্থিতির দরুণ আয়ব্যয়ের আলোচনা সেরূপ কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ বিবিধ কারণে জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে তাহা বিশেষ অনিষ্টকর না হইবার কারণ এই: (১) উচ্চ শুল্ক-ব্যবস্থার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আয় খুব বেশী হয়; (২) জাতীয় ঋণ তাড়াতাড়ি শোধ হইয়া গিয়াছে; (৩) যুক্তরাষ্ট্রের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ রহিয়াছে; (৪) গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খরচ সামান্য ছিল; (৬) যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপের সহিত সম্পর্ক অনেকটা না রাখিয়া অবস্থান করিতে পারিয়াছে।

উপরে বিশেষভাবে রাজস্বের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমিতিসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। ফ্রান্সের বিউরো ও কমিশনের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংল্যাণ্ডেও সমিতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সমিতির দ্বারা কার্য্য সমাধা করিবার প্রণালী যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ বহুলভাবে প্রযুক্ত হয় এমন আর কোথাও হয় না। বস্তুত, এই সব সমিতির কথা বুঝিতে না পারিলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার কথা কিছুই বুঝা যায় না। সমিতির দ্বারা আইন-প্রণয়নের মূল কথা এই যে, রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা উভয়েই আকারে বৃহৎ। এতগুলি লোকের একসঙ্গে শাসন বা আইন-প্রণয়ন করা সম্ভবপর নহে। সেই হেতু কার্য্যের সুবিধার জন্য উভয় সভাকে বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত করা হয় ও এক এক সমিতির উপর এক এক প্রকার কাজের ভার দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য এক ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সমিতিতে বসিবার কোন বাধা নাই। সমিতি প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার পর তাহা সমগ্র সভার নিকট আসে।

যুক্তরাষ্ট্রে সমিতির দ্বারা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা।

কোন সভাতেই সরকারী প্রতিনিধি কেহ থাকেন না, দলপতিও কেহ নাই, সুতরাং কাজ চালাইবার জন্য সমিতি স্থাপন করার প্রয়োজন গোড়া হইতেই হইয়াছিল। বিশেষত প্রতিনিধি-সভা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিলের উদ্যোক্তা বলিয়া ১৮০২ সনেই উক্ত সভায় পাঁচটি

সমিতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র-সভা ১৮১৬ সনের পূর্ব পর্যন্ত সমিতি ছাড়া কাজ চালাইয়াছে, ঐ সন হইতে সমিতি কায়েম করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ও লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার উদয় হইয়াছিল, সে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য একটির পর আর একটি সমিতি মোতায়েন হইতে থাকে। এই সকল সমিতি গঠনের দ্বারা এক দিকে যেমন সুশৃঙ্খলে কাজ চালাইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি সকলের দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কারণ প্রতিনিধি-সভায় সকলের পক্ষে কথা কহা বা কাজ করা সহজ না হইলেও তাহা সমিতিতে সম্ভবপর হইয়াছে।

রাষ্ট্র-সভার সমিতি।

১৯৩০ সনের নবেম্বর মাসে যে মহাসমিতি নির্বাচিত হইয়াছে (১৯৩১-৩৩) তাহা দ্বিসপ্ততিতম মহাসমিতি। একষষ্টিতম মহাসমিতিতে (১৯০৯ সনে) রাষ্ট্র-সভার ৭২টি সমিতি ছিল। রাষ্ট্র-সভার সভাপতি এই সব সমিতির অধ্যক্ষ ও সভ্যদের নির্বাচন করেন না, অপ্রকাশ্য ভোটের দ্বারা রাষ্ট্র-সভা নিজেই ইঁহাদের নিয়োগ করে। অতিজন ও ঊনজন দল আগেই ঠিক করিয়া রাখেন কে কোন্ সমিতিতে যাইবেন, রাষ্ট্র-সভায় ভোট লওয়া হয় মাত্র। সকল সমিতির আকার একরূপ নহে। সমিতিগুলি তিন হইতে সতের জন পর্যন্ত সভ্য লইয়া গঠিত হয়। অধিকাংশই পাঁচ হইতে চৌদ্দ পর্যন্ত সভ্য লইয়া গঠিত। বলা বাহুল্য, অনেককেই একের অধিক সমিতিতে থাকিতে হয়। কেহ কেহ চারিটি বা ততোধিক সমিতিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সমিতির অধ্যক্ষ সেই সব সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হন না, সমগ্র রাষ্ট্র-সভা কর্তৃক হন। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ সমিতিসমূহ (সিলেক্ট কমিটিস্) নির্বাচিত হইতে পারে, মহাসমিতির এক বৎসরের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমিতিসমূহের আয়ু শেষ হয়। প্রত্যেক বিল রাষ্ট্র-সভায় সাধারণতঃ বিনা আপত্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয়বার পড়া হইয়া থাকে। অতঃপর ঐ বিল কোন সমিতির নিকট প্রেরিত হয়। সমিতি উহা পরীক্ষা ও সংশোধনাদির পর আবার রাষ্ট্র-সভার নিকট পাঠায়।

প্রতিনিধি-সভার সমিতি।

দ্বিষষ্টিতম মহাসমিতিতে (অর্থাৎ ১৯১১ সনে) প্রতিনিধি-সভার সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৪। প্রত্যেক সমিতিতে তিন হইতে একুশ জন করিয়া সভ্য থাকেন। অধিকাংশ সমিতির সভ্য সংখ্যা ৫ বা ১৯। প্রতিনিধি-সভার প্রত্যেক সভ্য কোন না কোন সমিতিতে থাকেন, কিন্তু একের অধিক সমিতিতে খুব কম সভ্যই থাকেন। কয়েকটি প্রধান সমিতির নাম এই: অর্থ-সংস্থান (ওয়েজ্ অ্যাণ্ড মিন্স); ব্যয় (এপ্রোপ্রিয়েশন্স্); নির্বাচন; ব্যাঙ্কিং ও টাকা; শিল্পের; নদী ও বন্দর; বিচার; রেলওয়ে ও খাল; পর-রাষ্ট্র-নীতি; নৌ-নীতি; সামরিক নীতি; আভ্যন্তরীণ নীতি; সরকারী জমি; কৃষি ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রত্যেক মহাসমিতির প্রারম্ভে এক এক সমিতির সভ্যগণ নির্বাচিত হন ও মহাসমিতির যতদিন আয়ু ততদিন পর্যন্ত মোতায়েন থাকেন। সভ্যগণ নামে প্রতিনিধি-সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে অর্থ-সংস্থান সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ও প্রতিনিধি-সভা এই নির্বাচন গ্রাহ্য করে। প্রতিনিধি-সভার অতিজন দল অর্থ-সংস্থান সমিতির অতিজন দলকে নির্বাচিত করিয়া দেয় ও প্রতিনিধি-সভার তাহাতে সম্মতি থাকে। প্রথম যাঁহার নাম করা হয় তিনি অর্থ-সংস্থান সমিতির অধ্যক্ষ হন। প্রতিনিধি-সভায় বিল আনা হয়, ইহা আগেই বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ কোন

আলোচনা ব্যতিরেকে সেখানে বিলটি প্রথম ও দ্বিতীয়বার পড়া হইয়া গেলে পর উহা সমিতির নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিলকেই কোন না কোন সমিতির নিকট পাঠাইতে হয়। কিন্তু অনেক সময় কোন্ বিল কোন্ সমিতিতে পাঠান উচিত তাহা লইয়া সংশয় জন্মে। এরূপ সংশয় স্থলে সমগ্র প্রতিনিধি-সভায় ভোট লইয়া স্থির হয় বিলটি কোন্ সমিতিতে যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সমিতির গঠনের উপর ঐ বিলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সমিতিটি যদি অধিক সংখ্যক অনুকূলমতাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত হয়, তবে তাহা পাশ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, নচেৎ তাহা পণ্ড হইয়া যায়। কোন বিল কোন সমিতির নিকট উপস্থিত হইলে সাধারণত যে সভ্য ঐ বিল আনয়ন করিয়াছেন আগে তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা শুনা হয়। যে সকল সভ্য ঐ বিল পাশ হউক এরূপ ইচ্ছা করেন তাঁহারাও সমিতির নিকট উপস্থিত হইয়া বিলের স্বপক্ষে বলিতে পারেন। সমিতি যেরূপ খুসী বিলটিকে সংশোধন করিতে পারে, বিলটিকে একেবারে নিঃশেষ করিতে না পারিলেও বিরুদ্ধ মত দিতে পারে অথবা বৈঠকের শেষে খুব দেরী করিয়া ইহার সম্বন্ধে বিবরণী পাঠাইতে পারে বা আদৌ বিবরণী দাখিল না করিতে পারে। এইরূপে প্রতিনিধি-সভায় আনীত বিলসমূহের ৯/১০ অংশ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় (ব্রাইস্)। কোন্ সভ্য সমিতিতে কি বলিয়াছেন তাহা তিনি প্রতিনিধি-সভায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য নহেন। কোন কোন সমিতি, যেমন সামরিক নীতি সমিতি, আইন-প্রণয়ন আলোচনা না করিয়া শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়া থাকে। তখন সাক্ষ্য দিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ডাকিবার ক্ষমতা ঐ সমিতির আছে। মন্ত্রিগণ বা কর্ম্মচারিগণ রাষ্ট্র-নেতার ভৃত্য মাত্র। সুতরাং তাঁহারা যদি সরকারী কাগজপত্র দাখিল করিতে অস্বীকার করেন, তবে সমিতি তাঁহাদের বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা থাকায় সমিতিসমূহ পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলীর উপর শাসন চালায়। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সুপরিচালনার জন্য সর্ব্বদা টাকার দরকার হয়। কোন সমিতিকে চটাইলে সে টাকা বন্ধ হইয়া যাইবে। অথবা সমিতির আলোচনার ফলে দেশের লোকের চোখ ফুটিলে নূতন নূতন কঠিন আইন পাশ হইবার জন্য আসিতে পারে। সুতরাং সমিতির ভয়ে বিভিন্ন বিভাগকে যথেষ্ট সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। কোন বিল্ সমিতিতে বিবেচিত হইবার পর সংশোধিত হইলে সংশোধন সহ প্রতিনিধি-সভায় ফিরিয়া আসে। প্রতিনিধি-সভাতে কোন সমিতির নাম উল্লিখিত হইলে পর সমিতির সভ্যগণ যে ব্যক্তিকে বিবরণী দাখিল করিবার জন্য নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বলিবার জন্য এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। তিনি প্রায়ই পুরা এক ঘণ্টা সময় লন না।

সমিতিতে উপস্থাপিত বিল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

যুক্তরাষ্ট্রে দলের প্রাধান্য খুব বেশী। শাসন-ব্যাপারে দল ছাড়া এক পাও চলা যায় না। এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রে যে দুইটি প্রধান দল বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাদের নাম স্বারাজ্যবাদী (রিপাবলিকান্) ও গণতন্ত্রবাদী (ডিমোক্রাটিক)। এই দুই দলের উদ্ভবের ইতিহাস নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

যে সময়ে যৌথরাষ্ট্রের পত্তন হইয়াছিল সেই ১৭৮৭ সন হইতে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে

দুইটি বিপরীত মত স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। একটি সংহত ও সম্মিলিত রাষ্ট্রশক্তির অনুকূল। দ্বিতীয়টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের পার্থক্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যাকুল। কাঠামো-আইনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইতেছে,—এই আশঙ্কা কতকগুলি রাষ্ট্রে এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ঐ আইনের সহিত কতকগুলি সংশোধনী জুড়িয়া দেওয়া হইবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কাঠামো-আইন পাশ করা সম্ভবপর হয় ও তারপর তিন বৎসরের মধ্যে সেই সংশোধনীগুলি যোগ করা হয়। তারপর জর্জ ওয়াশিংটন রাষ্ট্র-নেতা হইলেন এবং রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা লইয়া রাষ্ট্রের কাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কাঠামো-আইন সম্পর্কে যে মতবিরোধ দেশে দেখা দিয়াছিল তাহা জর্জ ওয়াশিংটনের মন্ত্রি-সমিতির মধ্যেও দেখা দিল। অর্থসচিব আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন শক্তিশালী যৌথ শাসনের এবং স্বরাষ্ট্র সচিব জেফারসন বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইলেন। হ্যামিল্টনের দল কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধির স্বপক্ষে ছিলেন বলিয়া তাঁহার দলের নাম যৌথতত্ত্ববাদী (ফেডারেলিষ্ট)। ইঁহাদের বিপক্ষ দল স্বারাজ্যবাদী (রিপাব্লিকান্) বা গণতান্ত্রিক স্বারাজ্যবাদী (ডিমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকান্) বলিয়া কথিত হন। ফরাসী স্বরাজের উদ্ভব ও ইংরেজের সহিত উহার যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে এই দুই দলের রেষারেষি বাড়িয়া যায়। যৌথতত্ত্ববাদিগণ ১৭৯২ সনের ফরাসী বিভীষিকার পর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন ও ফরাসী কি ইংরাজ কাহারও পক্ষে যোগ না দিয়া যৌথরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইতে চেষ্টা করেন। অন্য দিকে, জেফারসনের দলের লোকেরা ফরাসী আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন; তাঁহারা যৌথরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া রাষ্ট্রীয়, স্থানীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রূপ লইয়া গঠিত হয়। উভয়েই রাজতন্ত্রের বিরোধী,—কিন্তু একটি জনগণের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন, স্বাধীনতার উপাসক, অন্যটি শক্তিশালী শাসন তথা শৃঙ্খলার পক্ষপাতী।

যুক্তরাষ্ট্রের দুই দলের উদ্ভব, যৌথতত্ত্ববাদী ও স্বারাজ্যবাদী।

প্রথমত যৌথতত্ত্ববাদিগণ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করেন। রাষ্ট্র-নেতা ওয়াশিংটন কোন দলের লোক না হইলেও হ্যামিল্টনের বুদ্ধি-কৌশলে এই দলে আসিয়া পড়েন। যৌথরাষ্ট্রের পত্তনের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং লোকে শক্তিশালী শাসনের পক্ষপাতী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু ওয়াশিংটনের পর জন অ্যাডাম্‌সের রাষ্ট্র-নেতা থাকার কালে যৌথতত্ত্ব-বাদিগণ যথেষ্ট শাসন-উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। ফলে ১৮০০ সনে জনগণ জেফারসনের বাণী কাণ পাতিয়া শোনে ও স্বারাজ্যবাদিগণ জয়লাভ করেন। জেফারসন দুইবার নির্ব্বাচিত হইয়া ১৮০৮ সন পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-নেতার পদে অবস্থান করার পর, তাঁহার বন্ধু ম্যাডিসন পরবর্ত্তী আট বৎসর ও তাঁহার শিষ্য মনরো তৎপরবর্ত্তী আট বৎসর নির্ব্বিবাদে রাষ্ট্রনেতৃত্ব করিবার অবকাশ পান। স্বারাজ্যবাদীর দল ক্রমে এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ সনের মধ্যে যৌথতত্ত্ববাদিগণ বিলুপ্ত হইয়া যান।

যৌথতত্ত্ববাদিগণের তিরোধান।

১৮২৪ সনের পর যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র দল—গণতান্ত্রিক স্বারাজ্যবাদীদের দল—থাকিবার কথা। কিন্তু ১৮২০ সনে মনরোকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন করিবার কালে দলের মধ্যে

যুক্ত-সংঘর্ষ দেখা দেয়, আর ইহার পর রাষ্ট্র-নেতার পদ লইয়া হেনরি ক্লে ও অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের (ইনি ১৮২৮ সনে রাষ্ট্র-নেতা হন) মধ্যে বিবাদ বাধিবার ফলে ১৮৩০ সনে দুইটি বড় দলের সৃষ্টি হয়। এই রাজনৈতিক দল দুটি অন্যান্য ছোট ছোট দলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। একটি দল গণতান্ত্রিক (ডিমোক্রাট) নামে পরিচিত হয়। এই দলের লোকেরা জেফারসনের স্বারাজ্য-বাদিগণের পশ্চাৎবর্তী। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার রক্ষা ও কাঠামো-আইনের কম প্রয়োগ এই দলের লক্ষ্য ছিল; প্রধানত দক্ষিণের লোকেরা ও চাষীরা এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিল বলিয়া ইহা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে মত দিত। অন্য দলটি প্রথমত জাতীয় স্বারাজ্যবাদী (ন্যাশনাল রিপাব্লিকান) ও পরে উদারমতাবলম্বী (হুইগ) নামে কথিত হয়। ইঁহারা যৌথতন্ত্রবাদি-গণের অনেক মত গ্রহণ করেন। শিল্প-সংরক্ষণের জন্য শুল্ক, আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য টাকা খরচ, জলস্থল সৈন্যবৃদ্ধি ইহাদের পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। ১৮১৯ সনে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। মিসৌরি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করে। মিসৌরিতে তখন দাসত্ব-প্রথা ছিল। প্রশ্ন উঠে যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইলে ঐ প্রথা সেখানে থাকিবে কি না। উত্তরের সমস্ত রাষ্ট্র থাকার বিপক্ষে ও দক্ষিণের সমস্ত রাষ্ট্র থাকার স্বপক্ষে ভোট দেয়। এই ঘটনা লইয়া ভয়ানক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। সেবারকার মত একটি রফা করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়। রফায় কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত রাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথা থাকিতে পারিবে না, তাহা স্থির হয়। মিসৌরিতে উহা রহিয়া যায়। ১৮৪০ সনে ব্যাপার আবার সঙ্গীন হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বে যখনই একটি দাসহীন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে তখনই একটি দাসযুক্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। উহার ফলে উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান হওয়ায় কোন গণ্ডগোল ঘটে নাই। কিন্তু ঐ সনে যে সকল রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইতে বাকী ছিল সেগুলির অধিকাংশ যে ভূভাগে অবস্থিত ছিল তাহা উপরি উক্ত রফা অনুসারে দাসত্বহীন হইবার কথা। ১৮৫০ সনে ক্যালিফোর্নিয়া দাসহীন রাষ্ট্ররূপে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইতে চাহিলে সমগ্র দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। উত্তরের লোকেরা রাষ্ট্র-সভায় সংখ্যায় পুষ্ট হইলে দক্ষিণের লোকেরা আর দাস-ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না, ইহাই হইল আন্দোলনের কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গণতান্ত্রিক বা উদারমতাবলম্বী কোন দলই এই আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে যোগ দিতে সাহস করে নাই, কারণ উভয় দলেই দাসব্যবসায়ী লোক ছিলেন। উদার-মতাবলম্বীরা একটি রফা করিয়া ক্যালিফোর্নিয়াকে গ্রহণ করেন ও দক্ষিণ দেশকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'পলাতক দাস আইন' পাশ করা হয়। কিন্তু ফলে পরবর্তী রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে (১৮৫২ সন) উদারমতাবলম্বীরা ভয়ানক রকম হারিয়া গেলেন এবং ১৮৫৪ সনে যখন এক বিল উপস্থিত করিলেন যে, কন্সাস্ রাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথা থাকিবে কি না তাহা জনগণ বিচার করিয়া স্থির করিবে তখন তাঁহাদের দল একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ ১৮২০ হইতে ১৮৫৬ সনের মধ্যে উদারমতাবলম্বী দলের উত্থান ও পতন ঘটিল। এই সময়কার তিনটি প্রধান ঘটনা এই: (১) যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োরোপ হইতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি; (২) উত্তর ও পশ্চিমের রাষ্ট্রসমূহে জাতীয়তা বোধের বৃদ্ধি ও দাস-অধিস্বামিগণের যৌথরাষ্ট্র ত্যাগের ইচ্ছা; (৩) দল গঠনের জটিল উপায়ের বিকাশ।

স্বারাজ্যবাদী দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গণতন্ত্রবাদী ও উদার-মতাবলম্বী দলের সৃষ্টি হইল।

উদার মতাবলম্বী দলের পতন।

গণতান্ত্রিকগণ দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে একেশ্বর হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনে উচ্চতম বিচারালয় দাস-স্বামীদের সম্বন্ধে এক রায় দেওয়ার ফলে উদারমতাবলম্বী দল অন্য কয়েকটি অপ্রধান দলের সহিত মিলিত হইয়া "স্বারাজ্যবাদী" (রিপাবলিকান) নামে পুনরায় এক নূতন দল খাড়া করিলেন। ১৮৬০ সনে রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন বিষয়ে গণতান্ত্রিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। এই সুযোগে এই নূতন দল আব্রাহাম লিঙ্কনকে রাষ্ট্র-নেতা করিয়া বসিল। স্বারাজ্যবাদিগণ দাসত্বপ্রথার সঙ্কোচনে বদ্ধপরিকর হইল এবং যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেক বাড়াইল। ইহার পর দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ অংশে যে যুদ্ধ হয় তাহা ইতিহাস-বিখ্যাত হইয়াছে। যুদ্ধকালে যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক দল মাথা তুলিতে পারে নাই, কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর নিগ্রোদের বহু অধিকার স্বীকৃত হইয়া গেলে এই দলের লোকেরা আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়া উঠেন। ১৮৫৬ হইতে ১৮৭৬ সনের মধ্যে দাসত্ব-প্রথার বৃদ্ধি থামাইবার জন্য স্বারাজ্যবাদিগণের উদ্ভব হয়, তাঁহারা দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করিতে যুদ্ধ করেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে এরূপ দৃঢ় করেন যে, পূর্ব্বে আর তাহা কখনো সম্ভবপর হয় নাই।

গণতান্ত্রিক দলের জয়লাভ সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে অনৈক্য বশত স্বারাজ্য দল কর্তৃক রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন।

১৮৭৬ সনের পর অনেক নূতন অবস্থা ও সমস্যার উদয় হইয়াছে, কিন্তু তখনকার দুই দল আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং দুই দল অতিশয় শক্তিশালী হইলেও যে সকল কারণে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলি এক্ষণে আর বর্ত্তমান নাই। পূর্ব্বে যে সকল বাণী লইয়া এই দুই দল নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিত এখনও তাহাই করে, কিন্তু এক্ষণে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন গভীর নহে এবং দুয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে রাষ্ট্র-নেতার পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার রাজ-নৈতিক পদ দখল করা। আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে সেগুলি সমাধানের জন্য দুই দলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রায় দেখা যায় না। মদের ব্যবসা কমাইয়া দেওয়া বা একেবারে বন্ধ করা সমীচীন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কোন দলই একেবারে মদ্যপান বিরোধী মত চালাইতে সাহস করে নাই। কাঠামো-আইনে সংশোধনী করিয়া ভোলষ্টেড আইন দ্বারা এক্ষণে "মদ্যপান নিষিদ্ধ" করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন একটি দলের বিশেষ কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করা চলে না। প্রায় যৌথরাষ্ট্রের পত্তনের সময় হইতে অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের চিত্তকে বিশেষ ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে। ঘরোয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে গণতান্ত্রিকগণ অনেকটা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও স্বারাজ্যবাদিগণ উঁচু হারে শুল্ক রাখিবার পক্ষপাতী বলিয়া লোকে মনে করে, তথাপি এক্ষণে গণতান্ত্রিকগণ হয় শুল্ক সম্পর্কে বাধা দেন না নচেৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে দেন না। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সংক্রান্ত সংস্কারের জন্য কমিশন বসিলে উভয় দলই তাহার অনুমোদন করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যে সব রেল কোম্পানি ব্যবসাবাণিজ্যের সহায়তা করে সেগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব থাকা দরকার, ইহা দুই দলই স্বীকার করে। কিন্তু কোন দলই এবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করে নাই। গণতান্ত্রিকগণ ফিলিপাইন দখলের বিরোধী হইলেও পোর্টো-রিকোর শাসন লইয়া দুই দলে বিবাদ হয় না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার, ভোট দিবার

১৮৭৬ সনের পর দেশে নূতন সমস্যা দেখা দিলেও আর দলের ভাঙাগড়া হয় নাই।

প্রথা সংস্কার, শ্রমকাল সম্বন্ধে আইন ইত্যাদি কোন বিষয়ই উভয় পক্ষকে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত করে না।

উত্তরের উদারমতাবলম্বীর ধ্বংসাবশেষ হইতে লোকেরা দক্ষিণের দাসত্ব-প্রথার প্রতি বীতরাগ হইয়া বর্ত্তমান স্বারাজ্য দল গঠন করে। গণতান্ত্রিকগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ নিজ দল ত্যাগ করিয়া এই দলে যোগ দেন। এই দলের অনেকে নিজেদের জেফারসনের প্রকৃত শিষ্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদকে কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোড়া হইতেই স্বারাজ্য দলকে উত্তর দেশসমূহের দলরূপে দেখা যায়। যৌথতত্ত্ববাদিগণ বা উদারমতবালম্বিগণ কম বেশী দক্ষিণের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু স্বারাজ্য দল প্রধানত উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। উদারমতাবলম্বীরা এই দলে থাকিয়া ইহাকে ঐক্য, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ধনী ব্যক্তির সাহচর্য্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছিল। দাসত্ববিরোধিগণ শক্তি ও উৎসাহ দ্বারা ইহাকে যুদ্ধকালে স্থিরভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে দিয়াছিল। সমগ্র উত্তরাঞ্চল ব্যাপিয়া বণিক্, শিল্পী ও ছোট বড় সহরের করিৎকর্ম্মা লোকেরা প্রায় অধিকাংশ স্বারাজ্যবাদী। চাষীরাও অনেকে এই পক্ষের। ঘরোয়া যুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা এ পক্ষে ছিল তাহারা এখনও তাহাই আছে। উত্তরাঞ্চল যেমন প্রধানত স্বারাজ্যবাদী, দক্ষিণাঞ্চল সেইরূপ প্রধানত গণতান্ত্রিক। দক্ষিণের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই দলের অন্তর্গত। মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহ, যেমন নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, ওহিও, ইণ্ডিয়ানা ইত্যাদি কখনো স্বারাজ্য দলের কখনো গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে অতিজন ভোট দেয়, কিন্তু এই সকল রাষ্ট্রে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বারাজ্য দলের অন্তর্গত। এই দলে অনেক পরোপকারী, বিদ্বান্, অর্থতত্ত্ববিৎ ও বিত্তশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন। যুদ্ধকালে দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে এই প্রকার লোকেরা বহুল পরিমাণে স্বারাজ্য দলে যোগ দেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আজ বৃদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আর ঠিক এই কারণেই গণতান্ত্রিকগণ উত্তরে ও পশ্চিমে সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন। দক্ষিণের প্রতি মমতার জন্য ইঁহারা নিন্দাভাজন হন। দক্ষিণকে সম্পূর্ণ বশে আনিবার পর নূতন নূতন সমস্যার উদয়ে লোকের মনে দক্ষিণের প্রতি বিদ্বেষ চলিয়া যায়। ১৮৬৯ হইতে ১৮৮৫ সন অবধি সরকারের বিরোধী পক্ষরূপে এই দলকে সর্ব্বদা সরকারের কাজের উপর চোখ রাখিতে ও সমালোচনা করিতে হইত। এইরূপে ইঁহারা নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হন। দক্ষিণে যাঁহাদের বিদ্যা ও ধন আছে তাঁহারাই গণতান্ত্রিক। দক্ষিণের অধিকাংশ চাষী ও দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ আর মধ্যবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের ও উত্তর-পশ্চিমের অল্পসংখ্যক সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র ব্যক্তি এই দলের অন্তর্গত। নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রান্তদেশেও এই দলের লোক কিছু কিছু দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ অঞ্চলে কোন্ দলের প্রাধান্য।

পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির আগমনে কখনো স্বারাজ্য দলের কখনো বা গণতান্ত্রিক দলের শক্তি বাড়িত। এক্ষণে তাহা হয় না। কারণ বিদেশ হইতে এক্ষণে আর সেরূপ লোক আসে না। বিদেশ হইতে আগত কোন জাতি এক্ষণে দুই তিন পুরুষের মধ্যে একেবারে আমেরিকান বনিয়া যায়। তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব প্রায়ই আর কিছু থাকে

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন্ জাতি কোন্ দলে যোগ দিয়াছে।

না। ১৮৯০ সনে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকান্ ছাড়া নিম্নলিখিত জাতিসমূহের জনগণ দ্বারা গঠিত ছিল: বৃটিশ, জার্মাণ, স্কাণ্ডিনেভিয়ান, ফরাসী ক্যানাডিয়ান। ইংরেজ ও স্কচেরা সংখ্যায় অনেক হইলেও যুক্তরাষ্ট্রে দেশবাসীদের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ নিজের বৃটিশ প্রজার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আমেরিকান হয় নাই। যাহারা হইয়াছে তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন বিশেষ দলে যোগ দিবার পক্ষপাতী নহে।

(১) ইংরেজ,

দেখা যায় যে আইরিশরা দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের জাতীয়তা বজায় রাখিয়া চলে। আইরিশরা বহুকাল ধরিয়া প্রায় সকলেই গণতান্ত্রিক ছিল। ১৮১২ সনে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বহু লোক যুক্তরাষ্ট্রে আসে, তারপর ১৮৪৭ সনে দুর্ভিক্ষের পর ইহাদের সংখ্যা আরো বহুগুণ বাড়িয়া যায়। সে সময়ে ইহারা গণতান্ত্রিকদের বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে স্বারাজ্য দলের মধ্যেও অনেক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীকে দেখা যায়।

(২) আইরিশ,

জার্ম্মাণরা আইরিশদের পরে আসিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে আইরিশদের সহিত ইহাদের মনোমালিন্য ছিল বলিয়া কতকটা সেই কারণে আর কতকটা জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকেরা দাসত্বের বিরোধী ছিল বলিয়া ইহারা স্বারাজ্য দলের দিকে ঝুঁকে। মধ্য ও পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহে জার্ম্মাণরা চাষবাস আরম্ভ করে। এই অঞ্চলদ্বয়ের অধিবাসীরা প্রধানত স্বারাজ্যবাদী বলিয়া ইহাদের পক্ষে এ অঞ্চলে বাস করা সহজ হয়। কিন্তু এখানে জার্ম্মাণগণতান্ত্রিকের সংখ্যাও কম নহে। জার্ম্মাণরা স্বদেশের মত্ত ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় স্বারাজ্যদলের মত্তবিরোধিতা অনুমোদন করে না। ব্রাইস্ বলেন জার্ম্মাণদের নয় ভাগের পাঁচ ভাগ স্বারাজ্যবাদী আর নয় ভাগের চারিভাগ গণতন্ত্রবাদী। কিন্তু এক্ষণে জার্ম্মাণরা জাতি হিসাবে কোন বিষয়ে একত্র ভোট দেয় না। কারণ ইহারা উত্তরোত্তর আমেরিকানদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুইডেন-নরওয়ের অধিবাসী, অল্পসংখ্যক আইসল্যাণ্ডবাসী ও দিনেমারদের বিশেষভাবে উইস্‌কন্‌সিন, মিন্নেসোটা ও উভয় ডাকোটায় দেখা যায়। ইহারা খুব তাড়াতাড়ি আমেরিকান্ বনিয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রায় দশভাগের নয়ভাগ স্বারাজ্য দলে। কিন্তু তথাকথিত "জনগণের দল" (পীপ্‌ল্‌স্ পার্টি) এর উদ্ভবের পর অনেকে গণতন্ত্রবাদীদের দলে চলিয়া যায়। তথাপি এখনও অধিকাংশ স্বারাজ্যবাদী রহিয়াছে।

(৩) জার্ম্মাণ,

(৪) স্কাণ্ডিনেভিয়ান,

ফরাসী ক্যানাডিয়ানরা নিউ ইংল্যাণ্ড ও ২১টি উত্তর রাষ্ট্রে ছাড়া অন্যত্র সংখ্যায় বেশী নহে। ইহারা সহজে বৃটিশ প্রজার স্বত্ব ত্যাগ করে না বলিয়া ইহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বেশী হইতে পারে নাই। গণতান্ত্রিকদের দিকেই সাধারণত ইহারা ভোট দেয়, যদিও স্বারাজ্যদলের পক্ষে কখনো কখনো ভোট দিয়াছে।

(৫) ফরাসী ক্যানাডিয়ান,

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে নিগ্রোদের সংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক, ওহিও ও ইণ্ডিয়ানায় তাহাদের ভোট নগণ্য নহে, বিশেষত যখন কোন রাষ্ট্রের ভোটের ফল সন্দেহ জনক (অর্থাৎ দুই পক্ষের ভোট প্রায় সমান) হয় তখন তাহাদের ভোট কোন দলের জয়পরাজয়ের কারণ হয়। তাহারা দাসত্বের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সুতরাং কৃতজ্ঞতা বশত তাহাদের স্বারাজ্যদলের পক্ষে ভোট দেওয়াই স্বাভাবিক। মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি ও মিসৌরিতে শ্বেত স্বারাজ্যবাদীদের সংখ্যা বেশী, বিপক্ষের লোকেরা কিনিয়া লইতে না পারিলে

(৬) নিগ্রো।

এই সকল অঞ্চলের নিগ্রোরা স্বারাজ্যবাদীদের ভোট দেয়। দক্ষিণে তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, তাহারা শ্বেত অধিবাসীদের সমান উন্নত হইলে রাষ্ট্র-নেতার নির্বাচন পর্যন্ত চালাইতে পারিত, কিন্তু অনুন্নত বলিয়া তাহা হয় নাই। গোড়াতে তাহারা সকলে স্বারাজ্যবাদীদের পক্ষে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন দেখিল তাহাতে তাহাদের কোন লাভ হইল না তখন গণতন্ত্রবাদিগণ তাহাদের অনেক ভোট ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। দক্ষিণের রাষ্ট্র-সমূহ একণে নিজ নিজ রাষ্ট্রে এরূপ রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে যে, তাহার ফলে প্রায় ১০ ভাগের ৯ ভাগ নিগ্রোদের ভোট নাই। (ব্রাইস্)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দল—স্বারাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবাদী। কিন্তু ইহা ছাড়াও কতকগুলি ছোট ছোট দল আছে। যৌথতন্ত্রবাদিগণ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ১৮২০ সন হইতে ১৮৩০ সন পর্যন্ত অন্ত দলটি দুই ছোট ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার পর ক্রমাগত নূতন নূতন দলের উদ্ভব ও বিলয় হইতে থাকে। একণে দুইটি প্রধান দল ছাড়া আরো দুতিনটি জাতীয় দল বর্তমান রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল :

প্রথম অপ্রধান দলের নাম ছিল গ্রীণব্যাকার (সবুজপৃষ্ঠ নোট বাড়াইবার পক্ষপাতী)। ঘরোয়া যুদ্ধ শেষ হইবার পর ইহাদের উদ্ভব হয়। ইহারা গ্রীণব্যাক নামক কাগজী মুদ্রার বহুল প্রচার প্রার্থনা করে। ইহাদের যুক্তি এই ছিল যে, দেশে টাকা বেশী হইলে গরীবদের হাতে টাকা বেশী আসিবে ও তাহারা স্বচ্ছন্দে থাকিবে। ঘরোয়া যুদ্ধের কালে বেশী কাজ জুটিত ও মজুরি বাড়িয়াছিল। সেই অবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত লোকে কাগজী মুদ্রার পক্ষপাতী হয়, ভাবিত এইরূপে বুঝি দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। গ্রীণব্যাকের দলের নাম প্রথমে স্বাধীন দল ছিল। ১৮৭৬ সনে ইহারা এক জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক বসাইয়া রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থী দুইজন লোককে নির্বাচন করে। তাহাতে ১৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন। ইহারা দুইটি প্রধান দলের আর্থিক নীতিরই কটু সমালোচনা করে। ইহারা ১৮৮০ ও ১৮৮৪ সনেও এরূপ নির্বাচন করে। কিন্তু ভোটের সময় অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার পর এই দল বিলুপ্ত হইলে এই দলের কেহ কেহ পপুলিষ্ট বা জনগণের দলে যোগ দেয়। (১) গ্রীন ব্যাকার।

গ্রীণব্যাকরা প্রধানত চাষী ছিল। মজুর ও সমাজতন্ত্রবাদী দল প্রধানত খনি ও সহরের মজুর। বাহির হইতে আগত অনেকে এই দলে যোগ দিয়াছে। বিশেষত অনেক জার্মাণ, ইহুদী, পোল, চেক ও অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর স্লাভ এই দলে দেখা যায়। মোটামুটি এই দলের নেতারা জমিকে জাতীয় সম্পত্তিকরণ ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর বসান, জাতীয় শাসনব্যবস্থা কর্ত্তৃক রেলরোড ও টেলিগ্রাফ গ্রহণ, একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, রেলরোডকে প্রদত্ত জমি পুনর্গ্রহণ, শিক্ষা বৃদ্ধি, কাজের সময় সঙ্কোচন ইত্যাদি করিতে চাহেন। মজুর দল ১৮৮৮ সনে প্রথম রাষ্ট্র-নেতার একজন পদপ্রার্থী নির্বাচন করে। কিন্তু সে সময়ে এই দল বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং নির্বাচনে সফলতা ঘটে নাই। কিন্তু রাষ্ট্র ও সহরের নির্বাচনে এই দল প্রায়ই লোক নির্বাচন করে। কোন কোন বৎসরে ইহারা অনেক ভোট যোগাড় করিয়াছে। ১৮৯২ সনে এই দলের একটি ভাগ নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী (২) মজুর।

মজুরদল বলিয়া অভিহিত করিতে থাকে। ১৯০০ সন হইতে ইহারা শুধু সমাজতন্ত্রবাদী (সোশ্যালিষ্ট) নামে পরিচিত হইতেছে। ইহারা নিজেরা প্রবল না হইলেও এক বা অন্ত দলের সহিত যোগ দিয়া সেই দলকে প্রবল করিতে পারে।

(৩) সমাজতন্ত্রবাদী।

১৮৭২ সন হইতে মদ্যপানবিরোধী দল রীতিমতভাবে জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক বসাইয়া রাষ্ট্র-নেতা ও সহকারী রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থীদের মনোনয়ন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দলের অর্থাৎ যাহারা স্বারাজ্য বা গণতান্ত্রিক দলে থাকিয়াও এই দলে যোগ দেয় তাহারা ছাড়া অন্তেরা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য। ইহাদের সহিত মিতাচারী (টেম্পারেন্স) লোকদের পার্থক্য এই যে, মিতাচারিগণ একেবারে আইন করিয়া মদ্যপান তুলিয়া দিবার বিরোধী যদিও ইঁহারা মদ্যপানের পক্ষপাতী নহেন। স্বারাজ্য ও গণতান্ত্রিক দলে ইহাদের সংখ্যা অনেক। বর্ত্তমান কালে এই ক্ষুদ্র দলও রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে সংশোধনী আনিয়া মদ্যপান আইন দ্বারা নিবারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৪) মদ্যপান বিরোধী।

পুরাতন প্রচলিত দলগুলি ভাল নয়, আইন করিয়া চাষীদের অবস্থা ভাল করিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব লইয়া একদল লোক 'চাষীদের সঙ্ঘ' দল গঠন করেন। ইহাই পরে জনগণের (পীপল্স বা পপুলিষ্ট) দল নামে অভিহিত হয়। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সনে এই দল পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রাধান্য লাভ করে। কোন কোন সময়ে ইহারা গ্রীণব্যাক ও মজুর দলের সহিত একত্র হয়। ১৮৯২ সনে এই দল রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থী নির্ব্বাচন করে। কিন্তু তারপর হইতে ইহার অবনতি আরম্ভ হয়। ১৯০০, ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১২ সনে সমাজতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী মজুরদল রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থী খাড়া করে। ১৯০৮ সনে স্বাধীন দল দেখা দেয়। এই সকল ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদীরা ১৯১২ সনে সবচেয়ে বেশী ভোট পায়,—৯০১,৮৭৩। ১৯১২ সনে উন্নতিবাদী দল রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থী দাঁড় করায়।

(৫) জনগণের দল।

১৮৮৪ সনের রাষ্ট্র-নেতা নির্ব্বাচন সময়ে স্বারাজ্যবাদী দলের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিজ দলের মনোনীত ব্লেইনকে ভোট দিতে অস্বীকার করেন। কেহ কেহ ভোট দেন না, অন্য কেহ কেহ মদ্যপানবিরোধী সেন্ট জনকে ভোট দেন, যদিও তাঁহারা জানিতেন এই ভোট নিরর্থক হইবে। কিন্তু এই দলের অধিকাংশ গণতন্ত্রবাদী নিযুক্ত ক্লীব্‌-ল্যাণ্ডের পক্ষে ভোট দেন। এই দলকে তখন মাগওয়াম্প (স্বদল পরিত্যাগী) বলা হইত। ইঁহাদের কতক এক্ষণে নিজ দলে ফিরিয়া গিয়াছেন, কতক গণতন্ত্রবাদী দলে যোগ দিয়াছেন।

(৬) মাগ্‌ওয়াম্প দল।

যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট দলের সহিত বড় দুইটি রাজনৈতিক দলের একটা গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। রাজনৈতিক বড় দল দুটি যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারা সমগ্র দেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ১৯৩০ সনের পর যে চারিটি দল রাষ্ট্র-নেতার মনোনয়নের বৈঠক বসাইয়াছে, তাহারা গোটা দেশ জুড়িয়া আপনাদের প্রতিষ্ঠান মোতায়েন রাখিতে সচেষ্ট হয় নাই। এক এক দল এক এক স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাময়িক কোন সমস্যার সমাধানের জন্য যেখানে ছোট দলের প্রাধান্য বেশী সেখানে নূতন একটি দল রাষ্ট্র-নেতা দাঁড় করায়, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নহে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান দলের সংখ্যা কেন দু'য়ের অধিক নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের মত এরূপ বিশাল দেশে দলের সংখ্যা আরো বেশী না হইবার কয়েকটি

কারণ এই : (১) সমগ্র দেশের কোন স্থানবিশেষে আবদ্ধ দলের পক্ষে সমগ্র আমেরিকাবাসীর সহানুভূতি পাওয়া আবশ্যক ; (২) নূতন জাতীয় দল স্থাপন বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য ; (৩) উভয় দলের লোকদের মধ্যে যে দলপ্রীতি আছে তাহা সহজে বিনষ্ট হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কোন দলই একজন বা দুইজন বড় নেতার অধীনে বহুকাল ধরিয়া পরিচালিত হয় না। আইন-প্রণয়ন ও শাসনবিভাগ সুস্পষ্টরূপে বিভিন্ন হওয়ায় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

দলের পক্ষে প্রধান কথা হইল রাষ্ট্র-নেতার বা সহকারী রাষ্ট্র-নেতার পদপ্রার্থীর নির্ব্বাচন। এ কাজ দলের সভাতে করা হয়। সে সভাকে কনভেনশন বা মনোনয়ন বৈঠক বলে। কোন দল কোন নীতি অবলম্বন করিবে কি না তাহা বৈঠকে স্থিরীকৃত হয় এবং তাহা পুস্তিকা ইত্যাদি দ্বারা ঘোষিত হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিবিদ্‌গণ শুধু রাজনীতিতে লিপ্ত হইতে বাধ্য থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ্‌গণের সহিত ইংলাণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি কয়েকটি দেশের রাজনীতিবিদ্‌গণের পার্থক্য এই যে, আমেরিকান রাজনীতিবিদ্‌গণকে তাঁহাদের সমগ্র সময় রাজনৈতিক কার্য্যে দিতে ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ দেন, তাঁহাদের ঐরূপে অন্তত জীবিকা অর্জ্জনের পথ থাকা চাই। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিতে যোগ দান আর কোন না কোন রাষ্ট্রীয় চাকুরী গ্রহণ প্রায় অভিন্ন বস্তু। সত্য বটে, অল্প কতকজন লোক শুধু রাজনৈতিক জীবনই কাম্য বলিয়া মনে করেন, তথাপি মোটামুটি ইহা বলা চলে যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যদি অন্তত জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ও না থাকিত, তবে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতির আকর্ষণ থাকিত না। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকে যে সকল কারণে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না তাহার কয়েকটি এই : (১) যৌথরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ্ হইতে হইলে ওয়াশিংটনে থাকিতে হয়। কিন্তু ওয়াশিংটনে সামাজিক মেলামেশার বা বাণিজ্য চালানোর সুযোগ কম। (২) কম চেষ্টায় আপনা হইতে কেহ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। নাম বা সম্পর্কের জোরে কেহ সহজে তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ হয় না। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার রাষ্ট্র বা জিলা কর্ত্তৃক মনোনীত না হন তবে তাঁহার অন্য কোন স্থান হইতে মনোনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। (৪) যুক্তরাষ্ট্রে যে দুই প্রশ্ন লইয়া বিশেষ উত্তেজনা ও আকর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারিত তাহা হইতেছে পররাষ্ট্রনীতি ও কাঠামো-আইনের সংশোধন। কিন্তু ঐ দেশে পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্ত্তন ও কাঠামো-আইনের সংশোধন কম হয়। (৫) যুক্তরাষ্ট্রে যে দরিদ্র সেও কালে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে, তাহার সে সুযোগ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ধনী বা দরিদ্র নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক মনে করে না। (৬) যৌথরাষ্ট্রের মহাসমিতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাগুলি দেশের আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে। ইহাতে মহাসমিতির ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে ও অনেকে মহাসমিতিতে প্রবেশ করা আর আবশ্যক মনে করেন না। (৭) যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি ব্যতীত অনেক বড় বড় ক্ষেত্র আছে যেখানে লোকে

খ্যাতি, অর্থ ইত্যাদি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রেলওয়ে প্রভৃতি। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হন।

দল গঠনের মূলকথা।

যেমন বাধ্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে, সেইরূপ সুচারুরূপে দল গঠন করিতে না পারিলে রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের কল্পনা করা আকাশকুসুম মাত্র। আর দল-গঠনও বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি মাত্র প্রবল দল বর্ত্তমান থাকায় দল-গঠন ও ভোট গ্রহণ ব্যাপারে এই দেশ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে দলের প্রধান কাজ হইতেছে, বিভিন্ন কাজের জন্য লোক-নির্ব্বাচন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল স্থান নির্ব্বাচন দ্বারা পূরণ করা হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী; দ্বিতীয়ত, অনেক ব্যক্তির কার্য্যকাল অল্প। সুতরাং অল্প সময়ের ব্যবধানে বহুসংখ্যক নির্ব্বাচন হইয়া থাকে বলিয়া দুইটি দলকেই সর্ব্বদা আগে থেকে পদপ্রার্থীদের ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। নির্ব্বাচন-প্রার্থী কোন ব্যক্তি তিন উপায়ে নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াইতে পারেন: (১) তিনি স্বয়ং ভোটদাতাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ভোট সংগ্রহ করিতে পারেন; (২) কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলিত ভাবে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে তাঁহার পক্ষে ভোট যোগাড় করিতে পারেন; (৩) জনগণ অর্থাৎ দলের সভ্যেরা, একত্র মিলিত হইয়া ভোট দিয়া হউক বা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে হউক, তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এই তৃতীয় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রথার কয়েকটি সুবিধা এই: (১) নির্ভরযোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ দলের লোকেরা ভাল ও বিশ্বাসযোগ্য লোককেই নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; (২) দলের প্রাধান্য ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে; (৩) নির্ব্বাচিত ব্যক্তি দলের অনুমোদিত বলিয়া তিনি জোরের সহিত নিজ মতানুসারে কাজ করিতে পারেন; (৪) জনমত তথা গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলা হয়। কোন ব্যক্তি নিজেকে ভোটদাতাদের নিকট উপস্থিত করিলে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নীতি খণ্ডিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জনগণের যাহাকে খুসী নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আছে,—নির্ব্বাচনপ্রার্থী দাঁড়াইলে সেই অধিকার খর্ব্ব করা হয়, ইহাই হইল যুক্তরাষ্ট্রের মত। সুতরাং শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হন তাহা নহে, যাঁহারা এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তার পদপ্রার্থীরূপে দাঁড়ান তাঁহাদেরও সকলকে নির্ব্বাচিত করা রীতি।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচন প্রথা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক দলের দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের একটি স্থায়ী ও অন্যটি অস্থায়ী। স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজ দল পরিচালনা করা, আর অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজ বিভিন্ন পদপ্রার্থীদের মনোনয়ন করা।

পরিচালনা সমিতি।

বহু পরিচালনা-সমিতি (ম্যানেজিং কমিটি) যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র মোতায়েন আছে। যেখানে নির্ব্বাচন হয় সেখানেই প্রায় একটি করিয়া এইরূপ সমিতি থাকে। কোন কোন রাষ্ট্রে প্রত্যেক নির্ব্বাচন-জিলায় একটি করিয়া সমিতি আছে। কোথাও বা বড় বড় শহর বা জিলা জুড়িয়া সমিতি রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি সমিতি আছে। একটি সমিতি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়া-

কলাপ, বিশেষত রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন, নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র সমিতি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই সব সমিতি প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান, কিন্তু প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র-সমিতি সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত জিলা ও শহরের সমিতিসমূহকে নির্দ্দেশ করিতে পারে ও সেই নির্দ্দেশ উহারা অবহেলা করিতে পারে না। এই সকল সমিতি সাধারণত নির্ব্বাচন ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার জন্য টাকা তুলে ও খরচ করে, দরকার হইলেই সভা ডাকে, ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করে, বিভিন্ন পত্রিকার মারফৎ নিজেদের প্রচার-কার্য্য চালায়। নির্ব্বাচন-কালে ইহাদের কার্য্যভার প্রায়ই-নির্ব্বাচন "অভিযান সমিতিসমূহের" (ক্যাম্পেন কমিটি) হাতে দেওয়া হয়। এই সকল সমিতি বৎসর বৎসর প্রাথমিক সভা (প্রাইমারি) বা বৈঠক (কনভেনশন) কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচিত হয়। পুনরায় নির্ব্বাচনের পর কোন সমিতি একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৎসরের পর বৎসর প্রায় একই লোকেরা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বিশেষত কোন সমিতির অধ্যক্ষ সাধারণত স্থায়ী কর্ম্মচারী হইয়া দাঁড়ান এবং ইঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খুব বেশী হয়,—ইনি প্রতি বৎসর রাশি রাশি টাকা খরচ ও অনেক লোককে কাজে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই সব সমিতি শুধু একটি কাজ করিতে পারে না, তাহা পদপ্রার্থীদের নির্ব্বাচন করা। এ কাজ মনোনয়নকারী সভাসমূহ করে।

প্রাথমিক সভা।

প্রত্যেক নির্ব্বাচন-জিলায় শাসন, আইন ও বিচার সম্পর্কে দলীয় লোকদের নির্ব্বাচন করিবার জন্য দলের সভা হয়। এই সভা মনোনয়নকারী (নমিনেটিং) সভা। যদি ঐ জিলা অবিভক্ত হয় অর্থাৎ ছোট ছোট জিলায় বিভক্ত না হয় তবে উহাকে প্রাইমারি কহে। শহর বা অন্য ক্ষুদ্রায়তন স্থানের অন্তর্গত স্বদলভুক্ত ভোটদাতাদের লইয়া প্রাথমিক সভা গঠিত। প্রাথমিক সভার কাজ দুটি—(১) স্থানীয় জিলা কর্ম্মচারীদের নিয়োগ; (২) বৃহত্তর স্থানের মনোনয়নকারী সভাসমূহের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ। সাধারণত, সকল ভোটদাতা আসিয়া ভোট দেয় না বলিয়া, যাহারা আসে তাহাদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র সমাগত হইয়া সাক্ষাৎভাবে ভোট দেওয়া অসম্ভব হয় না। কিন্তু নির্ব্বাচন-জিলা বৃহৎ হইলে বিভিন্ন স্থানের লোকেরা একত্র ভোট দিতে পারে না বলিয়া তাহাদের প্রতিনিধি পাঠায়। তখন পদপ্রার্থীদের নির্ব্বাচন-ভার মনোনয়ন বৈঠক (নমিনেটিং কনভেনশন) নামক প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত থাকে। এইরূপ বৈঠক আবার কখনো কখনো বৃহত্তর স্থানের জন্য সৃষ্ট মনোনয়ন বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠায়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক বলে। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পৃঃ ৭৯-৮০)। জাতীয় মনোনয়ন বৈঠকে বিভিন্ন বৈঠক হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ থাকেন। কোন প্রাথমিক সভা সাক্ষাৎভাবে এখানে লোক পাঠায় না। ইহার প্রধান কাজ রাষ্ট্র-নেতার মনোনয়ন।

মনোনয়ন বৈঠক।

দলের স্থানীয় পরিচালনা-সমিতি প্রাথমিক সভা আহ্বান করে ও উহার স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। স্থানীয় চাকুরীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রস্তাবিত হয়। যাঁহারা সব চেয়ে বেশী ভোট পান তাঁহারা নিযুক্ত হন। প্রাথমিক সভা হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণও এইরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। বিভিন্ন বৈঠকে এইরূপে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হইলে পর

নির্ব্বাচনের কিছুকাল পূর্ব্বে প্রত্যেক বৈঠক প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকদের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠায়।

যুক্তরাষ্ট্রে চক্র ও চক্রের প্রভাব।

যুক্তরাষ্ট্রের দলের সম্পর্কে এখানে আরো দুটি বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক : (১) চক্র (রিং) ও (২) চক্রপতি (বস্)। বড় বড় শহরে যাহারা সমিতি গঠন করে ও দল চালনা করে তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে কোন না কোন চাকুরীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা। এইরূপ দেখা যায় যে, দলের কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভোটদাতাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি প্রাথমিক সভার সভ্য হইয়া নিয়মিতভাবে উপস্থিত হইতে থাকেন, উহার দলপতির সহিত যুক্ত থাকিয়া নানা কাজে লিপ্ত হন, ও তাঁহার নির্দ্দেশ মত ভোট দেন। ইহাই হইল উন্নতির প্রথম অবস্থা। ইহার পর ইনি ঐ সভার সকলের নিকট পরিচিত হইলে ও খ্যাতিলাভ করিলে পর বৈঠকের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। দলের প্রতি অনুরাগ ও বিভিন্ন নির্ব্বাচনে কাজ দ্বারা ইনি শহরের কোন বিভাগীয় ছোটখাট চাকুরী লাভ করেন ও অচিরে নির্ব্বাচন দ্বারা প্রাপ্য চাকুরীতে মনোনীত হন। এই সময়ে তাঁহার পক্ষে পল্লী সমিতিতে স্থান পাওয়া ও পরে কেন্দ্রীয় সমিতিতে উন্নীত হওয়া সহজ হয়। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার চারিদিকে একটা দল জড় করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাথমিক সভাতে তাঁহার অনেক অনুবর্ত্তী জুটিয়া থাকে। এইরূপে তিনি প্রতিপত্তিশালী ও দশজনের একজন হইয়া দাঁড়ান এবং স্থানীয় নির্ব্বাচন-বিভাগের অন্যতম পরিচালক হন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক শহরে এইরূপ দল রহিয়াছে। এই দলকেই চক্র বলে। এই দলের লোকেরা শুধু দলের লোকদের চাকুরী জুটাইতেই ব্যস্ত থাকে না, যত বেশী সম্ভব লোকের উপর নানা প্রকারে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন শহরে এই চক্রের প্রভাব সাধারণত খুব হয়। নিউ ইয়র্কের মত বড় শহরে প্রায় ৪০।৫০ হাজার লোক এরূপ চাকুরীতে লিপ্ত রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের চাকুরী প্রতি বৎসর নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করে ও এই সব চাকুরীতে চক্রপতিদের বিশেষ হাত থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও যৌথ-রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত বহু কর্ম্মচারীও ঐরূপ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা যৌথ-কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন। যেখানে শহর, রাষ্ট্র ও যৌথ-রাষ্ট্র—তিন স্থানেই কোন দল বিশেষের প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে ঐ দলের কর্ত্তৃত্ব একেবারে নিরঙ্কুশ হয় ও চক্রপতিদের কথামত সকল কার্য্য বিনা বাধায় নির্ব্বাহিত হয়।

চক্রপতির প্রতিপত্তি।

নানা কারণে চক্রস্থ কোন ব্যক্তি অন্য সকল ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অনেকের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে সমর্থ হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহাকে সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সাহস ও বুদ্ধি বলে এবং শক্তিশালী ধনী বা ব্যবসায়ীর সাহায্যে ইনি অর্থ ও শক্তির অধিকারী হন। ইনি সেনাপতির ন্যায় চক্র চালনা করেন। ইঁহাকে চক্রপতি বা বস্ বলা হয়। ইঁহার কাজ হইল লোকদের চাকুরী জুটাইয়া দেওয়া, বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত ও বিদ্রোহীদের তিরস্কৃত বা বহিষ্কৃত করা, দরকার মত লোকদের চাকুরীচ্যুত করা এবং নানা পরিকল্পনা আনয়ন করা। বড় বড় শহরে চক্রপতির প্রতিপত্তি বেশী দেখা যায়। কারণ সেই সব স্থলে ভোটদাতার সংখ্যা ও চাকুরীর সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। কখনো কখনো কোন চক্রপতি এরূপ প্রভাবান্বিত হন যে, তিনি সমগ্র রাষ্ট্রের অধিকাংশ ভোট-

দাতাকে নিজের মতানুসারে চালাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূপ বৃহৎ স্থান জুড়িয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ গুণের দরকার হয়। সে গুণ অনেকের থাকে না।

যখন শহরের বা রাষ্ট্রের বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক নির্ব্বাচন আরম্ভ হয় তখন কে কোন্ চাকুরী পাইবে তাহা শহরের চক্র স্থির করিয়া দেয়। পুলিশের কাজ হইতে প্রতিনিধি সভার সভ্যের পদ পর্য্যন্ত প্রায় সবই ইহার দ্বারা স্থির হইতে পারে। বিভিন্ন চক্রপতিদের পরস্পর বিরুদ্ধতা স্বাভাবিক। কিন্তু চক্রপতির সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বিরুদ্ধ চক্রের নেতা তত নয়, যত নিজ চক্রের বিভিন্ন উপদলের দলপতিগণ। কারণ, চক্রের সমস্ত ভোট একত্রে না পাইলে কোন চক্রের পক্ষে কোন বিষয়েই জয়লাভ করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া চক্রপতিকে সর্ব্বাগ্রে নিজ দলের বিরোধীদের সম্বন্ধে সাবধান হইতে হয়।

চক্রের রাজস্ব নিম্নলিখিত প্রকারে সংগৃহীত হয়:

চক্রের রাজস্ব।

(১) প্রধান প্রধান নির্ব্বাচনের সময় এক নির্ব্বাচন অভিযান ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়। দলের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা তোলা এই ভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্য।

(২) কোন কোন ধনী ব্যক্তি দলের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও দলের নিকট হইতে কোন না কোন উপকার পাইবেন বলিয়া চাঁদা দিয়া থাকেন।

(৩) যাঁহাদের চাকুরী ইত্যাদি জুটাইয়া দেওয়া হয় তাঁহাদের বাৎসরিক বেতনের ৪% অথবা ৫% করস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৮ সনে এইরূপে নিউ ইয়র্ক শহরের চাকুরেদের নিকট হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বা ৩ কোটি টাকার উপর উঠে।

(৪) কথনো কথনো নির্ব্বাচন বা চাকুরী বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ চক্র হইতে হয়ত কোন ধনী ব্যক্তিকে বলা হয় "তোমায় অমুক স্থানের জন্য নির্ব্বাচন করিব বা তোমায় অমুক চাকুরী দিব। কিন্তু তজ্জন্য তোমায় অত টাকা দিতে হইবে।" রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার পদের দাম কথনো কথনো ৫,০০০ হইতে ১০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত লওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচন ব্যাপারে চক্র ও চক্রপতির ন্যায় আরো একটি বিষয়ের গুরুত্ব আছে, তাহা নূতন রাষ্ট্র-নেতার মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের কর্ম্মচ্যুতি ও তৎফলে নূতন লোকের নিয়োগ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯১০ সনে ঐ প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা যৌথ-রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোককে পরীক্ষা গ্রহণের পর লওয়া হইয়াছে। ইঁহারা স্থায়ী কর্ম্মচারী। ইহা ছাড়া এখনও যাঁহারা রাষ্ট্র-নেতার কার্য্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচ্যুত হন তাহাদের সংখ্যা কম নহে।

রাষ্ট্র-নেতা যৌথ-রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকেন,—গুরুতর নিয়োগ-সমূহে রাষ্ট্র-সভার সম্মতি দরকার হয় ও অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে হয় রাষ্ট্র-নেতা নয়ত বিচারালয় নয়ত বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ নিয়োগ করেন, ইহা আগে বলিয়াছি। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ দেখিলে মনে হয় যে, এই সকল কর্ম্মচারী রাষ্ট্র-নেতাগণের খুসীমত বাহাল থাকিবেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতাগণ কোন কর্ম্মচারীকে বিনা কারণে

কর্ম্মচ্যুত করিতেন না। কর্ম্মচারিগণ যাবজ্জীবন অথবা সৎস্বভাবের জন্ত কাজে বাহাল থাকিতেন। ওয়াশিংটন ৯ জনকে, জন অ্যাডামস্‌ ৯ জনকে, জেফারসন ৩৯ জনকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন; তারপর ১৮০৮ হইতে ১৮২৮ সনের মধ্যে ১৬ জনকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে কর্ম্মচ্যুতি রাজনৈতিক কারণে ঘটে নাই। ১৮২০ সনে মহাসমিতিতে এক আইন পাশ করা হয়। তাহাতে প্রধান কর্ম্মচারীদের কর্ম্মকাল ৪ বৎসরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক রাষ্ট্র-নেতার মনোনয়নের কিছুকাল পরই পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীদের কার্য্যকাল শেষ হইবার কথা। কিন্তু এই আইন পাশ হইলেও ১৮২৮ সন পর্য্যন্ত তদনুসারে কাজ হয় নাই; ১৮২৯ সনে জ্যাকসন রাষ্ট্র-নেতা হইয়া ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তন গণতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত ও তাঁহার প্রথম বৎসরেই তিনি ৫০০ পোষ্ট মাষ্টারকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সে স্থানে নিজ দলের লোকদের নিয়োগ করেন। সেই সময় হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্ত রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, নূতন রাষ্ট্র-নেতার সঙ্গে সঙ্গে যৌথরাষ্ট্রে প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীর পদ—বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশে অবস্থিত রাষ্ট্রদূত হইতে আরম্ভ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার পর্য্যন্ত—শূন্ত হইয়া যাইত। এই রীতি প্রবর্ত্তনের ফল নিম্নরূপ হইল: রাষ্ট্র-নেতা বা তাঁহার মন্ত্রিগণের পক্ষে এত বড় দেশের সকল রকম কর্ম্মচারীর জন্ত আবেদনপ্রার্থীদের কথা জানা সম্ভবপর নহে। তাহাদের বিষয় জানিবার জন্ত রাষ্ট্র-নেতা বা মন্ত্রীদিগের পক্ষে সাধারণত নিকটস্থ লোকদের নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ করা দরকার হইত। ফলে যে রাষ্ট্র হইতে লোক নিযুক্ত হইবার কথা সেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্র-সভাসদ্‌দ্বয় ও যে জেলায় চাকুরী খালি হয় তথাকার প্রতিনিধি-সভার সভ্য রাষ্ট্র-নেতার নিকট নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, আর রাষ্ট্র-নেতা ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতেন, অবশ্য উভয়ে এক দলের হইলে। ইহাই দস্তুর হইয়া গেল। অর্থাৎ এইরূপে একথা স্বীকৃত হইল যে, শুধু দলের লোকেরাই চাকুরী পাইবার অধিকারী, অন্তেরা নহে। কোন কোন রাষ্ট্র-নেতা বা মন্ত্রী কখনো কখনো এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণকে হাতে রাখিবার জন্ত তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এই প্রথা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রথার মূল কথা এই যে, যে দল জয়লাভ করে সেই দল যাহাদের খুসী চাকুরীতে নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণত দলের লোকদের চাকুরী পাইবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ঐ দল ন্যায্য বলিয়া মনে করে ও প্রায় সকল কাজে দলের লোকদের নিয়োগ করে। যেখানে অন্ত লোক নিয়োগ করে সেখানে ঐরূপ করিতে বাধ্য হয় বলিয়া করে না, সে লোককে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে বলিয়া বা অন্ত কারণে করে; আর কোন দল ক্ষমতাচ্যুত হইলে সেই দলের লোকদের কর্ম্মচ্যুতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রথার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ দুইটি: (১) চাকুরীর পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তিদের সকলেরই একবার করিয়া চাকুরীতে নিয়োগ গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করা হয়; (২) যুক্তরাষ্ট্রে এই বিশ্বাস প্রবল যে প্রত্যেক লোকই প্রতি কাজের উপযুক্ত।

এ স্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। উপরে যে প্রথার কথা বর্ণনা করিলাম তাহা

যৌথ-রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইহাদের অধিকাংশ সামান্য কর্মচারী,—গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার, বন্দরস্থ শুল্ক কর্মচারী, ইত্যাদি। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন বিভাগের কেরাণী, পররাষ্ট্রদূত ইত্যাদি এবং অধিকৃত ভূভাগের শাসনকর্তা প্রভৃতি বড় কর্মচারীও আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। দ্বিতীয়ত, এই প্রথা যদিও প্রথমে শুধু যৌথ-রাষ্ট্রে আবদ্ধ ছিল, পরে ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও শহরে দেখা দেয়। ঐ সকল স্থলে কয়েকটি উচ্চ পদ ব্যতীত বহু পদ এই প্রকারে নির্বাচিত হইতে থাকে। সুতরাং জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় ক্ষেত্রে এই প্রথার জয়জয়কার হইয়াছিল। ইহার নাম "স্পয়েল্স" প্রথা।

এই প্রকার প্রথায় যে সরকারী চাকুরীর অবনতি ঘটে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ১৮৫৩ সন হইতে এই প্রথার সংশোধনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ঐ সনে মহাসমিতি হইতে এক আইন পাশ করা হয় যে, ওয়াশিংটনে নিযুক্ত কেরাণীদিগকে পরীক্ষায় পাশ করিলে পর চাকুরী দেওয়া হইবে। কিন্তু এই আইন অনুসারে কাজ হয় নাই। রাষ্ট্র-নেতা হেইস্ (১৮৭৭-৮১) সিবিল সার্বিস সংস্কারের অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮৮৩ সনে পেণ্ডলটন আইন পাশ করা হয়। তদনুসারে ওয়াশিংটনের বিভিন্ন বিভাগের অনেক চাকুরী ও অন্যান্য স্থানেরও কোন কোন চাকুরী পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পর দেওয়ার কথা হয়। ঐ সময়ে মাত্র ১৪,০০০ চাকুরী সম্পর্কে এই আইন প্রযুক্ত হইত। পরে যুক্তরাষ্ট্রের সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত পৌনে ৪ লক্ষ চাকুরের মধ্যে ২½ লক্ষের নিয়োগ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা গ্রহণের পর হয়। যে সকল কাজ পরীক্ষা ব্যতীত দেওয়া হয় তন্মধ্যে প্রায় ½ লক্ষ লোককে রাষ্ট্র-নেতা ও বিভিন্ন বিভাগ নিয়োগ করিয়া থাকেন। বর্তমান কালে এই আইনের সুফল এই হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কয়েকটি রাষ্ট্রেও চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে এবং জনমত ক্রমশ ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ইহার পক্ষপাতী হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রে শুধু জনগণের নহে জনমতের প্রাধান্যও সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের যেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়, অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। রাষ্ট্র-নেতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসক, মহাসমিতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহ—সকলের উপর জনমতের প্রভুত্ব। অন্য সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান জনমত অনুসারে চালিত হয় মাত্র। পূর্বে নানা প্রসঙ্গে এই জনমতের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা আজ্ঞা একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ সোজাসুজি আপনাদের কর্তৃত্ব খাটাইয়া থাকে, লোকেরা সমবেত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভোট দেয়, শাসন ও বিচারার্থ কর্মচারী নিযুক্ত করে বা তাঁহাদের কর্মচ্যুত করে, যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘোষণা করে ইত্যাদি। অন্য কোন কোন গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ স্বয়ং রাজ্যভার না লইয়া নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সেই ভার অর্পণ করে, এই প্রতিনিধিগণ তাহাদের হইয়া সকল কার্য্য নির্বাহ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই দুই প্রকার গণতন্ত্রের মাঝামাঝি একপ্রকার গণতন্ত্র অবলম্বিত

হইয়াছে। ব্যবস্থাপক-সভা অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া সভা আছে বটে, কিন্তু মহাসমিতির কার্য্যকাল দুই বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া ও কাঠামো-আইনের সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা অক্ষত রাখিয়া ইহা ঐ সভার ক্ষমতা ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অর্থাৎ শেষ কর্ত্তৃত্বভার এই প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হয় নাই, জনগণের নিজেদের হাতেই রহিয়াছে; জনগণ ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, তাহার বাহিরে উহার যাইবার ক্ষমতা নাই, আর ঐ সভা জনগণের কোন কোন ইচ্ছা পূরণ করিবার বাহন মাত্র। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া ও একমাত্র জনমতের বলে ঐ আইন-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা রাখিয়া জনমতের প্রাধান্যকে আরো স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা জনমতের মুখপাত্ররূপে জনগণের নির্দ্দিষ্ট হুকুম পালন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন। ব্যবস্থাপক সভা অভ্যভিযোগ আনয়ন ব্যতীত রাষ্ট্র-নেতা বা তাঁহার মন্ত্রিগণকে শাসন করিতে পারে না,—রাষ্ট্র-নেতা জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন ও জনগণের নিকট দায়িত্বশীল রহেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রেও জনমতের এইরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন সংশোধনের দুরূহতা,—ইহা ছাড়া সর্ব্বত্র জনগণ অপ্রতিহত বলা যাইতে পারে।

বহু গণতান্ত্রিক দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে জনমত বেশী প্রবল। এখানে রাষ্ট্র-নেতাকে জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত করিয়া ও মহাসমিতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়া ও অন্যান্য বহু প্রকারে মহাসমিতির ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জনগণ স্পষ্টভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপক সভাসদ্‌গণ ও শাসকগণ জনমত কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া তদনুসারে কাজ করেন। বিলাতে পার্ল্যামেন্ট দ্বারা ইংরেজ জাতির মনোভাব যেরূপ বুঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে মহাসমিতি দ্বারা তাহা যায় না। লোকেরা নিজেরাই নিজ আইন দ্বারা দেশের কাঠামো নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং একমাত্র তাহারাই উহার সংশোধনে সমর্থ। জনগণ তাহাদের কর্ত্তৃত্বের কতকাংশ মাত্র ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-ব্যবস্থার হাতে তুলিয়া দিয়াছে, সমগ্র অংশ দেয় নাই। সুতরাং তাহাদের যাহা ইচ্ছা অর্থাৎ জনমতকে ঐ দুই প্রতিষ্ঠান বহুল পরিমাণে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়।

জনমতের প্রাধান্যের কারণ:

যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের এরূপ প্রাধান্য লাভের দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) দেশের কর্ত্তৃত্বভার, আইন-প্রণয়ন, কর বসান, আইনের ব্যাখ্যা করণ ও প্রয়োগ, বিচার, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে যে, কখনো কখনো ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিরোধ ঘটা বিচিত্র ব্যাপার নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত রাষ্ট্রীয়-কাঠামো আইনের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে, বিচারালয়সমূহ কোন সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারে। কিন্তু বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণে দুইটি বাধা আছে: (ক) বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা চাই, (খ) বিচারালয়ের ফল

(১) শাসন-যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পর বিরোধ-নিবারণ;

অনেক সময় দেরীতে পাওয়া যায়। সুতরাং যেখানে তাড়াতাড়ি কার্য্য সম্পন্ন করা দরকার সেখানে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো বিচারালয়সমূহের স্থির করিয়া দিবার মত বিষয় কিছু থাকে না, উভয় পক্ষই স্ব স্ব অধিকার মধ্যে কাজ করিতে পারে। প্রতিনিধি-সভা কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিলেও রাষ্ট্র-সভায় তাহা গৃহীত না হওয়ার উদাহরণ আছে। উভয় সভা কোন বিল পাশ করিলেও রাষ্ট্র-নেতা হয়ত তাহা নাকচ্ করিয়া দিলেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের অভাবে তাঁহার নাকচ্ বলবৎ থাকিতে পারে। মহাসমিতি রাষ্ট্র-নেতাকে এক প্রকারে কাজ করিতে বলিতে পারে, আর রাষ্ট্র-নেতা অন্য পথে চলিতে পারেন। রাষ্ট্র-নেতা কোন সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্র-সভা তাহা মঞ্জুর না করিতে পারে। এইরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা দেখানো যাইতে পারে যে, এ সকল ক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া যায়। কোন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইলে, সমগ্র দেশের মন যদি আগে হইতে স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে জনমতের পক্ষে স্পষ্টভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শক্ত হয় না। আর জনমত যাহা চায়, শেষ পর্য্যন্ত তদনুসারে কাজ হয়। উভয় পক্ষে জনমত সমান প্রবল বলিয়া বোধ হইলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এরূপ সমস্যার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা থাকে না, নির্ব্বাচনের পর তাহা বুঝা যায়। এইরূপে জনমতকে প্রবল রাখায় শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া যায় না। (২) যুক্তরাষ্ট্রে জনমত কোন শ্রেণী বিশেষের মত মাত্র নয়, সমুদায় লোকের মত। আর কোন দেশে জনমত বলিলে এত বৃহৎ শ্রেণীর মত বুঝায় না। বিভিন্ন দেশে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন বা এইরূপ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা জনমতকে সৃষ্টি ও চালনা করিয়া থাকেন, সাধারণ জনগণ তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তন করেন মাত্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ জনগণের প্রাধান্য সব চেয়ে বেশী। যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি বা ধনে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সাধারণত জনগণকে চালাইবার ও জনমত সৃষ্টি করিবার কল্পনা করেন না, তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন সমগ্র দেশবাসীর মতটা কি ও সেই অনুসারে নিজেদের চালিত করেন। ইহাই যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের জনমত সমগ্র দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির মত। যুক্তরাষ্ট্রের বা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-ব্যবস্থা এই জনমতের অংশ হইলেও বৃহত্তর জনমতকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, নিজের বিশিষ্ট মতকে শেষ পর্য্যন্ত এই জনমতের নিকট নত করিতে হয়।

(২) জনমত শ্রেণী বিশেষের মত মাত্র নহে।

যুক্তরাষ্ট্রে জনমত কোন শ্রেণী বিশেষের মত নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কোন শ্রেণী নাই বা তাহাদের মতের বৈশিষ্ট্য নাই, তাহা নহে। এখানে দুইটি বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি এই কয় শ্রেণী আছে বলা চলে: (১) চাষী, (২) দোকানী ও ছোট শিল্প-ব্যবসায়ী, (৩) মজুর, (৪) পুঁজিপতি, (৫) ব্যবহারজীবী, সংবাদ-পত্র পরিচালক, ডাক্তার ইত্যাদি, এবং (৬) লেখক, চিত্রকর ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যাইতেছে। প্রথম শ্রেণী সংখ্যার দিক্ দিয়া সব চেয়ে বড় না হইলেও ইহাদের প্রভাব কম নহে। ইহারা সাধারণত নিজেরাই নিজেদের জমির মালিক, চল্লিশ হইতে একশ একর পর্য্যন্ত জমির চাষবাস নিজেরাই চালাইয়া থাকে। যাহাদের আরো বেশী জমি থাকে, বিশেষত পশ্চিমের চাষীরা মজুর রাখিয়া জমি চাষ করায়। তথাপি

জনমত সৃষ্টিতে বিভিন্ন শ্রেণীর হাত:

(১) চাষী,

এইরূপ ভাড়া করা মোট লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। চাষিগণ ব্যবসায়ীদের চেয়ে ঢের কম উপার্জন করিতে সমর্থ। সেই জন্য ইহারা জিলা বা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বেতনের হার নীচু রাখিবার পক্ষপাতী। কোন দলে যোগ দেওয়া ও ভোটের সময় ঐ দলের সমর্থন করা ইহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু জাতীয় সমস্যায় ইহারা যত মনোযোগ না দেয় তার চেয়ে ঢের বেশী মনোযোগ দেয় কৃষি-ঘটিত সমস্যায়; একচেটিয়া ব্যবসায়ী, পুঁজিপতিগণ ও রেলরোড কোম্পানিসমূহ ইহাদের আক্রমণের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রে কোন নূতন দলের উদ্ভব হইলে এই শ্রেণী হইতে অনেক লোক সেই দলে পাওয়া যায়। অন্তর্যুদ্ধের কালে চাষীরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অনেকে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিল। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকের স্বার্থ চাষীদের স্বার্থের সহিত জড়িত। কিন্তু দোকানীরা শিক্ষাদীক্ষায় বেশী অগ্রসর হইলেও তাহারা নিজের দোকান ছাড়িয়া প্রায়ই রাজনীতিতে যোগ দিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু রাষ্ট্রের বা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা সম্ভব নহে। ইহাদের দলের প্রতি আসক্তি চাষীদের মত তত প্রবল নহে। (৩) এক মজুর-সমস্যা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মজুরদের সহিত চাষীদের বা দোকানীদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তবে ইহাদিগকে সহজে উত্তেজিত করা সম্ভব। এবং বাহির হইতে আগত শ্রমিকদের, বিশেষত যে সকল বিদেশী শ্রমিক অল্প মজুরিতে কাজ করিতে আসে তাহাদের, অত্যন্ত বিরোধী। মহাসমিতিতে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মজুর-প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আগে কোন প্রকার দাবী ছিল না। এই দাবী কিছুদিন হইল দেখা দিয়াছে। এই দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ হইতে পারে। (৪) পুঁজিপতির শ্রেণী বলিতে বণিক্, বড় শিল্প-ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও রেল কোম্পানির পরিচালক প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে বুঝায়। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন শ্রেণী ইহাদের ন্যায় ক্ষমতাশালী নহে। ইহাদের কেহ কেহ রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগ দিলেও অনেকে বিষয়-কর্মে এরূপভাবে লিপ্ত থাকে যে, তাহাদের পক্ষে সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর নহে। ইঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে রাজনৈতিক গগনে নিজেদের প্রভাব অব্যাহত রাখেন: কাহারও কাহারও সংবাদপত্র আছে, কেহ বা সংবাদপত্রের পরোক্ষ পরিচালক; অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে বহু কোটি টাকা দান করিয়াছেন; কেহ কেহ কোন বড় কোম্পানির পরিচালকরূপে সহস্র সহস্র কর্মচারী নিয়োগ করেন,—এই কর্মচারীরা তাঁহার প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে; রেল কর্তৃপক্ষের হাতে এরূপ লাভজনক চাকুরী বা মাল সরবরাহের চুক্তি থাকে যে, তাঁহার পক্ষে বহু ভোট তাঁহার দিকে আনা অসম্ভব হয় না। মোটামুটি বলা চলে এই শ্রেণীর লোকেরা বর্তমান সামাজিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অভিলাষী। (৫) পঞ্চম শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যবহারজীবিগণ প্রধান। পূর্বেই বলিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারজীবী বলিতে উকীল ও এটর্নি উভয়কেই বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রে যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ দেন তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধেক লোক ব্যবহারজীবী, সুতরাং ইঁহাদের প্রভাব সামান্য নহে। ইঁহাদের প্রভাব বেশী হইবার একটা কারণ এই যে, যাঁহারা ওকালতী করিতে চান, তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন লইয়া ঘাঁটা-

(২) দোকানী, (৩) মজুর, (৪) পুঁজিপতি, (৫) ব্যবহারজীবী ইত্যাদি,

খাঁটি করিতে হয়। তাঁহারা নিজ রাষ্ট্রের ও যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হইলে তাঁহাদের চলে না। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় রাষ্ট্র-চিন্তাবীরের উদ্ভব এই শ্রেণী হইতে হইয়াছে। (৬) ষষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষকগণ কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মতামত গঠনে সহায়তা করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর লোকদের প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে। (৬) শিক্ষক ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, স্থান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে মতামতের পার্থক্য লক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতামত বুঝিবার জন্য এই দেশকে মোটামুটি পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ব্ব দিক্‌স্থ রাষ্ট্রসমূহে পুঁজিপতি, বড় শিল্প-ব্যবসায়ী, বণিক্ ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেদের প্রাধান্য বেশী। প্রায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শিল্প-কারখানার জন্য পুঁজি এই স্থান হইতে আসে। বিশেষত দেশব্যাপী বহু রেলওয়ে কোম্পানির টাকা ইহারা যোগায় এবং ঐ গুলির প্রধান কর্ম্মস্থল নিউ ইয়র্কে রাখা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের সহিত আমেরিকার যে বিপুল বাণিজ্য চলে তাহা এই পূর্ব্ব দিক্ দিয়াই চলে। এইরূপে পূর্ব্ব উপকূলে ইয়োরোপ হইতে শুধু বাণিজ্যের তরীই আসে না, ইয়োরোপের নব নব চিন্তা ও জ্ঞানবিজ্ঞানও এখানে আগে আসে। এক কথায়, ইয়োরোপের প্রভাব এখানে সব চেয়ে বেশী। এখানকার লোকেরা জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহিত্য বা বিজ্ঞান শিক্ষায় সর্ব্বদা সচেষ্ট। এস্থলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন বেশী, এখানকার সংবাদপত্রসমূহও সাধারণত সেইরূপ উঁচু ধরণের। পূর্ব্ব প্রান্তের একটি বড় সমস্যা এই যে, ইয়োরোপ ও অন্যান্য স্থান হইতে অধিকাংশ লোক উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য এখানে আসিয়া আগে উপস্থিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের বিশ্বাস ইহাদের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের উঁচু জীবনযাত্রার ধারাকে খর্ব্ব করিয়া দিতেছে। জনমত সৃষ্টিতে বিভিন্ন অঞ্চলের হাত : পূর্ব্ব ;

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান-রেখার নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কারণ কালক্রমে পশ্চিমের এক একটি রাষ্ট্র পূর্ব্বাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মত হইয়া গেলে তখন আর উহাকে পশ্চিমের রাষ্ট্র বলা চলে না। এইরূপে পশ্চিমের রেখা ক্রমেই পিছনে সরিয়া যাইতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব চাষীদের,—কোন কোন জিলায় জার্ম্মাণ ও নরওয়ে-সুইডেনের অধিবাসীদের সংখ্যা খাস্ অধিবাসীদের চেয়ে বেশী। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণ সাধারণত জল্পনাকল্পনার পক্ষপাতী নহে। তাহারা নিজেরা করিৎকর্ম্মা লোক ও সেইরূপ লোককে পছন্দ করে। নিজ দেশের উপর বিশেষত পশ্চিমাঞ্চল কি নিজ রাষ্ট্রের উপর ইহাদের অগাধ বিশ্বাস, পূর্ব্বাঞ্চল বা ইয়োরোপের মতামতের ধার ধারে না। নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইলেও, সরকারী কর্ম্মচারীদের বেশী মাহিনা দিয়া রাখিতে অত্যন্ত নারাজ। মোটের উপর, রাষ্ট্র যে টাকাই খরচ করিতে চাহে, তাহা ইহারা সহজে দিতে চায় না। বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার সংস্কারের ব্যাপারে ইহারা অমনোযোগী নহে। কেহ কেহ এই পশ্চিমাঞ্চলকে খাঁটি আমেরিকান্ অঞ্চল বলিয়া থাকেন। পশ্চিম ;

দক্ষিণে মোটামুটি তিন শ্রেণী দেখা যায় : উচ্চ বা শিক্ষিত শ্রেণী, মধ্যমগণ ও নিগ্রো। যে সকল শ্বেত অধিবাসী পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থান দখল করিয়া চা, কফি, রবার ইত্যাদির চাষ বিস্তীর্ণভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের বংশধর। অধিকাংশ

স্থানই জনবিরল ও অনুর্ব্বর। এই অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতা বা বিখ্যাত রাজনীতিবিদের অভাবের কারণ এই যে, যোগ্য ব্যক্তিরা সুযোগ পাইলেই ভাগ্য অন্বেষণে পূর্ব্ব দিকে ছুটিয়া যায়। দাসত্ব-প্রথা যখন বর্ত্তমান ছিল তখন এক শ্রেণীর শ্বেত অধিবাসী ছিল, যাহারা কোন প্রকারে খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাহিত না বা পারিত না। ইহারা নিম্নস্তরের লোক ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ইহাদেরই বংশধর। পূর্ব্বে যে সকল রাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথা বর্ত্তমান ছিল এক্ষণে সেই সকল রাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি নিগ্রো-সন্তান। দক্ষিণে যদিও নিগ্রো সংখ্যায় এরূপ প্রবল, তথাপি দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিগ্রোর স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের দ্বারা জনমত প্রভাবান্বিত হয় না। বহু ক্ষেত্রে ইহাদের ভোট দিতে দেওয়া হয় না।

দক্ষিণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহে অবস্থিত। আর ঐ এক-তৃতীয়াংশের অধিকাংশ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর শ্বেত অধিবাসী ও প্রায় সমুদায় নিগ্রোর রাজনৈতিক শিক্ষা ও জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। তারপর যাহারা যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ হইতে নূতন পদার্পণ করিয়াছে তাহাদেরও এ বিষয়ে উন্নত বলা চলে না। উপরে যে তিন বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট, আর এই পশ্চিমাঞ্চল ক্রমাগত প্রসার লাভ করিতেছে। পূর্ব্ব অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিজের স্বার্থকে সর্ব্বদা বড় করিয়া দেখে না, সাধারণত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ কিসে পরিপুষ্ট হইবে তাহাই দেখে। যদিও লোকবৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলেও এই ভাব বাড়িতেছে, তথাপি এই অঞ্চল সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মোটামুটি সত্য। তিন বিভিন্ন অঞ্চলে মতামতের বিরোধ ও মিলনের ফলে যে জনমত উদ্ভূত হয়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গগনে তাহার তুল্য প্রতাপশালী বস্তু আর কিছুই নাই।

পশ্চিমের লোকসংখ্যা বেশী ও সেজন্য উহার প্রভাবও বেশী।

বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ-দান বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহের সমকক্ষ মেলা দুষ্কর। প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠকের জন্য কাগজগুলিকে মুখরোচক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। মুখরোচক সংবাদের অন্বেষণে কোন কোন কাগজ কখনো কখনো ঘটনার সত্যমিথ্যা পরীক্ষার অবকাশ পায় না। কারণ বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে এরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে যে, কেহই কোন সংবাদ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ছাপাইয়া বেশী কাটতির প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। ইহাতে এই অপকার হয় যে, সময় সময় অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও নিন্দাগ্লানি সহ্য করিতে হয়। ঘটনা প্রকাশ দ্বারা একটি উপকার এই হয় যে, অন্যায় ও অবিচার লোক চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রবাসীর সংবাদের ক্ষুধা অত্যন্ত বেশী। ঐ দেশের সংবাদ-পত্রসমূহে যত রাজনৈতিক ভিন্ন অন্য খবর বাহির হয় তত অন্য কোন দেশের কাগজে দুর্লভ। সাধারণত স্থানীয় রাজনৈতিক খবরাখবর, বিশেষত কোন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে, সংবাদপত্রের অনেক স্থান জুড়িয়া বসে। কাগজগুলির বিশেষত্ব এই যে, বক্তৃতাদি খুব কমই ছাপা হয়, বিভিন্ন দল বা সভা-সমিতির পরিকল্পনা, কাজ ইত্যাদি, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ গোলাকাতে কে কি বলেন, তাহার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র-সমূহ :

(১) বিবরণ-দাতা,

যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় সংবাদপত্রসমূহের কাটতি অধিক।

কাগজগুলি সাধারণত সুসম্পাদিত। সুতরাং যে কাগজ যে বিষয় লইয়া ওকালতি করুক, তাহা ভালভাবে করে। যুক্তরাষ্ট্রে লোকে সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ খুব কম পড়ে, তবে যখন বিশেষ কতকগুলি মন্তব্য দিনের পর দিন সম্পাদকীয় লেখারূপে বাহির হইতে থাকে তখন কোন কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক অপযশ হইতে পারে। যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসৎ উপায় অবলম্বনে বড় হন, তাঁহাদের পক্ষে এই সব সংবাদপত্র ভীষণ বিশেষ।

(২) কোন বিষয় বা পক্ষের সমর্থক.

যুক্তরাষ্ট্রে কোন একটি কাগজ দেশের সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ নহে। ব্রাইস্ বলেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মাণিতে প্রথম কুড়িটি বহুল-পঠিত কাগজ যত লোক ঐ সব দেশে কাগজ পড়ে তাহার ৯/১০ অংশ লোক দ্বারা পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকার যে কোন কুড়িটি কাগজ সমগ্র দেশের ১/৫ অংশ কর্ত্তৃক পঠিত হয় কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে বা মালিকদিগকে অনেক সময় বড় বড় রাজনৈতিক পদ দেওয়া হয়, এবং দলের উপদেশ থাকে শুধু দলের পরিপোষক কাগজ পড়িবার জন্য, তথাপি উহা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রবাসী চিন্তাশীল ও স্বাধীন প্রকৃতির বলিয়া সর্ব্বদা সংবাদপত্র দ্বারা চালিত হয় না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, নিজের দলের সংবাদপত্রের দিকে চাহিয়াই কোন যুক্তরাষ্ট্রবাসী নিজের মতামত গঠন করে না। যে সকল শহরে শক্তিশালী দুই বা ততোঽধিক কাগজ থাকে, সেখানে প্রতিযোগিতা খুব তীব্র হয় এবং লোকেরা সাধারণত একের অধিক সংবাদপত্র পড়িয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রসমূহকে প্রধানত জনমতের প্রকাশক বলিয়া মনে করা হয়। জনমতকে যথাযথভাবে অনুবর্ত্তন ও প্রকাশ করা কাগজগুলি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, আর সেজন্য রাজনীতিবিদ্গণ উহাদের মানিয়া চলিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে সকল রকম মতামতই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমস্যা এই যে, কোন্ মতকে জনমত বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। এ বিষয়ে রাজনীতিবিদ্গণকে অবহিত হইয়া দেখিতে হয় কোন্ মত দেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশী লোক অনুমোদন করিতেছে। দল-সম্পাদিত কাগজ এই দিক্ দিয়া কাজে লাগে না, স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন কাগজগুলি সাধারণত এ বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। বড় বড় শহরে এই প্রকার ২।৩টি কাগজ থাকিলেও ঐগুলি সাধারণত কোন একটি দলকে অনুমোদন করিলে, দলের কাজ যখন পছন্দ হয় না বা মনে করে যে জনমত দলের কাজের অনুমোদন করিবে না, তখন ঐগুলি দলের বিপক্ষতা করে। কতকগুলি কাগজ প্রধানত সংবাদ ছাপাইয়া থাকে, যদিও কোন রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইলে এক বা অন্য দলকে সমর্থন করিয়া থাকে। অন্য কতকগুলি কাগজ মূলত রাজনৈতিক কাগজ নয়। এগুলির মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত প্রভাবশালী। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সংবাদপত্রের যেরূপ আদর এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। এই সকল কাগজ বিশেষ সময় ব্যতীত রাজনীতি আলোচনা করে না—রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনকালে ইহারা রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু যখন রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা করে, তখন প্রকাশিত মতের প্রভাব বেশী হয়। এই ধরণের কাগজসমূহ বেশীর ভাগ স্বারাজ্যদলভুক্ত।

(৩) জনমতের পরিচায়ক।

রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচন কালে বড় বড় শহরের সংবাদপত্রগুলি দেশের মত অনেকটা

বুঝাইয়া দেয়; স্বদলের কাগজের সমর্থন না পাইলে বুঝিতে হয় যে, দলের নেতা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে লোকমতকে বুঝিবার ও পরিমাপ করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে বিখ্যাত লোকদের কথাবার্ত্তা বা মতামত ছাপাইয়া দেওয়া ইহা নানাপ্রকারে ঘটিতে পারে। যথা, কোন ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা ছাপানো; পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন কালে ঐ ব্যক্তি স্বপক্ষে ভোট দিবেন কি না এবং না দিলে তাহার কারণ দেখানো; কোন খবরের কাগজের বিবরণীকারের নিকট বিস্তৃত মোলাকাৎ দেওয়া—এই মোলাকাতে তিনি তাঁহার মত ও ভবিষ্যতে কি করিবেন তাহা বিশদ্‌ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন,—কখনো সম্পাদকের, কখনো বা তাঁহার নিজ অনুরোধে কোন বিবরণী লেখক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রে (১) মোলাকাতের স্থান;

লোকমত গঠন করিবার অন্য একটি উপায় বক্তৃতা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নির্ব্বাচন সময়ে ছাড়া বক্তৃতার স্থান প্রায় নাই। ঐ দেশে বৈঠক ইত্যাদির সাহায্যে, পদপ্রার্থীকে নির্ব্বাচন করা সাধারণত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে উপদেশ লইতে হইলে পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে আনিয়া তাঁহাকে দিয়া বক্তৃতা করাইবার রীতি প্রচলিত আছে। কোন রাজনৈতিক বক্তা তাঁহার বক্তৃতার জন্য ৭৫ হইতে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত, কখনো কখনো ১৫০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্র-সভাগদেরাও এইরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করেন। নির্ব্বাচন-কালে অনেক সভা-সমিতি হয় বটে, কিন্তু মহাসমিতির সভ্যগণ বৎসর বৎসর তাঁহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্র বা জিলায় গিয়া বক্তৃতা করেন না। নির্ব্বাচন কালে দলের শাসন কঠোর বলিয়া বেশী বক্তৃতার দরকার হয় না।

(২) বক্তৃতার স্থান।

এই স্থলে যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইয়োরোপীয় দেশসমূহে সাধারণত যে সকল লোক দেশের শীর্ষস্থানীয় ও নানা বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও জনমত সৃষ্টি ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। আর বহুসংখ্যক লোক ভোটের ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাহারা মাথা খাটায় না, ভোট দিয়াই খালাস হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই দুই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রভাব কম। অন্য দেশে যে শ্রেণীর লোকেরা এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি অর্থাৎ যাহারা মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত রাজনীতির খবর রাখে, পার্ল্যামেন্ট অথবা নেতাদের মতানুযায়ী নিজেদের মতামত গঠন করে ও ভোটের সময় নিজেদের ইচ্ছানুসারে ভোট দেয়, যুক্তরাষ্ট্রে তাহারাই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও প্রবল। এখানে ইহারাই জনমত সৃষ্টি করে বা পরীক্ষা করিয়া দেখে। ইহারা উপরের শ্রেণীর লোকদের দ্বারা চালিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ রাষ্ট্রিকের রাজনৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর নহে ও তাহার একটা কারণ এই যে, ঐ দেশে বহুবার নির্ব্বাচন হয় বলিয়া লোকদের অনেক বেশী রাষ্ট্রনীতির কথা ভাবিতে হয়। ইহারা যাহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদিতে প্রতিনিধি পাঠায় বা রাজনৈতিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে, তাহাদিগের চেয়ে নিজেদিগকে কোন প্রকারে হীন মনে করে না। সেজন্য নিজেদের মতামত ঠিক করিবার জন্য ইহারা রাজনীতিবিদ্‌গণের দিকে তাকায় না, তাকায় পরস্পর পরস্পরের দিকে। এরূপ অবস্থায় ঠিক করিয়া বলা শক্ত, কোথায় কখন কোন্ জনমতের প্রথম উদ্ভব হইতেছে। হাজার

জনমতের উদ্ভব কিরূপে হয়।

হাজার লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস একপ্রকার হওয়ায়, বহুলোকের একসঙ্গে এক প্রকার ধারণা হওয়া বা একই ঘটনায় বহুলোকের ধারণা ও কার্য্যপ্রণালী একরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষত, প্রত্যেকে অতিজনের সহিত নিজেদের মত মিলাইতে ব্যস্ত ও এরূপ মিলনকে বেশী আকাঙ্ক্ষণীয় মনে করে বলিয়া, বহুলোকের এক প্রকার ভাবের ভাবুক হওয়া সহজ হয়। প্রত্যেক প্রকার মতই অবশ্য কোন না কোন ব্যক্তি বা কোন না কোন দল প্রথমে আরম্ভ করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কে বা কাহারা এইরূপে আরম্ভ করে তাহা সাধারণত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এখানে ব্যক্তির চেয়ে জনসাধারণের প্রভাব অনেক বেশী। নূতন কোন মতবাদ প্রচারের জন্য বৈঠক ডাকা, বক্তৃতা করা সবই হইয়া থাকে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্ব নামমাত্র নেতৃত্ব হয়, তাঁহাকে তাঁহার দলের মতানুসারেই চলিতে হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য কি জনমত সৃষ্টির ও নেতার দরকার হয় না? তাহার উত্তর এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে নূতন ঘটনার সঙ্গে জনমত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। এইস্থলে বক্তৃতার প্রভাব কম, কারণ সাধারণ রাষ্ট্রিক নিজে চিন্তা করিতে সমর্থ; সংবাদপত্রের সমালোচনা তত কার্য্যকর নয়, কারণ এরূপ সমালোচনা নিত্যকার ঘটনা; কিন্তু সাময়িক ঘটনার প্রভাব বেশী, কারণ জনসাধারণ এই সকল ঘটনার খবর রাখে। ফলে, তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ভোটের সময় ভোটদাতাদের খুব বেশী অংশ সাধারণত ভোট দিতে আসে। ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র-সেবক, সাহিত্যিক, ধর্ম্মযাজক, শিক্ষক, ব্যবহারজীবী, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ নহেন বলিয়া ও নিজ কাজের বাহিরে সময় পান না বলিয়া জনমতকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন না। ক্বচিৎ কখনো ইঁহাদের মতবাদ জয়লাভ করে, ইহার দৃষ্টান্ত আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দলের প্রভাব এরূপ বেশী যে দলস্থ সকল লোক নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তির পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য থাকে। অথচ এই নির্ব্বাচন ব্যাপারেই জনমত যৌথরাষ্ট্রে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিজ প্রভুত্ব প্রকাশের সুযোগ পায়। কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে, সংশোধনী আনিয়া জনগণের ভোট সাক্ষাৎভাবে লওয়া হয়। ইহা ছাড়া অন্য সকল সময়ে, রাষ্ট্রিকগণ কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিয়া কোন নীতির সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়াই নীতির সমর্থন বা প্রতিবাদ জানানোর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না। কারণ কোন না কোন সময়ে ঐ ব্যক্তির সহিত জনগণের মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব নহে, অথচ দলের শাসনে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত ভোট দিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় বিরুদ্ধ কোন মত সঙ্ঘবদ্ধ হইলে পর নিম্নলিখিত তিন উপায়ে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে: (১) যে দল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন অথবা সহজে নূতন মতের সত্যতা স্বীকারে ইচ্ছুক, ইহারা সেই দলের দিকে নিজেদের ভোট নিক্ষেপ করিতে পারে। এমন বহু রাষ্ট্র আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান দল প্রায় সমান বলী। সেরূপ ক্ষেত্রে ইহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইহারা নূতন বা পুরাতন (অর্থাৎ নিজেদের) দলে নিজেদের

নূতন কোন মত কিরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কাহাকেও চাকুরী জুটাইয়া দিতে পর্য্যন্ত পারে, অথবা নিজ মতানুসারে পুরাতন দলকে কাজ করাইতে সমর্থ হয়। (২) নূতন এক দল গঠন করিতে পারে। ইহা অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্টসাধ্য এবং মতের বিশেষ গুরুত্ব না থাকিলে এরূপ চেষ্টা উপহসিত হয়। (৩) দুই প্রধান দলের একটিকে দখল করা অর্থাৎ ঐ দল অনুরোধেই হোক্, বা ভয়েই হোক্ নূতন মতকে নিজের দলের মত বলিয়া ঘোষণা করে। এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইলেও অতিশয় দুরূহ। নূতন মত গ্রহণ করিয়া ভোট বেশী পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কেহই সে মত গ্রহণে অগ্রসর হয় না।

ব্যবস্থাপক সভাসদ্ ও কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপও সর্ব্বত্র জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহাদের ভয় জনগণ তাঁহাদের কার্য্য পছন্দ না করিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে আর তাঁহাদের নির্ব্বাচিত করিবে না। ইঁহাদের মধ্যে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত না হইবার ভয়ের দরুণ, ইঁহারা নিজের মত লইয়া বেশী জিদ্ করিতে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে সাহস করেন না। কোন রাষ্ট্র-নেতা যদি দেখেন যে মহাসমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন বিল নাকচ্ করিলেও জনমত তাঁহারই আনুকূল্য করিতেছে, তবে তিনি ঐরূপ করিতে সাহসী হন, আর সেইজন্য মহাসমিতিও সে বিল পাশ করিবার জন্য জিদ্ করে না। প্রতিনিধি-সভার অতিজন দল "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন" নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা আলোচনা বন্ধের ফলে যদি দেখে জনমত তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলিত হইতেছে, তবে তাহারা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে। যখন ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখায় কোন গুরুতর বিষয়ে মতভেদ ঘটে ও তজ্জন্য দরকারী বিল পাশ করা সম্ভবপর হয় না, তখন যে দল মূলত এইরূপ হইবার জন্য দায়ী সেই দলকে জনমত পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে আর না পাঠাইয়া শাস্তি দেয়। বস্তুত, এইরূপে স্বার্থপর রাজনীতিবিদ্গণের কয়েক মাস পরে হোক বা কয়েক বৎসর পরে হোক নির্ব্বাচনকালে শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সংযত রাখিতে হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, জনমত কোন দলের অথবা ব্যবস্থার পোষকতা করিতেছে কি না তাহা কি করিয়া বুঝা যাইবে? প্রথমত, পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত, আগে থেকে বলা যায় না কাহারা জয়ী হইবে বা হইবে না। রাষ্ট্র-নেতা মনে করিতে পারেন পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার সাহস বা ভুলচুকের কথা জনগণের মনে থাকিবে না, অথবা ব্যবস্থাপক সভার অতিজন ভুল করিয়া ভাবিতে পারে তাহারা জনমতের স্বপক্ষেই চলিতেছে। সাধারণত, জনমত কোন্ দিকে রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আগেই বলিয়াছি স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন সংবাদপত্রসমূহের মতামত হইতে তাহা কতকটা বুঝা যায়। তারপর দলের পরিচালিত বা পৃষ্ঠপোষক কোন কোন কাগজ দলের দোষ দেখাইয়া সমালোচনা আরম্ভ করে। তখন বুঝিতে হইবে ব্যাপার সঙ্গীন বটে। অন্য দল কখনো এই সুযোগ হারায় না। দুই দল প্রায় সমান শক্তিশালী হইলে ত কথাই নাই। এরূপ সমালোচনায় কতকগুলি লোকের ভোট হারাইলেও পরাজয়ের সম্ভাবনা।

ব্যবস্থাপক সভা ও কর্ম্মচারীদের উপর জনমতের প্রভাব।

যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে যেরূপ বৃহৎ, উহার লোকসংখ্যাও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশে রাজনৈতিক সাম্যের সহিত সামাজিক সাম্য যতদূর স্বীকৃত হইয়াছে, এরূপ আর কোন দেশে হয় নাই। এখানে অতিজনের ইচ্ছা অপ্রতিহতভাবে পালিত হইয়া থাকে, প্রত্যেক সমস্যাতেই

অতিজনের মত লওয়া হয়, অথচ যে অতিজনের ইচ্ছানুসারে দেশের কাজ চলে তাহা এরূপ বৃহৎ ও সমগ্র দেশে এমন ভাবে ছড়াইয়া আছে যে, সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রবাসীর সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে মাত্র। ইহার ফলে কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাস নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে :

(১) অতিজনের ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হইয়া থাকে। যেখানে গণতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানেই অবশ্য এই রীতি মানিয়া চলা হয়। ইহা না মানিলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভবপর হয় না। (২) অতিজনের ভুল হয় না। অর্থাৎ অতিজন যাহাই হোক্ যেহেতু তাহা অতিজন করিয়াছে সেইজন্য বুঝিতে হইবে উহা ঠিক হইয়াছে। (৩) অতিজনের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা বা দোষারোপ করা বৃথা।

প্রথম ধারণাটি বহু গণতন্ত্রে দেখা গেলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারণা যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। প্রথমত মনে হইতে পারে বটে যে, প্রথম ধারণা হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারণা কিরূপে হয়? কারণ, যেখানে অতিজনের ইচ্ছা জয়লাভ করার কথা বলা হইতেছে সেখানেই স্বীকার করা হইতেছে না কি যে বেশ শক্তিশালী উনজন দল রহিয়াছে যাহাকে পরাজিত করিয়া অতিজন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? আর উনজন দল পরাজিত হইয়া গেলেই কি নিজেদের মতামত পরিত্যাগ করে, না বারংবার সেই মতামতের প্রচার করিয়া অপেক্ষায় থাকে কবে নিজেদের মতবাদ জয়যুক্ত হইবে ও উনজন দল অতিজন দলে পরিণত হইবে? জনমতে অতিজনের গুরুত্বের কারণ।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অতিজনের অধিকার স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে অতিজন ভুল করিতে পারে না এই বিশ্বাসও প্রসার লাভ করিয়াছে। বস্তুত, আর কোন দেশে অতিজনের এরূপ সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত হয় কি না সন্দেহ। আর কোন দেশে উনজন হারিয়া গেলে এরূপ সর্ব্বতোভাবে অতিজনের মতানুসারে কাজ করে না। এখানে প্রত্যেক লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে, সব লোক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুধু সমান নয়, সব লোকের মতামত সমান শ্রদ্ধার বস্তু। উনজন দলের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্রবাসী ভোটে হারিয়া যাইবার পর এই কথা ভাবিতে অভ্যস্ত যে, সৎ রাষ্ট্রিক হিসাবে এক্ষণে তাহার অতিজনকে অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। আর রাষ্ট্র-নীতি লইয়া যাহারা বেশী সময় দিতে পারে না তাহাদের পক্ষে জয়ী দলের মতামত গ্রহণ করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। দেশের মধ্যে এরূপ কতকগুলি লোক থাকা বিচিত্র নহে যাঁহারা নিজ দলের মতামতের প্রতি অতিশয় আস্থাবান্ ও অন্য দলের মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু হারিয়া যাইবার পর তাঁহাদের মনোভাবও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহারাও ভাবেন যে, জনগণ যখন তাঁহাদের মত গ্রহণ করিল না বোধ হয় তাঁহাদেরই ভুল, জনগণের বিচারে ভুল হইতে পারে না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে দুই দলের মধ্যে জয়-পরাজয় অনেক সময় ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনের ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। বস্তুত, বহু লোক যাহারা দুই দলের কোন্ দলকে সমর্থন করিবে, এই চিন্তায় ইতস্তত করিতে থাকে, তাহারা ঐ প্রকার নির্ব্বাচনের পর জয়ী দলের দিকে ঝুঁকে, কারণ তখন তাহারা মনে করে অতিজনকে অনুমোদন করাই ন্যায়সঙ্গত।

যুক্তরাষ্ট্রে অতিজনের অত্যাচার বিরল।

এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রবাসী অতি সহজে অতিজনের মতের সহিত মত মিলাইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, ঐ দেশে অতিজনের অত্যাচার বিশেষভাবে বর্ত্তমান আছে। অতিজন জোর করিয়া উনজনকে আপনার পক্ষে আনে না বা বশ্যতা স্বীকার করায় না। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে অতিজনের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বহুপ্রকার ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মত আর কোথাও জনমতের অর্থাৎ অতিজনের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি উনজন যাহাতে দলিত ও নির্য্যাতিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন-প্রণেতাগণ ভুলিয়া যান নাই। কখনো কখনো কোন কোন স্থলে (যেমন নিগ্রোদের সম্পর্কে) ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে উনজন যে ভোটযুদ্ধে হারিয়া যাইবার পর অতিজনকে মানিয়া লয়, তাহা অতিজনের অত্যাচারের ফলে নহে। তাহার কারণ যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মনে অতিজনের নৈতিক শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস।

অতিজনের প্রতি আনুগত্যের কারণ।

অতিজনের প্রতি এরূপ বশ্যতার দু'একটি কারণ এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা। কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় দলের নিজ নিজ বক্তব্য জনগণকে বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার অসীম স্বাধীনতা রহিয়াছে। সংবাদপত্র, সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা, আন্দোলন প্রভৃতি যত রকমে সম্ভব উভয় পক্ষ নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিয়া থাকে। কোন পক্ষেরই একথা বলিবার অবকাশ থাকে না যে, আমার মতবাদ ভাল করিয়া প্রচারের সুযোগ পাই নাই। সুতরাং যখন এক পক্ষ জয়লাভ করে, তখন অন্য পক্ষ বুঝিয়া লয় যে, জনগণ তাহাদের বিরুদ্ধে বিচার-ফল অর্পণ করিয়াছে।

(২) যুক্তরাষ্ট্রবাসীর নিজ প্রতিষ্ঠান ও উহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে অগাধ বিশ্বাস। যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মনে এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, তাহারা ভগবৎ-নির্ব্বাচিত জাতিরূপে জগতে একটা বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য আসিয়াছে। এই কারণে লোকেরা সহজেই অতিজনের আনুগত্য ও অনুমোদন্ করিয়া থাকে। সাধারণ আমেরিকাবাসীর মনে এই অহঙ্কার নাই যে, তাহার মতই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মত ও প্রতিষ্ঠা লাভের উপযুক্ত। জনগণের মতকে যথোপযুক্ত সম্মান করিতে সে অভ্যস্ত ও তাহার একথা মনে হয় না যে, তাহার নিজমত অবলম্বন না করিলেই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পরন্তু ইহাই সে মনে করে, বহুল জনসমষ্টি যাহা চাহিতেছে তাহাতে বাধা না দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য।

(৩) ধর্ম্ম-বুদ্ধি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রভাব বেশী। সাধারণ আমেরিকান্ বহুল পরিমাণে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। সেইজন্য ভোটযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ইহারা জয়ী দলের মতানুসারে কাজ করিতে বাধা না দেওয়াকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে ও এই কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

জনমতের প্রাধান্যের ভালমন্দ।

উপরে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ও আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থায় জনমতের ভাল ও মন্দ উভয় ফলই দেখা যায়। জনমতকে সকলের উপর স্থাপন করার একটা কুফল এই হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমত, ব্যবস্থাপক সভা শেষ পর্য্যন্ত জনমতের পরিচায়ক নাও হইতে পারে

বলিয়া তদনুসারে কাজ করিয়া রাষ্ট্র-নেতা সর্ব্বদা রেহাই পান না; দ্বিতীয়ত, শাসনযন্ত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পায় না বলিয়া সরকারী ও মঙ্গলকর আইন পাশ করিতে বিলম্ব হয় অথবা অনেক আইন পাশ হয় না। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে দেশব্যাপী হৈ চৈ ও গোলমালে একদিকে যেমন প্রতি তিন বৎসর অন্তর কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, অন্যদিকে শাসন-যন্ত্র শক্তিশালী না হওয়ার দরুণ বাকী তিন বৎসরও যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই উভয়ই জনমতকে অতিশয় প্রাধান্য দেওয়ার ফল। জনমতকে প্রাধান্য দেওয়ার একটা সুফল হইয়াছে এই যে, সর্ব্ববিষয়ে জনগণের সাম্য স্বীকৃত হয়, জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞান বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে এবং শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পর বিরোধ নিবারিত হয়।

যৌথরাষ্ট্র ও তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যৌথরাষ্ট্রের সম্বন্ধ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি যৌথরাষ্ট্র অর্থাৎ বিভিন্ন ও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কতকগুলি রাষ্ট্র যুগ্মবদ্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। যৌথরাষ্ট্রের স্বরূপ পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ১৭৮৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন-প্রণয়নের কালে যে দুইটি চিন্তা জনগণের চিত্ত আন্দোলিত করিতেছিল তাহা এই: (১) একটি জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীন ও পৃথক্ সত্তা কতদূর পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইবে? (২) রাষ্ট্রগুলি হইতে কি পরিমাণ ও কি ধরণের ক্ষমতা লইয়া জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার হাতে অর্পণ করা হইবে? ১৭৯১ সনের মধ্যে এই দুই প্রশ্নের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনো তর্কের বিষয় এই ছিল যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে কম বা বেশী ক্ষমতা লওয়া উচিত ছিল কি না এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের হাতে কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিবার পরও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বজায় ছিল কি না। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের পর ইহারও মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা মোটামুটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে যে, যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে তিনটি স্বীকৃত সত্য।

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্র যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া নিজ সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়াছিল ও উহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বর্ণিত যৌথরাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে;

(খ) প্রত্যেক রাষ্ট্র এইরূপে যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াও আত্মমর্য্যাদা ও আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে;

(গ) যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রকার ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক ও তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

যৌথরাষ্ট্র ও তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার কথা আলোচনা কালে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। সমুদায় শাসন-ক্ষমতাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের হাতে ও বাকীটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের হাতে দেওয়া হয় নাই। উভয়ের সমুদায় শাসন ক্ষমতা বিভক্ত হইবার পরও যে ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের হাতে রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের প্রাধান্যের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইতে এই বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন কোন কাজ থাকিতে পারে

যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতাই সব নয়: জনগণের হাতেও ক্ষমতা আছে।

যাহা কোন রাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্র করিতে পারে না। ধরুন কোন রাষ্ট্রে এমন কোন আইনের দরকার হইল যাহা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাপক সভায় বা জনগণের বৈঠকে পেশ করিতে পারে না। অন্যদিকে হয়ত ঐ আইন পাশ করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতিকেও দেওয়া হয় নাই। যদি ঐ আইন প্রণয়ন করা অতিশয় প্রয়োজন হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ উপায় হইবে যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সংশোধন করা।

ক্ষমতার শ্রেণী-বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, যে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রসমূহের নিকট হইতে লইয়া যৌথ-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় নাই, সেগুলি রাষ্ট্রসমূহ ভোগ করিবে। কিন্তু কাঠামো-আইনে যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতাসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াই রাষ্ট্রসমূহ সন্তুষ্ট হয় নাই, ঐ ক্ষমতাকে নানাপ্রকার শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে ও উহা কোন্ কোন্ কাজ করিতে পারিবে না তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রায় সমান, অর্থাৎ উভয়েই অথবা উভয়ের যে কোন একজন দরকারী আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। এইরূপে দেখা যাইবে যে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আছে :

(১) কেবল কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত ক্ষমতা,

(২) কেবল রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত ক্ষমতা,

(৩) যে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারে,

(৪) কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা,

(৫) রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষসমূহের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা।

কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা।

কোন্ কোন্ ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার অষ্টম পল্লব, দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় পল্লব, চতুর্থ ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পল্লব এবং ঐ আইনের ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দফা সংশোধনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পররাষ্ট্রের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের আছে। কোন রাষ্ট্র একাকী বা অন্য রাষ্ট্রের সহিত একযোগে পররাষ্ট্র বিষয়ে বোঝাপড়া করিতে অক্ষম। স্থল ও জলসৈন্য, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্য, সিক্কা, ওজন, ডাকঘর ইত্যাদি জাতীয় প্রয়োজনীয়তামূলক কাজ সম্পর্কে একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের আইন-প্রণয়ন, শাসন-পরিচালনা ও বিচার-ব্যবস্থার ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের অষ্টম পল্লবটি আঠারটি বিভিন্ন দফায় বিভক্ত। এই আঠারটি দফার মর্ম্ম নীচে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে। মহাসমিতির নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি আছে :

(১) কর বসাইবার,

(১) কর বসানো। কর না বসাইয়া কোন রাষ্ট্রেরই চলিতে পারে না। সুতরাং ইহার স্থান সর্ব্বাগ্রে। মহাসমিতির করগ্রহণ ও আদায়ের ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু এই ক্ষমতা অসীম নহে, নানা দিক্ দিয়া সীমাবদ্ধ। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে করভার বসানো চলে, কোন্ কোন্ জিনিষ বাবদ্ কর আদায় হইতে পারে এবং কি উপায়ে কর বসানো যাইবে, সব নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, তিনটিমাত্র উদ্দেশ্যে কর বসানো চলে : (১) "ঋণশোধের জন্য," (২) "দেশরক্ষার জন্য", এবং (৩) "যুক্তরাষ্ট্রের

সাধারণ হিতসাধনের জন্য"। এই তিন কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মহাসমিতি কর বসাইতে পারে না, কিন্তু "সাধারণ হিতসাধন" এরূপ ব্যাপক শব্দ যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের যে কোন কারণে কর বসাইতে বাধা হয় না। কোন কোন রাষ্ট্র-নেতা স্থানীয় উদ্দেশ্যে টাকা খরচ মহাসমিতি মঞ্জুর করিলেও তাহা নাকচ্ করিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্র-নেতা অ্যাণ্ড্রু জনসন যদি বুঝিতেন যে কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা শুধু স্থানীয় উপকার করিবে, কিন্তু তাহার উপকারিতা আরও ব্যাপক হইবে না তাহা হইলে তিনি হিতসাধনমূলক বিলও নাকচ্ করিতে দ্বিধা করিতেন না। দ্বিতীয়ত, সমুদয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপিয়া একটিমাত্র হারে কর বর্ত্তমান থাকিবে। অর্থাৎ মহাসমিতি দেশের একস্থানে একরূপ ও অন্য স্থানে অন্যরূপ হারে কর বসাইয়া তাহা আদায় করিতে সমর্থ নহে। করের হার এবং উহা বসাইবার জন্য সম্পত্তির মূল্য-নির্ণয়-প্রণালী দেশের সর্ব্বত্র একরূপ হইবে। কখনো কখনো কোন রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রকার করের অধিকাংশ যোগানো অসম্ভব ব্যাপার নহে। যেমন, অধিকাংশ ঔপনিবেশিক নিউইয়র্ক বন্দরে আসিয়া নামে বলিয়া ঐ রাষ্ট্র প্রায় সমুদায় করভার বহন করে, যদিও নিয়ম এই যে, ঔপনিবেশিক যেখানেই নামুক তাহার নিকট হইতে সর্ব্বত্র সমান কর গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়ত, কোন রাষ্ট্র হইতে প্রেরিত রপ্তানির উপর কর বসান যায় না [প্রথম ধারা, নবম পল্লব, পঞ্চম উপপল্লব ; ও নিম্নে দ্রষ্টব্য]।

(২) ঋণগ্রহণ। "যুক্তরাষ্ট্রের নামে ঋণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে মহাসমিতির কোন বাধা নাই। অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ, সময় এবং প্রণালী সম্বন্ধে মহাসমিতির যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বহুবার নানাপ্রকারে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছে। কাঠামো-আইনে স্পষ্টরূপে লেখা না থাকিলেও জাতীয় সমুদায় ব্যাঙ্ক ও যৌথ-ব্যাঙ্ক (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) মহাসমিতি কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাঙ্ক-পরিচালনা, যুদ্ধের সময় কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা ও ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণ করা ঋণগ্রহণ-ক্ষমতার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। বিচারালয়সমূহের নানা বিচারের ফলে যৌথরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এই দিকে অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। (২) ঋণ করিবার,

(৩) "বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে ও রেড ইণ্ডিয়ানদের সহিত বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ"। ১৭৮৭ সনে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ বলিতে যাহা বুঝাইত ১৯৩১ সনেও তাহা বুঝাইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। সেকালে বাণিজ্য বলিতে বুঝাইত ঘোড়ার গাড়ী, মালগাড়ী ও সমুদ্রগামী জাহাজের দ্বারা বাহিত বাণিজ্য ; বাষ্পীয় জাহাজ, রেল, মোটর, বাস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, নলের লাইন, 'শক্তি'-চালিত যানবাহন, আকাশযান বা রেডিওর কথা সে সময়ের লোক কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। তথাপি বাণিজ্য শব্দটি ধীরে ধীরে এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, চলাচলের সকল রকম উপায়ই এক্ষণে ধরা হয়। বিচারালয়ের সাহায্যে কাঠামো-আইনের বিস্তৃতির ইহা আর একটি উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় বারে বারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বাণিজ্য বলিতে নৌচালনা (ন্যাভিগেশন), চলাচল (কমিউনিকেশন), যানবাহন (ট্রাফিক), আরোহীবহন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা বেতারের সাহায্যে সংবাদ-প্রেরণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহাও স্থির হইয়াছে

(৩) বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার,

যে, বরাত চিঠি (বিল অব্ এক্সচেঞ্জ) ক্রয়-বিক্রয়, বীমা পলিসি, অথবা এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে পক্ষীসমূহের সাময়িক গমনাগমন, শিল্পের প্রণালী বাণিজ্যের অন্তর্গত নহে। পরদেশের সহিত বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া মহাসমিতি শুল্ক-দেওয়াল ও ঔপনিবেশিক আইনকানুন খাড়া করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়ন কালে রেড ইণ্ডিয়ানদের সহিত বাণিজ্যের গুরুত্ব কিছু ছিল, এখন তাহা অকিঞ্চিৎকর। ১৭৮৭ সনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য অল্প ছিল, কিন্তু বিগত ৫০.৬০ বৎসরে ইহা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ৪৮টি রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত যে পরিমাণ বাণিজ্য করে, পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ একত্রে পরস্পরের সঙ্গে ততটা বাণিজ্য করে না। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের অর্থ এই নয় যে, শুধু কোন রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিবার কালে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে; তাহার অর্থ এই যে, কোন রাষ্ট্র হইতে বাহির হইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গন্তব্য স্থানে না পৌঁছা অবধি এই ক্ষমতা অব্যাহত রহিয়াছে। আন্তর্রাষ্ট্র-বাণিজ্য-সমিতি (ইণ্টার ষ্টেট কমার্স কমিশন), যৌথ-বাণিজ্য-সমিতি (দি ফেডারেল ট্রেড কমিশন), যৌথ-বেতার-সমিতি (দি রেডিও কমিশন) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মহাসমিতি নিয়ন্ত্রণের কাজ চালায়। সাধারণত, কোন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত যানবাহন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলেও, উচ্চতম বিচারালয় ইহা স্থির করিয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত রেলরোডের হার আন্তর্রাষ্ট্র-বাণিজ্য-সমিতির সাহায্যে বাঁধিয়া দিবার ক্ষমতা যৌথ-কর্তৃপক্ষের আছে।

(৪) রাষ্ট্রিক-করণের,

(৪) "রাষ্ট্রিক-করণের (নেচারালিজেশন) সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একরূপ নিয়ম প্রচলিত করা।" রাষ্ট্রিকত্ব দুই উপায়ে লাভ হইতে পারে: (ক) জন্মদ্বারা, (খ) রাষ্ট্রিক-করণ দ্বারা। সকল সভ্য দেশেই রাষ্ট্রিক-করণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের চতুর্দ্দশ সংশোধনী দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে জাত ও উহার শাসনাধীন সকল ব্যক্তিই (পিতা মাতা বিদেশী হইলেও) রাষ্ট্রিক বলিয়া গণ্য হয়। বিদেশে জাত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রিক-করণের ফলে রাষ্ট্রিক হয়। রাষ্ট্রিক-করণ আবার সমূহগত বা ব্যক্তিগত হইতে পারে। যখন কোন স্থানের সমুদায় জনসমষ্টি আইন সাহায্যে এক কলমের খোঁচায় রাষ্ট্রিকে পরিণত হয়, যেমন, ১৮৪৫ সনে যখন টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছিল, তখন তাহাকে সমূহ রাষ্ট্রিক-করণ বলে। ১৯০০ সনে এইরূপে হাওয়াইতের সকল অধিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন আইনের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া যাওয়া মাত্রই তাহার অধিবাসিগণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক হইয়া যায় না। সেজন্য এইরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবার সময়ে অথবা পরে মহাসমিতির উভয় শাখায় স্পষ্ট প্রস্তাব আনা প্রয়োজন। ১৮৯৮ সনে স্পেনের সহিত সন্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পায়, কিন্তু ফিলিপাইনের অধিবাসিগণ আজও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক নহে। পরন্তু মহাসমিতির আইনের বলে পোর্টো রিকোর অধিবাসিগণ সকলেই ঐরূপ রাষ্ট্রিক। ১৯০৬ সনের এক আইন দ্বারা এক্ষণে ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক-করণ হয়। এই কাজ রাষ্ট্রিক-করণ সমিতির (বিউরো অব্ নেচারালিজেশন, ইহা যৌথসরকারের শ্রম-বিভাগের অন্তর্গত) তাঁবে বিচারালয়ে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রিক-করণের জন্য তিনটি জিনিষ আবশ্যক।

(১) রাষ্ট্রিক হইবার ইচ্ছা অর্থাৎ "আমি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক হইতে অভিলাষী" এইরূপ ঘোষণা প্রকাশ্যভাবে সরকারের নিকট করিতে হয়। যে কোন বিদেশী ইংরেজী ভাষায় লিখিতে পারে, শ্বেতাঙ্গ অথবা আফ্রিকায় জাত বা আফ্রিকানের বংশোদ্ভূত, সেই এইরূপ ঘোষণা করিতে সমর্থ। এই আইনের ফলে বিদেশাগত চীনা ও জাপানীদের বাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রে জাত চীনা বা জাপানী পিতামাতার সন্তানেরা রাষ্ট্রিকত্ব লাভে বঞ্চিত হয় নাই। আঠার বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কেহ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক হইবার ইচ্ছা পেশ করিতে পারে না। (২) দুই হইতে সাত বৎসরের মধ্যে (দুই বৎসরের আগে নয় এবং সাত বৎসরের পরে নয়) সেই ব্যক্তি (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে অন্তত পাঁচ বৎসর অনবরত যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়া চাই। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হইল সেই ব্যক্তির রাষ্ট্রিকত্বের জন্য আবেদন করা। এইরূপ আবেদন কোন যৌথ-বিচারালয়ে করিতে হয়। সেখানে উহা অন্তত ৯০ দিন থাকিবার পর ও আবেদনকারীর দাবী রাষ্ট্রিক-করণ সমিতির নিযুক্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যথোচিত-ভাবে পরীক্ষিত হইবার পর, সেই বিদেশী ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক দুইজন সাক্ষী সহ স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী বা সভাপতি বিচারক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হয়। আইন অমান্য করিয়াছেন কি না, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সম্বন্ধে জ্ঞান কিরূপ, তিনি সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী কি না, রাষ্ট্রিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত আছেন কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করা হয়। বিচারালয় সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে রাষ্ট্রিকের কাগজপত্র দিয়া দেয়। এই সব কাগজপত্রের জন্য একটা ফী লাগে। পিতার রাষ্ট্রিক-করণ হইলে ২১ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সমুদায় সন্তানের রাষ্ট্রিক-করণ হয়, কিন্তু উহার ঊর্দ্ধবয়স্ক সন্তানদের হয় না। ১৯২১ সনের পূর্ব্বে স্বামীর রাষ্ট্রিক-করণ হইলে স্ত্রী এবং বিদেশজাত স্ত্রীলোক কোন যুক্তরাষ্ট্রবাসীকে বিবাহ করিলে তিনি রাষ্ট্রিক বনিয়া যাইতেন। কিন্তু ১৯২১ সনের পর হইতে স্ত্রী ও বিদেশজাত স্ত্রীলোককেও রাষ্ট্রিক-করণ আইনের সাহায্য লইতে হয়, তাহা না হইলে তাহারা রাষ্ট্রিক হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কোন স্ত্রীলোক বিদেশীকে বিবাহ করিলে কোন কোন সর্ত্তে মাত্র রাষ্ট্রিক থাকিয়া যাইতে পারে।

"যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র দেউলিয়া-বিষয়ক একই আইন প্রচলিত করা"। ১৮৯৮ সনের এক আইনের বলে এক্ষণে সর্ব্বত্র এক নিয়ম চলিতেছে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত দেউলিয়া আইন সেই সেই রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইতে পারে, যদি ঐ আইনের সহিত ১৮৯৮ সনের আইনের বিরোধ না হয়। এই ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, ইহা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বাধা পাইত। এক রাষ্ট্রের বিক্রেতা অন্য রাষ্ট্রের ক্রেতাকে ধারে জিনিষ দিতে পারিত না ও সর্ব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত।

(৫) "মুদ্রা তৈরী করা এবং উহার ও বিদেশী মুদ্রার দাম নির্ণয় করিয়া দেওয়া"। ১৭৭৬ সনে বিভিন্ন দাম বিশিষ্ট বহু ফরাসী ও স্পেনীয় মুদ্রা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল, ১৭৯৩ সনের আগে জাতীয় মুদ্রার ব্যবস্থা হয় নাই। বিভিন্ন মুদ্রা থাকিলে অথবা এক এক রাষ্ট্রে মুদ্রার দাম এক এক রূপ হইলে বাণিজ্য কখনো শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না বলিয়া মুদ্রা তৈরীর ক্ষমতা

(৫) মুদ্রা-সম্পর্কিত,

একমাত্র মহাসমিতির হাতে দেওয়া হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা নাই। ফিলাডেলফিয়া, ডেনভার, সান ফ্রান্সিস্‌কো ও নিউ অর্লিন্‌সে জাতীয় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৭৯৪ সনে দশমিক সিক্কা প্রণালী—ডলার, ডাইম, সেন্ট প্রচলিত হয়। তখন সোনা ও রূপার দামের অনুপাত ছিল ১৫ : ১। ১৮৩৪ সনে উহা ১৬ : ১ করা হয়। ১৮৭৩ সনে রূপার ডলার তৈরী বন্ধ হইলে সোনার ডলার একমাত্র সিক্কা হইয়া দাঁড়ায়। রূপাকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা ইহার পর সফল হয় নাই ও ১৯০০ সনে আইন করিয়া স্বর্ণমান অবলম্বন করা হয়। এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত সমুদায় সিক্কা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, ভগ্নাংশ মুদ্রা (অর্দ্ধ ডলার, সেন্ট ইত্যাদি), জাতীয় ব্যাঙ্ক নোট, যৌথ রিজার্ভ নোট ও যৌথ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট, যৌথ-কর্ত্তৃপক্ষের শাসনাধীন।

"ওজন ইত্যাদির মাপ ঠিক করিয়া দেওয়া"। ব্যবসার সৌকর্য্যের জন্য দেশের সর্ব্বত্র এক-প্রকার ওজনের মাপ প্রচলিত থাকা দরকার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাত্র ১৯০১ সনে মহাসমিতি ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিকভাবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক প্রকার মাপের প্রচলন করিয়াছে।

(৬) মুদ্রা-বিষয়ক অপরাধের শাস্তি প্রদানের,

(৬) কেহ মুদ্রা বা নোট জাল করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া। ইহা একমাত্র কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নহে, বিভিন্ন রাষ্ট্রেও এ বিষয়ে এবং কখনো কখনো জাল মুদ্রা বা নোট কাহারও হাতে আসিলে তাহাকে শাস্তি দিবার আইন মোতায়েন রহিয়াছে।

(৭) ডাকঘর ও ডাক-রাস্তা তৈয়ারীর,

(৭) "ডাকঘর ও ডাক-রাস্তা তৈরী করা"। সমগ্র দেশের ডাক-প্রথা মহাসমিতি কর্ত্তৃক ত পরিচালিত হয়ই, উপরন্তু ডাক-রাস্তার উপরেও কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের অব্যাহত ক্ষমতা রহিয়াছে। ১৭৮৭ সনে ডাক-রাস্তার অর্থ ছিল, যে রাস্তায় ঘোড়ার পীঠে বা ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক বহিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রধানত রেলে ও আকাশযানে ডাক বাহিত হয়। সেজন্য এখন ডাক-রাস্তার ক্ষমতা বলিতে বুঝিতে হইবে যে, মহাসমিতি রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও চালনা, ডাক উড়োগাড়ীর জন্য জমি লওয়া ও আকাশ-বন্দর স্থাপন করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ ডাকের সুবিধার জন্য যাহা কিছু দরকার সবই করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ডাক-বিভাগ পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যবসা বিশেষ। চিঠি, পার্শেল, মণি অর্ডার, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক ইহার অন্তর্গত। এই সমুদায়ের উপর কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের অসীম ক্ষমতা, মহাসমিতির অনুমতি পাইলে ডাক কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিতে পারেন কোন জিনিষ প্রেরণ নিষিদ্ধ কি না, বিচারালয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিচার হয় না।

(৮) গ্রন্থস্বত্ব স্থিরীকরণের,

(৮) বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধির জন্য গ্রন্থকার ও আবিষ্কারকদের নিজ নিজ লেখা ও আবিষ্কারের উপর কিছু কালের জন্য অবাধ অধিকার দান। এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে না থাকিলে অসুবিধা হইত। গ্রন্থকার বা আবিষ্কারককে ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিতে গিয়া এই অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতে হইত। কোন আবিষ্কারককে ১৭ বৎসরের জন্য নিজ আবিষ্কারের উপর একমাত্র অধিকার বা পেটেন্ট দেওয়া হয়। ১৮৩৬ সনে পেটেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ পেটেন্ট দেওয়া হইয়াছে। স্বত্বসংরক্ষণ চিহ্ন (ট্রেড-মার্কও) পেটেন্ট অফিসে রেজেষ্ট্রী হইতে পারে। গ্রন্থ-স্বত্বের অধিকার বা কপিরাইটের কাল ২৮ বৎসর, অবশ্য উহা

আরো ২৮ বৎসরের জন্য পুনরায় লওয়া যায়। মহাসমিতির গ্রন্থশালা বা লাইব্রেরী কর্ত্তৃক গ্রন্থস্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৯) উচ্চতম বিচারালয়ের নিম্নে বিচারালয় স্থাপন করা। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে একমাত্র উচ্চতম বিচারালয়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। অন্যান্য যৌথ বিচারালয় মহাসমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই অভিপ্রায় ছিল। মহাসমিতি ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে নিম্নতন যৌথ বিচারালয়রূপে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া উচ্চতম হইতে নিম্নতম আদালত পর্য্যন্ত ইহার নিজস্ব বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং কালক্রমে জিলা আদালত, ভ্রাম্যমান আপীল আদালত, দাবী আদালত, শুল্ক আপীল আদালত ইত্যাদি নানাপ্রকার যৌথ বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। যৌথ বিচারালয়সমূহের বিচারকগণকে রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্র-সভার সম্মতি লইয়া নিয়োগ করিয়া থাকেন। অত্যভিযোগ ব্যতীত ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। এই সব বিচারালয়ের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত হন। ইঁহাদের নিয়োগ করিতে হইলে রাষ্ট্র-নেতাকে রাষ্ট্র-সভার সম্মতি লইতে হয় না।

(৯) যৌথ বিচারালয় স্থাপনের,

(১০) বাহির-সমুদ্রে দস্যুবৃত্তির ও আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়া। বাহির-সমুদ্র (হাই সীজ্) বলিতে সমুদ্র-কূল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তীর পরে অবস্থিত জলরাশি বুঝায়। আন্তর্জাতিক আইনে কোন দেশের অধিকার তৎসমীপবর্ত্তী সমুদ্রের তিন মাইল ব্যাপিয়া ধরা হয়, তাহার বাহিরের জলরাশি কাহারও অধিকারভুক্ত নহে। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এখন কোন কোন রাষ্ট্রের এরূপ সমঝোতা আছে যে, মদ্যপান সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করার সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র তাহার তীর হইতে তিন মাইলের বেশী দূরবর্ত্তী বিদেশী জাহাজও খানাতল্লাস করিতে পারে। কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীন না থাকিয়া সমুদ্রে জাহাজের উপর অত্যাচার করার নাম দস্যুতা। ইহা এক্ষণে বিরল। আন্তর্জাতিক আইনের নির্দ্দেশ এইরূপ যে, উদাসীন কোন রাষ্ট্র যুধ্যমান দুই রাষ্ট্রের কোনটিকেই কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রে কেহ এরূপ করিলে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ কর্তৃপক্ষ তাহার শাস্তি দিতে পারেন।

(১০) আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনে শাস্তি দেওয়ার,

(১১) "যুদ্ধঘোষণা করা।" যুদ্ধঘোষণা করিবার ক্ষমতা একমাত্র মহাসমিতির আছে, কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, যুদ্ধঘোষণার পূর্ব্বেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধঘোষণা সম্বন্ধে নিয়ম এই : রাষ্ট্র-নেতা প্রথমত মহাসমিতিকে যুদ্ধঘোষণার পরামর্শ দিয়া পাঠান। তারপর ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার অনুমোদিত এক প্রস্তাব আনীত হইয়া যথোচিতভাবে পাশ হয়। তখন উহাতে রাষ্ট্র-নেতা সহি করেন। যুদ্ধঘোষণার পর যুদ্ধকালে ও শেষে যে সকল সমস্যার উদয় হয় সেগুলির যথোচিত মীমাংসার ভারও মহাসমিতির হাতে থাকে। কিন্তু নূতন জনপদ লাভ করিতে হইলে তাহা সন্ধিবিগ্রহাদির ক্ষমতা দ্বারা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্র-নেতা সমুদায় সৈন্যবলের প্রধান সেনাপতি, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের দায়িত্বে রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন না। যুদ্ধকালে শত্রুর শুধু যুদ্ধজাহাজ নয় সর্ব্বপ্রকার জাহাজ বলে অধিকার করা আন্তর্জাতিক আইন মতে অন্যায় নহে। এই সকল বাণিজ্য-জাহাজ বন্দরে

(১১) যুদ্ধঘোষণা করিবার,

আনীত হইলে একপ্রকার বিশেষ আদালতে স্থির হয় জাহাজের মালপত্রের কি ব্যবস্থা করা হইবে।

(১২) স্থল ও জলসৈন্য তৈয়ারী,

(১২) স্থল-সৈন্যবল তৈরী ও রক্ষা করা। যুদ্ধ যতকাল চলিতে থাকে ও সন্ধি স্বাক্ষরিত না হয় ততকাল জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগের উপর যৌথকর্তৃপক্ষের অসীম ক্ষমতা থাকে। যুদ্ধরত সৈন্যবলের ভরণপোষণের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যকে যে প্রকারে খুশী নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। সে সময় মহাসমিতি জিনিষপত্রের দর পর্যান্ত বাঁধিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধকালে মহাসমিতির ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্থলসৈন্যের ভরণপোষণের জন্য দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া টাকা দিবার ক্ষমতা মহাসমিতির নাই। যুদ্ধের সময় প্রতি দুই বৎসর অন্তর মহাসমিতিকে নূতন করিয়া স্থলসৈন্যের জন্য টাকা চাহিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থার কারণ এই যে, ভয় ছিল পাছে স্থলসৈন্য স্থায়ী হইয়া রাজ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

(১৩) রক্ষা

(১৩) জলসৈন্যের সংস্থান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্থলসৈন্য সম্বন্ধে যেরূপ দুই বৎসরের অধিক সময়ের জন্য টাকার বরাদ্দ করিবার ক্ষমতা নাই, জলসৈন্য সম্বন্ধে সেরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। অর্থাৎ কাঠামো-আইন-প্রণেতাগণ গণতন্ত্র-রক্ষার পক্ষে জলসৈন্যকে বেশী অনুকূল মনে করিয়াছিলেন।

ও (১৪) নিয়ন্ত্রণ করিবার,

(১৪) "স্থল ও জলসৈন্য শাসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা।" যদিও রাষ্ট্র-নেতা জল ও স্থলসৈন্যের প্রধান সেনাপতি, তথাপি মহাসমিতি উঁহাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। স্থল ও জলসৈন্যের আকার, পদোন্নতি ও শাসনের নিয়ম, এবং টাকার বরাদ্দ মহাসমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। কি কি সর্তে টাকা খরচ করা হইবে, তাহাও মহাসমিতি স্থির করিয়া দিতে পারে। কিন্তু টাকা খরচ করিবার স্বাধীনতা রাষ্ট্র-নেতার আছে; যদি তাঁহার মনে হয় সব টাকা খরচ করিবার আর আবশ্যকতা নাই, তবে তিনি সে টাকা খরচ করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তিনি টাকা খরচ করিতে পারেন না।

(১৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যগণকে ব্যবহার,

(১৫) যুক্তরাষ্ট্রের প্রণীত আইন-প্রয়োগ, বিদ্রোহ-দমন ও আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধ-সৈন্যগণকে আহ্বান করা। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিবার কালে (১৭৭৫ সন) প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ সৈন্যদল ছিল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে প্রত্যেক রাষ্ট্রের এইরূপ সৈন্য মোতায়েন রাখিবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। শান্তির সময়ে এই সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি সেই রাষ্ট্রের শাসক (গবর্ণর) ও উহা তাঁহার শাসনাধীন থাকে। কিন্তু এই সৈন্যদলকে যৌথ কর্তৃপক্ষ তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারেন: (১) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আইন-প্রয়োগে বাধা পাইলে; (২) দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে; (৩) বিদেশী শত্রু দেশ আক্রমণ করিলে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই সৈন্যদলকে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু মহাসমিতি বহির্যুদ্ধেও এই সৈন্যদলকে কাজে লাগাইবার উপায় বাহির করিয়াছে। ১৯১৬ সনে জাতীয় রক্ষা আইনের বলে, যখন মহাসমিতি যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য ভিন্ন অতিরিক্ত সৈন্য ব্যবহার করার আদেশ দেয় তখন

রাষ্ট্র-নেতা রাষ্ট্রীয় সৈন্যদলের কতক বা সমুদায় ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারেন।

(১৬) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যবল গঠন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করণ, নিয়ন্ত্রণ ও উহার যে অংশ যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগান হয় তাহার শাসন করা। শান্তি ও যুদ্ধ সকল সময়েই গঠন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করণ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যৌথ কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে। কিন্তু ঐ সৈন্যবলের কর্মচারীদের নিয়োগ ও সৈন্যবলকে যুদ্ধশিক্ষা দিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের রহিয়াছে। অর্থাৎ সৈন্য-শাসন ব্যাপারটাকে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ সৈন্যবলকে যুদ্ধশিক্ষা দিতে পারে, তথাপি ঐ শিক্ষা কিরূপ ভাবে দেওয়া হইবে তাহা মহাসমিতি নির্দেশ করিয়া দিতে সক্ষম।

ও (১৬) নিয়ন্ত্রণ করিবার,

(১৭) যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে আইন প্রণয়ন করিবার একমাত্র অধিকার। ১৭৮৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী স্থিরীকৃত হয় নাই,—রিচমণ্ড, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক ও বোষ্টন প্রত্যেকটি এই সম্মান পাইবার জন্য উৎসুক ছিল। কাঠামো-আইন-প্রণেতাগণ এই সমস্যাটি মহাসমিতির হাতে তুলিয়া দিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, রাজধানী এমন একটি স্থানে স্থাপিত হইবে, যেখানে কোন রাষ্ট্রের অধিকার থাকিবে না। সেই জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ১০ বর্গ মাইলের অনধিক কোন জিলা কোন রাষ্ট্রের নিকট হইতে লইয়া মহাসমিতির সম্মতি থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হইবে। একদিকে মেরিল্যাণ্ড ও অন্যদিকে ভার্জিনিয়া জমি দান করে। ভার্জিনিয়ার জমি ফিরাইয়া দিয়া মেরিল্যাণ্ডের কলম্বিয়া জিলা রাজধানীর জন্য লওয়া হয়। রাষ্ট্র-নেতা কর্তৃক মনোনীত তিনজন জিলা কমিশনার এই জিলার শাসন চালান ও ইহার সমস্ত আইন মহাসমিতি কর্তৃক প্রণীত হয়। এই জিলার শাসক, ব্যবস্থাপক সভা ও ভোট নাই। কিন্তু ইহার সমুদায় অধিবাসী কর দিয়া থাকে।

(১৭) রাজধানীর আইন-কানুন প্রণয়নের ক্ষমতা; এবং

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি অনুসারে যদি দুর্গ, বারুদ ঘর, বন্দর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য সেই রাষ্ট্রের জমি যুক্তরাষ্ট্র কিনিয়া লয়, তাহা হইলে সেই সব স্থলের উপরও যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়া জিলার শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা চালাইতে পারে, সেই স্থানের উপর রাষ্ট্রের আর কোন অধিকার থাকে না।

(১৮) উপরে যে সকল ক্ষমতার উল্লেখ করা হইল এবং কাঠামো-আইন দ্বারা আর যে সকল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অথবা ইহার কোন বিভাগ অথবা কোন কর্মচারীর হাতে অর্পিত আছে, সেগুলিকে কাজে পরিণত করিবার জন্য যে যে আইন প্রণয়ন করা দরকার বিবেচিত হইবে তাহা প্রণয়ন করা। ইহা দ্বারা যদিও নির্দিষ্ট কোন ক্ষমতার উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি এই দফার গুরুত্ব এই জন্য যে, ইহা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিবার সহায়তা করিয়াছে। যেমন, মহাসমিতির ডাকঘর স্থাপনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ক্ষমতাসমূহ,—ডাকঘর কোথায় বসানো হইবে, উহার ভার কাহাকে দেওয়া হইবে, কিরূপে ডাক প্রেরিত হইবে, টিকিটের দাম কি হইবে ও আরও অনেক বিষয়ে মহাসমিতি আইন করিতে পারে।

(১৮) উপরোক্ত ক্ষমতা-সমূহ প্রয়োগের জন্য অন্যান্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা-সমূহ।

রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বর্ণনাকালে ইতিপূর্বেই দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় পল্লবের মর্ম ব্যক্ত করা

হইয়াছে। সেখানে মহাসমিতি শুধু রাষ্ট্র-নেতাকে, বিচারালয়সমূহকে অথবা বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণকে আইন করিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দিয়াছে, এই কথা বলিয়াছি। বিচারালয় সম্পর্কে মহাসমিতির ক্ষমতার কথা পরে বলা যাইবে। তৃতীয় ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পল্লবের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, (ক) মহাসমিতি কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিতে পারে। কোন রাষ্ট্রে প্রচলিত নিয়মকানুনের জন্মই হোক্ বা আর যে কোন কারণেই হোক্ মহাসমিতি কোন রাষ্ট্রকে গ্রহণ নাও করিতে পারে। প্রথমত কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইতে ইচ্ছুক বলিয়া আবেদন করিতে হয়। মহাসমিতি ইহার স্বপক্ষে মত দিলে রাষ্ট্রের জনগণের উপর উহার কাঠামো তৈয়ারীর ভার পড়ে। সেই কাঠামো জনগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে ও মহাসমিতির নিকট উপস্থাপিত করিলে মহাসমিতি প্রস্তাব করিয়া সেই রাষ্ট্র ও তাহার প্রতিনিধিগণকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করে। (খ) নূতন রাষ্ট্র গ্রহণ বিষয়ে মহাসমিতির ক্ষমতায় কোন বাধা নাই, কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বা পরস্পর যোগ দিয়া নূতন রাষ্ট্র তৈয়ারীর ক্ষমতা মহাসমিতির নাই। (গ) যুক্তরাষ্ট্রের অধীন রাজ্য (টেরিটরি) অথবা অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যে কোন প্রকার আইন-কানুন করিতে মহাসমিতি সমর্থ। এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন স্থান নাই—কিন্তু ঐ সীমার বাহিরে আলাস্কা, হাওয়াই, পোর্টো রিকো, ফিলিপাইন ও ভার্জিন দ্বীপ এবং খাল-প্রদেশ রহিয়াছে। (ঘ) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের এরূপ ব্যাখ্যা কখনো করা হইবে না যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের বা তদন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের দাবিদাওয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। (ঙ) প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বারাজ্য আকার যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আইনত বাধ্য আর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যদি সেই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা অথবা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপক সভার অনুপস্থিতিতে) আবেদন করে তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র উহাকে সাহায্য করিতে পারে (৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আবেদন না করিলে যুক্তরাষ্ট্র নিজে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহে।

কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের অন্যান্য ক্ষমতাবলী।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের ১৩, ১৪ ও ১৫ সংশোধনী দ্বারা বলা হইয়াছে যে, (ক) দাসত্ব প্রথা বা জোর করিয়া দাস রাখা চলিবে না, (খ) জাত অথবা রাষ্ট্রিক-কৃত সকল ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ও যে রাষ্ট্রের অধিবাসী সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক—মহাসমিতি যথোচিত কারণ থাকিলে কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রিকত্ব নাকচ্ করিতে পারে, (গ) কোন রাষ্ট্র এরূপ নিয়ম প্রণয়ন বা প্রয়োগ করিতে পারে না যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকের অধিকার খর্ব্ব হয়, (ঘ) তদ্রূপ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি নাশ বা আইনের সহায়তা-লাভে বাধা দেওয়া চলিবে না, (ঙ) যে কেহ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যোগ দিয়াছে, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হইবে—তবে মহাসমিতি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে, (চ) জাতীয় ঋণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং (ছ) জাতি, বর্ণ বা পূর্ব্বেকার দাস অবস্থার জন্ম কোন ব্যক্তি ভোট দেওয়ার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। ইহা ছাড়া লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়মও উল্লিখিত হইয়াছে।

আভ্যন্তরিক শাসন-সৌকর্য্যের জন্য ফৌজদারি ও দেওয়ানি সকল প্রকার আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা ও দরিদ্র পালনের ব্যবস্থা ও নিজ কার্য্য সম্পাদনের জন্য করভার স্থাপন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার অন্তর্গত। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে প্রত্যেক রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বশীল,—শুধু কয়েকটি স্থলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ [নীচে দ্রষ্টব্য], তাহা ছাড়া যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় নাই, সেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা।

কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে যদিও উভয় কর্তৃপক্ষেরই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, তথাপি কোন প্রকার যৌথ আইন না থাকিলে মাত্র রাষ্ট্রীয় আইন কার্য্যকর হয়। দেউলিয়া, নৌ-চালনা ও বন্দর বিষয়ক আইন এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ষোড়শ সংশোধনী অনুসারে এক্ষণে আয়কর সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, লোকগণনা অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে টাকা বণ্টনের কথা কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ঐ কর আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ আইন অনুসারে রাষ্ট্র-সভাসদ্ ও প্রতিনিধি-সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারে। কিন্তু মহাসমিতি অনুরূপ ব্যবস্থা করিলে রাষ্ট্রীয় আইন আর বলবৎ থাকে না। কোন কোন শ্রেণীর মোকদ্দমায় যদি মহাসমিতির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা কোন প্রকার আইন প্রণয়ন না করিয়া থাকে, অথবা যেখানে কোন ব্যক্তির খুসীমত মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা আছে সেখানে, মোকদ্দমাকারীর যৌথ বা রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে মোকদ্দমা চালাইবার বাধা নাই।

যৌথরাষ্ট্রের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুগ্ম ক্ষমতা।

কোন্ কোন্ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার নবম পল্লবে ও প্রথম দশটি সংশোধনীতে লিপিবদ্ধ আছে। এইগুলির অর্থ সংক্ষেপে নীচে দেওয়া যাইতেছে।

যৌথরাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা।

(১) ১৮০৮ সনের পূর্ব্বে দাস হিসাবে যে সকল ব্যক্তিকে বাহির হইতে আনা হইত, মহাসমিতি তাহাদের আনিবার পক্ষে কোন রাষ্ট্রকে বাধা দিত না, অবশ্য এরূপ লোক আমদানির জন্য মাথা পিছু দশ ডলারের অনধিক একটি কর আদায় করিয়া লওয়া হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাসমিতিকে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে এই সন্দেহ ছিল যে তাহারা আফ্রিকা হইতে নিগ্রো দাস আনিয়া আর ব্যবসা করিতে পারিবে না। অন্য দিকে, উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দাস-ব্যবসায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিল। উভয়ের মধ্যে রফার ফলে স্থির হয় যে, ১৮০৮ সন পর্য্যন্ত মহাসমিতি এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করিবে না, শুধু দশ ডলারের অনধিক কর প্রত্যেক দাসের জন্য আদায় করিতে পারিবে। মহাসমিতি এই সর্ত্ত পালন করিয়াছিল, কিন্তু মাথা পিছু দশ ডলার কর বসাইয়াছিল। ১৮০৮ সনে মহাসমিতির এইরূপে দাস আমদানি বন্ধ করার পর যুক্তরাষ্ট্রে আর দাস আসে নাই। অন্তর্যুদ্ধের কালে যুক্তরাষ্ট্রের দাসগণ তদ্দেশস্থ দাসগণের সন্তান-সন্ততি মাত্র ছিল।

(১) ১৮০৮ সন পর্য্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলকে বাহির হইতে দাস আমদানিতে বাধা দেওয়া হয় নাই।

(২) বিদ্রোহ বা আক্রমণের সময়ে জনসাধারণকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য দরকার না

মহাসমিতি
(২) কাহাকেও রিট্ অব্ হেবিয়াস্ কর্পাসের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না;

হইলে সশরীরে হাজির করাইবার পরোয়ানা 'রিট অব্ হেবিয়াস কর্পাস' এর সুযোগ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে অযথা আটক হইয়াছে, তবে সে বিচারালয়সমূহে সশরীরে হাজির করাইবার পরোয়ানার সুবিধা চাহিতে পারে। ইহা প্রদত্ত হইলে জেল-রক্ষককে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার যথাযোগ্য কারণ দেখাইতে হয়,—না দেখাইতে পারিলে কয়েদীকে খালাস করিতে হুকুম দিবার ক্ষমতা বিচারালয়সমূহের আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমিতি পাছে নিজে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, সেজন্য কয়েকটি বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণ রাষ্ট্রিককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত না করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহ বা আক্রমণ কালে রাষ্ট্রিককে এই অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার ক্ষমতা কাহার হাতে দেওয়া আছে—রাষ্ট্র-নেতার না মহাসমিতির—তাহার উল্লেখ নাই। উচ্চতর বিচারালয়ে কখনো কখনো সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মহাসমিতির হাতে এই ক্ষমতা দেওয়াই অভিপ্রায় ছিল।

(৩) সরাসরি বিচার-আইন বা আগে যাহা অপরাধ ছিল না তাহা অপরাধ গণ্য করিবার আইন পাশ করিতে পারে না।

(৩) সরাসরি বিচার আইন (বিল্ অব্ এটেইণ্ডার) বা পূর্ব্বে যাহা অপরাধ ছিল না পরে তাহা অপরাধ গণ্য করিবার (এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টো) আইন মহাসমিতি পাশ করিতে পারে না। ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ করিয়া সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইরূপে আনীত বিলকে বিল্ অব্ এটেইণ্ডার বলে। যেখানে জুরি বা অত্যভিযোগের সাহায্যে কোন লোককে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর নহে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে সেই ব্যক্তিকে তাহার অপরাধ না জানাইয়া অথবা তাহার বিচার না করিয়া ও তাহার কি বলিবার আছে তাহা না শুনিয়া, লোকটি দেশের শত্রু অথবা ইহাকে বিনা বিচারে আটক করা হউক, এই বলিয়া কোন অবস্থাতেই কোন আইন পাশ করিতে পারে না। রীতিমত বিচারালয়ের বিচারে অত্যভিযোগে দোষী সাব্যস্ত না হইলে কাহাকেও শাস্তি দিবার জন্য কোন প্রকার বিল আনিবার ক্ষমতা মহাসমিতির নাই। উচ্চতম বিচারালয়ে এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টো আইনের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে: "কোন কাজ পূর্ব্বে অপরাধ ছি[ল] না কিন্তু আইন পাশ করিবার পর অপরাধে পরিগণিত হইয়াছে, এইরূপ আইন; অপ[রাধ] অনুষ্ঠিত হইবার কালে উহার গুরুত্ব যতটা ছিল আইনের পর তাহার গুরুত্ব তাহার চেয়ে বেশী হইয়াছে এবং তাহার শাস্তির ব্যবস্থা ও বিচারের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৪) আয়-কর ক্ষমতা।

(৪) বর্ত্তমানে আয়-কর সম্বন্ধে আইন ষোড়শ সংশোধনী দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। (১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(৫) রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসানো সম্বন্ধে অক্ষমতা।

(৫) "কোন রাষ্ট্র হইতে প্রেরিত রপ্তানি দ্রব্যের উপর কোন প্রকার কর বসানো হইবে না।" যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অংশ হইতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে প্রেরিত রপ্তানি দ্রব্যের কথা এখানে বলা হইয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলের সহিত রফার ফলে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ভয় ছিল যে মহা-সমিতিকে রপ্তানি-শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা দিলে ঐ অংশে জাত ও প্রধানত ইয়োরোপে প্রেরিত তুলা, তামাক ও দক্ষিণঅঞ্চলস্থিত অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(৬) এমন কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না, যাহাতে বাণিজ্য বা রাজস্ব বিষয়ে

কোন রাষ্ট্রের বন্দর অন্য রাষ্ট্রের বন্দরের চেয়ে বেশী সুবিধা পাইবে; অথবা কোন রাষ্ট্রের দিকে অথবা রাষ্ট্র হইতে পরিচালিত জাহাজসমূহ অন্য কোন রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে, উহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে অথবা সেখানে শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিবে না। এক কথায়, যুক্তরাষ্ট্র কোন বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিতা দেখাইতে পারিবে না। যৌথরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিবার জন্য অন্য রাষ্ট্রের জাহাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক আইনকানুন প্রণয়ন করিতেছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মহাসমিতির হাতে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়। তখন এই ভয় ছিল যে, মহাসমিতি হয়ত বিশেষ কোন রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইতে পারে। তাহার প্রতীকারকল্পে ফলে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়।

(৬) কোন রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক আইন করা সম্ভব নহে।

(৭) আইন করিয়া খরচের জন্য ছাড়া অন্য কোন প্রকারে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা মহাসমিতির নাই; এবং আয়ব্যয়ের একটা রীতিমত হিসাব কখনো কখনো প্রকাশিত করিতে হইবে। মহাসমিতি কর্ত্তৃক টাকা খরচ করিবার বর্ত্তমানে রীতি নিম্নরূপ: রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত আয়ব্যয় পরিচালক (ডিরেক্টর অব্ বাজেট) নামক এক কর্ম্মচারী প্রত্যেক বৎসর বিভিন্ন সমিতির (বোর্ডের—আন্তর্রাষ্ট্র সমিতি, যৌথ-বাণিজ্য সমিতি, সিবিল সার্ব্বিস্ সমিতি ইত্যাদি) নিকট হইতে আগামী বৎসরের খরচপত্রের হিসাব চাহিয়া পাঠায়। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব শুল্ক, আয়কর ও অন্যান্য দফা বাবদ ঐ বৎসর কি আয় হইবে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই উভয় প্রকার তথ্য একত্র সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব সহ রাষ্ট্র-নেতার নিকট প্রেরিত হয়। রাষ্ট্র-নেতা প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাতে কোন কোন পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা প্রতিনিধি-সভার নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রতিনিধি সভায় ব্যয়সমিতি দফায় দফায় উহা আলোচনা করিয়া থাকে। এইরূপ আলোচনাকালে উহা বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাব্যক্তিগণকে ও অন্য প্রধান কর্ম্মচারীদের ডাকিতে পারে। সমিতির আলোচনার পর, বাজেটটি একটি বিলরূপে সমগ্র প্রতিনিধি সভার নিকট প্রেরিত হইলে, সেখানে আলোচনা ও সংশোধনের পর রাষ্ট্র-সভায় প্রেরিত হয়। রাষ্ট্র-সভায়ও ঐরূপে পাশ হইলে উহা রাষ্ট্র-নেতার নিকট ফিরিয়া আসে। তখন রাষ্ট্র-নেতা উহাতে স্বাক্ষর করিয়া পাশ করিতে পারেন অথবা নাকচ্ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, নাকচ্ করিতে হইলে সমগ্র বিলটিকেই করিতে হয়। (৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(৭) আইন পাশ না করিয়া কোন অর্থব্যয়ের ক্ষমতা নাই।

(৮) কোন প্রকার উপাধি দেওয়া হইবে না; এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারী, লাভজনক অথবা বিশ্বাসের কাজে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মহাসমিতির অনুমতি ব্যতীত কোন রাজা বা বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন প্রকার উপহার, পুরস্কার, চাকুরী বা উপাধি গ্রহণ করিতে পরিবে না। বিলাতে রাজার জন্মদিনে ও অন্যান্য সময়ে নানাপ্রকার উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে স্বারাজ্য গণতন্ত্রের ফলে সকলের সাম্য স্বীকৃত হওয়ায় এরূপ উপাধি দেওয়া চলে না। পরন্তু বাহির হইতেও এরূপ উপাধি লওয়ার পক্ষে বাধা আছে। বাধাটা যাহারা যুক্তরাষ্ট্রের চাকুরী করে তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অর্থাৎ সাধারণ রাষ্ট্রিকের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হওয়ায় কোন দোষ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী

(৮) উপাধি দেওয়া নিষিদ্ধ।

চাকুরেরা যে একেবারেই এরূপ বিদেশী সম্মান লাভ করিতে পারে না, তাহা নহে। মহাসমিতি সম্মতি দিলে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে মহাসমিতি সম্মতি দিয়াছে।

অন্যান্য নিষেধ।

প্রথম দশটি সংশোধনীতেও জাতীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিষেধের কথা আছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নরূপ: (১) ধর্ম্ম, বক্তৃতা ও মুদ্রাযন্ত্র, এবং অন্যায়ের প্রতি ক্রিয়ার্থে আবেদন সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতি কোন প্রকার আইন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে পারে না। (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পক্ষে সৈন্যশ্রেণী দরকার বলিয়া, লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। (৩) যুদ্ধকালে (আইন-নির্দ্দিষ্টভাবে) ও শান্তির সময়ে কখনোই মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন গৃহে সৈন্য রাখা যায় না। (৪) জনগণের নিজ দেহ, গৃহ, কাগজপত্র, সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহ অযথা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ নহে; শপথের দ্বারা যথেষ্ট কারণ দর্শাইলে তবেই খানাতল্লাসির ওয়ারেণ্ট বাহির করা যায়। (৫) ও (৬) বিদ্রোহ ইত্যাদি বড় রকমের অনিষ্টকর ঘটনা না ঘটিলে, 'গ্রাণ্ড জুরি' কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হইলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না; কোন লোককে একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি দেওয়া হইবে না; ফৌজদারি মোকদ্দমায় কাহাকেও তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হইবে না; রীতিমত বিচার ছাড়া কাহারও জীবন লওয়া হইবে না, স্বাধীনতা বা সম্পত্তিচ্যুত করা হইবে না; অথবা যথোচিত ক্ষতিপূরণ না দিয়া কাহারও সম্পত্তি সরকারী কাজের জন্য লওয়া হইবে না। ইহা ছাড়া সকল রকম ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি জুরীর বিচারের, বিরুদ্ধ সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিবার, নিজের সাক্ষী ও উকীল যোগাড় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। (৭) দেওয়ানি মোকদ্দমায় যে মোকদ্দমার ২০ ডলারের অধিক মূল্য লইয়া বিবাদ সেখানেই জুরির বিচার হইবে। (৮) অত্যধিক জামিন, জরিমানা বা শাস্তি নিষিদ্ধ। (৯) জনগণের কতকগুলি অধিকার বর্ণিত আছে বলিয়া মনে করা হইবে না যে, উহাদের অন্যান্য অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। (১০) যে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় কাঠা[মো] আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হয় নাই অথবা উহা দ্বারা রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে [নিষি]দ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই, সেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বা জনগণে অর্পিত আছে বুঝিতে হইবে।

উপরে যে দশটি সংশোধনীর মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে বিল অব্ রাইট্‌ (স্বাধীনতার পরোয়ানা) বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐগুলি দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রস্থ জনগণের কতকগুলি এমন সাধারণ অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে সেগুলি ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নাই। সুতরাং যৌথরাষ্ট্রের পক্ষে যে সব ক্ষমতা নিষিদ্ধ তাহার অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক-সম্পর্কিত, আর কতকগুলি সাধারণ আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা।

যৌথরাষ্ট্রের মত বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও কতকগুলি ক্ষমতা নিষিদ্ধ। এইগুলি রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম ধারার দশম পল্লবে ও সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ সংশোধনীতে আছে। এগুলির মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।

(১) (ক) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের সন্ধি-বিগ্রহাদি করিবার ক্ষমতা নাই।

৪৮টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির এরূপ ক্ষমতা থাকিলে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। (খ) যুদ্ধকালে শত্রুর বাণিজ্য-জাহাজ অধিকার করিবার ক্ষমতা যৌথকর্তৃপক্ষের আছে তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রকার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নাই। (গ) মুদ্রা প্রস্তুত করা, সাউকারি বিল (বিল অব্ ক্রেডিট্) বাহির করা ও ঋণশোধের জন্য সোনা ও রূপার মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু প্রচলিত করা রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে নিষিদ্ধ। মুদ্রা তৈরীর ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আছে। রাষ্ট্রসমূহ কোন প্রকার কাগজী মুদ্রার প্রচলন করিতে পারে না। বিলাতের সঙ্গে যুদ্ধকালে ও পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার কাগজী মুদ্রা বাহির করায় এরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মহাসমিতি রাষ্ট্রের হাত হইতে মুদ্রা তৈরীর ক্ষমতা উঠাইয়া লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের মুদ্রা তৈরী বা প্রচলনের ক্ষমতা না থাকিলেও ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিবার ও ব্যাঙ্কসমূহকে কাগজী মুদ্রা প্রচার করিতে দিবার ক্ষমতা আছে। বস্তুত ১৮৬৩ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে এইরূপ অনেক ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছিল। কিন্তু ঐ সনে মহাসমিতি জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইন পাশ করিয়া নিয়ম করিয়াছে যে, কোন ব্যাঙ্ক যত কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহার লিখিত মূল্যের ১০% কর হিসাবে দিবে। এই আইনের ফলে পূর্ব্বোক্তপ্রকার নোটের প্রচলন রহিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী ঋণশোধের জন্য কি প্রকার মুদ্রা লওয়া হইবে বা হইবে না সে সম্বন্ধে নিয়ম করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা মহাসমিতির আছে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের সে ক্ষমতা নাই। রাষ্ট্রের পক্ষে মাত্র সোনা-রূপাতে ঐ কাজ চালাইতে হয়। (ঘ) কোন রাষ্ট্রের সরাসরি বিচার আইন (বিল অব্ এটেইণ্ডার) ও পূর্ব্বে যাহা আইনের চোখে অসঙ্গত ছিল না পরে তাহা বে-আইনী করিবার (এক্স্ পোষ্ট ফ্যাক্টো) আইন অথবা চুক্তিভঙ্গবিষয়ক আইন পাশ করিবার অধিকার নাই। প্রথম দুইটি ক্ষমতা যৌথকর্তৃপক্ষের পক্ষেও নিষিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চুক্তির অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্মিলিত বোঝাপড়া। দুই ব্যক্তি পরস্পর চুক্তি করিলে সেই চুক্তি মানা তাহাদের কর্ত্তব্য। কোন রাষ্ট্র এমন আইন করিতে পারে না যাহা পূর্ব্বকৃত চুক্তি বিনষ্ট করে। কিন্তু যখন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কোন প্রকার সনন্দ লাভ করে, তখন রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে সেই সনন্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে যে উহা কিরূপে কখন ত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। (ঙ) কোন রাষ্ট্রের পক্ষে উপাধি দান নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে যৌথকর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা একরূপ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই আইনের ফলে কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী যে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নিকট হইতে উপাধি, পেন্সন বা পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে না, একথা বলা হয় নাই। কোন রাষ্ট্র ইহাতে আপত্তি না করিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রই এক্ষণে নিজ কাঠামো-আইনের দ্বারা ঐরূপ কাজ নিষিদ্ধ করিয়াছে।

কোন রাষ্ট্রের সন্ধি-বিগ্রহ,

মুদ্রা নির্ম্মাণ,

সরাসরি বিচার আইন, নূতন অপরাধ আইন, চুক্তিভঙ্গবিষয়ক আইন,

উপাধি দান,

(২) মহাসমিতির অনুমতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্র কোন প্রকার আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইতে পারে না। অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বাণিজ্যেই হোক্ বা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যেই হোক্, শুল্ক-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র যৌথকর্তৃপক্ষের আছে।

আর এই প্রকার শুল্ক বসাইবার অনুমতি মহাসমিতি কখনো কোন রাষ্ট্রকে দেয় নাই। শুল্ক সম্পর্কে যে পরিদর্শন-আইন বাহাল আছে অর্থাৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কর্মচারী বাহাল রাখিয়া দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে হয় তজ্জন্য খরচ মিটাইতে ফল, মাংস প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানির উপর রাষ্ট্র শুল্ক বসায়, কিন্তু এইরূপে যদি খরচের চেয়ে বেশী টাকা উঠে, তাহা হইলে সে টাকা যুক্তরাষ্ট্র পায়। রাষ্ট্রের পরিদর্শন-আইনও পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিবার ক্ষমতা মহাসমিতির আছে।

ও শুল্ক-স্থাপনের ক্ষমতা নাই।

(৩) মহাসমিতির অনুমতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্র জাহাজের উপর শুল্ক বসাইতে পারে না; শান্তির সময়ে রীতিমত সৈন্যবল বা যুদ্ধজাহাজ রাখিতে, অন্য রাষ্ট্র বা বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন প্রকার সমঝোতা খাড়া করিতে বা যুদ্ধ করিতেও সক্ষম নহে, যদি না আক্রান্ত হয় বা এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হয় যে দেরী সহিবে না। রাষ্ট্রসমূহ আমদানি-রপ্তানি-শুল্ক বসাইতে পারে না,—পাছে বন্দরাভিমুখী ও বন্দর হইতে বহির্গামী জাহাজের উপর কর বসায়, সে জন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ঐরূপ শুল্ক বসানো নিষিদ্ধ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ সৈন্যবল ও পুলিশ আছে, তাহা কাঠামো-আইন দ্বারা অনুমোদিত। কিন্তু রীতিমত যুদ্ধ-দক্ষ সৈন্যবল অন্য জিনিষ। এই প্রকার সৈন্য কোন রাষ্ট্রের থাকিতে পারে না। কোন রাষ্ট্র নৌ-সৈন্য রাখিতেও অক্ষম। কোন কোন সমুদ্রতীরস্থ রাষ্ট্রের বন্দরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ এইজন্য রাখিতে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে যৌথরাষ্ট্রের নিযুক্ত সৈন্যগণের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সৌকর্য্য সাধিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হোক বা বিদেশী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হোক্, কোন রাষ্ট্র যুদ্ধঘোষণা করিতে পারে না। অতিশয় বিপদের সময় ছাড়া যুদ্ধ করাও রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে নিষিদ্ধ।

সপ্তদশ সংশোধনী রাষ্ট্র-সভার নির্ব্বাচন, অষ্টাদশ সংশোধনী মদ্যপান নিবারণ, ঊনবিংশ সংশোধনী স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান সম্বন্ধে। এই সব ক্ষেত্রে যৌথকর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতাই চূড়ান্ত বলিয়া মানা হইয়াছে ও যেখানে যৌথরাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেখানে কোন রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

রাষ্ট্রের কয়েকটি বিশেষত্ব :

উপরে যুক্তরাষ্ট্র ও তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষণ ও ক্ষমতাবলীর কথা উল্লেখ করা হইল। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সত্তা বজায় আছে।

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসমূহ কাঠামো-আইনে এমনভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই যে, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য থাকিবে না। পরন্তু ধর্ম্ম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে কোন প্রকার নিষেধের উল্লেখ না থাকায় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষমতাবলী সমস্তই আদিম ক্ষমতা। অর্থাৎ যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবার পূর্ব্বে হইতেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সত্তা ও আত্মকর্তৃত্ব ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবার কালে মাত্র কতকগুলি ক্ষমতা যৌথকর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যে সকল ক্ষমতা যৌথকর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ নাই ও যে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে

নিষিদ্ধ নহে, সেগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং যখন কোন ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্রের অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের রহিয়াছে, এইরূপ সমস্যার উদয় হয়, তখন যৌথরাষ্ট্রকে প্রমাণ করিতে হয় যে কাঠামো-আইনে ঐ ক্ষমতা যৌথ-কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে। যৌথকর্তৃপক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে সে ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্পিত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষমতা যেমন আদিম ক্ষমতা, যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা সেইরূপ প্রতিনিধির প্রতি অর্পিত ক্ষমতা। যে ক্ষমতা কাঠামো-আইন দ্বারা যৌথকর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হইয়াছে, যৌথকর্তৃপক্ষ তাহার বেশী ক্ষমতার দাবী বা প্রয়োগ করিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্রে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কতকগুলি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সুশাসন ইত্যাদির জন্য তুলিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে এই সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, উহারা ঐ সব ক্ষমতা হাতে অর্পণ করিয়াছে বলিয়াই অধিকারী হইয়াছে।

(২) রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা হইতেছে আদিম ক্ষমতা ও যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্পিত ক্ষমতা।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ বিষয়ে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একে অন্যের নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া থাকে। সুশাসন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র উহার জনগণের দ্বারা সৃষ্ট। জনগণ রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন বাঁধিয়া দিয়া শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছে। সুতরাং স্থানীয় শাসন বা আইন-প্রণয়ন বা বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র মাথা ঘামায় না, বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহা লইয়া মাথা ঘামায়। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও সুশাসন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের উপর যৌথরাষ্ট্র সরাসরি ও সাক্ষাৎভাবে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তজ্জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তার দরকার হয় না। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিককে যৌথরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক বলিয়াও গণনা করে। যৌথ-কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করেন না, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মাত্র কাঠামো-আইন রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছে :

(৩) যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ অন্য-নিরপেক্ষভাবে শাসন-কার্য্য চালায়।

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রকে রাজধানীতে দুইজন রাষ্ট্র-সভাসদ্ ও যথা-নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধি-সভার সভ্য পাঠাইতে হয়।

(খ) রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনের জন্য নির্ব্বাচকেরা একত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভোট দেয় ও তাহাদের ভোট রাজধানীতে প্রেরিত হয়।

(গ) প্রত্যেক রাষ্ট্রকে উহার রক্ষিত সৈন্যবল সুগঠিত রাখিতে হয় এবং যুদ্ধার্থ আহূত হইলে উহাদিগকে রাষ্ট্র-নেতার কর্তৃত্বাধীনে পাঠাইতে হয়।

(ঘ) প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বারাজ্য গণতন্ত্র বজায় রাখিতে বাধ্য।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যে সংঘবদ্ধ বা যৌথ-রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা খণ্ডিত বা বিধ্বস্ত হইতে পারে না। কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই ঐ সঙ্ঘ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহকে যদিও রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হয়, প্রকৃত পক্ষে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বকর্তৃত্বশীল একটি মাত্র রাষ্ট্র।

(ক) যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিভিন্ন রাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের এই যুগবদ্ধতার দুইটি মূলসূত্র নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) জাতীয় মঙ্গলের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্ষমতাসমূহ মাত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে,—এই ক্ষমতা আরও খর্ব করিলে জাতীয় মঙ্গল খর্ব হইত; (২) যৌথরাষ্ট্র বিভিন্ন রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্বন্ধ দুই দিক্ হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে: (ক) ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যৌথকর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ; (খ) যে সকল ব্যক্তি লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গঠিত রাষ্ট্রের ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকরূপে তাহাদের সহিত যৌথকর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ।

(১) জাতীয় শাসন-যন্ত্র প্রণয়নে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তা।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের তিনটি সম্বন্ধ আছে। (১) জাতীয় শাসন-যন্ত্র প্রণয়নে উহাদের সহায়তা। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচক বাছাই, রাষ্ট্র-সভাসদ্ নির্বাচন, প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইবার যোগ্যতা নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বহুপ্রকার ক্ষমতার বলে প্রত্যেক রাষ্ট্র যতদূর সম্ভব অধিক ক্ষমতা মহাসমিতি ও রাষ্ট্র-নেতার উপর প্রয়োগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

(২) ও (৩) ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন কর্তৃপক্ষের সহায়তা।

(২) যৌথ-বিচারালয়ের সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আপন ক্ষমতা প্রয়োগ। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন কর্তৃপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ। যৌথরাষ্ট্রীয় আইনের বলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহকে কতকগুলি ক্ষমতাচ্যুত করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষমতার কতক, যেমন সন্ধিবিগ্রহাদির ক্ষমতা, কোন রাষ্ট্রের হাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্য কতকগুলি ক্ষমতা (যেমন আমদানি-রপ্তানি শুল্ক) না দেওয়ায় তাহাদের প্রতিদিনকার কার্য্যে কখনো কখনো বাধা পড়ে। কোন রাষ্ট্র এই সকল বিষয়ে আপনার ক্ষমতার বাহিরে কাজ করিয়াছে কি না, তাহা যৌথ-রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ে স্থির হয়। ঐ বিচারালয় কোন রাষ্ট্রের কার্য্যের বিরুদ্ধে রায় দিলে সে কাজ বে-আইনী হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্র-নেতা ও ব্যবস্থাপক-সভা কাঠামো-আইনের বলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। মহাসমিতির অস্ত্র হইল আইন পাশ করা। এইরূপ আইনের সহিত রাষ্ট্রকৃত আইনের বিরোধ ঘটিলে মহাসমিতির আইনই বলবৎ থাকে। মহাসমিতির ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নির্ণয় কালে যৌথরাষ্ট্রকেই প্রমাণ করিতে হয় যে, ঐ ক্ষমতা উহার কাঠামো-আইন-নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে পর্য্যন্ত না যৌথরাষ্ট্র এরূপ প্রমাণ করিতে পারে সে পর্য্যন্ত ঐ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু ঐ ক্ষমতা মহাসমিতির ক্ষমতা বলিয়া একবার প্রমাণিত হইলে উহার শক্তি কাঠামো-আইনের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। কখনো কখনো যেখানে কোন আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রকে নিষেধ করা হইয়াছে সেখানে ঐ ক্ষমতা মহাসমিতির হাতে আছে বলিয়া বুঝিতে হয়। রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা বর্ণনাকালে বলিয়াছি, মহাসমিতি-প্রণীত আইনকে কার্য্যকর করা অথবা কাঠামো-আইন-নির্দ্দিষ্টভাবে নিজ বিবেচনা খাটানো হইল তাঁহার কাজ। কোন রাষ্ট্র স্বারাজ্য শাসন ব্যবস্থা ত্যাগ করিলে বা কোন রাষ্ট্রে বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাহা তৎক্ষণাৎ মহাসমিতির নিকট জানাইতে হয় ও ব্যবস্থা করিতে হয়।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যৌথকর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে: (ক) যৌথ আইন ভঙ্গ করিলে যৌথ বিচারালয়ে বিচার হয় ও যৌথকর্তৃপক্ষ তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করে; (খ) যৌথ আইন প্রয়োগে কেহ বাধা দিলে যৌথকর্তৃপক্ষ তাহাকে দমন করিতে পারে; (গ) যৌথরাষ্ট্রের সম্পত্তি আক্রমণ বা তদ্রূপ দাঙ্গা নিবারণ করিবার ক্ষমতা যৌথকর্তৃপক্ষের আছে; (ঘ) যৌথ বিচারালয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমায় যে বিচার হয় তাহা ঐ সব বিচারালয়ের কর্মচারীরা কাজে খাটাইতে পারে। অন্য সকল প্রকার অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দমন করিতে পারে, অবশ্য যৌথ রাষ্ট্রের সাহায্য চাহিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

(খ) রাষ্ট্রিকের সহিত কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ। যে সকল বিষয়ে রাষ্ট্রিককে তাহার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে মানিয়া লইতে হয় তাহাদের সংখ্যা অনেক। তাহার চেয়ে কম বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের শাসন মানিতে হয়। কিন্তু যেখানে কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকেই মানিতে হইবে। এমন কি, সেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ অবহেলা করা চলিতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি এমন আইন পাশ করে যাহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের বিরোধী তাহা হইলে সেই আইন অমান্য করা কোন রাষ্ট্রিকের পক্ষে দোষের হয় না। মহাসমিতি-প্রণীত আইন ও যৌথরাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত শাসন-কার্য্য উভয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিকের একমাত্র বিচার্য্য বিষয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে মানিলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন উল্লঙ্ঘন করা হইবে কি না। কাঠামো-আইনের বিরোধী যৌথরাষ্ট্রের মহাসমিতি প্রণীত আইন ইত্যাদি কার্য্যকর নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় উভয় প্রকার বিচারালয়েই মোকদ্দমা করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে যৌথ বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমা লইয়া যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যৌথ বিচারালয় হইতে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে মোকদ্দমা লইয়া যাইতে পারা যায় না। অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমা রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন সম্পর্কে হইয়া থাকে,—মাত্র এই সকল বিষয়ে যৌথ বিচারালয়ে আপীল চলে না। এমন কি, যৌথ বিচারালয় বা উচ্চতম বিচারালয় যদি এমন কোন রায় দিয়া থাকে যাহাতে রাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহা হইলে কোন রাষ্ট্রের বিচারক রাষ্ট্র-আইন সম্পর্কে সেই রায় মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে; অধিকন্তু রাষ্ট্রের বিচারক অন্যপ্রকার রায় দিলে ভবিষ্যতে উচ্চতম বিচারালয়েও পূর্ব্বতন রায়ের বিপরীত ও রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের রায়ের অনুকূল রায় দেওয়া হইয়া থাকে।

(খ) রাষ্ট্রিক বনাম কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ।

যৌথরাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের উপর সাক্ষাৎভাবে আপন কর্তৃত্ব খাটাইয়া থাকে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যৌথ কর্মচারীদিগকে মোতায়েন রাখা হইয়াছে। কোন যৌথ কর্মচারী আপন কোন রাষ্ট্রে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা পাইলে, সেই রাষ্ট্রস্থ রাষ্ট্রিকগণকে সাহায্যার্থ ডাকিবার অধিকার তাঁহার আছে। প্রকৃত পক্ষে, শৃঙ্খলাবদ্ধ অধিকাংশ রাষ্ট্রে এক্ষণে যৌথ কর্মচারীরা কাজে বাধা পান না। ১৮৬১-৬৫ সনের অন্তর্যুদ্ধের পর হইতে এক্ষণে অবিসংবাদিতরূপে স্থির হইয়াছে যে—

(ক) কোন রাষ্ট্রেরই যৌথ-শাসনযন্ত্রের অনুষ্ঠিত কোন কাজকে বে-আইনী বলিবার অধিকার নাই।

(খ) যৌথরাষ্ট্র হইতে কোন রাষ্ট্র সরিয়া যাইতে সমর্থ নহে।

(গ) মহাসমিতি অথবা কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের কোন কাজ বে-আইনী কি না তাহা একমাত্র যৌথ বিচারালয়সমূহ স্থির করিতে পারে।

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা অথবা শাসকগণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের অথবা ঐ আইন অনুসারে কৃত জাতীয় কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত কোন কাজের বিরোধিতা করিলে, তাহা সেই রাষ্ট্রের শাসকদের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু যাহারা সেই রাষ্ট্রের নামে সে কাজ করিয়াছে তাহারাই দায়ী হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রের হুকুমে করিয়াছি বলিলে তাহারা রেহাই পায় না। তাহাদের যৌথরাষ্ট্রের বিপক্ষে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হয়।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ঐরূপ করিলে উহাকে বাধা দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন

রাষ্ট্রের পৃথক্ সত্তা ও প্রাচীনতা স্বীকার করার ফল।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যৌথরাষ্ট্র-গঠনের পূর্ব্বেও ছিল। ঐ সকল রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন রাষ্ট্রসমূহ যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবার সময়ে যেরূপ ছিল, আজ অবিকল সেইরূপ নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তথাপি প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের অগ্রবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। যখনই কোন নূতন রাষ্ট্রকে যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে তখনই সেই রাষ্ট্রের পূর্ব্ব অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া করা হইয়াছে। কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করিতে হইলে মহাসমিতিতে আইন পাশ করিতে হয়। যে ৪৮টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত, তাহার কতকগুলির জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা মিলিত হইয়া সেই সব রাষ্ট্রের কাঠামো স্থির করিবে; অন্য কতকগুলিতে পূর্ব্ব হইতে জনগণ কর্ত্তৃক কৃত যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রচলিত ছিল তাহাতে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়ন কালে মহাসমিতির বিভিন্ন সর্ত্ত স্থাপন করিবার ক্ষমতা আছে। তথাপি এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের ক্ষমতা মহাসমিতি প্রদত্ত ক্ষমতা নহে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণ ঐ সব ক্ষমতা নিজ নিজ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছে মাত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের উপর সেই রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের যে ক্ষমতা তাহা যৌণ রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় কাঠামো-আইন-প্রসূত ক্ষমতা নহে। সত্য বটে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনই এক বা অধিকবার (কোন কোনটি পাঁচ ছয়-বার) সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উহার ধারাবাহিকতা খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় না।

ফলে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের সেই রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আছে।

এই ক্ষমতার প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন ঐ রাষ্ট্রের মূল আঙ্গিক (অর্গ্যানিক) আইনও বটে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সেই রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই রাষ্ট্রের সমুদায় শাসন, ব্যবস্থা ও বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন হইতে উদ্ভূত ও তাহা দ্বারা শাসিত। রাষ্ট্রের কোন বিভাগ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। যদি কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা এমন আইন পাশ করে যে, তাহা ঐ রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের প্রতিকূল তাহা হইলে তাহা যৌথ ও রাষ্ট্রীয় উভয় প্রকার বিচারালয়েই অপ্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তৃতীয়ত, জনগণ সাক্ষাৎ ভাবে ভোট দিয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের একটি খসড়া তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হইলে পর, জনগণ সাক্ষাৎ ভাবে ভোট দিয়া উহার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি করে।

কেহ কেহ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন :

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন-সমূহের বিভিন্ন অংশ।

(১) রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্দেশ।

(২) ব্যক্তিগত ও সম্পত্তি মূলক স্বাধীনতার পরোয়ানা—এই অংশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তি রক্ষার কথা থাকে।

(৩) শাসন-যন্ত্রের প্রকৃতি বা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের নাম, কাজ ও ক্ষমতা, শাসন চালাইবার কর্ম্মচারিগণ, বিচারালয়সমূহ।

(৪) শাসন ও আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা—শিক্ষা, সৈন্য, কর আদায় ও রাজস্ব, সরকারী ঋণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রের জেল ও হাসপাতাল, কৃষি, মজুর, রেল ও অন্য কোম্পানী, অভ্যভিযোগ ও কাঠামো-আইন সংশোধনের প্রণালী ইহার অন্তর্গত।

(৫) তপশীল (শেডিউল) বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে জনগণের ভোটে ফেলিবার প্রণালী ও পূর্ব্ব কাঠামো-আইন ত্যাগ করিয়া নূতন আইন গ্রহণ করিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কি ব্যবস্থা থাকিবে সে সম্বন্ধে বন্দোবস্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের এই পাঁচটি অংশ সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সকল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেই যে রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নহে। পুরাতন অর্থাৎ আদিম রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ নির্দ্দেশ নাই।

(১) সীমা নির্দ্দেশ।

ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত স্বাধীনতার পরোয়ানা (বিল্ অব রাইট্স) সাধারণত কাঠামো-আইনের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, কখনো কখনো সর্ব্বশেষে বসানো হয়। প্রথম ১৩টি রাষ্ট্র যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়ন কালে উহাদের অধিকাংশ এই স্বাধীনতার পরোয়ানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সেকালে ভয় ছিল, রাষ্ট্রের শাসন-কর্ম্মচারিগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও ধনসম্পত্তি ভোগের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই হস্তক্ষেপ যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ জনগণ কাম্য বিবেচনা করিত। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কার কারণ বহুদিন হইল

দূরীভূত হইয়াছে ; এক্ষণে জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত শাসকগণ জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কখনো সাহস করে না ; তথাপি এই স্বাধীনতার পরোয়ানার মর্য্যাদা যুক্তরাষ্ট্রবাসীর চোখে কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই,—তাহারা এখনও মনে করে ইহা কাঠামো-আইনে সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। রক্ষণশীলতা ইহার একটি কারণ হইতে পারে ; অন্য কারণ সম্ভবত এই যে, ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে সাময়িক উত্তেজনা বশত ব্যক্তি বা উনজনের অধিকার পদদলিত না হয়, তজ্জন্য কাঠামো-আইনে এইরূপ স্পষ্ট অনুশাসন থাকা দরকার বলিয়া বোধ হইয়াছে।

(২) স্বাধীনতার পরোয়ানা।

সমুদায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে স্বাধীনতার পরোয়ানা রহিয়াছে, কিন্তু উহা সর্ব্বত্র এক ভাষায় বা ভাবে লিপিবদ্ধ নহে। ধর্ম্ম ও তন্মূলক মতবাদে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আইনের চোখে সকলের সাম্য সকল রাষ্ট্রে স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অর্থব্যয়ে সকলে একমত নহে। ১৩টি রাষ্ট্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যেন এরূপ মনে করা না হয় যে অসামাজিক ব্যবহার অথবা রাষ্ট্রের শান্তি ও অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক অভ্যাসকেও বরদাস্ত করা হইবে। কোথাও ব্যবস্থা আছে যে, ইস্কুলে বাইবেল পড়াইতেই হইবে। অন্য কোথাও কোথাও বহুস্বামিত্ব ও বহুপত্নীত্ব আইনে দণ্ডনীয় বলা হইয়াছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবন ও স্বাধীনতা ভোগের যে অধিকার তাহা স্বাভাবিক, স্বয়ম্ভূত ও অবিভাজ্য অধিকার; এবং মানুষ সুখী হইবারও অধিকারী বটে। ধনসম্পত্তি অর্জ্জন, ভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে, ইহাও বেশীর ভাগ রাষ্ট্র ঘোষণা করে। কোন কোন রাষ্ট্র স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, স্বারাজ্য গণতন্ত্রে কোথাও জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর যথেচ্ছ অধিকার কাহারও নাই, এমন কি অতিজনেরও নাই ; সকল লোক সমান ; সকল ক্ষমতা জনগণ হইতে উদ্ভূত ও জনগণের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, শান্তি ইত্যাদি রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে ; এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন সময়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের অপরিসীম ক্ষমতা জনগণের আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে জনগণের লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে স্বাধীনতা রহিয়াছে। সভাসমিতি করিবার ও আবেদন করিবার ক্ষমতা হইতেও কেহ বঞ্চিত নহে। আগে যাহা আইনের চোখে অসঙ্গত ছিল না তাহা বে-আইনী করিবার ক্ষমতা (এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টো) অনেক রাষ্ট্রের নাই ; এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র গ্রহণ করিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্থলে উপাধি দেওয়া নিষিদ্ধ। সাধারণত অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিকগণের অস্ত্রশস্ত্র ধারণের অধিকার স্বীকৃত হইলেও কোন কোন জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আত্মহত্যা ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোথাও কোথাও আইন করা হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ বালক-বালিকা একসঙ্গে পড়িবে কি না সে বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন কায়েম করিয়াছে। জুরির বিচার অনেক রাষ্ট্র অপরিত্যাজ্য মনে করে। ঋণের জন্য কয়েদ কোথাও নিষিদ্ধ। কোথাও একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে, কোথাও বা বংশগত সম্মান, পুরস্কার ইত্যাদি দেওয়ার বিরুদ্ধে আইন আছে। কোন রাষ্ট্রে ভোট দিবার অধিকার অর্জ্জনের জন্য সম্পত্তি দরকার

হয় না, কোন রাষ্ট্রে ভোটদাতাগণের পক্ষে ধর্ম্মজ্ঞান প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। কোথাও সম্পত্তি আইন ব্যাপারে রাষ্ট্রিক ও অরাষ্ট্রিকের তুল্য ক্ষমতা আছে, কোথাও বা চাকুরী খুঁজিয়া লওয়া সম্পর্কে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কোন রাষ্ট্র শাসন-বিভাগে অধিক কাল চাকুরী করা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে ও সেজন্য নূতন নূতন লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত স্বাধীনতার পরোয়ানা বলিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র কিরূপ বিভিন্ন অধিকারের কথা বুঝিয়া থাকে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনসমূহ, বিশেষ করিয়া পরে যেগুলি প্রণীত হইয়াছে সেগুলি, অনেক অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহেরও উল্লেখ করিয়াছে। সেজন্য উক্ত স্বাধীনতার পরোয়ানার সকল দফাগুলিকে তুল্যমূল্য মনে করা সমীচীন হইবে না।

(৩) শাসন-যন্ত্রের প্রকৃতি।

আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারাসমূহ প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কাঠামো আইনে বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত আছে। এগুলির কথা পরে বলা হইবে।

(৪) শাসন ও আইন সংক্রান্ত বিবিধ ব্যবস্থা।

বিবিধ ব্যবস্থা বলিতে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ব্যবস্থামাত্রকে বুঝায় না। এই দফার অন্তর্গত কতকগুলি বিষয়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমুদায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এগুলি একভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আর এগুলির প্রণয়ন বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নিয়ম মানিয়া চলা হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে এমন অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে যেগুলি প্রণয়নের ভার ব্যবস্থাপক সভার হাতে থাকিলে যথোপযুক্ত হইত। বিচারের প্রণালী, উত্তরাধিকার, চুক্তি, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে প্রভৃতির পরিচালনা, কর্ম্মচারীর বেতন, বিচারালয়ে আপীল করিবার সময়, বিচারালয়ের বিবরণী প্রকাশ, ইস্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা, কৃষি, খাল, শ্রম নিয়ন্ত্রণ, জুয়া, বহুপত্নীত্ব, বহুপতিত্ব, কয়লার দর-বাঁধা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সামান্য বা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে দেখা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-সমূহকে এরূপ বাহুল্য-বিশিষ্ট করিবার কারণ কি? ব্রাইস্ নিম্নলিখিত চারিটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: (ক) বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনসমূহ সেই সেই রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিগণ কর্তৃক প্রণীত হইলেও, সকল সময়ে যুক্তিসিদ্ধ শ্রেণী-নির্দ্দেশ লক্ষ্য ছিল না। (খ) জনগণ যে সকল মত ও বিশ্বাস মূল্যবান্ মনে করিত, নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়নকালে সেইগুলির অনুযায়ী আইনসমূহকে কাঠামো-আইনের অন্তর্গত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার মুখাপেক্ষা না করিয়া সেগুলিকে তাড়াতাড়ি কাঠামো-আইনে জুড়িয়া দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হয়। (গ) ব্যবস্থাপক সভার উপর জনগণের বিশ্বাস তেমন গভীর নহে। সেজন্য ব্যবস্থাপক সভাসমূহকে যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ রাখিয়া নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখা জনগণ পছন্দ করে। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে বহু বিস্তৃত করা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। (ঘ) লোকেরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইন প্রণয়ন না করিয়া নিজেরাই আইন প্রণয়নের বেশী পক্ষপাতী। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে বেশী ভালবাসে।

(৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের প্রসার ও সংশোধন।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন ধীরে ধীরে কিরূপভাবে বিস্তৃতি ও প্রসারতা লাভ করিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি (৬২-৭০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের পক্ষে সেইরূপ ভাবে প্রসার লাভ করিবার সুযোগ নাই। ব্যাখ্যা বা প্রথা দ্বারা উহার বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না; কারণ, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনগুলি এরূপ দীর্ঘ ও বাহুল্যবিশিষ্ট যে, এমন খুব কম বিষয়ই অবশিষ্ট থাকে যাহা উহাতে সন্নিবিষ্ট হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন যেমন সংক্ষিপ্ত, তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনসমূহ তেমনি বিস্তৃত। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকে পদে পদে ব্যাখ্যা ও প্রথা দ্বারা না বাড়াইয়া উপায় নাই, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনসমূহের পক্ষে সে প্রয়োজন কম। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা চলে [নীচে দ্রষ্টব্য]।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা একেবারে করিতে হয় না, তাহা নহে। যখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তখন যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা যে প্রণালীতে করা হয়, ইহারও ব্যাখ্যা সেই প্রণালীতে হয়। এ বিষয়ে যৌথরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের শুধু একটি পার্থক্য আছে। তাহা এই যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের কোন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে কি নাই তাহা বিচারের কালে রাষ্ট্রের তাহা আছে বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত। যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে যদি স্পষ্টভাবে এরূপ নির্দ্দেশ না থাকে যে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা তবে সে ক্ষমতা রাষ্ট্র সাধারণত প্রয়োগ করিতে সমর্থ।

আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা অবশ্য সাধারণত ব্যবস্থাপক সভার হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ মূলত এই ক্ষমতার অধিকারী হইলেও ইহা তাহাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হয়। বুঝিতে হইবে যে, জনগণ যে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে রাখিয়াছে সেই সকল ছাড়া অন্য সমুদায় ক্ষমতা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার আছে। কিন্তু তাহার অর্থ এ নয় যে আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ক্ষমতা কোনরূপে বিলাতী পার্ল্যামেন্টের সঙ্গে তুলনায় হইতে পারে। মাথার উপর যৌথরাষ্ট্র যদি না থাকিত ও প্রত্যেক রাষ্ট্র যদি এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইত, তথাপি বর্ত্তমান রাষ্ট্রসমূহের কোনটিরই ব্যবস্থাপক সভা বিলাতী পার্ল্যামেন্টের সমান হইত না। কারণ, এই সকল ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিবার যন্ত্র মাত্র,—যে কাঠামো-আইন উহাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আবার শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ সৃষ্টি করিয়াছে। এই তিনটির কোনটিই অন্যটি অপেক্ষা ন্যূন নহে। ব্যবস্থাপক সভা যদি কাঠামো-আইন লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, তবে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। তেমনি ব্যবস্থাপক সভা যদি বিচারালয়ের কোন বিচার না মানিয়া চলে ত উহার কার্য্য বে-আইনী হইবে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের ক্ষমতা এরূপভাবে একদিকে কাঠামো-আইন ও অন্যদিকে বিচারালয়সমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের আইন ও শাসনবিভাগসমূহ প্রথমত

নিজেদের বুদ্ধিমত কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু বিচারালয়সমূহ যেরূপ ব্যাখ্যা করে শেষ পর্য্যন্ত সকলকে তাহাই মানিয়া লইতে হয়। কোন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন ও উহার ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইনে সজ্বর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আছে। এইজন্ত কোন কোন রাষ্ট্রে এ প্রকার ব্যবস্থা আছে যে, শাসক অথবা ব্যবস্থাপক সভায় কোন শাখা উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের মতামত লইতে পারেন। বিচারকগণ এই প্রকার মত দিবার কালে কোন মোকদ্দমা প্রকৃতই উপস্থিত না থাকায় দৃঢ়ভাবে কোন মত দেন না, পরামর্শ মাত্র দিয়া থাকেন এবং কার্য্যকালে তাঁহারা সেই পরামর্শ নিজেরা নাও মানিয়া চলিতে পারেন। কোন রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় যদি বুঝে পূর্ব্ববর্ত্তী বিচার ঠিক হয় নাই, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রায়ের বিপরীত রায় দিবার ক্ষমতা উহার আছে। কিন্তু বিচারালয় কচিৎ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া থাকে। কারণ, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন সহজে ও তাড়াতাড়ি পরিবর্ত্তিত করা চলে ও মাঝে মাঝে তাহা হয় বলিয়া এবং তাহাতে এ প্রকার ভুল সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, বিচারালয়সমূহ সাধারণত তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতে অনিচ্ছুক থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য :

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনসমূহের কয়েকটি বিশেষত্ব :

(ক) কাঠামো-আইনসমূহ আকারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যত বিষয় সন্নিবিষ্ট হইত, বর্ত্তমান কালে তাহার চেয়ে ঢের বেশী বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়। একটি উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। ১৭৭৬ সনে ভার্জিনিয়ার কাঠামো-আইন চারিটি কোয়ার্টো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল, শব্দ ছিল প্রায় ৩২০০। ১৮৩০ সনে সাত পৃষ্ঠায়, ১৮৭০ সনে বাইশ পৃষ্ঠায় (১৭,০০০ শব্দে), এবং ১৯০২ সনে ৩৫,০০০ শব্দে দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের বেলাতেও এইরূপ হইয়াছে।

(ক) আকার-বৃদ্ধি ;

(খ) পরবর্ত্তী কাঠামো-আইনসমূহে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমত, প্রায় সকল রাষ্ট্রে বয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার আছে, কতকগুলি রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকেরাও এই অধিকার ভোগ করে। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিকগণ সহজে ও তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রিকত্ব পায়। তৃতীয়ত, নির্ব্বাচন প্রথা এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, আগে যেখানে শাসক অথবা ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে বিচারকদের নিয়োগ হইত, এখন সেখানে অনেক রাষ্ট্রে জনগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য বিচারকগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এরূপে প্রায় সকল বিষয়েই জনগণকে ঘন ঘন ডাকিয়া পরামর্শ লওয়া হয় ও তাহাদের ভোটের মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে।

(খ) গণতান্ত্রিকতার দিকে অধিকতর ঝোঁক ;

(গ) ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদের উপর জনগণের আস্থা অনেক কমিয়া গিয়াছে। একথা শুধু ব্যবস্থাপক সভা সম্পর্কে নহে, স্থানীয় গ্রাম্য ও নাগরিক প্রতিনিধি-সভা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

(গ) ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আস্থা-হ্রাস ;

(ঘ) যৌথকর্তৃপক্ষের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা;

(ঘ) যৌথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ বিষয়েও রাষ্ট্রসমূহ সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, যৌথরাষ্ট্রের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ শুধু যে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন না, তাহা নহে; অধিকন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইতেও সমর্থ নহেন। কোন কোন রাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীকে নিজ রাষ্ট্রে নিয়োগ সম্বন্ধেও বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়াছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা;

(ঙ) প্রায় সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে যথোচিত আইনসমূহ কায়েম আছে। পূর্ব্বে আশঙ্কা ছিল, জনগণের হাতে বেশী কর্তৃত্ব দেওয়ার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত হইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বরং ব্যবস্থাপক সভা আইন করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার খর্ব্ব করিলে, তাহা কাঠামো-আইনের অননুমোদিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়।

(চ) 'রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ' বিরল।

(চ) ইয়োরোপীয় দেশসমূহে রাষ্ট্র এমন অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করে যাহাতে যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহ হাত দেওয়া সমীচীন মনে করে না। উদাহরণত বলা যাইতে পারে, কোন রাষ্ট্রই রেল, টেলিগ্রাফ, খনি অথবা বন নিজ অধিকারে রাখে নাই বা পরিচালনা করে না; এইগুলি ব্যক্তি বা কোম্পানীর দ্বারা অধিকৃত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।

রাষ্ট্র-শাসক ও অন্য প্রধান কর্ম্মচারিগণ

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নেতাকে রাষ্ট্র-নেতা বলিয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত প্রকার ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে :

(ক) ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন কর্ত্তাব্যক্তি, ইঁহাকেই রাষ্ট্র-শাসক (গবর্ণর) নামে অভিহিত করা হইবে।

(খ) শাসন বিভাগের অন্য কর্ম্মচারিগণ।

(গ) দুই শাখায় বিভক্ত ব্যবস্থাপক সভা।

(ঘ) বিচারালয়সমূহ।

(ঙ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক সহর, গ্রাম, ইস্কুল, জিলা প্রভৃতি বিভাগসমূহ।

প্রথমে রাষ্ট্র-শাসক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের অন্য কর্ম্মচারিগণের কথা আলোচনা করা যাউক। কোন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ বলিতে শাসক বা গবর্ণর (ইনি সকল রাষ্ট্রে আছেন), সহকারী শাসক (লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর—অধিকাংশ রাষ্ট্রে ইনি থাকিলেও কতকগুলিতে দেখা যায় না) এবং নানাবিধ ছোট বড় কর্ম্মচারী বুঝিতে হইবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণ: তাঁহাদের কার্য্যকাল ও বেতন।

গোড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ১৩টি রাষ্ট্রের অধিকাংশ তাহাদের পুরাতন কাঠামো-আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা শাসক নির্ব্বাচিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সকল রাষ্ট্রে জনগণ রাষ্ট্র-শাসককে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের সভ্যগণকে নির্ব্বাচন করিবার কালে যাহারা ভোট দিবার অধিকারী রাষ্ট্রের শাসক নির্ব্বাচনেও তাহারাই ভোট দিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতাও জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত হন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাষ্ট্রের শাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে

জনগণের ভোট দ্বারা মনোনীত হন। সকল রাষ্ট্রে তাঁহার কার্য্যকাল বা বেতন সমান নহে। বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-শাসকের পদের মেয়াদ নিম্নরূপ: ১৮টিতে ৪ বৎসর, একটিতে (নিউ জার্সি) ৩ বৎসর, ২৮টিতে দুই বৎসর এবং একটিতে (কোলোরাডো) এক বৎসর। শাসকের বাৎসরিক বেতনের হার এই: দুইটি মাত্র রাষ্ট্রে (সাউথ ডাকোটা ও ভার্মণ্ট) ৩,০০০ ডলার, দুইটি রাষ্ট্রে (আরকান্সাস্ ও টেক্সাস্) ৪,০০০ ডলার, দুইটিতে ৪,৫০০ ডলার, ১২টিতে ৫,০০০ ডলার, তিনটিতে ৬,০০০ ডলার, দুইটিতে ৬,৫০০, দুইটিতে ৭,০০০ ডলার, ১১টিতে ৭,৫০০ ডলার, দুইটিতে ৮,০০০ ডলার, ছয়টিতে ১০,০০০ ডলার, একটিতে (ইলিনয়) ১২,০০০ ডলার, একটিতে (পেনসিলভেনিয়া) ১৮,০০০ ডলার ও একটিতে (নিউ ইয়র্ক) ২৫,০০০ ডলার [একটির (টেন্নেসি) জানা যায় নাই]। দেখা যাইতেছে যে, শাসকগণ সাধারণত বেশীর ভাগ ৫,০০০ হাজার ও ৭,৫০০ হাজার ডলার করিয়া বাৎসরিক বেতন পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের বেতনের উর্দ্ধসীমা ২৫,০০০ ডলার ও নিম্নসীমা ৩,০০০ ডলার। কোন কোন রাষ্ট্রে শাসক পুনরায় পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু যেখানে পদপ্রার্থী হইতে পারেন, সেখানে তৃতীয়বার পদপ্রার্থী হইতেও বাধা নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার বর্ণনাকালে দেখাইয়াছি জনগণ উক্ত সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিগণের উপর কিরূপ কম আস্থা স্থাপন করে এবং রাষ্ট্র-নেতা শক্তিশালী হইলে তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধে জনগণের আনুকূল্য পাওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। এই প্রবণতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বেলাতেও দেখা যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কিরূপ দুর্ব্বল ইহা পরে বর্ণিত হইবে, কিন্তু এই দুর্ব্বলতার একটা ফল এই হইয়াছে যে জনগণ শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ শাসককে অধিক পরিমাণে সম্ভ্রম ও বিশ্বাস করে। উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব করিবার ও রাষ্ট্রকে সুপথে চালিত করিবার সুযোগ যথেষ্ট রহিয়াছে। বস্তুত, শাসকের বেতন যাহাই হউক না কেন এক্ষণে শাসকের কার্য্য বিশেষ মর্য্যাদার কার্য্য এবং জনগণ তাঁহাকে নিজেদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি-রূপে নির্ব্বাচন করিয়া আশা করে যে, তিনি রাষ্ট্রকে যথোচিতভাবে চালনা করিবেন। যদি কোন রাষ্ট্রের জনগণ বুঝে যে, তাহাদের নির্ব্বাচিত শাসক একমাত্র তাহাদেরই হিতসাধন করিতেছেন, তবে তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বদা অনুমোদন করে, এমন কি তাঁহার সহিত ব্যবস্থাপক সভার মতভেদ ঘটিলে জনগণ ব্যবস্থাপক সভাকে তাঁহার মতানুসারে চলিতে বাধ্য করে।

শাসকের ক্ষমতাসমূহ:

শাসকের ক্ষমতাবলি নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে:

তিনি (১) রাষ্ট্রস্থ সৈন্য-সামন্তের সেনাপতি;

(১) শাসক নিজ রাষ্ট্রের সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি এবং তাঁহার রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বা রাষ্ট্রে বিদ্রোহ হইলে তিনি ঐ সৈন্য ব্যবহার করিতে পারেন। এক্ষণে রাষ্ট্র মধ্যে কোন কারণে দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইলে এই সৈন্যের ব্যবহার হয়।

(২) অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন;

(২) সমুদায় রাষ্ট্রে শাসকের অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বিদ্রোহ করিলে বা অত্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না, অন্য কোন কোন রাষ্ট্রে তিনি একা এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে

পারেন না। ইদানীন্তন কোন কোন রাষ্ট্রে তাঁহার ক্ষমতাকে বহু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

(৩) কতকগুলি কর্ম্মচারী নিয়োগ,

(৩) তিনি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ও বেতন অল্প। অনেক সময় এই প্রকার কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে কোন কোন রাষ্ট্রকে উহার রাষ্ট্র-সভার (সেনেট) সম্মতি লইতে হয়। বলা বাহুল্য, কর্ম্মচারী নিয়োগে যৌথ রাষ্ট্র-নেতা যেরূপ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র-শাসক তাহার অল্পমাত্রও প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহেন। ইহার একটা কারণ এই যে, গুরুত্ববিশিষ্ট ও অধিক বেতনের চাকুরীসমূহে যে লোকদিগকে নিয়োগ করা হয়, অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাহারা জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে নূতন নূতন পদের জন্য যোগ্য লোককে নিয়োগ করিবার ভার শাসকের হাতে অধিক পরিমাণে অর্পিত হইতেছে।

(৪) শাসন-কার্য্য ও বিচার-কার্য্য পরিদর্শন,

(৪) রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীরা যাহাতে যথাযথভাবে আইন অনুসারে শাসন চালায় ও বিচারকগণ বিচার করেন তাহার তদ্বির করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

(৫) ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন-কর্ম্মচারীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন;

(৫) অন্যান্য শাসন-কর্ম্মচারিগণ শাসককে সকল প্রকার সংবাদ যোগাইতে বাধ্য এবং শাসকও রাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যবস্থাপক সভাকে জানাইতে বাধ্য। তিনি কোন কোন প্রস্তাব পাশ হওয়া উচিত বলিয়া পাঠাইতে পারেন, কিন্তু বিল তৈরী করা বা ব্যবস্থাপক সভায় বিল উপস্থিত করা তাঁহার কাজ নয়। কোন কোন রাষ্ট্রে তিনি বাজেট (বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব) পেশ করিতে পারেন।

এবং (৬) নাকচ্ ক্ষমতার অধিকারী।

(৬) প্রায় সমুদায় রাষ্ট্রে শাসকের নাকচ্ ক্ষমতা আছে। ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক যে সকল বিল পাশ হয়, সেগুলি সম্বন্ধেই শাসক তাঁহার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই নাকচ্ ক্ষমতাও কিরূপে ব্যর্থ করা যাইতে পারে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। কিন্তু সাধারণত শাসক তাঁহার এই ক্ষমতা যে বিল সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন, তাহা পাশ করা আর সম্ভবপর হয় না। কারণ সেদিকে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বলিয়া ব্যবস্থাপক সভা সে বিল পাশ করিতে ভয় পায়। শান্তির সময়ে শাসকের নাকচের ক্ষমতাকে সব চেয়ে গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হয় এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারাই তাঁর দোষগুণের বিচার চলে।

সহকারী শাসক।

শাসকের পরেই রাষ্ট্রের সহকারী শাসকের স্থান। যৌথরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্র-নেতা উহার রাষ্ট্র-সভার সভাপতি হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সহকারী শাসকও রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভার সভাপতি হন। শাসকের পদ খালি হইলে তিনি শাসকের কাজ করেন তখন তিনি আর রাষ্ট্র-সভার সভাপতিত্ব করেন না। কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহার পদমর্য্যাদা অনেক কম। তিনি বেতন অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীর চেয়েও কম পান।

অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিগণ।

অন্য প্রধান কর্ম্মচারিগণ সকল রাষ্ট্রে এক নামে অভিহিত হন না, তাঁহাদের কর্ত্তব্যও একপ্রকার নহে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকজনকে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই দেখা যায়: রাষ্ট্র-সচিব (সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্—ইনি সকল রাষ্ট্রে আছেন), অর্থ-সচিব (ট্রেজারার—ইঁহাকেও সকল রাষ্ট্রে দেখা যায়), সর্ব্বপ্রধান সরকারী কৌঁসুলি (এটর্নি-জেনারেল), হিসাব-

পরীক্ষক (কম্পট্রোলার), আয়-ব্যয় পরীক্ষক (অডিটর), শিক্ষা-পরিচালক (সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন)। কোন কোন রাষ্ট্র একজন করিয়া এঞ্জিনিয়ার, জরীপ-কারী (সার্ভেয়ার) ও জেল-পরিদর্শকও নিযুক্ত করিয়া থাকে। রেলরোড, খাল, জেল, কৃষি, শ্রম, লোক-চলাচল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সমিতিও মোতায়েন রাখা হয়।

রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে কোন ক্রমেই শাসকের কর্ত্তৃত্বাধীন মন্ত্রী মনে করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকৃতই মন্ত্রীর কাজ করেন, তাঁহারা শাসকের নিকট বা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন। দায়ী একমাত্র জনগণের নিকট। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী না হইলেও রাষ্ট্র-নেতার অধীন। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধান কর্ম্মচারিগণ শাসকের অধীন নহেন,—শাসকের ন্যায় এবং অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণত, তাঁহারা শাসকের আজ্ঞা অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন। প্রত্যেকে তাঁহার নিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরূপে সেই বিভাগের পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা একত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন না, যে যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করেন। কোন্ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা ব্যবস্থাপক সভা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং সে বিষয়ে তাঁহারা আর বিশেষ বিচার-বুদ্ধি খাটান না।

প্রধান কর্ম্মচারিগণ শাসক ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন, জনগণের নিকট দায়ী।

এই সকল কর্ম্মচারী রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন কালেই শুধু নির্ব্বাচিত হন, তাহা নহে, প্রায় সমুদায় রাষ্ট্রে ইঁহাদের কার্য্যকাল শাসকের কার্য্যকালের সমান। যে রাষ্ট্রে শাসক ১০,০০০ ডলার বেতন পান, সে রাষ্ট্রে ইঁহাদের অধিকাংশের বেতন ৬,৫০০ ডলার হইয়া থাকে। কোন কোন রাষ্ট্রে এই সকল কর্ম্মচারীর কেহ কেহ ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত বা শাসক কর্ত্তৃক মনোনীত হন। শাসক যেখানে মনোনয়ন করেন, সেখানে রাষ্ট্র-সভার সম্মতি দরকার হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রে গুরুতর অপরাধের জন্য শাসন কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে অত্যভিযোগ-আনয়নের ব্যবস্থা আছে। দু' একটি রাষ্ট্রে ছাড়া সর্ব্বত্র প্রতিনিধি-সভা অত্যভিযোগ আনয়ন করে এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা তাহার বিচার করে। সাধারণত, দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট না পাইলে কোন অত্যভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হয় না। দু'একটি রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা মিলিত হইয়া অত্যভিযোগ আনিলে তবে বিচার হইতে পারে। অত্যভিযোগের দৃষ্টান্ত বিরল। অত্যভিযোগ ছাড়াও কোন কর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করিবার উপায় আছে। অনেক রাষ্ট্রে কখনো ব্যবস্থাপক সভার ভোট দ্বারা, কখনো ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার প্রস্তাবে শাসকের দ্বারা, কখনো বা শাসকের দ্বারা কিংবা রাষ্ট্র-সভার সম্মতিতে শাসকের দ্বারা কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা চলে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে এইরূপ পদচ্যুতির যথেষ্ট কারণ থাকা চাই, কর্ম্মচারীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ ব্যতীত এইরূপভাবে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা সম্ভবপর নহে। কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা কখনো কখনো শাসককে দেওয়া হয়। অন্য উপায়টি হইতেছে প্রত্যাহ্বান

কর্ম্মচারীদিগকে শাসন করিবার উপায়: অত্যভিযোগ, ব্যবস্থাপক সভার ভোট, ও প্রত্যাহ্বান।

(রিকল)। কোন কর্ম্মচারী লোকের অপ্রিয় হইলে তিনি তাঁহার কার্য্যকালের বাকী সময়টা কাজ করিবেন কি করিবেন না তজ্জন্য জনগণের প্রত্যাহ্বানের ক্ষমতা আছে। প্রত্যাহ্বানের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভোটদাতা দাবী করিলে ও সভায় অধিকজন ভোট দিলে তিনি পদচ্যুত হন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা দুই ভাগে বিভক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা দুইটি শাখায় বিভক্ত,—আকারে ছোট সভাটিকে রাষ্ট্র-সভা (সেনেট) ও বড়টিকে প্রতিনিধি-সভা (হাউস্ অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্, কখনো কখনো এসেম্ব্লি, কখনো বা হাউস্ অব্ ডেলিগেট্স্) বলে। ব্যবস্থাপক সভামাত্রকেই দুই শাখায় বিভক্ত করা এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রবাসীর স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকের ধারণা এই যে, প্রতিনিধি-সভা সাধারণত যে সকল দোষের অধিকারী, যেমন তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়ন করা, ঊনজনের মতকে পদদলিত করা ইত্যাদি, রাষ্ট্র-সভা সেগুলিকে কতকাংশে নিবারিত করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা দুই শাখায় যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যগণ প্রেরিত হন তাঁহাদের ভোট দাতাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কোন কোন রাষ্ট্রে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ থাকিলেও, সমুদায় রাষ্ট্রই কতকগুলি নির্ব্বাচন-জিলায় বিভক্ত হয়, এবং ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভ্যদের নির্ব্বাচন করিবার জন্য একই ব্যক্তিগণ ভোট দিয়া থাকেন। কোন কোন রাষ্ট্রে আনুপাতিক (প্রপোরশনাল) ভোটের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সফলতা লাভ করে নাই।

ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার মধ্যে পার্থক্য :

প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, তাহা এই :

(ক) প্রতিনিধি-সভার সভ্যের চেয়ে রাষ্ট্রসভাসদের সংখ্যা কম।

(ক) রাষ্ট্র-সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচন-জিলাসমূহ প্রতিনিধি-সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট জিলা-সমূহের চেয়ে আকারে অনেক বড় হয়—কখনো কখনো দুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। রাষ্ট্র-সভার সভ্যদের সংখ্যাও সেই অনুপাতে কম হয়।

(খ) রাষ্ট্রসভাসদের কার্য্য-কাল দীর্ঘতর।

(খ) প্রতিনিধি-সভার সভ্যের চেয়ে সাধারণত রাষ্ট্র-সভাসদের কার্য্যকাল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সাধারণত রাষ্ট্র-সভাসদের মেয়াদ ৪ বৎসর ও প্রতিনিধি-সভার সভ্যের ২ বৎসর—কোথাও দুই বৎসর অন্তর অর্দ্ধেক রাষ্ট্র-সভাসদ্ আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হন। ত্রিশের উপর রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-সভাসদ্ ৪ বৎসরের জন্য, মাত্র একজন (নিউ জার্সি) ৩ বৎসরের জন্য ও বাকী কয়েকজন (ইহাদের সংখ্যা ১২র বেশী) দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। আর প্রতিনিধি-সভার সভ্যের মেয়াদ ৪টি রাষ্ট্রে ৪ বৎসর, ৩৬টিতে ২ বৎসর ও দুইটিতে (নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্ক) ১ বৎসর মাত্র।*

(গ) রাষ্ট্রসভাসদ হইবার বয়স বেশী।

(গ) সাধারণত প্রতিনিধি-সভার সভ্যপদপ্রার্থীর চেয়ে রাষ্ট্র-সভাসদের পদপ্রার্থীর বয়স বেশী হইয়া থাকে।

* পাঁচটি রাষ্ট্রের (আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো, রোড আইল্যাণ্ড, সাউথ ডাকোটা এবং ভার্মণ্টের) সঠিক খবর জানিতে পারি নাই।

মাহিনা করা সরকারী চাকুরো, যুক্তরাষ্ট্রের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ, মহাসমিতির সভ্যেরা, ও নির্ব্বাচন-জিলার অবাসিন্দা কেহ কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার কোন শাখাতেই প্রবেশ করিতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট জিলা হইতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রথার কথা ইতিপূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার সভ্য নির্ব্বাচনের বিষয় বলিবার কালে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রথা এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র বিভিন্ন নির্ব্বাচন-জিলায় বিভক্ত ও এইরূপ প্রত্যেক জিলা হইতে একজন মাত্র সভ্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা বা প্রতিনিধি-সভার জন্য নির্ব্বাচিত হন। সমগ্র রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচন অথবা এক জিলা হইতে একের অধিক ব্যক্তির নির্ব্বাচন এখন আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোন রাষ্ট্রের নির্ব্বাচন-জিলায় যদি সুযোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটে তবে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচিত করিতে হয়, আর কোন জিলায় যদি একের অধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকেন তবে তাঁহাদের সকলের পক্ষে ঐ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা অসম্ভব হয়। ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার যে ক্ষতি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকল মানুষ সামর্থ্যে সমান এই ধারণা হইতেই যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সর্ব্বত্র আইন ও শাসন বিভাগে এইরূপে সাম্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

রাষ্ট্র-সভায় কাহারা প্রবেশ করিতে পারেন না।

উপরে (পৃঃ ১৬০-১৬২) ব্যাবস্থাপক সভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করিয়াছি। এই ক্ষমতাকে বহু দিক্ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নিষিদ্ধ ক্ষমতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। এখানে বিশেষ গুরুতর কতকগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতা:

কতকগুলি বিধিনিষেধ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যপ্রণালী (প্রসিডিওর) সম্পর্কিত অর্থাৎ সমুদায় বিল বা কোন কোন বিল পাশ করিতে হইলে কি ভাবে পাশ করিতে হইবে, কখন পাশ করিতে হইবে, ইত্যাদি। (ক) কোন কোন বিল, বিশেষত ব্যয়সূচক বিল, পাশ করিতে কিরূপ অতিজন প্রয়োজন। কখনো হয়ত প্রত্যেক শাখায় নির্ব্বাচিত সভ্য-সংখ্যার অতিজন, কখনো যাঁহারা উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের অর্দ্ধেকের চেয়ে একজন বেশী থাকা দরকার। (খ) ভোট গ্রহণের প্রণালী কিরূপ হইবে। (গ) কোন বিল একবার পড়িবার পর দ্বিতীয়বার পড়ার পূর্ব্বে কতটা সময় অতিবাহিত হইবে,—শেষের দিকে তাড়াতাড়ি যাহাতে বিল, বিশেষত ব্যয়ের বিল, না পাশ হয়, তাহার ব্যবস্থা। (ঘ) প্রকাশ্যভাবে সম্পূর্ণ বিল পড়া হইবে কি না। (ঙ) সমুদায় বিল সমিতিতে প্রেরিত হইবে কি না, এবং তথায় কোন্ প্রণালী অবলম্বিত হইবে। (চ) গোপন বৈঠক কখন উচিত। (ছ) নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনকে কার্য্যকর না করা,—যেমন বৈঠক সমাপ্তির নব্বই দিন পর পর্য্যন্ত। (জ) কোন বিল ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হওয়ার কালে, উহার উদ্দেশ্য-পরিবর্ত্তন কিরূপে নিবারিত হইতে পারে। (ঝ) একটি বিলে একটি মাত্র বিষয়ের সন্নিবেশ ও বিলের নামকরণে সেই বিষয়টির নির্দ্দেশ কিরূপে করা যায়। (ঞ) শুধু নামটি উল্লেখ করিয়া, কিন্তু বিলে কি আছে তাহা না বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আইন পুনরায় পাশ বা সংশোধিত বা যুক্ত না হয়, তাহা দেখা। (ব্রাইস্)

(১) কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কিত;

(২) নিজ ক্ষমতা-প্রয়োগ সম্পর্কিত।

অন্য কতকগুলি ব্যবস্থাপক সভার নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্বন্ধে অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভা আইন পাশ করিতে পারিবে না। যেমন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই : (ক) গণতান্ত্রিক তত্ত্ব লঙ্ঘনকারী আইন—উপাধি দান, কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে পক্ষপাতিতা দেখান, সম্পত্তি ব্যতীত ভোট দিতে পারিবে না বা চাকুরী পাইবে না এইরূপ নিয়ম। (খ) সরকারী নীতি বিরুদ্ধ আইন,—জুয়া খেলার প্রশ্রয়, চুক্তি ভঙ্গের ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক একীকৃত করণের হুকুম, ব্যাঙ্কের ষ্টক হাতে রাখা। (গ) রাষ্ট্রের ঋণ নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে বৃদ্ধি করা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার বেশী ঋণ করিতে দেওয়া। (ব্রাইস্)

ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় সদস্যের সংখ্যা সকল রাষ্ট্রে সমান নহে। নীচে এক্ষণে কোন্ রাষ্ট্রে কত জন রাষ্ট্র-সভাসদ্ ও প্রতিনিধি-সভাসদ্ আছেন তাহা দেখান যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কোন্ রাষ্ট্র হইতে কতজন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় প্রেরিত হন তাহারও উল্লেখ ব্র্যাকেটে করিতেছি। (প্রত্যেক রাষ্ট্র তুইজন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভাসদ্ নির্ব্বাচন করে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।)

রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার সভ্য-সংখ্যা।

আলাবামা—৩৫ রাষ্ট্রসভায় ও ১০৬ প্রতিনিধি-সভায় (১০ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায়); আরিজোনা—১৯ ও ৫৪ (১); আরকাংসাস্—৩৫ ও ১০০ (৭); কালিফোর্ণিয়া—৪০ ও ৮০ (১১); কোলোরাডো—৩৫ ও ৬৫ (৪); কনেক্‌টিকাট—৩৫ ও ২৫৮ (৫); ডেলাওয়ার—১৭ ও ৩৫ (১); ফ্লোরিডা—৩৮ ও ৯৫ (৪); জর্জিয়া—৫১ ও ২০৭ (১২); ইডাহো—৪৪ ও ৫৯ (২); ইলিনয়—৫১ ও ১৫৩ (২৭); ইণ্ডিয়ানা—৫০ ও ১০০ (১৩); আইওয়া—৫০ ও ১০৮ (১১); কংসাস্—৪০ ও ১২৫ (৮); কেণ্টাকি—৩৮ ও ১০০ (১১); লুসিয়ানা—৩৯ ও ১০১ (৮); মেইন—৩১ ও ১৫১ (৩); মেরিল্যাণ্ড—২৯ ও ১১৮ (৬); ম্যাসাচুসেট্‌স্—৪০ ও ২৪০ (১৬); মিশিগান—৩২ ও ১০০ (১৩); মিন্নেসোটা—৬৭ ও ১৩১ (১১); মিসিসিপি—(৮); মিসৌরি—৩৪ ও ১৫০ (১৬); মোণ্টানা—৫৩ ও ১০২ (২); নেব্রাস্কা—৩৩ ও ১০০ (৬); নেভাদা—১৭ ও ৩৭ (১); নিউ হ্যাম্পশায়ার—২৪ ও ৪১৯-৪২২ (২); নিউ জার্সি—২১ ও ৬০ (১২); নিউ মেক্সিকো—২৪ ও ৪৯ (১); নিউ ইয়র্ক—৫১ ও ১৫০ (৪৩); নর্থ ক্যারোলিনা—৫০ ও ১২০ (১০); নর্থ ডাকোটা—৪৯ ও ১১৩ (৩); ওহিও—৩৫ ও ১৩০ (২২); ওক্লাহোমা—৪৪ ও ৯৭—১০৯ (৮); ওরগন—৩০ ও ৬০ (৩); পেন্‌সিলভেনিয়া—৫০ ও ২০৮ (৩৬); রোড্ আইল্যাণ্ড—৩৯ ও ১০০ (৩); সাউথ ক্যারোলিনা—৪৬ ও ১২৪ (৭); সাউথ ডাকোটা—২৫-৪৫ ও ৭৫-১৩৫ (৩); টেন্নেসসি—৩৩ ও ৯৯ (১০); টেক্সাস্—৩১ ও ১৫০ (১৮); উটা—২০ ও ৫৫ (২); ভার্মণ্ট—৩০ ও ২৪৮ (২); ভার্জিনিয়া—৪০ ও ১০০ (১০); ওয়াশিংটন—প্রতিনিধি-সভার ১/২-১/৩; ৬৩-৯৯ (৫); ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া—৩০ ও ৯৪ (৬); উইস্‌কনসিন—৩৩ ও ১০০ (১১); ওয়াইয়োমিঙ—২৭ ও ৬২ (১)।

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা গঠনে কিরূপ স্বাধীনতা রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌথরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক

রাষ্ট্র হইতে যে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হন তাঁহারা সেই রাষ্ট্রের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রেরিত হন। সুতরাং উপরে ব্র্যাকেটে ধৃত সংখ্যাগুলি হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকবলের অনুপাতের ধারণা হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখায় নির্ব্বাচিত সভ্যদের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। যেমন, যৌথরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় নিউ ইয়র্ক সর্ব্বাধিক সদস্য পাঠাইলেও, উহার রাষ্ট্র-সভায় ৫০ ও প্রতিনিধি-সভায় ২০৮ জন প্রেরিত হন; অথচ উহার চেয়ে ঢের ছোট দেশ নিউ হ্যাম্পশায়ার রাষ্ট্র-সভায় ২৪ জন ও প্রতিনিধি-সভায় ৪১৯ জনের অধিক ব্যক্তি পাঠাইয়া থাকে। রাষ্ট্র-সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য নির্ব্বাচন করে মিনেসোটা (৬৭), আর সর্ব্বাপেক্ষা কম করে ডেলাওয়ার (২৭)। আর প্রতিনিধি-সভায় নিউ হ্যাম্পশায়ার (৪১৯-৪২২) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ডেলাওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা কম (৩৫) প্রতিনিধি পাঠায়।

কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সদস্যেরা সমান বেতন পাইয়া থাকেন। ১৯২৪ সনে সদস্যদের ন্যূনতম বাৎসরিক বেতনের হার ১৫০ ডলার, ঊর্দ্ধতম বাৎসরিক বেতন ১৫০০ ডলার ছিল,—গড়ে ৫০০ ডলার। কতকগুলি রাষ্ট্রে যতদিন ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক হয় ততদিনের জন্য সদস্যেরা দিনে কত ডলার পাইবেন তাহা ঠিক করা থাকে, ইহা ছাড়া ভ্রমণের জন্য একটা ভাতাও পান। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্রে দিন ধরিয়া বেতন দেওয়া হয়, সেগুলিতে বৈঠক কতদিন বসিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারে সময় বাঁধিয়া দেয়। কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপও ব্যবস্থা থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইলে দৈনিক বেতনের হার কমিয়া যাইবে অথবা কিছুই দেওয়া হইবে না। সত্য বটে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে যাহা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা যথেষ্ট উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিদের পক্ষে কিছুই নহে, তথাপি অল্প উপার্জ্জনশীল কেহ কেহ এই পদের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হন যে, বৈঠকের সময় হ্রাস করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা না হইলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় অধিকতর খরচ হইয়া যাইত।

ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভ্যগণ বেতন পান।

পূর্ব্বে সাধারণত বৎসরে একবার করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইত। কিন্তু এক্ষণে অধিবেশনের সংখ্যা যেমন কমিয়াছে, সময়ও সেইরূপ হ্রাস করা হইয়াছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রে দুই বৎসরে একবার মাত্র ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়,—অল্প কতকগুলিতে বাৎসরিক অধিবেশন দেখা যায়। ২১টি রাষ্ট্রে চারি বৎসর অন্তর বৈঠক বসে। তবে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলে শাসকের ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিবার ক্ষমতা আছে।

দুই বৎসর অন্তর অধিবেশনের ব্যবস্থা।

প্রায় সকল রাষ্ট্রে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক সকল ব্যক্তি কোন প্রকার রাষ্ট্র-সম্পর্কিত অপরাধে অপরাধী না হইলে ভোট দিতে পারে। কতকগুলি রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকেরাও ভোট দিবার অধিকারী। কোন কোন রাষ্ট্রে সামান্য কর দেয় ও লিখিতে পড়িতে জানে এরূপ ব্যক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি বিরল। ভোট সম্বন্ধে সার্ব্বজনীনতার একটি কারণ এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা এই: রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় সভ্যদিগকে নির্ব্বাচন করিবার জন্য যাহারা ভোটদানের অধিকারী, তাহারাই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা ও মহাসমিতির সভ্য-

কাহারা ভোট দেন?

দিগকে নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী। কোন রাষ্ট্র বহুসংখ্যক লোককে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনে উহার গুরুত্ব কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকল রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব অধিক লোককে ভোটদাতা করিবার চেষ্টা করে।

ব্যবস্থাপক সভার শাখা-দ্বয়ের ক্ষমতা।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার যে কোন শাখায় কোন বিলের উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু অর্থ-সম্পর্কিত বিল প্রতিনিধি-সভায় আনয়ন করা দরকার। যদিও রাষ্ট্র-সভার অর্থ-ঘটিত বিল তৈরী করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা অন্যান্য বিলের ন্যায় ঐ বিল সংশোধন অথবা নামঞ্জুর করিতে পারে। একটি বিষয়ে রাষ্ট্র-সভার বিশেষ এক ক্ষমতা আছে। প্রতিনিধি-সভা কাহারও বিরুদ্ধে অত্যাভিযোগ করিলে রাষ্ট্র-সভা সেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর বিচারের জন্য বিচারালয়রূপে বসিতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে ঐ সভা শাসক কর্তৃক মনোনীত কর্ম্মচারীদের মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিয়া থাকে। আর সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ক্ষমতা প্রায় সমান। কোন রাষ্ট্রের সহকারী শাসক সাধারণত তাহার রাষ্ট্র-সভার সভাপতি হইয়া থাকেন; তাঁহার একটি অতিরিক্ত ভোট আছে। কিন্তু উহার প্রতিনিধি-সভার সভাপতি সকল স্থানে ঐ সভা হইতে নির্ব্বাচিত হন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কাঠামো-আইন দ্বারা অধিবেশনের ন্যূনতম সংখ্যা (কোরাম্) স্থিরীকৃত আছে,—তাহা সাধারণত সমুদয় সভ্যের অতিজন হওয়া প্রয়োজন। উভয় শাখাতে সমিতির (কমিটি) সাহায্যে কার্য্য পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র-সভার ও প্রতিনিধি-সভার সমিতিসমূহ উহাদের নিজ নিজ সভাপতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, যদিও উভয় শাখা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। রাষ্ট্রের শাসক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের অবসান (প্ররোগ) বা কাজ মুলতবী (এডজোর্ণ) রাখিতে পারেন না। যদি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভা অধিবেশন মুলতবী রাখিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু সময় সম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দল সমান হয়, তাহা হইলে শাসক নিজের মতানুসারে কাজ করিতে পারেন। সমিতির সাহায্যে ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন কর্ম্মচারীদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; ও বিভিন্ন সমিতিতে বিলসমূহ পাশ হইবে কি না এবং কি ভাবে পাশ হইবে তাহা ঠিক হইয়া যায়। কোন কোন রাষ্ট্রে কোন বিল সমিতিতে প্রেরিত হইলে রাষ্ট্রের যে কোন রাষ্ট্রিক গিয়া ঐ বিলের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থের সংস্থান।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থের সংস্থান কিরূপে হয় সে সম্বন্ধে দু' একটি কথা এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোন রাষ্ট্রেরই বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাব (বাজেট) বড় নয়, সে রাষ্ট্রের ধনৈশ্বর্য্যের তুলনায় উহা যত বড় হইতে পারিত তার চেয়ে সাধারণত ঢের ছোট হইয়া থাকে। বস্তুত রাষ্ট্রের গুরুভার বহন করিয়া থাকে রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, বিশেষত গ্রাম ও নগরসমূহ। রাষ্ট্রের বিচার ও শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বেতন, বিচারকার্য্য চালাইবার খরচ, দাতব্য ও অন্য প্রকার প্রতিষ্ঠান চালনার খরচ, ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য, কারাগার রক্ষা, সরকারী ঘরবাড়ী ও খাল তৈরী বা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ,—এ গুলিই হইল রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যয়ের দফা। প্রত্যেক রাষ্ট্রে নানাপ্রকারে সংগৃহীত সমুদায় রাজস্বের অল্পমাত্র অংশ শুধু রাষ্ট্রের কাজে ব্যয়িত হয়। রাষ্ট্রের প্রায় সমগ্র রাজস্বই প্রত্যক্ষভাবে কর বসাইয়া তোলা হয়। কারণ যৌথ-

রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের বলে কোন রাষ্ট্রই আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক বসাইতে পারে না এবং তাহা ছাড়া অন্য যে সকল কর বসাইয়া অর্থ সংগৃহীত হয় তাহাও যৌথ-কোষাগারে দিতে হয়। রাষ্ট্রে প্রধানত সম্পত্তির উপর কর বসাইয়া অর্থ সংগৃহীত হয়। এই অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে একটা দুঃখের বিষয় এই যে, বহু ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীকে ফাঁকি দিয়া থাকে। অবশ্য অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এমন কতকগুলি সম্পত্তি আছে যাহার উপর কোন কর বসান হয় না। যথা, রাষ্ট্রের ঘরবাড়ী বা অন্য সম্পত্তি, কবরখানা, ইস্কুল, কলেজ, দাতব্যালয়, গির্জ্জা, ব্যাঙ্কের আমানত ইত্যাদি। সম্পত্তির উপর কর স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের দ্বারা সংগৃহীত হয়। রাষ্ট্র প্রথমে স্থির করে কোন্ কোন্ আয় উহার দরকার, তারপর বিভিন্ন বিভাগের (কাউন্টি) উপর ঐ আয়ের বিভিন্ন অংশ তুলিবার ভার দেয়। এই বিভাগসমূহ আবার রাষ্ট্রকে দিয়া অর্থের সহিত নিজেদের প্রয়োজনীয় অর্থও নিজ এলাকাভুক্ত সহর ও গ্রামের মধ্য হইতে তুলিবার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ সহর ও গ্রামের কর্তৃপক্ষগণ সাধারণত একসঙ্গে তিন প্রকার কর আদায় করিয়া থাকেন—রাষ্ট্রের কর, বিভাগের কর এবং গ্রাম বা সহরের কর। তৃতীয় প্রকার করের টাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া অন্য দুই প্রকার করের টাকা বিভাগকে দেন। বিভাগ আবার বিভাগীয় করের টাকা রাখিয়া রাষ্ট্রীয় করের টাকা রাষ্ট্রকে দেয়। কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক-সভা যাহাতে বেপরোয়াভাবে টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা না করে, সেজন্য কাঠামো-আইনে নিষেধ জারি করা হইয়াছে। এই নিষেধের ফলে অনেক অযথা ব্যয় নিবারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রাষ্ট্রসমূহের ঋণ করিবার অভ্যাস অতিশয় প্রবল ছিল। তাহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ঋণ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। অবশেষে এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ঋণ করা সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সন্নিবিষ্ট করা হয়। এই বিধি নিষেধ নিম্নপ্রকার: (ক) কোন রাষ্ট্র যাহাতে সহজে ঋণ না করিতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা, যথা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় দুই-তৃতীয়াংশ অতিজনের স্বপক্ষে মত পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি; (খ) আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য ঋণ গ্রহণেও বাধা; (গ) ঋণ গ্রহণ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্য ক্রম-পরিশোধ ভাণ্ডার (সিঙ্কিং ফাণ্ড) রাখা সম্বন্ধে বাধ্য-বাধকতা; (ঘ) উক্ত প্রকার ভাণ্ডার থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র ঋণ-শোধের অনুজ্ঞা; (ঙ) ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা নিয়ম।

জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন

রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নে জনমতের কার্য্য।

এইখানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন বিষয়ে একটি বিশেষ অধিকারের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই বিশেষত্ব ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড বা ইংল্যাণ্ড কোন দেশের নিকট হইতেই ধার করিয়া লওয়া হয় নাই, উহা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আপনা হইতে দেখা দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ও শাসন ব্যাপারে জনগণের কিরূপ প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান আইন-কর্ত্তা রাষ্ট্রিকগণ এবং এ বিষয়ে তাহাদের অধিকার কোন কালে খর্ব্ব হইতে পারে না—

এই মূলনীতি সকল রাষ্ট্র একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কোন কোন আইনের মূলসূত্রকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা জনগণের মতকে মানার ফল। এই মতকে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন পাশ করা হয় সেগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে প্রণীত আইনের নীচে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকারে জনমতকেই মানিয়া চলা উচিত। জনগণ এইভাবে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াই খুশী হয় নাই, শাসনকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগে এই নীতি আরো বেশী পরিমাণে অনুসৃত হইয়া থাকে। জনগণের প্রাধান্যের ফলে (১) তাহাদের প্রত্যেক ভোট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রেই কাঠামো-আইন প্রণীত হইতে পারে না; (২) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাহীন হইয়া গিয়াছে, উহাদের প্রণীত আইনসমূহ তত ভাল হয় না এবং জনগণও সেগুলির প্রতি কম শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল।

শাসন-কার্য্যে জনগণের হাত থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের দুর্ব্বলতা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত ছিল নিজ নিজ ব্যবস্থাপক সভাকে সংস্কৃত ও উন্নত করা, তথাপি ব্যবস্থাপক সভাসমূহ নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা জনগণের শ্রদ্ধা-হ্রাসের সহায়তা করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের প্রধান কাজ হইল বিশেষ বিশেষ আইন পাশ করা। ব্যবস্থাপক সভাসমূহ সাধারণত নিজেরা কোন গুরুতর কাজে হাত দিতে ভয় পায়, সহজে অধিকাংশ বিষয়ে জনমত দ্বারা পরিচালিত হয় এবং জনগণ তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে তাহারা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করে বলিয়া খুসী হয়। যে সকল বিষয়ে উহারা নিজেরা আইনত কোন সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ, সে সকল বিষয়ও অনেক সময় জনগণের দ্বারা বিচারিত হইবার জন্য প্রেরণ করে। তবে কোন ব্যবস্থাপক সভা নিজ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সরাসরিভাবে জনগণের হাতে অর্পণ করিতে পারে না, কারণ ব্যবস্থাপক সভা জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বলিয়া দ্বিতীয়বার আইন-প্রণয়নের জন্য কাহাকেও নিজেদের প্রতিনিধি করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে উহা জনগণের পরামর্শ চাহিয়া পাঠায় নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ে কিরূপ আইন পাশ করিবে। ঐ পরামর্শ পাইলে পর তদনুযায়ী আইন-প্রণয়ন করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রিকের ক্ষমতা:

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণ রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্নলিখিত চারি প্রকারে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

(১) কাঠামো-আইন প্রণয়ন ও সংশোধন।

(১) কাঠামো-আইন প্রণয়ন বা সংশোধন দ্বারা। যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, তাহার খসড়া প্রথমত বৈঠক (কনভেনশন) বা ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা (যেরূপ নিয়ম আছে) প্রণীত ও পাশ হওয়া আবশ্যক। তারপর উহা জনগণের নিকট পেশ করা হয়।

(২) বিভিন্ন প্রস্তাবের জন্য মত প্রদান।

(২) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের ব্যবস্থা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ জনগণের ভোটের জন্য উপস্থিত করিয়া। কখনো কখনো এইরূপ প্রস্তাব প্রথমে ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া আসে। কখনো বা কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ অনুসারে সরাসরিভাবে জনগণের ভোট লওয়া হয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা কোন সাধারণ আইন পাশ করিলে পর উহার গ্রহণ বা প্রত্যাহারের জন্য ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে জনগণের ভোট লইয়া। ইহাকে প্রত্যুপস্থাপন (রেফারেণ্ডাম্) বলা যাইতে পারে। (৩) প্রত্যুপস্থাপন।

(৪) ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে ভোটদাতাগণের নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের দ্বারা সাধারণ আইন অথবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সংশোধন-প্রস্তাব আনিয়া। ইহাকে অভিনয়ন (ইনিশিয়েটিভ্) বলে। (৪) অভিনয়ন।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রথা আধুনিক। যে সকল রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন পরিবর্ত্তনে ইচ্ছুক সেগুলি অধিকতর পরিমাণে এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। যে সকল ব্যবস্থা এইরূপে জনগণ কর্তৃক পাশ হয়, সেগুলির সম্পর্কে কোন কোন রাষ্ট্রে-শাসক নাকচ্ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন না। কোন বিলের বিভিন্ন দফা বা অংশ সম্বন্ধেও প্রত্যুপস্থাপন করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রত্যুপস্থাপন ও অভিনয়নমূলক সকল প্রস্তাবই যে পাশ হয়, তাহা নহে। কোথাও কোথাও প্রস্তাবের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়গণ নিজেদের যুক্তি মুদ্রিত করিবার পর ঐগুলির এক এক খণ্ড রাষ্ট্রের খরচে বিভিন্ন ভোটদাতার নিকট প্রেরিত হয়।

ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে জনগণ কর্তৃক ভোট দ্বারা আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা আরো অধিক রাষ্ট্রে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। শুধু যে রাষ্ট্রেই এইরূপ হইতেছে, তাহা নহে, কোন কোন রাষ্ট্রের প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপালিটিতেও ইহা গৃহীত হইয়াছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি (১৭৪-১৭৫পৃঃ দ্রষ্টব্য) বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মচারিগণ শাসকের নিকট বা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন এবং তাঁহারা সকলে একত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া চলেন না। ইহাতে স্বতই এই প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে যে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়?

এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। তাহা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রকেই এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় কোন রাষ্ট্রের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের ন্যায় এখানে কোন রাষ্ট্রের কোন নির্দ্দিষ্ট সমবেত দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন হয় না—সুতরাং রাষ্ট্র-চালনার ভার যাঁহাদের উপর থাকে তাঁহাদের মত বা উদ্দেশ্য এক না হইলেও সামঞ্জস্যের অভাব হয় না। রাষ্ট্রীয় নীতি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মচারিগণ একত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করেন না।

রাষ্ট্রসমূহে শাসন-কার্য্যের ব্যাঘাত না হইবার কারণ এই যে, যাঁহাদের হাতে শাসন-ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের পরিমাণ অল্প, এবং যে অর্থ তাঁহাদের ব্যয় করিতে হয়, তাহারও পরিমাণ কম। ইহার দুইটি প্রধান কারণ এইঃ (১) যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ এরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে, বহু বিষয় রাষ্ট্রের তাঁবে না রাখিয়া উক্ত বিভাগগুলির তাঁবে রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের দাবী যেমন কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের কাজে বিশৃঙ্খলা না ঘটিবার কারণসমূহ।

ন্যূনতম করিয়া ছাড়িয়াছে, রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগও সেইরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বহু পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়াছে। (২) ইয়োরোপের বহু রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা যে সমুদায় কর্ত্তব্য ভার সাধারণত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার বহুল অংশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ নিজেদের হাতে রাখিয়াছে, যেমন ব্যবস্থাপক সভার সমিতিসমূহ বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতার প্রয়োগ করে। তারপর ইহাও দ্রষ্টব্য যে কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলিয়া কিছু নাই, কারণ এ সম্বন্ধে যৌথরাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রকে কোন প্রকার অধিকার দেয় নাই; যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা বহু লোককে চাকুরী দিতে পারেন, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের শাসকের হাতে মুষ্টিমেয় কতকগুলি চাকুরী মাত্র আছে; রাষ্ট্র-নেতা যৌথরাষ্ট্রের স্থল ও জল-সৈন্যের সেনাপতি,—শাসকও রাষ্ট্রের সৈন্য-সামন্তের নায়ক বটে, কিন্তু শান্তির সময়ে তাহা অকিঞ্চিৎকর; রাষ্ট্র-নেতা বিশাল ডাক-বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ডাক-বিভাগ নাই। এইরূপে যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, বুঝা যাইবে রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ।

রাষ্ট্রের শাসক বনাম ব্যবস্থাপক সভা।

রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম্মচারিগণের পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণ অগ্রসর হন না, তাহা নহে। কিন্তু সাধারণত তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর লোক ও তাঁহাদের বিশেষ গুরুতর কর্ত্তব্য থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসকের একটি বিশেষ পদমর্য্যাদা আছে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্ত্তা হিসাবেই জনগণ শাসককে বিচার করে না, তাঁহার খ্যাতি বা অখ্যাতি নির্ভর করে আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে। তিনি অবশ্য নিজে কোন আইন প্রণয়ন করেন না, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন মঞ্জুর অথবা নাকচ্ করেন। এ বিষয়ে তিনি যত বেশী সাহসের সহিত কাজ করিতে পারেন, তত জনগণের প্রিয় হন। বস্তুত, অনেক সময়ে কোন শাসকের পুনর্নির্ব্বাচন নির্ভর করে এই বিষয়ের উপর যে, তিনি তাঁহার নাকচ্ ক্ষমতা যথোচিতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন কি না। নিজেদের প্রেরিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহ গঠিত হয়, অথচ সেই প্রতিনিধিগণের কাজে যে শাসক যত বেশী চোখ রাখিবেন ও বাধা দিবেন, তিনি তত প্রিয় হইবেন, ইহার কারণ এই যে, শাসক ও প্রতিনিধিগণ উভয়েই একই জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেও শাসক একবারে সকলের ভোটে নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন জিলা প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করিয়া থাকে। ইহাতে শাসক জনগণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরূপে জোরের সহিত নিজ মতানুসারে চলিতে পারেন। অধিকন্তু ইহার একটা ফল হইয়াছে এই যে, অনেক সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা প্রেরিত হন তাঁহারা যে দলের লোক হন, শাসক সে দলের না হইয়া অন্য দলের হন। সমগ্র রাষ্ট্রে যে দলে অতিজন থাকে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জিলার অধিকাংশে তাহারা উনজন হইতে পারে, সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন দলের অধিকাংশ লোক যায়। ইহাও মঙ্গলকর বিবেচিত হয়। একই দলের হইলে শাসকের পক্ষে হয়ত ব্যবস্থাপক সভার প্রতি ততটা কড়া নজর রাখা সম্ভবপর হইত না।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তিন শ্রেণীর আইন প্রণয়ন করে।

রাষ্ট্রসমূহ ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে ব্রাইস্ সেগুলিকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:

(১) সাধারণ ব্যক্তিগত আইন; যেমন, চুক্তি, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত অনিষ্ট (টর্ট), উত্তরাধিকার, পারিবারিক সম্বন্ধ, দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিধির প্রণালী বিষয়ক।

(২) শাসন-সংক্রান্ত আইন; যথা, মিউনিসিপ্যাল ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, পূর্ত্তকার্য্য, শিক্ষা, মদ্যের ব্যবসা, টীকা গ্রহণ, ভেজাল, দাতব্য, কয়েদশালা, খনি ও শিল্প পরিদর্শন, রেলপথ, শ্রম, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর আদায়, সরকারী ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ক।

(৩) বিশেষ বিশেষ আইন; যথা, গ্যাস, জল, যান, ট্রাম, টেলিফোন অথবা রেল কোম্পানি খুলিবার জন্য সনদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিল ইত্যাদি।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রথম শ্রেণীর চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলের সংখ্যা অনেক বেশী। আবার তৃতীয় শ্রেণীর বিল সর্ব্বাধিক পরিমাণে উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহে প্রথম শ্রেণীর আইনসমূহ সমগ্র বৎসরের মধ্যেও বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না। কোন কোন রাষ্ট্রে কখনো হয়ত কোন বিষয় লইয়া পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহ এই প্রকার আইনের সম্পর্কে যথেষ্ট রক্ষণশীল। অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির যে প্রকার সম্পর্ক আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আর বড় নড়চড় হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ, এবং প্রত্যেক বৈঠকে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি আইন প্রণীত হইয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর আইন প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সংখ্যায় অনেক হয় এবং এই প্রকার আইন-প্রণয়নে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। যুক্তরাষ্ট্রবাসী অনেক রাজনীতিবিদ্ এই প্রকার আইনের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, নানাপ্রকার কোম্পানি ইত্যাদি খুলিবার জন্য যে প্রভূত অর্থব্যয় হয়, তাহার কিয়ৎ পরিমাণ ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন প্রভাবশালী সভ্যের ভোট কিনিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে; তাঁহারা নিজেদের প্রভাবের ফলে ব্যবস্থাপক সভার মতামত নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হন। ইহা ছাড়া, আইন-প্রণয়ন করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির শাসন-প্রণালী ও সহর-সমূহের পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার আছে। সহরের রাজস্বের পরিমাণ বেশী, সুতরাং ন্যায়পরায়ণ লোকে সহরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ না করিলে ঐ রাজস্বের যথেষ্ট অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা সহরের শাসন সম্পর্কে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা কোন কোন রাজনীতিবিদের হাতে থাকিলে দেশের মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে রক্ষিত হয় না। নিজেদের স্বার্থ যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারা নানা উপায়ে লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিলের পক্ষে ভোট দিতে হইলে অর্থ বা অর্থের বদলে অন্য জিনিষ চাহেন। অন্য কেহ হয় ত ভোটের বদলে ভোট দেন, অর্থাৎ তিনি এই সর্ত্তে ভোট দেন যে, তাঁহার নিজের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল কোন আইন পাশ করিবার কালে তিনি যাঁহাদের জন্য ভোট দিতেছেন তাঁহারা তাঁহার পক্ষে ভোট দিবেন। কোন কোন রাষ্ট্র এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন করিয়াছে। অন্য কেহ কেহ ব্যবস্থাপক সভায় এমন বিল উপস্থাপিত করেন যে, তাহা পাশ হইলে কোন বড় কোম্পানি (যেমন রেলওয়ে) সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরা গোপনে কোম্পানির পরিচালকদের কাহাকেও অথবা

বিশেষ আইনের বাহুল্য ও তাহার কুফলসমূহ।

কোন বড় কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠান ও কথাবার্তা ঠিক হয় যে কোম্পানি তাঁহাদের একটা মোটা টাকা দিলে পর তাঁহারা ঐ বিল শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখিবেন, (ব্রাইস্)। যেখানে এইরূপ লোকদের প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা উহার প্রতিনিধি-সভার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়, অন্যত্র রাষ্ট্র-সভা শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ এই যে, রাষ্ট্র-সভা ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহার প্রত্যেক সভ্যের ভোটের দাম ও ফল অনেক বেশী এবং সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র-সভায় প্রবেশ করিয়া নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহের কতকগুলি দোষ;

এইখানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতকগুলি সাধারণ দোষের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে :

(ক) ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় যে সকল সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের অধিকাংশ জ্ঞানে, বুদ্ধিতে এবং কখনো কখনো কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে তেমন উচুদরের নহেন।

(খ) অর্থের ব্যাপারে অমিতব্যয়িতা দেখা যায়।

(গ) শাসন-সংক্রান্ত বিল যথেচ্ছভাবে পাশ করার স্বভাব আছে।

(ঘ) বিশেষ বিশেষ আইন-প্রণয়ন কালে অনেক সময়ে যথোচিত প্রণালী অবলম্বিত হয় না।

(ঙ) কর্পোরেশন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশেষ বিল প্রণয়নে চক্রের প্রভাব বেশী।

(চ) সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি প্রীতি বেশী।

(ছ) স্বীকৃত নেতার অধীনে কাজ করিবার প্রবৃত্তি কম।

(জ) বহু সংখ্যক বিল এক সঙ্গে পাশ করিবার ইচ্ছা প্রবল।

(ঝ) নানা কারণে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদনে সাহসের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম পাঁচটি দোষের ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র বৃথা ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়াছে, বহু অনাবশ্যক আইন প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতে অবৈধ সুবিধা সংগ্রহ করিয়া লোকের যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত করিবার ঝোঁক দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রবাসীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি প্রীতির পরিচয় পূর্ব্বে কয়েকবার দেওয়া গিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতার ফলে এক এক জিলা হইতে এক এক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার যে গুণ-হ্রাস ঘটে, তাহাও বলিয়াছি। সপ্তম দোষের ফলে, ষষ্ঠ দোষটি অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা আরো বেশী অনিষ্টকর হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন ক্ষুদ্র দল সর্ব্বদা হৈ চৈ করিয়া নিজ নিজ দাবী অনুসারে অপেক্ষাকৃত সহজে বিল পাশ করিয়া লইতে পারে। নির্ব্বাচিত সকলেই বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধি, সুতরাং নিজ জিলার স্বার্থ-রক্ষার কথা সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে প্রত্যেকে বাধ্য। কেহই সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নহেন। ইহার ফলে প্রতি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বহু অনাবশ্যক বিল আনা হয়। তারপর ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি খাটো হওয়ার দরুণ, তাড়াতাড়ি বহু বিল এক সঙ্গে পাশ করিবার প্রবণতা ইঁহাদের অত্যন্ত অধিক। সুতরাং সাধারণত বৎসরে পনের বা বিশ হাজার আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হওয়া বিচিত্র নয়। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত বিলের সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী। উপরে যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ফলে ব্যবস্থাপক সভা-

সমূহে কর্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে সাহসের অভাব দেখা দিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার কোন ব্যক্তিই সাহস করিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিতে পারেন না,—দলের কার্য্য সম্বন্ধে ত নয়ই। (ব্রাইস্)

উপরোক্ত দোষসমূহ বিদূরিত করিবার বা উহাদের অনিষ্টকর ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা প্রকারে করিয়াছে। তাহার কতকগুলি এই: (১) প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভাকে দুই শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এক শাখা সর্ব্বদা অন্য শাখার কাজের উপর চোখ রাখে ও সব সময়ে অন্য শাখা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কাজে বাধা দিতে না পারিলেও উহার গলদ্‌সমূহ জনগণের নিকট প্রকটিত করে। (২) শাসক তাঁহার নাকচ্‌ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বহু অনিষ্টকর আইন-প্রণয়ন নিবারণ করিতে পারেন। অবশ্য সকল রাষ্ট্রে শাসক সমান শক্তিশালী হন না, তথাপি সাধারণত জনগণ আশা করে যে, তাঁহার দ্বারা সর্ব্বাগ্রে দেশের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। কোন কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, শাসক সমগ্র বিলটিকে নাকচ্‌ না করিয়াও আয়ব্যয়ের কোন কোন দফা নাকচ্‌ করিতে পারেন। সুতরাং অযথা ব্যয় নিবারণের উপায় তাঁহার হাতে আছে। (৩) ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ক্ষমতার ও কার্য্যপ্রণালীর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। (৪) ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন কত কাল ধরিয়া হইবে, সে সম্বন্ধে নিয়ম। পূর্ব্বে যতক্ষণ কাজ না শেষ হইত ততক্ষণ এই সকল সভা অধিবেশন চালাইত। তখন কার্য্য শেষ করিতে অধিক দিন লাগিত না। কিন্তু পরে নানা কারণে দীর্ঘতর সময় ধরিয়া অধিবেশন হইতে থাকায়, অধিকাংশ রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে আইন তৈরী করিয়াছে। (১৭৭-১৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ও তাহার প্রতীকারার্থ অবলম্বিত ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি (১২১-১৩৫ পৃঃ)। এখানে রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে পুনরায় রাষ্ট্রীয় দলের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পররাষ্ট্রনীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-স্থাপন, সংরক্ষণ-শুল্ক, দাসত্ব-প্রথা, অন্তর্যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের পুনর্গঠন প্রভৃতি যে সকল প্রশ্ন একমাত্র যৌথরাষ্ট্রের মীমাংসার বিষয় সেগুলির সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক না থাকাতে ঐ সকল রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক না রাখিয়া রাজনৈতিক মতামত ও দল গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তাহা হয় নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের শাখারূপে মাত্র গোতায়েন আছে। রাষ্ট্রীয় দলের ভিন্ন কোন সত্তা নাই। যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার কালে উহার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল দল ছিল, উহা স্থাপিত হইবার পর তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার একটা কারণ এই যে, ১৭৯৩ হইতে ১৮১৫ সন পর্য্যন্ত যে সকল সমস্যা জনগণের মনকে বিশেষ আন্দোলিত বা উত্তেজিত করিয়াছে, সেগুলি প্রায় সবই জাতীয় সমস্যা অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা। সুতরাং এই দিকে সকলের মন আকৃষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রতি লোকে তত নজর দিতে পারে নাই,—একই কালে দুই প্রকার সমস্যার দিকে সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে। তারপর দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য যে অবিরাম চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে রাষ্ট্রীয় দলের কথা ভাবা সম্ভবপর হয় নাই। প্রত্যেক দলই প্রত্যেক রাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও তাহা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নয়, কেন্দ্রীয়

যৌথরাষ্ট্রের প্রধান দল দুইটি রাষ্ট্রগুলিতেও দেখা যায়।

ব্যবস্থাপক সভায়, প্রাধান্য লাভের জন্য। অধিকন্তু যৌথকর্তৃপক্ষের ভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রে চাকুরীর সংখ্যা অনেক। যে দল প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতাকে নির্ব্বাচন করে, সে দল যে বিশেষ লাভবান্ হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রে যাঁহারা নির্ব্বাচিত রাষ্ট্র-নেতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন তাঁহাদের চাকুরী ইত্যাদি দিয়া রাষ্ট্র-নেতা পুরস্কৃত করেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক দলের প্রভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হয়,—রাষ্ট্রের শাসকের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর পদের জন্য দুই রাজনৈতিক দলে দ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকসমূহের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণও এক বা অপর রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি হইয়া থাকেন। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া রাষ্ট্রীয় দল গঠিত হইলে তাহার বিশেষ কিছুই প্রভাব থাকিত না। উহা জাতীয় রাজনৈতিক দল দুটির কোনটিরই সাহায্য পাইত না এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম বলিয়া দলস্থ লোকদের বেশী স্থায়ী চাকুরী দিতে পারিত না। এই প্রকার দলের দলপতিগণের অর্থ ও যশ লাভের সুযোগও কম হইত।

ইহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দল অর্থাৎ শুধু রাষ্ট্রের মঙ্গল ও রাষ্ট্র-সম্পর্কিত প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য দল গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহের দুর্ব্বলতার কথা বিবেচনার কালে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের এক এক জিলা হইতে নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং একদিকে সমগ্র রাষ্ট্র হইতে সভ্যগণ নির্ব্বাচিত না হওয়ায় ও অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় দল না থাকায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যগণের কাহারও সহিত অন্য কাহারও সেরূপ সম্বন্ধ নাই; কতকগুলি লোক একত্র বসেন, আলোচনা করেন, আইনও প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাঁহাদের উপর রাষ্ট্রীয় দলের শাসন না থাকায় পরস্পরের সহযোগে কার্য্য সম্পন্ন হয় না ও তাহাতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, প্রতি অধিবেশনে কেন প্রত্যেক রাষ্ট্রে এত অনাবশ্যক বিল পাশ হয়। যদি এমন হইত, রাষ্ট্রে দল না থাকায়, শুধু যোগ্য ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠানো সম্ভব হইতেছে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় না। কারণ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দলের নির্দ্দেশ মত নির্ব্বাচন হইয়া থাকে এবং তাহাতে নির্ব্বাচন-জিলার সব চেয়ে ভাল ব্যক্তিই নির্ব্বাচিত হন, এমন নহে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে অভ্যস্ত নহেন।

উন-রাষ্ট্র ও অধিকৃত দেশসমূহ

পূর্ব্বে (পৃঃ ৬০) যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টি রাষ্ট্র ব্যতীত আরও কতকগুলি টেরিটরির নাম করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে টেরিটরি বা উন-রাষ্ট্র কথাটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোড়াতে ১৩টি মাত্র রাষ্ট্র একত্র গ্রথিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত হইয়াছিল। পরে যে সকল রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করে সেগুলির অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্র বহির্ভূত অথচ তৎকর্তৃক শাসিত দেশ ছিল। এগুলিকেই টেরিটরি বা উন-রাষ্ট্র বলা হইত। কোন দেশ নির্দ্দিষ্ট লোকবল লাভ না করিলে রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইত না। সেই দেশ যে পর্য্যন্ত এইরূপে রাষ্ট্রত্ব না পাইত, সেই পর্য্যন্ত উহার শাসন-ব্যবস্থা নিম্নরূপ ছিল: এইরূপ দেশে যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকেই মূল আইনরূপে প্রয়োগ করা হইত, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের যেমন স্বকীয় কাঠামো-

আইন আছে, এই সব দেশের সেরূপ কোন কাঠামো-আইন থাকিত না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের মত শাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচারবিভাগের কার্য্য পৃথক্‌ভাবে পরিচালিত হইত। প্রথমে শাসক ও বিচারকগণ একত্রে আইন-প্রণয়ন করিতেন, পরে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইত। একজন শাসক, তাঁহার সহকারী (সেক্রেটারি), কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-পরীক্ষক, শিক্ষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ—এই কয়জনে মিলিয়া শাসনকার্য্য চালাইতেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা উঁহার রাষ্ট্র-সভার সম্মতিক্রমে শাসককে চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতেন ও তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। শাসক দেশস্থ সৈন্যসামন্তের সেনাপতি ছিলেন এবং নিজের নাকচ্‌ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ব্যবস্থাপক সভার আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারিতেন,—ব্যবস্থাপক সভার দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন অবশ্য তাঁহার নাকচ্‌ ক্ষমতাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার দায়িত্ব ছিল যৌথকর্ত্তৃপক্ষের নিকট এবং তিনি প্রত্যেক বৎসর নিজের শাসিত দেশ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার নিকট বিবরণী পাঠাইতেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক অধিবেশনের গোড়ায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিয়া জানাইতেন। সাধারণত, যোগ্যতা-অনুসারে শাসক নিযুক্ত হইতেন না, দলের লোককে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হইত। যুক্তরাষ্ট্র-বহির্ভূত অথচ যুক্তরাষ্ট্র-শাসিত দেশসমূহের প্রত্যেকটিতে ব্যবস্থাপক সভার দুইটি শাখা থাকিত,—পরামর্শ সভা (হাউস্‌ অব্‌ কাউন্সিল) ১২ জনকে লইয়া ও প্রতিনিধি-সভা (হাউস্‌ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌) ২৪ জনকে লইয়া গঠিত হইত। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ৬০ দিনের বেশী হইতে পারিত না ও প্রত্যেক সভ্য দৈনিক ৪ ডলার হারে পাইতেন। উভয় সভায় সাধারণত বিভিন্ন সমিতির সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন হইত। যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার মত এই সব ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু দুইদিকে ইহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল,—(১) যৌথরাষ্ট্রের প্রণীত বিধি-নিষেধ মানিতে হইত; (২) মহাসমিতি আইন করিয়া কোন উন-রাষ্ট্রের আইন বাতিল করিতে পারিত। কোন কোন উন-রাষ্ট্রকে প্রত্যেক আইন মহাসমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতে হইত ও মহাসমিতি অনুমতি না দিলে সে আইন প্রচলিত হইতে পারিত না। সমুদায় উন-রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা মহাসমিতির ছিল। রাষ্ট্র-সভার সম্মতি সহ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত তিন বা ততোহধিক বিচারককে লইয়া একটি উচ্চ আদালত গঠিত হইত; তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের একজন জিলা এটর্ণি ও যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল থাকিতেন। যৌথ ও স্থানীয় উভয় প্রকার আইনই প্রয়োগ করা হইত। কোন কোন স্থলে যৌথরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল চলিত।

উন-রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার-প্রণালী।

এইরূপ উন-রাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা বা প্রতিনিধি-সভায় সভ্য পাঠাইতে পারিত না। রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনেও ইহাদের কোন হাত ছিল না। ঐরূপ প্রত্যেক দেশের একজন করিয়া প্রতিনিধি গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-সভায় বসিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন, কিন্তু ভোট দিতে পারিতেন না। একদিকে উন-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকরূপে স্থানীয় সকল অধিকার উপভোগ করিতে সমর্থ ছিল, অন্যদিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে তাহার

কোন হাত ছিল না। উন-রাষ্ট্র হইতে কর আদায় করা হইত, তথাপি তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইত না। এই প্রকার ব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লওয়ার কারণ এই ছিল যে, এইরূপ প্রত্যেক দেশই যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী রাষ্ট্ররূপে বিবেচিত হইত। এগুলি এক একটি অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র, কতকগুলি অবস্থার পূরণ হইবামাত্র পূর্ণ রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইত। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিক্ষানবিশীর সময় একরূপ নহে, কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণে কোন কোন উন-রাষ্ট্র, তাড়াতাড়ি পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। যেমন দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে যৌথরাষ্ট্রের স্বপক্ষীয়দের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য কোন কোন উন-রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রত্ব লাভের উপায়:

নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ে কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-পদে উন্নীত করা যায়:

মহাসমিতি জনগণ কর্তৃক প্রণীত কাঠামো-আইন মঞ্জুর করিলে;

কোন উন-রাষ্ট্রস্থ জনগণ নিজেদের কাঠামো-আইন স্থির করিলে পর, মহাসমিতি আইন পাশ করিয়া সেই কাঠামো-আইন মঞ্জুর ও গ্রহণ করে, তারপর সেই দেশ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া যায়।

অথবা মহাসমিতি দ্বারা পারগতা আইন পাশ হইলে।

মহাসমিতি পারগতা আইন (এনেব্লিং অ্যাক্ট) পাশ করে। ঐ আইনের বলে যুক্তরাষ্ট্র-বহির্ভূত দেশ কাঠামো-আইনবিষয়ক বৈঠক (কনভেনশন) বসায়,—উহাকে কাঠামো-আইনের খসড়া প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন এই কাঠামো-আইন ঐ দেশের ভোটদাতাগণের নিকট উপস্থাপিত হইয়া তাহাদের দ্বারা গৃহীত হয়, তখন মহাসমিতির আইন দ্বারা উহাকে মঞ্জুর করা হইয়া থাকে। দেশটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। কখনো কখনো মহাসমিতি পারগতা আইনের বলে স্থির করিয়া দিতে পারে কাঠামো-আইন প্রণয়নের জন্য কোন্ কোন্ সর্ত্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

কোন রাষ্ট্র এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার ফলে উহা রাষ্ট্র-সভায় ও প্রতিনিধি-সভায় নির্ব্বাচিত লোকদের পাঠাইতে সমর্থ হয় এবং রাষ্ট্র-নেতার নির্ব্বাচনকালে ভোট দিতে পারে। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত থাকা কালে দেশসমূহ লোকবলে ও ধনসম্পদে এরূপ হীন ছিল যে, সে সময় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রত্ব লাভ না করায় উহাদের মধ্যে কোন আন্দোলন বা গণ্ডগোল উপস্থিত হইত না। উহারা নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধির জন্য এরূপভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিত যে, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদির দিকে অধিকতর মনোযোগ দিবার অবকাশ ঘটিত না।

উন-রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত।

বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা শাসিত কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত একটিমাত্র দেশ আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে রহিয়াছে। উহা আলাস্কা। মহাদেশের বাহিরে একটি দেশ আছে,—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। এ দুটি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আরো একটি স্থান আছে যাহা রাষ্ট্র নহে এবং যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের কোন চিহ্ন নাই—কলম্বিয়া জিলা। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। এই স্থানের কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইহাকে উন-রাষ্ট্র বিবেচনা করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সনে রুশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ৭২ লক্ষ ডলার দিয়া কিনিয়া লয়। ১৯১২ সনের ২৪শে আগষ্ট হইতে উহা উন-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা ইহার শাসককে চারি বৎসরের জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন; বেতন—৭,০০০ ডলার। ইহার রাষ্ট্র-

সভায় ৮ জন ও প্রতিনিধি-সভায় ১৬ জন নির্ব্বাচিত হন। মহাসমিতি কোন কোন বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা নিজ হাতে রাখিয়াছে; সুতরাং মহাসমিতি ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা ইহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ১৯১৩ সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে রাজধানী জুনোতে ৬০ দিন ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সাধারণত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন দুই বৎসরে একবার হইয়া থাকে। তবে শাসক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই ভূভাগের পরিমাণ ৫,৯০,৮৮৪ বর্গ মাইল এবং ১৯২০ সনে লোক সংখ্যা ছিল ৫৫,০৩৬ তন্মধ্যে ২৬,৫৫৮ জন রেড ইণ্ডিয়ান। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ০·১ জনের বাস। (১) আলাস্কা।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৮৯৩ সনে উহার রাণী লিলুয়োকলানিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বীপবাসিগণ ঐ স্থানটিকে পরে গণতন্ত্রে পরিণত করে। ঐ সময়ে গণতন্ত্রের অধিবাসিগণ নিজ ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার বাসনা জ্ঞাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতিও ১৮৯৮ সনে অনুরূপ প্রস্তাব আনয়ন করে। তদনুসারে ১৮৯৮ সনের আগষ্ট মাসে এই জনপদকে যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন করিয়া লওয়া হয়। ১৯০০ সনের জুন মাসে ইহাকে উন-রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে। মূল আইনের সংশোধন কয়েকবার হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা হাওয়াইর শাসককে (বেতন—১০,০০০ ডলার) ও তাঁহার সহকারীকে চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত করেন। হাওয়াইর রাষ্ট্র-সভায় চারি বৎসরের জন্য ১৫ জন ও প্রতিনিধি-সভায় দুই বৎসরের জন্য ৩০ জন নির্ব্বাচিত হন। দুই বৎসর অন্তর ৬০ দিন ধরিয়া একবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। এই স্থানের মোট আয়তন ৬,৪৪৯ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা (১৯২৯) ৩,৫৭,৬৪৯—তন্মধ্যে হাওয়াইয়ান ২০,৪৭৯ জন ও অর্দ্ধ হাওয়াইয়ান ২৭,২৮৫ জন, চীনা ২৫,২১১ জন, জাপানী ১,৩৭,৪০৭ জন, পর্ত্তুগীজ ২৯,৭১৭ জন, ফিলিপিনো ৫৩,৮৬৯ জন ও আমেরিকান্, বৃটিশ, জার্ম্মাণ, রুশিয়ান একত্রে ৩৮,০০৬ জন। (২) হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।

এই গেল উন-রাষ্ট্রদ্বয়ের কথা। কিন্তু ইহা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত কতকগুলি দেশ আছে যেগুলি রাষ্ট্র বা উন-রাষ্ট্র নহে। সেগুলিকে অধিকৃত দেশ বলাই যুক্তিসঙ্গত। এগুলির কথা সংক্ষেপে নীচে বিবৃত করা যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত দেশসমূহ:

১৮৯৮ সনের সন্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের নিকট হইতে পোর্টো রিকো পায়। ইহার অধিবাসিগণকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা একজন শাসক নিযুক্ত করেন। বেতন ১০,০০০ ডলার। শাসকের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। উহা ৬টি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের লইয়া গঠিত। রাষ্ট্র-সভায় ১৯ জন ও প্রতিনিধি-সভায় ৩৯ জন প্রেরিত হন। জনগণ চারি বৎসরের জন্য একজন কমিশনার নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে; ইনি পোর্টো রিকোর প্রতিনিধিরূপে মহাসমিতিতে প্রেরিত হন। এই দ্বীপের আয়তন ৩,৪৩৫ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১২,৯৯,৮০৯ (১৯২০ সন),—তন্মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ৯,৪৮,৭০৯; কৃষ্ণাঙ্গ ৪৯,২৪৬ ও মিশ্রিত (মুলোটা) ৩,০১,৮১৬। বলা বাহুল্য, এই জনপদ যদি উন-রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলে ইহার রাষ্ট্রত্ব প্রার্থনার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হইত না, যদিও শিক্ষাদীক্ষায় এখানকার অধিবাসীরা পশ্চাৎপদ। (১) পোর্টো রিকো।

পূর্ব্বে যে অঞ্চল দিনেমার পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা যুক্তরাষ্ট্র ২½ কোটি ডলার দিয়া ডেন্মার্কের নিকট হইতে কিনিয়া লয় (ডিসেম্বর ১৯১৬)। তাহাই এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। ১৯১৭ সনের মার্চ্চ মাসে মহাসমিতি এক আইন পাশ করিয়া সমুদায় সামরিক, অসামরিক ও বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতা একজন শাসকের হাতে অর্পণ করে। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ মত নিযুক্ত হন। দ্বীপপুঞ্জ দুইটি মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভক্ত: (১) সেণ্ট টমাস ও সেণ্ট জন মিউনিসিপ্যালিটি, (২) সাঁ ক্রোয়া মিউনিসিপ্যালিটি। প্রত্যেকের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা ঔপনিবেশিক পরামর্শ সভায় (কলোনিয়েল কাউন্সিল) ন্যস্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ১৩ জন ও শাসক কর্ত্তৃক মনোনীত ৫ জন আছেন; আর প্রথমোক্তটিতে জনগণ ১১ জন ও শাসক ৪ জন পাঠান। সভ্যদের মেয়াদ ৪ বৎসর। ১৯২৭ সনে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জবাসিগণকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব দান করা হইয়াছে। ৮টি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের লইয়া মন্ত্রি-সমিতি গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ১৩২ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা (১৯২৬) ২০,৭২৮।

(২) ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ।

স্পেন ১৮৯৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রকে সন্ধি অনুযায়ী গুয়াম্ দ্বীপ অর্পণ করে। ইহা একটী নৌ-ষ্টেশন। এখান হইতে কয়লা ভরিয়া লওয়া হয়। রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক একজন নৌ-কর্ম্মচারী শাসকরূপে নিযুক্ত হন। এই স্থানের আয়তন ২১০ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা (১৯২৯) ১৮,৬২০।

(৩) গুয়াম্ দ্বীপ।

বর্ত্তমানে টুটুলিয়া, টা'ও, ওফু, ওলোসেগা ইত্যাদি ও সোয়েন দ্বীপ লইয়া যুক্তরাষ্ট্র শাসিত সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। এই ভূভাগের আয়তন ৬০ বর্গ মাইল ও ১৯২৬ সনের লোক সংখ্যা ৮,৭৬০। এই দ্বীপপুঞ্জও নৌ-ষ্টেশন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা ইহার নৌ-সেনাপতিকে ইহার প্রধান শাসকরূপে নিযুক্ত করেন। ইনি কর্ম্মচারী নিয়োগ ও আইনাদি প্রণয়ন করিয়া থাকেন। দ্বীপপুঞ্জ তিনটি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া শাসক থাকেন।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সম্পর্কের কথা প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে। ইহাতে ৭,০৮৩টি দ্বীপ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহার আয়তন ১২৮,০০০ বর্গ মাইল, কিন্তু ৪৫০র অধিক দ্বীপের আয়তন মাত্র এক বর্গ মাইল বা কিছু বেশী। লোক সংখ্যা (১৯১৮) এক কোটির কিছু উপর। এই দ্বীপসমূহ মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসে, ইহা স্পেন যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করে। এই স্থানের শাসনের জন্য একজন গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত আছেন। ইনি রাষ্ট্র-সভার পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসন-বিভাগের ছয় জন সহকারী থাকেন। তন্মধ্যে রাষ্ট্র-নেতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সহকারী শাসক (ইনি শিক্ষা-বিভাগের সহকারীও বটে) ব্যতীত অন্য পদগুলিতে শুধু ফিলিপিনোদের নিযুক্ত করিতে হয়। মন্ত্রি-সমিতির সভ্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের বক্তব্য বলিতে পারেন। ফিলিপাইনের রাষ্ট্র-সভায় ২৪ জন ও প্রতিনিধি-সভায় ৯৪ জন সভ্য আছেন। রাষ্ট্র-সভার

(৫) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

দুই জন ও প্রতিনিধি-সভার নয় জন সভ্য ব্যতীত অন্য সকলে জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৮ ও ১৯২৮ সনের অনুশাসনের ফলে একটি পরামর্শ-সভা (কাউন্সেল অব্ ষ্টেট) মোতায়েন হইয়াছে,—গবর্ণর জেনারেল উহার সভাপতি এবং তাঁহাকে ও নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া ইহা গঠিত: ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভাপতিদ্বয়, উভয় শাখার অভিজন দল বা দলসমূহের নেতৃগণ, ছয়টি বিভাগের সহকারিগণ। ইহার কাজ হইল গবর্ণর জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়া ও তাঁহার সহিত ব্যবস্থাপক সভার যোগাযোগ স্থাপন করা। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ৩৭টি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রদেশে ও ১১টি বিশেষ প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশের একজন করিয়া শাসক আছেন। প্রথম ৩৭টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত শাসক ও দুই জন সভ্য লইয়া আইন-প্রণয়ন বিভাগ গঠিত। আর বিশেষ প্রদেশগুলির ৫টিতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন, একজন সভ্য জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত ও অন্য একজন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। ইঁহারা আইন-প্রণয়নের কার্য্য চালান।

(৬) ক্যানাল জোন।

পানামা খালের মুখে ৪৭৪ বর্গ মাইল একখণ্ড জমি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে রহিয়াছে। ইহা সমর-বিভাগ কর্তৃক শাসিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়

বিচারালয়ের শ্রেণী-ভেদ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কতকগুলি যৌথরাষ্ট্র-সম্পর্কিত, (২) অন্য কতকগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্র-সম্পর্কিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ যৌথরাষ্ট্রে পরিণত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটিতে বিচারকার্য্য চালাইবার জন্য বিচারালয়সমূহ মোতায়েন ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্র হইবার পর উহার জন্য পৃথক্ এক শ্রেণীর বিচারালয় সৃষ্টি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের তৃতীয় ধারায় এ বিষয়ে বিধি সন্নিবিষ্ট আছে।

উপরোক্ত ধারার প্রথম পল্লবের প্রথমাংশে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা আছে যে "যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতা একটি উচ্চতম বিচারালয়ে সমর্পিত থাকিবে," কিন্তু উহার নিম্নতন যে সকল বিচারালয়ে ঐ ক্ষমতা অর্পিত আছে সেগুলির বিচারক-সংখ্যা কত হইবে তাহা বলা হয় নাই। এই প্রকার নিম্নতন আদালতসমূহ বিভিন্ন সময়ে স্থাপন করিবার ক্ষমতা মহা-সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে। মহাসমিতি ১৭৮৯ সনে এক আইন পাশ করিয়া বিভিন্ন যৌথরাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ খাড়া করে। তারপর এই আইনের বহুবার সংশোধন হয়। ১৯১১ সনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত এক আইন প্রচলিত করা হয়। এক্ষণে যৌথরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা বলিতে নিম্নলিখিত বিচারালয়সমূহ বুঝায়:

যৌথ-রাষ্ট্রের বিচারালয়-সমূহ:

(১) যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়

(২) ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালতসমূহ (সার্কিট্ কোর্ট অব্ এপিল্‌স্)

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আদালত

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আপীল আদালত

(৫) দাবী আদালত (কোর্ট অব্ ক্লেইম্স্)

(৬) জিলা আদালতসমূহ

(১) যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়।

উচ্চতম বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার ৯ জন সহযোগী আছেন। এই দশজনের প্রত্যেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভার সম্মতিক্রমে রাষ্ট্র-নেতা কর্তৃক নিযুক্ত হন। উচ্চতম বিচারালয় ওয়াশিংটনে সাধারণত অক্টোবর হইতে মে মাস অবধি বসে। ইহা নিজেই নিজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন স্থির করে। প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয় সমুদায় বিচারকগণ দুইবার করিয়া আলোচনা করেন। প্রথমবারে অতিজনের মতামত নির্ণয় করা হয়, তাহা রায়রূপে লিখিত হইলে পর দ্বিতীয় বারে সমালোচনার পর বিচারালয় কর্তৃক অবলম্বিত রায় বাহির করিবার পালা। রায় লিখিবার ভার অবশ্য একজন বিচারকের উপর দেওয়া হয়। উচ্চতম বিচারালয় দুই বা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, কারণ বিচারকগণের অতিজন ভিন্ন কোন প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না,—এ সম্বন্ধে আইনের নিষেধ রহিয়াছে। সাধারণত ব্যবহারজীবিগণ মুখে মুখে ওকালতি করিয়া থাকেন, তবে বিচারকদের পড়িবার জন্য তাঁহারা মোকদ্দমার সার-লিপি (ব্রীফ্)ও দাখিল করেন। বিচারকদের সিদ্ধান্ত ভোট দ্বারা স্থির হয়।

উচ্চতম বিচারালয়ে নিম্নলিখিত তিন প্রকারে কোন মোকদ্দমা আনা যাইতে পারে: (ক) একেবারেই তথায় মোকদ্দমা করিয়া (এগুলির সংখ্যা কম), (খ) রাষ্ট্রীয় কোন বিচারালয় হইতে, (গ) নিম্নতন যৌথরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে। রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে উচ্চতম বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনার দৃষ্টান্তই অধিক। যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নতন হইতে উচ্চতম বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমা আনিতে হইলে ভ্রমের পরোয়ানা (রিট অব্ এরার) দাখিল করা হয়।

প্রধান বিচারপতি বাৎসরিক ২০,৫০০ ডলার ও তাঁহার সহযোগিগণ প্রত্যেকে বাৎসরিক ২০,০০০ ডলার করিয়া বেতন পান।

(২) ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালতসমূহ।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের নীচেই ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালতসমূহ অবস্থিত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে ১০টি সার্কিট বা চক্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার ৯জন সহযোগী—প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া চক্র ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক চক্রে একটি ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালত আছে। প্রধান বিচারপতি বা তাঁহার সহযোগীদের একজনের কর্তৃত্বাধীনে এই সব আদালতে কাজের পরিমাণ অনুসারে দুই হইতে চারিজন পর্য্যন্ত বিচারক নিযুক্ত হন,—উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকেরা নিজেরা গিয়া বিভিন্ন চক্রে বসেন না। যৌথরাষ্ট্রীয় নিম্নতন জিলা আদালত হইতে কোন মোকদ্দমা ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালতে বা উচ্চতম আদালতে আনীত হয়। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের সহিত সংঘর্ষ ঘটে না, সেখানে অনেক সময় কোন কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ভ্রাম্যমান্ আপীল আদালতে হইয়া যায়।

(৩) জিলা বিচারালয়সমূহ।

যৌথরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বিচারালয় হইতেছে জিলা বিচারালয়সমূহ। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে ৯৪টি জিলায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক জিলায় ১টি করিয়া আদালত আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে ও ঊন-রাষ্ট্রে অন্তত একটি জিলা আদালত থাকে ; যেখানে লোক-

ংখ্যা বেশী সেখানে দুই বা ততোঽধিক জিলা আদালতও দেখা যায়। যথা, নিউ ইয়র্ক াষ্ট্রে চারিটি যৌথ জিলা আদালত মোতায়েন রহিয়াছে। প্রত্যেক জিলায় একজন বিচারক াছেন, অন্য কতকগুলিতে একের অধিক বিচারক থাকেন, আরও অন্য কতকগুলির বিচারক ন্য বিচারালয়েও বসিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের জিলা আদালতসমূহ ফৌজদারি মোকদ্দমাও ম্পন্ন করে। এগুলি আপীল আদালত নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার সহযোগীদের ন্যায় ভ্রাম্যমান্ বা জিলা আদালত-মূহের বিচারকগণও রাষ্ট্র-নেতা কর্তৃক রাষ্ট্র-সভার সম্মতিতে নিযুক্ত হইবেন কি না, যুক্তরাষ্ট্রের াঠামো-আইনে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু উক্ত আইনের ঐরূপ উদ্দেশ্য ছিল ধরিয়া ইয়া তদনুসারে নিয়োগ হইয়া থাকে।

(৪) দাবী আদালত।

যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নতন আদালত সৃষ্টির যে ক্ষমতা আছে, তাহা খাটাইয়া মহাসমিতি বাকী য়েকটি আদালত মোতায়েন করিয়াছে। ইহাদের একটির নাম দাবী আদালত। যুক্তরাষ্ট্রের রুদ্ধে কোন ব্যক্তির কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে তাহা এই আদালতে শুনা হয়। হার জন্য একজন প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার চারিজন সহকারী নিযুক্ত আছেন। এই াদালত হইতে উচ্চতম আদালতে আপীল করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে।

(৫) ও (৬) শুল্ক আদালত ও শুল্ক আপীল আদালত।

এই শ্রেণীর অন্য দুইটি আদালত হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আদালত ও শুল্ক আপীল াদালত। নামেই বুঝা যাইতেছে শুল্ক বা ট্যারিফ্ সম্বন্ধে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে তাহা ই বিচারালয়ে বিচারিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। প্রথমোক্ত আদালত হইতে দ্বিতীয় াদালতে আপীল চলে। দ্বিতীয়টি ১৯০৯ সনে ট্যারিফ্ আইন অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। হাতে একজন বিচারক নেতৃত্ব করেন ও তাঁহার চারি জন সহকারী থাকেন।

তৃতীয় ধারার প্রথম পল্লবের শেষাংশে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণ কতকাল নিযুক্ত থাকিবেন া বিষয়ে নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের বেতনের কথাও বলা হইয়াছে। চারকগণ যত দিন সৎস্বভাবশীল (অব্ গুড্ বিহেভিয়ার) থাকিবেন, ততদিন বিচারকের পদে াসীন থাকিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন প্রণেতাদের অভিলাষ এই ছিল যে, ক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণকে তাঁহাদের পদ ও বেতনের জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে না হয়, াহারা স্বাধীনভাবে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহাদের কার্য্যের ন্য কোন বয়সের সীমা রাখা হয় নাই অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিলে তাঁহারা ার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন এবং মহাসমিতি এ বিষয়ে কোন নিয়ম করিলে াহা কাঠামো-আইনের বিরোধী হইবে। কোন কোন বিচারক ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বিচার-ার্য্য চালাইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। সমর্থ থাকিলে কোন বিচারকের আমরণ পর্য্যন্ত বচারালয়ে অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব নহে। যৌথরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহের বিচারকদের সম্বন্ধে ারো একটি ব্যবস্থা এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেতন পাইবেন, কন্তু যে বেতনে তাঁহারা নিযুক্ত হন যতদিন ঐ পদে বাহাল থাকেন ততদিন তাহা কোনপ্রকারে মানো চলে না। যথা, দেশে কোন আয়-কর প্রচলিত হইলে তজ্জন্য বিচারকদের বেতন ইতে কর হিসাবে কিছুই কাটিতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদের বেতন

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণের বেতন ও কার্য্যকাল।

বাড়ানো সম্ভবপর, কারণ সে দিকে কোন বিধি-নিষেধ নাই। বিচারকদের প্রতি এই ব্যবস্থা পক্ষপাতিতামূলক মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত ইহার উদ্দেশ্য—তাঁহাদের অন্য কোন প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচার-কার্য্য করিতে দেওয়া।

যৌথরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে ইহার যে সকল ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে, তাহা ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর অর্পিত আছে। এই ক্ষমতাসমূহ এক্ষণে একে একে বিবৃত করা যাইতেছে। এগুলি তৃতীয় ধারার দ্বিতীয় পল্লবে সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম উপপল্লবে সাধারণভাবে কোন্ কোন্ বিষয়ে যৌথ বিচারালয়সমূহ বিচার করিতে সমর্থ, দ্বিতীয় উপপল্লবে উচ্চতম বিচারালয়ে কোন্ প্রকার মোকদ্দমার বিচার হয় এবং তৃতীয় উপপল্লবে জুরীর বিচার ব্যবস্থা কিরূপ তাহা বর্ণিত আছে।

যৌথ বিচারালয়ের ক্ষমতা :

যৌথ বিচারালয়সমূহ নিম্নলিখিত বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ :

(১) কাঠামো আইন, ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন, ও সন্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে।

(১) যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন, উহার ব্যবস্থাপক-সভা প্রণীত আইন ও উহার কর্তৃত্বাধীন সন্ধি ইত্যাদি দ্বারা অনুশাসিত আইন বা শাশ্বত ন্যায় (ইকুইটি) ঘটিত মোকদ্দমাসমূহে। আইন তিন প্রকারের—(১) কাঠামো-আইন, (২) ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন, (৩) সাধারণ আইন (কমন ল)। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন, উহার সংশোধনীসমূহ, এবং উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত বিচারালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ,—এইগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার আইনের স্থান যে অন্য সকল প্রকার আইনের উপরে তাহা বলিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন বলিতে যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতি ও উহার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহকে বুঝায়। কোন কোন রাষ্ট্রে জনগণ সাক্ষাৎভাবে প্রত্যুপস্থাপন ও অভিনয়ন দ্বারাও এইরূপ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রণীত আইনও ইহার অন্তর্গত। কাঠামো-আইন ও ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন তৈরী করা হয়, কিন্তু সাধারণ আইন বহুকাল প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির সমষ্টি মাত্র। বিভিন্ন আদালতসমূহ কোন কোন মোকদ্দমা চালাইবার কালে নূতন ঘটনা সন্নিবেশে যে নিয়মাবলী পালন করিয়া থাকে তাহাই শাশ্বত ন্যায়; এগুলি বিচারকদের বিচারবুদ্ধি খাটাইবার ফল হইলেও, ক্রমে ক্রমে একটা স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে।

যৌথরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সকলের উপরে। সেজন্য উহার কাঠামো-আইন বা উহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইনকে সকল রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে তাহা দেখিবার ভার যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়ের উপর দিতে হয়, এ ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে দেওয়া চলে না। কোন সন্ধি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবার পর উহার রাষ্ট্র-সভা কর্তৃক মঞ্জুর হইলে উহা যুক্তরাষ্ট্রের আইনরূপে পরিণত হয়। যৌথরাষ্ট্রের কর্ম্মচারিগণ উহার লঙ্ঘনকারিদের শাস্তি দিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করিয়া কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন, উহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন ও সন্ধি সম্পর্কিত ব্যবস্থার প্রয়োগ বা ব্যাখ্যা লইয়া যখনই মতভেদ হয় তখনই তাহা বিচারের জন্য যৌথরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহে প্রেরিত হইতে পারে। বাদী ইচ্ছা করিলে কোন যৌথরাষ্ট্রের

বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনিতে পারে। অথবা প্রতিবাদী তাহা রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে তুলিয়া যৌথরাষ্ট্রের বিচারালয়ে লইতে পারে। কাঠামো-আইন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন ও সন্ধি সম্পর্কিত আইনসমূহ লঙ্ঘিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম যৌথ বিচারালয়ের আছে তাহা নহে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য যৌথ বিচারালয়েরও আছে। অবশ্য এইরূপ অধস্তন যৌথ বিচারালয়ের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতম যৌথ বিচারালয়ে আপীল করিবার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় না। রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম যৌথ বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য নিম্নলিখিত কারণে আসিতে পারে: (ক) যুক্তরাষ্ট্র কৃত কোন সন্ধি, ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবার পর রাষ্ট্রীয় বিচারালয় বিরুদ্ধ রায় দিলে; (খ) যুক্ত-রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন, সন্ধি-আইন ইত্যাদি ভঙ্গ করিয়া কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন বা অন্য ক্ষমতার স্বপক্ষে উহার রাষ্ট্রীয় বিচারালয় মত দিলে; (গ) পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন, সন্ধি, ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন বা অন্য ক্ষমতার বলে কোন অধিকার, সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি দাবী করার পর রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিলে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও প্রমাণ করা আবশ্যক যে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে প্রকৃতই কোন বিচারের কালে যুক্তরাষ্ট্রের কোন ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হইয়াছে,—লঙ্ঘনের সম্ভাবনা হইয়াছিল বলিলে যথেষ্ট হইবে না। আর রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ইত্যাদি আছে বলিয়া অনুকূল মত দেওয়া হয় সে মোকদ্দমা যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়ে পাঠানো চলে না। এই নিয়মের মূল কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কোন বিশেষ বিষয়ে অধিকার-রক্ষাসূচক রায় দিবার সম্ভাবনা থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে বলিয়া উহা আর রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় না।

(২) রাষ্ট্রদূত বাণিজ্য-দূত ইত্যাদির সম্পর্কে

(২) অন্য দেশের রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যদূত ইত্যাদির সম্পর্কিত সকল মোকদ্দমায়। আন্ত-র্জাতিক আইনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রদূত ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত অন্য কর্মচারিগণ যে যে স্থানে প্রেরিত হন, সেগুলিতে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা ভোগ করেন; যথা দেওয়ানি মোকদ্দমায় তাঁহাদিগকে ধরিয়া চালান দেওয়া যায় না; স্থানীয় পুলিশ কর্মচারিগণ তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের খানাতল্লাস করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদের চিঠিপত্র খোলা নিষিদ্ধ, তাঁহাদিগকে কোন কর দিতে হয় না, ইত্যাদি। কোন রাষ্ট্রীয় বিচারালয় যাহাতে তাঁহাদের এই সকল সুবিধায় না বাধা দেয়, সেজন্য কাঠামো-আইনে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার ভার যৌথরাষ্ট্রের বিচারালয়ের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

(৩) সামুদ্রিক এলাকা সম্পর্কে।

(৩) সামুদ্রিক (এডমিরালিটি ও মেরিটাইম্) এলাকাভুক্ত সমুদায় মোকদ্দমায়। স্বাধীন দেশসমূহে সমুদ্রে নৌ-চালনা ও বাণিজ্যসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা সামুদ্রিক আইন অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রকারের চুক্তি প্রভৃতি ভঙ্গজনিত মোকদ্দমার বিচারের ভার যৌথরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহের উপর ন্যস্ত আছে। যে সকল নদনদী ও হ্রদে জাহাজ চালনা সম্ভবপর, সেগুলি বাণিজ্য ও সামুদ্রিক আইন দ্বারা শাসিত হয়।

(৪) যে সকল মোকদ্দমায় যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যতর পক্ষরূপে যুঝিতে হয়। যৌথ বিচারালয়ে

(৪) কোন মোকদ্দমায় যুক্তরাষ্ট্র বাদী বা প্রতিবাদী হইলে।

আনীত কোন মোকদ্দমায় যুক্তরাষ্ট্র বাদীও হইতে পারে, প্রতিবাদীও হইতে পারে। নিজ এলাকাভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা যৌথ বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের আছে। যৌথ বিচারালয়ে উহা ব্যক্তি বা সমিতির বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা আনিতে পারে। যেমন, কর দিতে গাফেলি করিলে যুক্তরাষ্ট্র সেই ব্যক্তি বা সমিতির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে চাহিলে, তাহা যৌথ বিচারালয়ে আনিতেই হইবে, কোন রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে আনা চলে না। তারপর যে কোন ব্যক্তি বা সমিতি যে ইচ্ছা করিলেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনিতে পারে, তাহাও নহে। এই মোকদ্দমা আনিবার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ এই যে, যৌথরাষ্ট্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব অর্পিত আছে। সর্ব্বকর্তৃত্বশীল রাষ্ট্র যতক্ষণ না নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করে, ততক্ষণ উহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বলা বাহুল্য, বহু ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র ঐ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া নিজের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে দেয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বলিয়া সে মোকদ্দমা কোন রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে আনা চলে না।

(৫) (ক) দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে, (খ) কোন রাষ্ট্র ও অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের মধ্যে, (গ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের মধ্যে, (ঘ) বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জমির দাবীদার একই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের মধ্যে, (ঙ) কোন রাষ্ট্রের বা তাহার রাষ্ট্রিকগণের এবং বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের বা তাহাদের রাষ্ট্রিকগণের অথবা প্রজাগণের মধ্যে, পরস্পর মোকদ্দমায়। উপরোক্ত মোকদ্দমাসমূহ রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের হাতে অর্পিত থাকিলে নিরপেক্ষ বিচার হইত না বলিয়া আশঙ্কা ছিল। সেজন্য বাদী ও প্রতিবাদীর সহিত একেবারে সম্পর্করহিত এক কর্তৃপক্ষের হাতে বিচার-ভার অর্পিত হইয়াছিল। উপযুক্ত বিচারালয়ের হাতে এই সব মোকদ্দমা অর্পণ করার ফলে, শুধু যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণই বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ বিষয়ে সুবিচার পাইয়াছে, তাহা নহে, বিদেশী রাষ্ট্রও যখন জানিতে পারে যে স্থানীয় বিচারকগণ পূর্ব্ব-সংস্কার বশে কোন আইনগত অধিকার স্থির করিতেছেন না, কিন্তু নিরপেক্ষ যৌথ বিচারকগণ করিতেছেন, তখন সেই সব রাষ্ট্রও অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৫) (ক) দুই রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদে ;

(ক) দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে কোন পক্ষ বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এইরূপে নিষ্পত্তির উপায় না থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া যাইতে পারে। এক্ষণে অবশ্য সেরূপ সম্ভাবনা বিরল, কিন্তু ১৭৮৭ সনে বহু রাষ্ট্রের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া এরূপ বিবাদ চলিতেছিল যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থার স্থায়ী প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা হয় যে, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহার মীমাংসা করিবার ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের থাকিবে। শুধু তাই নয়। ইহার পরবর্ত্তী উপপল্লবে এই ক্ষমতা শুধু যৌথরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের হাতেই অর্পণ করা হইয়াছে।

(খ) কোন রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের সহিত বিবাদে

(খ) কাঠামো-আইনের এই অংশটি দ্ব্যর্থবোধক থাকায় অনেক গণ্ডগোলের উৎপত্তি হইয়াছে। কাঠামো-আইন প্রণেতাগণের উদ্দেশ্য ছিল, কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের

বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিলে তাহার মীমাংসা যৌথ বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু বস্তুত উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যৌথ বিচারালয়ে কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের পক্ষেও অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিবার কোন বাধা নাই। ১৭৯৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ে এই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল (চিজ্‌হোল্ম বনাম জর্জিয়া রাষ্ট্র)। কিন্তু বিচার-ফল বাহির হইবামাত্র রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব বিনষ্ট হইল বলিয়া জর্জিয়ায় আন্দোলন আরম্ভ হয় ও অন্যান্য রাষ্ট্রও তাহাতে যোগ দেয়। ফলে মহাসমিতি অনুরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব আনিতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র উহা তাড়াতাড়ি মঞ্জুর করিলে উহাই একাদশ সংশোধনীতে পরিণত হইয়াছে। এই সংশোধনীর ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের বিরুদ্ধে যৌথ বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনিতে পারে বটে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণ অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐরূপে কোন মোকদ্দমা আনিতে পারে না। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের অন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহার মীমাংসা করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নাই। এরূপ ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রিকগণকে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক বা প্রজাগণও শুধু রাষ্ট্রীয় বিচারালয়েই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে পারেন। সুতরাং উত্তর ডাকোটার কোন রাষ্ট্রিক যদি দক্ষিণ ডাকোটার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে চায় ত তাহাকে দক্ষিণ ডাকোটার আদালতে সেই মোকদ্দমা আনিতে হইবে; কিন্তু দক্ষিণ ডাকোটায় যদি ঐরূপ মোকদ্দমা আনিবার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সে ব্যক্তিকে দক্ষিণ ডাকোটার ব্যবস্থাপক সভার নিকট নিজ নালিশ পেশ করিতে হইবে।

(গ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের পরস্পর বিবাদে ;

(গ) আশঙ্কা ছিল যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণ পরস্পর বিবাদ করিলে, তাহা বিচার করিবার ভার শুধু বাদী বা প্রতিবাদীর রাষ্ট্রের বিচারালয়ের উপর দিলে ন্যায্য বিচার নাও হইতে পারে। বাদী ও প্রতিবাদীর সহিত সম্পর্করহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহে এ বিষয়ে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই আইনের এরূপ অর্থ নয় যে, এই প্রকার মোকদ্দমার মীমাংসা করিবার ক্ষমতা একমাত্র যৌথরাষ্ট্রেরই আছে। মহাসমিতি স্থির করিয়া দিতে পারে নিম্নতন যৌথ বিচারালয়সমূহের এলাকা কতদূর পর্য্যন্ত থাকিবে, আর এইরূপ আইন করা হইয়াছে যে, যদি কোন যৌথরাষ্ট্র ঘটিত প্রশ্ন না উঠে ও মোকদ্দমায় অর্থের পরিমাণ ২,৫০০ ডলারের অনধিক হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের মধ্যে মোকদ্দমার মীমাংসা রাষ্ট্রীয় বিচারালয়েই হইবে। অর্থের পরিমাণ ২,৫০০ ডলারের বেশী হইলেও বাদী যৌথ বিচারালয়ে অথবা নিজ রাষ্ট্রের বিচারালয়ে অথবা প্রতিবাদীর রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনিতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি বলিতে সমিতি, সঙ্ঘ ইত্যাদিকেও বুঝায়।

(ঘ) জমি লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের মধ্যে বিবাদে ;

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন যে সময়ে অবলম্বিত হয়, সে সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানা চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়া যায় নাই। বহু ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র কোন কোন স্থান নিজেদের বলিয়া দাবী করিত এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র এইরূপ সীমানায় অবস্থিত জমি নিজ প্রজাদের বিলি করিত। ফলে একই জমির জন্য দুই বা ততোধিক দাবীদার উপস্থিত হইত। এই প্রকার বিবাদ-নিষ্পত্তির ভার যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিচারালয়ের হাতে দেওয়া হইয়াছিল।

(ঙ) পূর্ব্বেই বলিয়াছি একাদশ সংশোধনীর ফলে বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক বা প্রজাগণ

(৬) রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিকের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রিকের বিবাদে।

যৌথ আদালতে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিতে পারে না। কিন্তু সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকের বিরুদ্ধে এইরূপ মোকদ্দমা আনিবার কোন বাধা নাই। অধিকন্তু কোন বিদেশী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও যৌথ বিচারালয়ে আনিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক বা প্রজার বিরুদ্ধে কোন যৌথ বিচারালয়ে মোকদ্দমা আনাও সম্ভবপর।

যৌথ রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের ক্ষমতা নিম্নরূপ :

উচ্চতম যৌথ বিচারালয়ের ক্ষমতা।

(১) রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যদূত ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল মোকদ্দমায় উচ্চতম বিচারালয়ের প্রাথমিক (অরিজিন্যাল) বিচার-ক্ষমতা রহিয়াছে। এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্র বিবাদে লিপ্ত হইলে সে মোকদ্দমাও উচ্চতম বিচারালয়ের প্রাথমিক বিভাগে নিষ্পন্ন হয়।

(২) অন্য সমুদায় ক্ষেত্রে উচ্চতম বিচারালয় নিম্নতন যৌথ বিচারালয় অথবা স্থলবিশেষে রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে আনীত মোকদ্দমার আপীল শুনিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা একমাত্র যৌথ বিচারালয়ের আছে, অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ বিচারালয় উভয়েই এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী। কিন্তু কাঠামো-আইনে এ বিষয়ে নির্দেশ এই আছে যে, আইন ও ঘটনা সম্পর্কে আপীল শুনিবার ক্ষমতা উচ্চতম বিচারালয়ের থাকিলেও, মহাসমিতি বিধিনিষেধ দ্বারা ব্যতিক্রম করিতে পারে। তাই বলিয়া যেখানে রাষ্ট্রীয় বিচারকগণ যৌথরাষ্ট্রের বিচারকগণের সহিত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, সেখানে ঐ ক্ষমতা মহাসমিতি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ রাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহের উপর মহাসমিতি কোন কর্তৃত্ব করিতে পারে না, উহাদিগকে কোন ক্ষমতাও প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এই প্রকার ক্ষমতা কাঠামো-আইন-নিরপেক্ষ ক্ষমতা।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আসে তাহার ৯৯% রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে আনীত হয় অথবা নিম্নতন যৌথ বিচারালয়ের বিচার হইতে আপীল।

ফৌজদারি মোকদ্দমায় জুরীর বিচার।

যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র অভ্যভিযোগ ব্যতীত অন্য সকল যৌথরাষ্ট্র সম্পর্কিত ফৌজদারির ক্ষেত্রে জুরীর বিচার প্রচলিত। অভ্যভিযোগের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি (পৃঃ ১০১-১০২)। উহাকেও এক হিসাবে জুরীর বিচাররূপে গণ্য করা চলে। রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণ জুরীর কাজ করেন। কাঠামো-আইনের নির্দেশ মত শুধু ফৌজদারি মোকদ্দমাতেই জুরির বিচার হইতে পারে। সপ্তম সংশোধনীর দ্বারা কোন কোন দেওয়ানি মোকদ্দমায় জুরির বিচার হইয়া থাকে। উক্ত সংশোধনীর মর্ম্ম নিম্নরূপ : (১) কোন যৌথ বিচারালয়ে আনীত দেওয়ানি মোকদ্দমা যদি ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন বা শাশ্বত ন্যায় সম্পর্কিত না হয়, ও মোকদ্দমার বিষয় ২০ ডলারের অধিক হয়, তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদী প্রত্যেকেই জুরীর বিচার চাহিতে পারেন। (২) যে ঘটনা একবার জুরীর বিচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনরায় বিচার করিতে হইলে জুরীর দ্বারা বিচার করাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, দেওয়ানি মোকদ্দমায় জুরীর বিচার বাদী বা প্রতিবাদীর ইচ্ছাগত হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে উভয়েই এই অধিকার ত্যাগ করিতে পারে এবং সাধারণত বহু ক্ষেত্রে তাহাই করে। রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে

জুরীর বিচার প্রচলিত থাকিবে কি না তাহা নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের ফৌজদারি মোকদ্দমায় জুরীর বিচার হয়।

বিচার-স্থানের নির্দেশ।

জুরীর বিচার কোন্ স্থানে নিষ্পন্ন হইবে?—এই প্রশ্নের উত্তরে কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ এই যে, যে রাষ্ট্রে কাজটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই রাষ্ট্রে বিচার হইবে। কিন্তু অপরাধটি যখন কোন রাষ্ট্রেই অনুষ্ঠিত হয় না, তখন মহাসমিতি স্থির করিতে পারে কোন্ স্থানে উহার বিচার হইবে। শুধু জুরীর বিচার প্রচলিত করাই যথেষ্ট নয়। যদি অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার স্বস্থান হইতে চ্যুত করিয়া অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে লইয়া জুরীর বিচার হয় তবে সে জুরীর বিচারের আর সার্থকতা থাকে না। সেইজন্য যদি কেহ পেনসিলভেনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করে ত তাহার বিচার উক্ত রাষ্ট্রের যৌথ-বিচারালয়ে হইবে, অন্যত্র হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু কলম্বিয়া জিলায়, কোন উন-রাষ্ট্রে, অধিকৃত দেশে, ক্যানাল জোনে বা সমুদ্রের উপর কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে, মহাসমিতির বিচার-স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের তৃতীয় ধারার তৃতীয় বা শেষ পল্লব দুইটি উপপল্লবে বিভক্ত। প্রথমটিতে মহাদ্রোহ (ট্রিজন) কাহাকে বলে ও তাহার জন্য কি প্রকার শাস্তি বাঞ্ছনীয় তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে কাহার শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে ও সে ক্ষমতা কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে তাহা আছে।

মহাদ্রোহ কাহাকে বলে?

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন প্রণেতাগণ মহাদ্রোহের অর্থ বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে, এইরূপে বাঁধিয়া না দিলে উহা ক্রমাগত বিস্তৃত হইবে ও জনগণের কোন কোন অধিকারকে খর্ব্ব করিবে। সেইজন্য তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট অপরাধের নামই মহাদ্রোহ দিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, উহার শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করা, তাহাদিগকে সাহায্যাদি দেওয়া হইল মহাদ্রোহ। রাষ্ট্র-নেতা আরন বুর (১৮০৭) এর বেলায় ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে না, কিন্তু যুদ্ধ করা, শত্রুর পক্ষাবলম্বন করা বা তাহার সাহায্য করা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কাজ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ থাকা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সাহায্য বলিতে শুধু সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া যুদ্ধ করা বা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের রসদ্ ও অন্যান্য মাল যোগানো বুঝায় না,—শত্রুদের কাজে লাগিতে পারে এমন বর্ণনা বা সংবাদ প্রকাশও বুঝায়। দ্রোহজনক কাজ যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় বা বাহিরে অনুষ্ঠিত হোক্ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে উহার কোন রাষ্ট্রিক বা অরাষ্ট্রিক করুক, তাহার শাস্তির ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র করিতে পারে। কিন্তু মহাদ্রোহীর প্রতি যাহাতে সুবিচার করা হয়, যাহাতে একটিমাত্র সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া অথবা ভয় প্রদর্শন বা জোর করিয়া তাহার নিকট স্বীকারোক্তি লইয়া তাহার শাস্তি না হয় সেজন্য কাঠামো-আইনে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে মহাদ্রোহীর অপরাধজনক প্রকাশ্য কাজের জন্য অন্তত দুই জন সাক্ষীর প্রয়োজন অথবা তাহার স্বীকারোক্তি প্রকাশ্যভাবে আদালতে হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্ব-ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে স্বীকারোক্তি করিতে দিতে হয়। মহাদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কোন অসামরিক কর্ম্মচারী হইলে তাঁহার বিচার অত্যভিযোগ দ্বারা হইতে পারে। নচেৎ জুরীর বিচার হইয়া থাকে।

মহাদ্রোহের শাস্তি।

মহাদ্রোহীর শাস্তি সম্বন্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাসমিতি নির্দ্দেশ করিতে পারে কি প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে। প্রথমে এরূপ ক্ষেত্রে শুধু বৈদ্যুতিক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। পরে এরূপ দণ্ড বা কোন কোন সময়ে উহার পরিবর্ত্তে কয়েদের ও জরিমানা করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কয়েদ ও জরিমানা হইলে, ঐ ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরী পাইবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তিটা তাহার যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হয়, মহাসমিতি তাহার সন্তান-সন্ততিগণের উপর কোন প্রকার দোষ চাপাইতে সমর্থ নয়, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণদণ্ড বা জরিমানা ও কয়েদ, এবং সম্পত্তির হ্রাস বা বাজেয়াপ্ত শুধু নিজে ভোগ করে।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সহিত অন্যান্য আইনের সংঘর্ষ বাধিলে যৌথ বিচারালয়ে আইনের ব্যাখ্যা হয়।

যৌথরাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহিত উহার যৌথ বিচারালয়সমূহের সম্পর্ক নির্ণয় কালে একথা মনে রাখা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভা সর্ব্বকর্তৃত্বশীল নহে। উহার ক্ষমতা দুই দিক্ হইতে সীমাবদ্ধ। প্রথমত রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন তৈরী করিতে পারে, দ্বিতীয়ত যে সকল বিষয়ে উহা আইন-প্রণয়ন করিতে সক্ষম সে সকল বিষয়েও কোনক্রমে কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। কিন্তু যদি ব্যবস্থাপক সভা এই আইন অমান্য করে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারী ঐরূপ কার্য্য করে, তবে উহার প্রতীকারের একটা উপায় অবশ্যই থাকা উচিত। স্বাধীন ও সভ্য দেশগুলির একটি রীতি এই যে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আইনত তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তাহার অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে, রাষ্ট্রিক যদি মনে করেন তিনি অযথা নিজ ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছেন, তবে রাষ্ট্রিক তাহা ইচ্ছা করিলে না মানিতে পারেন। অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিজে সর্ব্বকর্তৃত্বশীল নহেন এবং তিনি সর্ব্বকর্তৃত্বশীল বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্র বলিয়া উক্ত পার্ল্যামেণ্ট তাঁহাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছে তাহার বাহিরে কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই। তদ্রূপ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাও সর্ব্বকর্তৃত্বশীল নহে; জনগণ নিজেদের হাতেই অর্থাৎ ভোটদাতাগণের হাতে সর্ব্বকর্তৃত্ব রাখিয়া কাঠামো-আইনের সাহায্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা মহাসমিতির উপর অর্পণ করিয়াছে। মহাসমিতি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে যখনই এই ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ করে, তখনই সে আইন অপ্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন এই, মহাসমিতি-প্রণীত আইন কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করিয়াছে কি না এবং করিয়া থাকিলে তাহার প্রতীকারের কি উপায় আছে, তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে?

বিচারালয়ের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা। কোন্ আইনের প্রকৃত অর্থ কি এবং বিভিন্ন অবস্থায় সেই আইনের প্রয়োগ কিরূপভাবে করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা বিচারালয়ের এক প্রকার কাজ। অন্য প্রকার কাজ হইতেছে প্রয়োজন হইলে সে আইনের প্রয়োগ বা উহার উল্লঙ্ঘনে বাধা দান। এই ব্যাখ্যার ভার বিচারালয় ব্যতীত আর কাহারও হাতে দেওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতার হাতে দেওয়া যায় না, কারণ তিনি নিজে ব্যবহার-জীবী না হইতে পারেন, আর কোন পক্ষের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকিতে পারে। মহাসমিতি প্রণীত আইন কাঠামো-আইনকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে কি না তাহা

পরীক্ষা করিবার ভার মহাসমিতিকে দেওয়া হইলে মহাসমিতির পক্ষে নিজের দিকে রায় দেওয়াই স্বাভাবিক। বাকী থাকে বিচারালয়সমূহ। কিন্তু এই গুরুভার কোন রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের হাতেই দেওয়া যায় না, তাহাতে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নহে। সেইজন্য একমাত্র যৌথবিচারালয়সমূহ এই বিষয়ে ভার লইতে পারে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে শুধু উহার কাঠামো-আইন বা মহাসমিতি-প্রণীত আইন সমুদায় আইন নহে। আরো দুই প্রকারের আইন আছে, তাহার একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন বা রাষ্ট্রের জনগণ-প্রণীত আইন, অন্যটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে প্রণীত আইন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহে নিম্নলিখিত চারি প্রকার আইনের প্রতি নজর রাখিয়া বিচার-কার্য্য চালাইতে হয় :

বিভিন্ন আইনের স্থান-নির্দ্দেশ।

১। যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন

২। যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতি-প্রণীত আইন

৩। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনসমূহ

৪। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে প্রণীত আইন

এই চারি প্রকার আইনের মধ্যে যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের স্থান সকলের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ অন্যান্য আইনের সহিত সংঘর্ষ বাধিলে কাঠামো-আইনের মর্য্যাদা আগে রাখিতে হয়। বিচারালয়ে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভায় প্রণীত আইন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন অথবা মহাসমিতি-প্রণীত আইনকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভা-প্রণীত আইন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু এই ঘোষণা শুধু যৌথ বিচারালয় হইতে নহে, রাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতেও হওয়া দরকার। কারণ রাষ্ট্রীয় বিচারালয় নিজ কাঠামো-আইন বা ব্যবস্থাপক-সভা প্রণীত আইনের বিপক্ষে ও যৌথ আইনের স্বপক্ষে মত দিলে উহার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

যৌথ বিচারালয়ের ম্যার্শাল ও

নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌথ বিচারালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মার্শ্যাল নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইনি বিচারালয়ের পরোয়ানা (রিট্), বিচার-ফল ও হুকুম পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। অপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার, শাস্তির আদেশ হইবার পর তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার, কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি বা অর্থ পুনরায় পাওয়াইবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি তাঁহার কাজে বাধা পাইলে সাহায্যের জন্য সংরাষ্ট্রিক মাত্রকেই ডাকিতে পারেন এবং তাহারা তাঁহার সাহায্য না করিলে তিনি ওয়াশিংটন হইতে সেনাদলের সাহায্য পাইবার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-সংক্রান্ত প্রত্যেক জিলায় যুক্তরাষ্ট্রের জিলা এটর্ণি নামে একজন করিয়া সরকারী উকীল মোতায়েন আছেন। ইঁহার কাজ হইল যে সকল ব্যক্তি যৌথ আইন ভঙ্গ করিয়াছে অথবা যৌথ খাজাঞ্চিখানার কর ইত্যাদি বাবদ্ অর্থ দিতেছে না তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা। এই উভয় প্রকার কর্ম্মচারী এটর্ণি-জেনারেলের অধীনে তাঁহার নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহের কর্ম্মচারী ও সরকারী উকীলদের

জিলা এটর্ণি।

সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। কোন রাষ্ট্রে যৌথ বিচারালয়ে দণ্ডিত কয়েদীদের রাখিবার জন্ম জেলের ব্যবস্থা থাকিলে, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল কয়েদীদিগকে রাষ্ট্রীয় জেল-রক্ষকের হাতে অর্পণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে জনগণ ইহা বারে বারে বলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থাতেও সে কথা প্রযোজ্য। যৌথরাষ্ট্রের বিচারকগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য জনগণের মতামত যথাযথভাবে বুঝিয়া তদনুসারে আইনের ব্যাখ্যা করা। এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন স্বাধীনতা নাই। জনগণের ইচ্ছা বা মতামত জানিবার পক্ষে যৌথ বিচারকগণ যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছেন। তাঁহারা ইহা দ্বারাই পরিচালিত হন। তাঁহারা ঐ আইন দেখিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে বুঝিতে চেষ্টা করেন, জনগণের ইচ্ছা কি, ও সেই ইচ্ছা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করেন। কোন আইন-প্রণয়নকালে আইন-প্রণয়নকারীদের কোন মতলব ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা এবং কোন আইন সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গ নহে। মহাসমিতি যদি কোন ভাল আইন পাশ করিতে চায়, অথচ তাহা কাঠামো-আইন বিরুদ্ধ হয়, তবে বিচারকগণ তাহা অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে ইতস্তত করেন না। এক কথায়, বিচারকগণ সর্ব্বপ্রকারে জনগণের প্রকাশিত ইচ্ছা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনকে মানিয়া চলেন।

যৌথ বিচারালয় জনমত মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে।

যৌথ বিচারালয়ের কয়েকটি সুবিধা।

এই ব্যবস্থার কয়েকটি সুবিধা নীচে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে :

(১) বিচারালয়কে কোন কল্পিত সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইতে হয় না, যখন কোন মোকদ্দমায় সে সমস্যা উপস্থিত হয় তখনই সমাধান করিতে হয়। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলে অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীরূপে যুক্তরাষ্ট্র, কোন রাষ্ট্র বা কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের না করিলে, বিচারালয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি ঝোঁকের মাথায় কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, বাদী ও প্রতিবাদিগণ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য ভাল ভাল উকীল নিয়োগ করিতে পারে। এইরূপে বিচার-ফল বাহির হইতে বহু সময় অতিবাহিত হয় ও কোন মোকদ্দমায় উত্তেজনার কারণ থাকিলে তাহা দূর হয়। বিচারালয় সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া রায় দেয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন এক দিকে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেক বিষয়ে জনগণের যথার্থ মতামত বুঝা যেমন কঠিন, অন্য দিকে বিচারকগণ উহা বুঝিবার জন্য নিজেদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা খাটাইবার অবকাশ পাইয়াছেন।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিচারালয়সমূহ দেশস্থ রাজনৈতিক সমস্যার সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারজীবিগণ ঐ দেশের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহারা নিজেদের ব্যবসার উচ্চ আদর্শ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক যৌথ বিচারকের কার্য্য-কলাপের উপর ইঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি রহিয়াছে। বিচারকগণও এমন কাজ করিতে সাহস পান না যাহাতে বিচারালয়ের বদনাম হইবে।

(৫) শাসন-বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিশালী যৌথ বিচার-বিভাগ গঠিত করায় বিচারকগণ যথেষ্ট সুবিচার দেখাইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের কঠোর শাসন সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় এবং সর্ব্বদা উহারই ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার-কার্য্য চালনা করায় যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ বিচারালয়গুলিতে এমন একটি সুদৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ বিচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহা সকল দেশের প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এতক্ষণ যৌথ বিচারালয়সমূহের আলোচনা করা গেল। এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। অবশ্য ৪৮টি রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অল্প পরিসরের মধ্যে সকল কথা সংক্ষেপেও বলা চলে না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন দ্বারা যে সকল ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের হাতে অর্পিত হইয়াছে ও যে সকল ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারালয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ সেগুলি ছাড়া বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক রাষ্ট্র আত্মকর্তৃত্বশীল। তাহার ফলে এ বিষয়ে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের পার্থক্য দেখা যাইবে, তাহা বিচিত্র নহে। তথাপি মূলত ইহাদের মধ্যে একটি ঐক্যের ধারাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ মতে প্রত্যেক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিচারালয়ের বিচার-ব্যবস্থাকে সাধারণত মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে, আর প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসমূহ এক সাধারণ আইনকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রীয় বিচার-বিভাগ বলিতে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়:

(১) সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত,

(২) মধ্যবর্ত্তী আপীল আদালত,

(৩) সাধারণ প্রাথমিক আদালতসমূহ,

(ক) আইন আদালতসমূহ,

(খ) শাশ্বত ন্যায়ের আদালতসমূহ,

(গ) ফৌজদারি আদালতসমূহ,

(ঘ) উইল প্রমাণের (প্রোবেট্) অথবা উপধর্ম্মাধ্যক্ষ (সারোগেট) আদালতসমূহ,

(৪) অধস্তন মধ্যবর্ত্তী আদালতসমূহ,—যেমন কাউন্টি ও মিউনিসিপ্যাল আদালত,

(৫) অপ্রধান আদালতসমূহ, যথা, গ্রামের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত আদালত ও শহরের পুলিশ আদালত।

অধিকাংশ রাষ্ট্রে এক্ষণে আর পৃথক্ শাশ্বত ন্যায়ের আদালত নাই, মাত্র নিম্নলিখিত ছয়টি রাষ্ট্রে আছে: আলাবামা, আর্কংসাস্, ডেলাওয়ার, মিসিসিপি, নিউ জার্সি ও টেন্নেসি। অনেক রাষ্ট্রে পৃথক ফৌজদারি আদালতও নাই। যে সকল রাষ্ট্রে শাশ্বত ন্যায়ের আদালত নাই, সেগুলিতে সাধারণ প্রাথমিক আদালতসমূহই সে কাজ করিয়া থাকে। উইল প্রমাণের বা উপধর্ম্মাধ্যক্ষ আদালতসমূহের কাজ হইল বংশধরগণের সম্পত্তি পরিচালনা ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য কাজ। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাম্যজীবনে কাউন্টি আদালতসমূহের প্রভাব খুব বেশী—এগুলি

প্রায়শ প্রাথমিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের কার্য্য করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি আদালতসমূহ সাধারণত অল্প মূল্যের (হাজার বা দু হাজার ডলারের অনধিক) মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া সাধারণ আদালতের কাজের ভার লাঘব করিয়া দেয়। গ্রামের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত আদালতসমূহ প্রধানত ফৌজদারি মোকদ্দমার স্থল হইলেও, দেওয়ানি মোকদ্দমারও তদ্বির করে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগে সর্ব্বোচ্চ আদালত বা সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত হইল শেষ বিচার-স্থল। উহা একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন সহযোগী বিচারপতি লইয়া গঠিত হয়।

রাষ্ট্রীয় বিচারকগণের নিয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে অধিকাংশ রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা বা রাষ্ট্র-সভার সম্মতিতে শাসক রাষ্ট্রীয় বিচারকদের নিয়োগ করিতেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ উহাদের নির্ব্বাচন করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণ জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা অথবা রাষ্ট্র-সভার সম্মতিতে শাসক রাষ্ট্রীয় বিচারক নিয়োগ করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারকগণের কার্য্যকাল সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যৌথ বিচারালয়ের বিচারকগণের মত ইঁহাদেরও কার্য্যকাল যাবজ্জীবন ও সৎস্বভাবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ অত্যভিযোগ আনিবার পর কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা কাহাকেও সরাইবার জন্য যুক্ত আবেদন পেশ করিলে পর, কোন বিচারকের পদচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাত্র অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বিচারকগণ যাবজ্জীবনের জন্য নিযুক্ত বা নির্ব্বাচিত হন। অন্য সর্ব্বত্র তাঁহাদের কার্য্যকাল বাঁধিয়া দেওয়া আছে। অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে কার্য্যকাল স্থির করিয়া দিয়াছে,—উহা ২ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত। রাষ্ট্রীয় বিচারকগণ সাধারণত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তবে অত্যন্ত বৃদ্ধ না হইলে তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং প্রায়ই পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশ্য দলের লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে তাহা সম্ভব হয়।

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় বিচারকগণের নিয়োগ-প্রণালীতে ও কার্য্যকাল নির্দ্ধারণে সম্প্রতি গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারই ফলে, অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণ নির্ব্বাচিত হইতেছেন ও তাঁহাদের কার্য্যকাল জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

বিচারকদের বেতন সম্বন্ধেও সকল রাষ্ট্র একপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার সহযোগীদের সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার ৫০০০ ডলার ও সর্ব্বোচ্চ ২২,৫০০ ডলার। ইঁহারা গড়ে ১০।১২ হাজার ডলার বেতন পাইয়া থাকেন। অধস্তন বিচারালয়সমূহের বিচারকদের বেতন আরও কম। বলা বাহুল্য, এই প্রকার বেতনে ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বিচারক হিসাবে পাওয়া কঠিন। অনেকে এটর্ণি (উকীল) রূপে ইহার চেয়ে অনেক বেশী উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং বিচারকদের চেয়ে উকীলদের প্রতাপ বেশী হওয়া বিচিত্র নহে।

জনগণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় বিচারকদের নির্ব্বাচন, তাঁহাদের হ্রস্ব মেয়াদ ও অল্প বেতন—এই তিন

কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার অসুবিধা ঘটিয়াছে। বস্তুত কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারকদের নিয়োগব্যাপার দলের হাতে গিয়া পড়িয়াছে ও তাহাতে স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ লোকদের বিচারকের পদ পাওয়া দুষ্কর। কোথাও কোথাও বিচারকগণ দল বা চক্রের প্ররোচনায় নির্ব্বাচনে জালজুয়াচুরির সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ অভিযোগও শোনা যায়। তারপর দলস্থ বা চক্রস্থ লোকদের নানাপ্রকার অবৈধ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। বস্তুত যেখানে দল বা চক্রের সাহায্যে বিচারকগণ তাঁহাদের পদ পান, সেখানে তাঁহাদের নিকট স্বাধীনভাবে কার্য্যকলাপের আশা করা বৃথা। ভাল ও নির্ভীক লোক বিচারকের পদ গ্রহণ করেন না, এমন নহে। কিন্তু সাধারণত বিচারকগণ মধ্যম শ্রেণীর হইয়া থাকেন। অনেক রাষ্ট্রে জ্ঞানী ও গুণী বিচারকগণ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে বিচার-ব্যবস্থা অতিশয় খারাপ। তথাপি মোটামুটি বলা চলে যে, উপরোক্ত তিনটি কারণে সমুদায় রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা যতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারিত, উহা ততদূর নিকৃষ্ট নহে। লেকী প্রভৃতি কেহ কেহ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিচার-বিভাগের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাইস্ কোন কোন রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থাকে মন্দ বলিলেও সমুদায় রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুরুতর অনিষ্টের কারণসমূহ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উহাদের ফল গুরুতর না হইবার হেতু এই :

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্রে যৌথ-বিচারালয়ের কল্পিত উপস্থিতি। এগুলির বিচারকগণ সাধারণত যোগ্য ও সুবিচারক হইয়া থাকেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত রাষ্ট্রীয় বিচারকগণকে অনেক সময়ে সুপথে চালনা করে। দল বা চক্রও অনেক সময়ে অনুপযুক্ত বা মন্দ লোককে বিচারকের আসনে বসাইতে লজ্জিত হয়।

(২) জনমতের প্রভাব। গণতন্ত্রের অন্য দোষ যাহাই থাকুক, ইহা নিজ দোষ সংশোধনের উপায়ও হাতে রাখিয়াছে। যে বিচারক ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-কার্য্য করেন না, তাঁহার প্রতি জনগণ সন্তুষ্ট হয় না। তিনি দল বা চক্রের লোক হইলেও জনগণ পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বাচন না করিতে পারে। বিচারক যাহা কিছু করেন, তাহার জন্য রায়ের মধ্যে কারণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য এবং জনগণ তাহা দ্বারা তাঁহার বিচার করে।

(৩) এটর্নি (অর্থাৎ উকীলদের) প্রভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুক্তরাষ্ট্রে উকীল ব্যারিষ্টারের পৃথক্ নাম নাই, ইঁহাদের এটর্নি বলে। বিচারালয়ে ইঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এই শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা বিচারালয়ের উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন ও প্রত্যেক বিচারকের কার্য্যের উপর খর-দৃষ্টি রাখেন। বস্তুত বিচারক যদি এমন হন যে, অত্যন্ত সহজ মোকদ্দমাতেও তিনি অবিচার করিতে বদ্ধপরিকর, তবে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুবিধা হয় তাঁহাদের, কারণ তাঁহাদের প্রবল যুক্তিতর্ক সফল হয় না। অনেক সময় তাঁহারা জনমতকে এরূপভাবে উত্তেজিত করেন যে, দল বা চক্র-নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ করিতে সমর্থ হন না।

কোন কোন রাষ্ট্রের বিচারকগণের প্রতি জনগণ এরূপ আস্থাশূন্য যে কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ সকল রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে বিচারকদিগকে প্রত্যাহ্বান করিবার ব্যবস্থা আছে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে বিচারকদের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ২১টি রাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত রায় জনগণের মনঃপূত না হইলে, প্রতিকূল ভোট দ্বারা উহা বদলাইয়া দিবার ক্ষমতা জনগণের হাতে দিবার প্রবণতাও কোন কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দেখা যায়। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারালয় সম্পর্কে জনগণের প্রাধান্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। (ব্রাইস্)

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কতকগুলি গলদ্।

রাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হওয়ায় দেওয়ানি বিচারের অপেক্ষা ফৌজদারি বিচার অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চুক্তি, অনিষ্ট (টর্ট) বা সম্পত্তি ঘটিত অন্যান্ত দেওয়ানি মোকদ্দমার অধিকাংশ বিচারের জন্ত রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে আসে। এই সব স্থলে বিচারের সম্বন্ধে বেশী অভিযোগ শোনা যায় না। কতকগুলি কুপ্রথা লোকের গা-সহা হইয়া গিয়াছে: রাষ্ট্রীয় বিচারকেরা যে তেমন শক্তিশালী নহেন, তাহাতে এখন আর কেহ তেমন দুঃখ বোধ করে না। মোকদ্দমা করার খরচ কম নহে। ইহা ছাড়া বহু রাষ্ট্রের মোকদ্দমার বিচার-ফল বাহির হইতে অনেক দেরী হয়,—মোকদ্দমার প্রণালী পুরাতন ও অসম্ভব রকম খুঁটিনাটি বিশিষ্ট, আইনসমূহও বর্ত্তমান কালের উপযোগী নয়। জুরীর বুদ্ধিমত্তা ও উকীলগণের পটুতা অনেক সময়ে দুর্ব্বল বিচারকগণের সহায়তা করিলেও পক্ষপাতিতা ইত্যাদি দেখা যায়। সর্ব্বোপরি বিচারকগণের অযোগ্যতা হেতু অনেক রাষ্ট্রে আপীল ও অন্যান্ত প্রকার বিলম্বের দ্বারা মোকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদীদিগকে বিশেষভাবে অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। (ব্রাইস্)

কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রে ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থা আরো খারাপ। অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত অন্ত সর্ব্বত্র ফৌজদারি মোকদ্দমায় সময় যেমন বেশী লাগে, সুবিচারও তেমন অনেক সময়ে পাওয়া কঠিন। বিচারালয়ের রায় বাহির হইলে কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। অনেক সময়ে দোষী পলাইয়া যায়। ফৌজদারি বিচারের এইরূপ হীনাবস্থার কয়েকটি কারণ এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে ফৌজদারি বিশেষত খুনের মোকদ্দমায় খুব বেশী সময় লাগে। প্রথমত জুরী স্থির করা সহজ নহে। কোন কোন রাষ্ট্রে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা নাই। যে সকল রাষ্ট্রে আছে, সেগুলিতে জুরীর অপক্ষপাতিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবার অধিকার বাদী বা প্রতিবাদীর আছে। অর্থাৎ যে লোকদের ডাকা হইয়াছে তাহারা আগে থেকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন অথবা কোন কিছু শুনিবার পূর্ব্বে মতামত স্থির করিয়া রাখিয়াছে, এই অজুহাতে ক্রমাগত জুরীর পরিবর্ত্তন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহে যত হয়, এমন আর কোথাও নয়। কখনো কখনো এক বা অপর পক্ষ এইরূপ শত শত লোককে ত্যাগ করে। তারপর মোকদ্দমা চালাইবার নিয়মকানুন ও সাক্ষ্যপ্রমাণ লইবার প্রণালীও অত্যন্ত জটিল। আসামী সুদক্ষ উকীল নিযুক্ত করিতে পারিলে, উকীলগণ প্রত্যেক বিষয় লইয়া আসামীর পক্ষে লড়িতে থাকেন ও কোন বিষয়ে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে তাহা শেষে সমবেত বিচারকমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন। এইরূপে এক বৎসরের পূর্ব্বে কোন বিচারালয়ের পক্ষে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। (২) জুরীর বিচারও সর্ব্বদা পক্ষপাতশূন্ত হয় না। কারণ জুরীদের

রাষ্ট্রীয় ফৌজদারি মোকদ্দমা প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব নহে। (৩) রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে যদি শেষ পর্যন্ত আসামী দোষী সাব্যস্ত হয়, উকীলদের উপস্থাপিত সকল প্রকার আইনের তর্কই বিচারক অগ্রাহ্য করেন, তথাপি আসামী পলায়ন করিয়া শাস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন শ্রেণীর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর জনগণের আশ্চর্য্যরকম সহানুভূতি দেখা যায়,—বিশেষত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পর যদি অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া যায় ত এই সহানুভূতি আরো বৃদ্ধি পায়। হত্যাপরাধে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সংবাদ-পত্রে তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য তুমুল আন্দোলন-আলোচনা এবং শাসকের নিকট তাহার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও শাস্তি রদের প্রার্থনা বিরল নহে। অথচ আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার পক্ষে এরূপ কোন ওকালতি দেখা যায় না। ব্রাইস্ বলিতেছেন, অপরাধীর জন্য এই প্রকার চিত্তদৌর্ব্বল্য ও সামাজিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টির অভাব গণতান্ত্রিক নরনারীর মধ্যে বেশী পরিমাণে দেখা দেয়; তাঁহার মতে ইতালি বা ফ্রান্সের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এই মনোভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপরোক্ত কারণসমূহ রাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থাকে যথেষ্ট দুর্ব্বল করিয়াছে। তাহার উপর বিচারকগণের অধিকাংশ উচ্চ শ্রেণীর না হওয়ায় অবস্থা যে কত খারাপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। দক্ষিণাঞ্চলে লোকেরা স্বভাবত উগ্র প্রকৃতির এবং তাহাদের মধ্যে নিগ্রোবিদ্বেষ প্রবল। সেজন্য নিগ্রোদের লিঞ্চিং প্রথা প্রচলিত আছে অর্থাৎ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পর বিচালয়ে বিচারিত হইবার পূর্ব্বেই জনসাধারণ অপরাধীকে ধরিয়া বধ করে। রাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ কোন প্রতীকার করিতে পারে নাই। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহের নজীর দেখাইয়া সেইজন্য ব্রাইস্ বলেন, গণতান্ত্রিক দেশের শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রিকদের মধ্যে আইনের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মাইবে এমন কোন কথা নাই। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক দেশ হইলেই যে রাষ্ট্রিকগণ আইন ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হইবে, তাহা সত্য নহে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

(ক) গ্রাম

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন যৌথ রাষ্ট্রের আইন দ্বারা শাসিত হয় না, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও উন-রাষ্ট্রসমূহ স্ব স্ব রাষ্ট্রিকগণের ইচ্ছানুযায়ী গ্রাম্য ও নাগরিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করিয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে। এক রাষ্ট্রের মধ্যেই নগর-শাসন সর্ব্বত্র এক প্রকার নাও হইতে পারে। তথাপি স্বায়ত্তশাসনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নগর-শাসন অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত ব্যাপার বাদ দিলে দেখা যাইবে যে স্থানীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হইয়া থাকে:

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন তিন প্রকার।

(১) গ্রাম (টাউনশিপ) হইল প্রথম প্রকার শাসন-ব্যবস্থার মূল। ইহা উত্তরাঞ্চলের নিউ ইংল্যাণ্ড জনপদের অর্থাৎ নিম্নলিখিত রাষ্ট্রসমূহের বিশেষত্ব: ম্যাসাচুসেট্‌স, কনেক্টিকাট, রোড আইল্যাণ্ড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভার্মণ্ট, মেইন।

(২) দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থার মূলে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন বিভাগ (কাউন্টি) রহিয়াছে। ইহা দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে প্রচলিত।

(৩) তৃতীয়টি এক প্রকার মিশ্রিত ব্যবস্থা,—উহাতে একই রাষ্ট্রে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলিতে ইহা প্রচলিত আছে: নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভেনিয়া, ডেলাওয়ার, মেরিল্যাণ্ড, ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, মিশিগান, ইলিনয়, উইস্কন্সিন, মিনেসোটা, আইওয়া, নেব্রাস্কা, কংসাস্, কোলোরাডো, উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, ওয়াইয়োমিঙ্, মোণ্টানা, ইডাহো।

যুক্তরাষ্ট্রের মত একই দেশে তিনটি বিভিন্ন ছাঁচের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক কারণ আছে। এক এক প্রকার অবস্থায় এক একটি ছাঁচ উদ্ভূত হইয়াছে। সেই ঐতিহাসিক কারণপরম্পরা এক্ষণে বিশ্লেষণ না করিয়া নিম্নে সংক্ষেপে ব্যবস্থাত্রয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) উত্তরাঞ্চলে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থায় "সভার" হাত।

(১) যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে গ্রাম বলিতে কয়েকটি গৃহের বা পরিবারের সমষ্টি বুঝায়। সাধারণত এই প্রকার গ্রামের আয়তন পাঁচ বর্গ মাইলের অনধিক হইয়া থাকে এবং গড়ে লোক সংখ্যা ৩০০০এর কম হয়। কোন কোন গ্রামে নিম্নপক্ষে দুই শতেরও কম লোক থাকে। অন্য দিকে ১৩,০০০ হাজার লোকবিশিষ্ট গ্রামও আছে। গ্রামের শাসন-ভার তত্রত্য অধিবাসী সমুদায় ভোটদাতাকে লইয়া গঠিত এক সভার (এসেম্‌ব্লির) হাতে ন্যস্ত থাকে। এই সভা বৎসরে অন্তত একবার বসন্ত ঋতুতে বৈঠক বসায়,—দরকার হইলে উহার আরো অধিবেশন হয়। সাধারণত, প্রত্যেক বৎসর তিন চারিটি বৈঠক বসে। ১০ দিন পূর্ব্বে সভা বসিবার বিজ্ঞপ্তি সকলের নিকট পাঠাইতে হয়; তাহাতে কোন্ স্থানে ঠিক কোন্ সময়ে সভা বসিবে ও তাহার কার্য্য-বিবরণী কি হইবে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। এই সভার কাজ দুটি,—(১) কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ও (২) আইন-প্রণয়ন। বাৎসরিক "সভা"য় পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য "বাছাই লোক"দের (সিলেক্ট মেন), ইস্কুল সমিতি, কার্য্য-নির্ব্বাহক কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচিত করা হয়। সভা স্থানীয় সমুদায় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ উপ-বিধি (বাই-ল), বিধান (অর্ডিন্যান্স) প্রস্তুত করে; বাছাই লোকদের ও বিভিন্ন সমিতিসমূহের বিবরণী শুনিয়া তাহাদের হিসাব পাশ করা হয়; উহারা পরবর্ত্তী বৎসরের কোন্ কোন্ খরচ বাবদ্ কি পরিমাণ অর্থ তুলিতে চায় তাহা শুনিয়া সভা ভোটের দ্বারা প্রয়োজনীয় করের ব্যবস্থা করে,—ইস্কুল, দরিদ্রদের সাহায্য, রাস্তা-ঘাট মেরামত ইত্যাদি প্রত্যেক দফায় যাহা ব্যয় করা হইবে, তাহা এই সময়ে স্থির হইয়া যায়। গ্রামের জমিজমা ও অন্যান্য সমুদায় স্থানীয় বিষয় (পুলিশ ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইহার অন্তর্গত) পরিচালনা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঐ সভার আছে। গ্রামের অধিবাসী যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত কোন প্রস্তাব আনিতে বা কোন প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারে। গ্রামে টাউন হল থাকিলে সেখানে, তাহা না হইলে প্রধান গির্জ্জা ঘরে বা ইস্কুল ঘরে বা খোলা মাঠে সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিতি মন্দ হয় না এবং আলাপ-আলোচনা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। সভায় একজন সভাপতি থাকেন, তাঁহাকে মডারেটার বলে। সাধারণত গ্রাম যত ছোট হয় উহার সভাও তত

উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে ৭৮ শতের অধিক লোক সমবেত হইয়া সভা করে সেখানে প্রায়শ কাজের চেয়ে গণ্ডগোল বেশী হয়। (ব্রাইস্)।

গ্রামের শাসন-কার্য্য সাক্ষাৎভাবে "বাছাই লোক"দের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়—ইঁহাদের সংখ্যা তিন হইতে নয় পর্য্যন্ত। তবে সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত জনে কাজ করেন। ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদিগকে প্রতি বৎসর নির্ব্বাচন করা হয়। গ্রামে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণও নিযুক্ত হন: (১) সহরের কেরাণী—সভার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করা, সমুদায় অধিবেশনের বিবরণী দাখিল করা, সহরের জন্মমৃত্যুর তালিকা তৈরী করা ইঁহার কাজ; (২) কোষাধ্যক্ষ; (৩) কয়েকজন কর-নির্ণায়ক,—ইঁহারা কর তুলিবার সাহায্যকল্পে গ্রামে অবস্থিত সমুদায় সম্পত্তির মূল্য-নির্ণয় করেন; সংগ্রাহক, ইনি কর আদায় করেন; ক্ষেত, কারখানা, লাইব্রেরী ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ। বলা বাহুল্য, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ অনুযায়ী এই সব ছোট কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ইস্কুল সমিতি আছে,—গ্রাম বড় হইলে উহার উপসমিতিও দেখা যায়। গ্রামের কর্ম্মচারিগণ ও বিভিন্ন সমিতিসমূহ সকল সময়ে বেতনভোগী নহে, কিন্তু গ্রামের কাজ চালাইবার জন্য তাঁহাদের যাহা খরচ হয় তাহা তাঁহারা পাইয়া থাকেন। সাধারণত, এই সকল কাজে ভদ্র ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের পাওয়া যায়।

গ্রামের উপরে বিভাগ,—বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার আয়তন ও লোক-সংখ্যা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। বিভাগের লোকসংখ্যা সাধারণত ৩,০০০ বা তদূর্দ্ধ হয়, বড় সহর না থাকিলে সাধারণত গড়ে ৩০,০০০ হইতে ৫০,০০০ লোক দেখা যায়। বিভাগ প্রকৃতপক্ষে বিচার কার্য্যের জন্য জিলা বিশেষ। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সেখানে হয়। লোকেরা বিভাগ হইতে উহার জন্য ভোট দ্বারা বিচারক নির্ব্বাচন করে, সঙ্গে সঙ্গে শেরিফ ও কেরাণীও নির্ব্বাচিত হন। বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন কমিশনারগণ ও বিভাগীয় কোষাধ্যক্ষ। ইঁহারা বেতন পান। ইঁহাদের কাজ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট তৈরী করা, লাইসেন্স দেওয়া, বিভাগের খরচের জন্য কর হইতে আনুমানিক মাসিক হিসাব তৈরী করা, গ্রাম ও সহরের মধ্যে অর্থ-বণ্টন করা ও বিচার-গৃহ, জেল প্রভৃতি বিভাগীয় ঘরবাড়ীর তত্ত্বাবধান করা। বলা বাহুল্য, উত্তরাঞ্চলে বিভাগের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই এবং উহা গ্রামের মত গুরুত্ববিশিষ্ট নহে।

(২) দক্ষিণাঞ্চলে বিভাগের কার্য্য-ব্যবস্থা।

(২) দক্ষিণাঞ্চলে এক লুসিয়ানা ব্যতীত সর্ব্বত্র শাসন-ব্যবস্থার মূল হইল বিভাগ,—লুসিয়ানায় উহাকে প্যারিশ্ বলা হয়। গোড়ায় ইহা বিচার-বিভাগ মাত্র ছিল, স্থানীয় বিচার-কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্থাপিত হইত। উহা রাষ্ট্রীয় কর আদায়ের নিমিত্ত আর্থিক বিভাগরূপেও গণ্য ছিল। এক্ষণে ঐ কার্য্য ব্যতীত বিভাগ সরকারী ইস্কুল, দরিদ্রদের সাহায্য দান, রাস্তাঘাট পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও পদবী বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। বিভাগে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন: বিভাগীয় কমিশনারগণ (বোর্ড বা কোর্ট) নামে পরিচিত, একজন

কর-নির্ধারক (ইনি সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করেন), একজন সংগ্রাহক (ইনি কর আদায় করেন), একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন শিক্ষাধ্যক্ষ এবং একজন রাস্তা পরিদর্শক। ইঁহারা প্রত্যেকে বেতন পান ও এক বা দুই বৎসরের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পুলিশ, দরিদ্র-সেবা, সেতু ও জেল প্রভৃতি নির্মাণও ইঁহাদের হাতে ন্যস্ত আছে। বিভাগীয় বিচারকগণ, শেরিফ্ ও কখনো কখনো অপমৃত্যু-বিচারক (করোনার) জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন।

(৩) মিশ্রিত ব্যবস্থা:

(৩) দক্ষিণাঞ্চলে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের নিম্নতন অংশ হইল বিভাগ, আর উত্তরাঞ্চলে হইল গ্রাম। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় উহাদের বিশেষত্ব: (১) বিভাগের গুরুত্ব ও ক্ষমতা, (২) গ্রামের কার্য্যতৎপরতা—দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে এই সকল স্থলে গ্রামে স্বাধীনতা যেমন বেশী কাজের পরিমাণও সেইরূপ অধিক। এই তৃতীয় শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসনকে আবার মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা চলে। (১) পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, আইওয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে গ্রামের চেয়ে বিভাগের প্রাধান্য বেশী; (২) মিশিগান, ইলিনয়, উইস্‌কন্‌সিন, মিনেসোটা, উভয় ডাকোটা প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিভাগের চেয়ে গ্রামের প্রাধান্য বেশী।

(৩) (ক) যেখানে গ্রামের প্রাধান্য বেশী;

মিশিগান, ইলিনয় প্রভৃতি রাষ্ট্রের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে:

কোন বিভাগের জনগণ প্রাগুক্ত প্রথা অবলম্বনের স্বপক্ষে ভোট দিলে পর কমিশনারগণ সেই বিভাগকে বিভিন্ন গ্রামে বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সাধারণত, এই গ্রাম মহাসমিতির নির্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রাম বা ইস্কুল-বিভাগের সমতুল্য হয়। প্রত্যেক গ্রামের আইনত ব্যক্তিত্ব, সম্পত্তি অধিকারের ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা, চুক্তি করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট দিবসে জনগণের বাৎসরিক সভাতে গ্রামের কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ও বিবিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ সভায় জনগণ গ্রামের সম্পত্তি গ্রহণ; ব্যবহার বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা; কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ; রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য কর আদায়ের ব্যবস্থা, আগাছা ও পঙ্গপাল নির্ম্মূল করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা; গরু প্রভৃতির যথেচ্ছ বিচরণে বাধা দান; খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা; কূপ ও নদী খনন; জরিমানা ও অন্য শাস্তি-দান; কেহ মোকদ্দমা করিলে তাহাতে আত্মরক্ষা ও প্রয়োজন মত মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারেন।

গ্রামের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন: পরিদর্শক (সুপারভাইজার),—ইনি দরিদ্রদের তত্ত্বাবধানও করিয়া থাকেন; কেরাণী; কর-নির্ণায়ক; সংগ্রাহক—ইঁহারা সকলে প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত হন; তিন বৎসরের জন্য তিনজন কমিশনার—প্রতি বৎসর একজন করিয়া নূতন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন; চারি বৎসরের জন্য দুইজন শান্তিরক্ষক ও দুইজন কনষ্টেব্‌ল। পরিদর্শক গ্রাম ও বিভাগ উভয়েরই কর্ম্মচারী। ইনি গ্রামের কাজ পরিচালনা করেন, আবার বিভাগের বোর্ডেরও সভ্য। ঐ বোর্ড বিভাগস্থ গ্রামসমূহের পরিদর্শকগণকে লইয়া অথবা বিভাগের জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয় ও বোর্ডের হাতে বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের ভার থাকে। জনগণের ইচ্ছানুসারে দরিদ্রদের সংস্থানের ভার

বিভাগ বা গ্রামের উপর অর্পিত হয়। পরিদর্শক, কর-নির্ণয়ক ও কেরাণী—এই তিনজন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বোর্ডরূপে পরিগণিত হন। বিভিন্ন কাজের জন্য বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া আছে,—গ্রামের কর্ম্মচারীরা তদনুসারে বেতন পান, অথবা তাঁহারা প্রতিদিন যে সময় কাজ করেন সেই সময়ের জন্য দৈনিক বেতন পান। কর-সংগ্রাহক যত কর সংগ্রহ করেন তাহার একটা শতকরা অংশ পান।

২১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ রাষ্ট্রিক কোন রাষ্ট্রে অন্তত এক বৎসর, বিভাগে ৯০ দিন ও গ্রামে ৩০ দিন বাস করিলে তিনি গ্রামের সভায় ভোট দিবার অধিকারী হন, কিন্তু গ্রামে এক বৎসর বাস না করিলে কেহ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রে ইস্কুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইস্কুলের উদ্দেশ্যে গ্রামকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয় ও তাহার আলাদা নাম থাকে। ইস্কুলের ট্রাষ্টিগণ (তিনজন) সাধারণত গ্রামের সভায় অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সহিত তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহারা কোন গ্রামকে বিভিন্ন ইস্কুল-বিভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। সাধারণত গ্রামকে এইরূপ নয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়,—প্রত্যেক বিভাগ আয়তনে ২ বর্গ মাইল ও উহার মাঝখানে একটি করিয়া ইস্কুল থাকে। ঐ আয়তনের জনগণ তৎস্থানের ইস্কুলের জন্য তিনজন করিয়া ইস্কুল পরিচালক নির্ব্বাচিত করে। ইস্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। বৎসরে ৫ হইতে ৯ মাস পড়া চলে। শিক্ষাদানের জন্য ২% ও ইস্কুলের ঘর-বাড়ী তৈরী করিবার জন্য ৩%এর অধিক কর গ্রামের সম্পত্তির উপর চাপানো নিষিদ্ধ। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সকল ইস্কুলের জন্য যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ করে।

কোন্ বিভাগে কত গ্রাম থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করিয়া বিচারক নিযুক্ত হন, প্রোবেট্ সম্পর্কে ইঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ও ইনি অছি (অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার), অভিভাবক (গার্জ্জেন) ইত্যাদি নিয়োগ করিয়া থাকেন। যে সকল দেওয়ানি মোকদ্দমার মূল্য হাজার ডলারের বেশী নয় সেগুলি, ছোট ছোট ফৌজদারি মোকদ্দমা ও পুলিশ আদালত বা শান্তিরক্ষকদের নিকট হইতে আপীল তিনি শুনিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, যে অনুপাতে কোন রাষ্ট্রে গ্রামের প্রাধান্য হয়, সেই অনুপাতে বিভাগ নিস্তেজ হইয়া যায়। মিশিগান, ইলিনয় প্রভৃতি রাষ্ট্রে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মত বিভাগ একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে নাই। এই সব রাষ্ট্রে ইস্কুলসমূহের পরিদর্শন কার্য্য একজন বিভাগীয় কর্ম্মচারীর হাতে থাকে ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গ্রামের ইস্কুলের জন্য কর বসাইয়া বিভাগ অর্থ তুলিয়া দেয়। প্রধান প্রধান রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য, কখনো কখনো গ্রামের ব্যয় পরিদর্শন-বিভাগ নিজের হাতে রাখে। বিচার-কার্য্য ছাড়া, দান-খয়রাত, রাস্তাঘাট ও ইস্কুলের সাহায্যে বিভাগীয় ক্ষমতা নানাদিকে প্রসারিত আছে। কোন কোন রাষ্ট্রে গ্রাম ও সহর (সিটি) কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পরিদর্শকদের লইয়া গঠিত বোর্ড বিভাগের শাসন ও অর্থসংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করে। বিভাগের অন্যান্য নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে সরকারী উকীল, শেরিফ, অপমৃত্যু-বিচারক, বিভাগীয় কেরাণী, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব-পরীক্ষক ও

কর-নির্দ্ধারকের নাম করা যাইতে পারে। আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা বিভাগের না থাকিলেও উক্ত দুয়ের দল সম্পর্কিত কার্য্যে বিভাগের গুরুত্ব অধিক।

(ক) (খ) যেখানে বিভাগের প্রাধান্য বেশী।

পেন্‌সিলভেনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে গ্রামের সভা নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রে গ্রামের গঠন ও শাসন প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। কোন স্থলে গ্রাম স্থানীয় কর্মচারীদের নির্ব্বাচিত করিয়া শুধু তাহাদের সাহায্যে কাজ করে; কোথাও সমুদায় স্থানীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন,—তাঁহাদের সহিত একজন কেরাণী ও কোষাধ্যক্ষও থাকেন। কোথাও দুই বা ততোঽধিক পরিচালক (তিন বৎসরের জন্য,—এক এক বৎসর অন্তর একজন নূতন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন), একজন কর-নির্দ্ধারক, একজন কেরাণী, তিনজন হিসাব-পরীক্ষক, ছয়জন ইস্কুল পরিচালক (তিন বৎসরের জন্য,—প্রত্যেক বৎসরে দুইজন অপসৃত হন), দুইজন দরিদ্র-পরিচালক থাকেন। এই সকল রাষ্ট্রের অধিকাংশে বিভাগের নিকট গ্রাম হীনপ্রভ। প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন-কার্য্য কয়েকজন কমিশনার লইয়া গঠিত বোর্ডের হাতে রহিয়াছে—ইঁহারা তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া জনগণ ভোট দ্বারা নিম্নলিখিত কর্মচারিগণকেও নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন: শেরিফ, অপমৃত্যু-বিচারক, উইল রেজিষ্ট্রার, দানপত্র হিসাবরক্ষক, কোষাধ্যক্ষ, জরীপকারী, তিনজন হিসাব পরীক্ষক, আদালতের কেরাণী, জিলা উকীল, ইত্যাদি। যে সকল রাষ্ট্রে জনগণের সংখ্যা ৫০,০০০এর অধিক সেগুলিতে এই সব কর্মচারী কাজের জন্য পারিশ্রমিক পান, অন্যত্র বেতন দেওয়া হয়। কোন বিভাগে অন্তত ৪০,০০০ অধিবাসী থাকিলে উহা বিচারবিষয়ক জিলারূপে গণ্য হইতে পারে ও তথা হইতে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য একজন বিচারক নিযুক্ত হন। বিভাগ ইস্কুল ও গরীবখানাও তদারক করে, প্রত্যেক গ্রামে কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া বিভাগীয় ও রাষ্ট্রীয় কর-সংগ্রহ করে। গ্রামের হিসাব পরীক্ষা ও অন্যান্য পরিচালনা-ক্ষমতা বিভাগের আছে। *যে সকল রাষ্ট্রে সভা নাই এবং যেগুলিতে বিভাগের প্রাধান্য আছে, সেই সব রাষ্ট্রে স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের ভোট গ্রহণ করা হয়।*

উপরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে একটি সাধারণ বর্ণনা মাত্র দেওয়া হইল। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি প্রণিধানযোগ্য:

গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের বিশেষত্বসমূহ।

(১) গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্গত প্রধান কাজগুলি এই: (ক) রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ বা সংস্কার। রাস্তাঘাট বা সেতু রাষ্ট্রের, বিভাগের বা গ্রামের ভাগে পড়িতে পারে। তদনুসারে রাষ্ট্রীয়, বিভাগীয় বা গ্রাম্য কর্তৃপক্ষ তাহার ভার গ্রহণ করেন। (খ) বিভাগের উৎপত্তির একটি কারণ বিচারের সুব্যবস্থা বিধান। আধুনিক কালেও বিভাগের কাজের বহুলাংশ তৎসম্পর্কিত। বিচারক বা বিচারকগণ, সরকারী জিলা উকীল, প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী, শেরিফ,—জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। জেল বিভাগের তাঁবে থাকে। পুলিশ স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত। গরীবদের তত্ত্বাবধানও প্রায় সর্ব্বত্র রাষ্ট্রের হাতে না রাখিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে রাখা হইয়াছে। (গ) স্বাস্থ্য-রক্ষা। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থল বিরল-বসতি হওয়ায় ও লোকেরা সাধারণত অন্যান্য দেশের চেয়ে অবস্থাপন্ন হওয়ায় স্বাস্থ্য-রক্ষার কাজ তেমন গুরুতর নহে। (ঘ) শিক্ষা-দান।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাদান ব্যাপারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় ও অবশ্য প্রতি বৎসর বিপুল অর্থরাশি ব্যয়িত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইস্কুল-সমিতি ও ইস্কুল-বিভাগ শাসন-সংক্রান্ত আয়তন বিশেষ। শিক্ষা-দান স্থানীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইলেও, রাষ্ট্র ও বিভাগও নানা প্রকারে উহা পরিদর্শন করে। উপরোক্ত চারিটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটির জন্ত খরচের পরিমাণ কম। সুতরাং শিক্ষার জন্ত অধিকতর ব্যয় করা সহজ হয়।

(২) গ্রামের শাসন-ভার হয় সমুদায় জনগণকে লইয়া গঠিত সভার উপর, নচেৎ তিন বা তদপেক্ষা কম ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক বোর্ডের হাতে থাকে। বিভাগে আইন-প্রণয়নের ভার প্রায় কখনোই কোন বোর্ডের হাতে দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনে প্রতিনিধি দ্বারা আইন-সভা গঠন-প্রণালী নাই বলিলেও চলে। আর বিভাগসমূহ রাষ্ট্র ও গ্রামের মাঝামাঝি থাকায় জনগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয় না।

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের কার্য্যাবলী রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন দ্বারা অনুশাসিত হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বিভাগ ও গ্রামের ক্ষমতাসমূহ প্রায়ই নির্দ্দেশ করা থাকে, তাহা অলঙ্ঘনীয়।

(৪) বিভাগীয় ও গ্রাম্য কর সাক্ষাৎ ভাবে আদায় করা হয়। যেখানে গ্রাম থাকে, সেখানে গ্রাম হইতেই সর্ব্বপ্রকার কর গৃহীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রিকেরা একই সময়ে, একই কর্ম্মচারীর হাতে তাহাদের সমুদায় স্থানীয় কর, রাষ্ট্রীয় কর, জাতীয় কর,—এক কথায় সকল মুখ্য কর—তুলিয়া দেয়। এইরূপে করদাতাগণ পুন পুন কর দেওয়ার বিরক্তি হইতে রক্ষা পায় ও অল্প খরচে সমুদায় কর সংগৃহীত হয়। স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তির উপরেই স্থানীয় কর গৃহীত হইয়া থাকে। স্থানীয় খরচের অধিকাংশ স্থানীয় সংগৃহীত কর দ্বারা মেটানো হয়। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে বিভাগীয় কর হইতেও ইস্কুলের সাহায্য চলে। স্থানীয় করেরও অধিকাংশ ইস্কুলসমূহের জন্ত ব্যয়িত হয়।

(খ) শহর বা মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামের ও শহরের স্বায়ত্তশাসন এক প্রকার নহে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থলে শহরের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেগুলির গুরুত্বও সেইরূপ বাড়িয়াছে। ১৭৯০ সনের লোক-গণনা কালে মাত্র ৫টি শহরের লোক-সংখ্যা ৫,০০০ এর বেশী ও মাত্র একটিতে ৩৩,০০০ এর অধিক অধিবাসী ছিল। আর সেই স্থলে ১৯১০ সনে ৮০০০ এর বেশী অধিবাসী বিশিষ্ট ৭৭৩টি, ২৫,০০০ এর বেশী অধিবাসী-যুক্ত ২২৮টি ও এক লক্ষের অধিক লোকবিশিষ্ট ৫০টি শহর দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে। মোট অধিবাসিগণের যত জন শহরে বাস করে তাহাদের অনুপাতও ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। ৮০০০ এর অধিক লোক বাস করে এরূপ শহরে ঐ অনুপাত ১৭৯০ সনে ছিল ৩·৩৫%, আর ১৯১০ সনে হয় ৩৮·৭৪%। যুক্তরাষ্ট্রের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ আজ বহু কোটি ডলার লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এমন কি, কোন কোন শহরের আয়-ব্যয় বা ঋণ-গ্রহণ রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ও ঋণ-গ্রহণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যথা, ১৯০৮ সনে নিউ ইয়র্ক শহরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, কিন্তু ঐ

যুক্তরাষ্ট্রে শহরের স্থান।

সময়ে ঐ রাষ্ট্র মাত্র ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছিল। ঐ সনে মিউনিসিপ্যালিটি ৮ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের ও রাষ্ট্র দেড় কোটি ডলারের বণ্ড বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের স্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু শহরের শাসন-ব্যবস্থা বিশদভাবে বুঝিবার পক্ষে দুইটি বাধা আছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে রাজনৈতিক দলের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া, দলের কথা মনে রাখা দরকার। দলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১২১-১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত যুক্তরাষ্ট্রে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের বা এক গ্রামের সহিত অন্য গ্রামের যে পার্থক্য, এক মিউনিসিপ্যালিটির সহিত অন্য মিউনিসিপ্যালিটির তদপেক্ষা অনেক অধিক পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। শহরের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শুধু যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা আছে তাহা নহে, অধিকন্তু একই রাষ্ট্রের ভিতর সকল শহরের জন্য এক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না—বড় শহরে ও ছোট শহরে পার্থক্য আছে, আবার এক বড় শহরের সহিত অন্য বড় শহরের মিল নাই। এ বিষয়ে ইয়োরোপের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের পার্থক্য রহিয়াছে। এক্ষণে, বিভিন্ন শহরে যে সকল সাধারণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে,সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

শহরের কর্ত্তৃপক্ষগণ : বড় বড় শহরগুলিতে আছে

(১) একজন করিয়া মেয়র, ইনি শাসন-বিভাগের প্রধান ব্যক্তি, এবং শহরের ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত হন।

(২) কয়েকজন কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী বা কয়েকটি সমিতি,—কোথাও শহরের ভোটদাতাগণ সাক্ষাৎ ভোট দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়, কোথাও বা মেয়র কর্ত্তৃক বা শহরের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হন।

(৩) ব্যবস্থাপক সভা। ইহার সাধারণত দুইটি শাখা থাকে, কখনো কখনো একটিও থাকে। শহরের ভোটদাতাগণ সাক্ষাৎভাবে সভ্যদের নির্ব্বাচন করে।

(৪) মিউনিসিপ্যাল বিচারকগণ। ইঁহারা সাধারণত শহরের ভোটদাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু কখনো কখনো রাষ্ট্র বা (কোন কোন বিচারক সম্পর্কে) মেয়র কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

(১) মেয়র, ইহাই শহরের শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে মেয়রের স্থান সকলের উপরে। তাঁহার কার্য্যকাল সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। এক হইতে চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পদের মেয়াদ হইয়া থাকে, তবে সাধারণত তাঁহাকে চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত করার দিকেই এক্ষণে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। কোন কোন শহরে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার মেয়রের পদে নির্ব্বাচিত করা হয় না। সমগ্র শহরের ভোটদাতাগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করে। সাধারণত, তিনি শহরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নহেন। শহরের ব্যবস্থাপক সভা যে কোন আইন পাশ করুক, প্রায় সর্ব্বত্র

তিনি তাহা নিজের স্বাক্ষর-ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ব্যর্থ করিতে পারেন, অবশ্য ঐ ব্যবস্থাপক সভা দুই-তৃতীয়াংশ অধিকজন ভোট দ্বারা সে ব্যবস্থা পাশ করিয়া লইতে পারে। কোন কোন শহরে তিনি বিভিন্ন বিভাগের ও শাসন-সমিতির কর্ত্তাব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ, যদিও অধিকাংশ শহরে এবিষয়ে তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার, অন্তত উহার একটি শাখার, সম্মতি লইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে মেয়রের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়ার দিকে জনগণের প্রবণতা দেখা যায়। কোন কোন শহরে মেয়রকে সকল বিভাগের জন্ম দায়ী করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শান্তি রক্ষা, দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ, এবং দরকার হইলে সৈন্তদের আহ্বান, তাঁহার কাজ। কার্য্যকালে, আইন-প্রণয়ন বিষয়ে তাঁহার নিজ বুদ্ধিগত কাজ করিবার অধিকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরের মেয়রগণ মোটা হারে বেতন পাইয়া থাকেন,—উহা শহরের আকারের উপর নির্ভর করে।

(২) বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকগণ,

শহরের আসল শাসন-কার্য্য বিভিন্ন বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই বিভাগসমূহের মাথায় কোথাও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন, কোথাও বা বিভিন্ন বোর্ড বা কমিশনের হাতে বিভাগসমূহ বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল বিভাগের মধ্যে যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিতে ভোটদাতাদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ থাকেন। ইঁহাদের কার্য্যকালও বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন প্রকার,—তবে সাধারণত এক হইতে চারি বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদ্ হইয়া থাকে। কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শহরের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক, অন্ত কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ব্যবস্থাপক সভা বা উহার একটি শাখার সম্মতিতে মেয়র কর্ত্তৃক মনোনীত হন। অধিকাংশ শহরে প্রধান কর্ম্মচারিগণ একে অন্ত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কাহারও তাঁবে না থাকিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন। ইঁহারা সমগ্র ব্যবস্থাপক সভার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্পর্ক না রাখিলেও উহার বিভিন্ন সমিতির সহিত ইঁহাদিগকে সম্পর্ক রাখিতে হয়।

শিক্ষা-সমিতি,

এই প্রসঙ্গে শহরের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। মেয়র বা শহরের ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে কোন প্রকারে হাত দিতে পারেন না। শহরের শিক্ষার ভার সাধারণত শিক্ষা-সমিতি (বোর্ড অব্ এডুকেশন)র হাতে ন্তস্ত থাকে। ইহার সভ্যেরা শহরের ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অথবা মেয়র কর্ত্তৃক মনোনীত হন। ইঁহারা শিক্ষার জন্ম আলাদা কর তুলেন ও ইঁহাদিগের কাজে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইঁহাদের তাঁবে বিভিন্ন কর্ম্মচারী মোতায়েন থাকে।

(৩) মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থাপক সভা,

সকল শহরের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ এক প্রকারের নহে। ছোট ছোট শহরে সাধারণত এক শাখা বিশিষ্ট মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাপক সভা থাকে। বড় শহরের কতকগুলিতে এক ও কতকগুলিতে দুই শাখা আছে। যেখানে দুই শাখা বর্ত্তমান, সেখানে একটি শাখার নাম অল্ডারম্যানদের সমিতি (বোর্ড অব্ অল্ডারমেন) ও অপরটির নাম সাধারণ পরামর্শ সভা (কমন কাউন্সেল)। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থাপক সভার সমুদায় সভ্য ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ইঁহারা সাধারণত বিভিন্ন শহরের কোথাও শহরের বিভিন্ন মহল্লা (ওয়ার্ড) হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, কোথাও বা প্রথমোক্ত শাখার জন্ম সমুদায় শহর হইতে একযোগে প্রেরিত হইয়া থাকেন। সাধারণ পরামর্শ সভা এক বৎসরের জন্ম অথবা কোথাও

কোথাও দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়, কিন্তু অপর সভাটি দীর্ঘতর কালের জন্য বসে। ছোট ছোট শহরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ প্রায় কোথাও কিছু পান না, কিন্তু বড় শহরে অল্ডারম্যানগণ কোথাও কোথাও বেতন পান। সভার কাজ হইল মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত শহরের সমুদায় আইন, বিধি ও উপ-আইন প্রণয়ন ও শহরের কোষাগার হইতে অর্থব্যয়ে অনুমতি দান,—বহু ক্ষেত্রেই এই সকল বিষয়ে মেয়রের নাকচ্ ক্ষমতা আছে। প্রায় সর্ব্ব নিম্নতন কর্ম্মচারীদের নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা সভার থাকে। বলা বাহুল্য, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতন এখানেও এই ক্ষমতা বিভিন্ন সমিতির সাহায্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে বিভিন্ন শাসন-বিভাগ পরস্পর হইতে আরও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) নির্ব্বাচিত বিচারকগণ।

মিউনিসিপ্যাল শাসনের সহিত শহরের মিউনিসিপ্যাল বিচারকগণের সম্পর্ক এই যে, তাঁহারা অধিকাংশ বড় বড় শহরে রাষ্ট্রিকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। সাধারণত পাঁচ বৎসর বা ততোঽধিক কালের জন্য কয়েকজন উর্দ্ধতন বিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এবং আরো বেশী সংখ্যক পুলিশ-বিচারক বা শহর-ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাকৃত অল্পকালের জন্য মোতায়েন রহেন। কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপ বিচারক নিয়োগের ভার রাষ্ট্র নিজ হাতে রাখিয়াছে।

ভোট ও নির্ব্বাচন।

শহরগুলিতে সার্ব্বজনীন ভোট প্রথা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচন কালে প্রায়শ শহরের কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, কখনো কখনো যৌথরাষ্ট্রের মহাসমিতির সভ্যগণ যে সময়ে নির্ব্বাচিত হন, সেই সময়েই রাষ্ট্রীয় ও শহরের কর্ম্মচারীরও নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে অনেক খরচ ও কষ্ট বাঁচে। কিন্তু অন্য দিকে ইহাতে ভোটদাতাগণের লোক-নির্ব্বাচনে গোলমাল হয় বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম্মচারী নিয়োগ করা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সচরাচর রাজনৈতিক দলের হুকুম অনুসারে ভোট দেওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যুক্তরাষ্ট্রে শহর-শাসনের নব ধারা।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রকার নূতন মিউনিসিপ্যাল শাসন-ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। টেক্সাস্ রাষ্ট্রের গল্ভেষ্টন নামক শহর নদীর প্লাবন দ্বারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে শহরের কার্য্য-পরিচালনার ভার সাময়িক ভাবে তিনজন কমিশনারের হাতে দেওয়া হয়। এই প্রথায় কাজের এরূপ সুবন্দোবস্ত হয় যে, অতঃপর পাঁচজন কমিশনারের হাতে ঐ শহরের শাসন-কার্য্য অর্পিত হইয়াছে (১৯০১)। এই বোর্ড বা সমিতি দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন, উহার সভাপতি মেয়র নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য চারিজনের প্রত্যেকে এক এক বিভাগের ভার পান। কমিশনারগণ আইন-প্রণয়ন, চুক্তিকরণ, (যে বিভাগে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় তাহার ভারপ্রাপ্ত কমিশনারের সম্মতি লইয়া) প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেন। এই প্রকার ব্যবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটির সকল বিভাগে উন্নতি দেখা দিয়াছে ও শহরের ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে। শহরের তাঁবে জলের কল, ড্রেণ প্রণালী ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই শহরের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ১৯১৩ সন অবধি যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭১টি শহর ইহার অনুরূপ মিউনিসিপ্যাল শাসন-প্রণালী গ্রহণ করে।

গ্রামের মতন শহরেও স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তির উপরই কর ধার্য্য হয় এবং

সেই কর বিভাগীয় ও স্থানীয় করের সহিত একযোগে তোলা হয়। বিভিন্ন শহরে কর-যোগ্য সম্পত্তির মূল্য বিভিন্নভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে।

উপরে মিউনিসিপ্যাল শাসন-ব্যবস্থার কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে একবার খতাইয়া দেখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রের শহরের অধিবাসিগণ কোন্ কোন্ সুবিধা বা অসুবিধা কতটা ভোগ করিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, ইহার রাস্তাঘাট সুন্দর বাঁধান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কোথাও জুয়া খেলা ও পান দোষ প্রশ্রয় পাইতেছে না, পুলিশ অন্যায় করে না, স্বাস্থ্য-রক্ষার এবং ঘরবাড়ী বা পার্ক রক্ষার ব্যবস্থা খুব ভাল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রায় সকল শহরেই এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিযোগ শুনা যায়। যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণ শহরের অবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট নহে। অবশ্য এক দিকে ইহা গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রিকগণের রাজনৈতিক চৈতন্যের পরিচায়ক হইলেও, অন্য দিকে মোটামুটি বলা চলে যে, অধিকাংশ শহরের মিউনিসিপ্যালিটি জনগণকে যথেষ্ট সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে সমর্থ হয় নাই। কোন কোন শহরের অবস্থা ভাল নয়। ইয়োরোপীয় বড় শহরগুলির চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলিতে শাসন-ব্যবস্থায় অসন্তোষের পরিমাণ সাধারণত অনেক বেশী দেখা যায়।

মিউনিসিপ্যাল শাসনের গলদ :

মিউনিসিপ্যাল শাসন-ব্যবস্থা সর্ব্বত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই ;

খরচের দিক্ হইতেও অধিকাংশ শহরে অমিতব্যয়িতা লক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শহরসমূহের ঋণের মাত্রা ও করভারের পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ব্রাইস্ দুইটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি সর্ব্ববৃহৎ শহরে ১৮৮০ হইতে ১৯০৫ এর মধ্যে ঋণ, কর ও লোক-সংখ্যা সম্পর্কে ও দ্বিতীয়টি কয়েকটি বড় শহরে ঐ দুই সনে ঋণের মাত্রা সম্পর্কে।

খরচের বাহুল্য ঘটিয়াছে।

(১)	লোক-সংখ্যায় বৃদ্ধি	...	...	৮৮.০%
	কর-যোগ্য মূল্যবৃদ্ধি	...	...	২২১·৬%
	ঋণবৃদ্ধি	...	...	১৮৬·০%
	করবৃদ্ধি	...	...	১৬৫·০%

(২)	ঋণের মাত্রা	১৮৮০ ডলার	১৯০৫ ডলার
	ফিলাডেলফিয়া	৫,৪২,২৩,৮৫০	৬,৯৯,৫০,৬৪০
	বোষ্টন	২,৮২,৪৪,০১৮	৯,৯১,৯১,৮৫৬
	ক্লীব্ল্যাণ্ড	৬৪,৬৭,০৪৬	২,৭৬,৮৫,৮৭৪
	মিলাবাউকি	২১,৬০,২৮৯	৮৫,৭৫,৮১৩
	নিউ ইয়র্ক	১৪,৯৭,২১,৬১৪	৬৪,৭৮,০৬,২৯৫

বড় বড় শহরগুলি যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতে শহরে উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করা হয় নাই, এমন নহে, কিন্তু অপব্যয়ও ঢের হইয়াছে। ব্রাইস্ বলেন, শহর-শাসন ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা অকৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছে এবং তাহাতে রাষ্ট্রিকগণের

ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হইয়াছে; অধিকন্তু রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় শহরগুলিতে অমিতব্যয়িতা, বিশৃঙ্খলা, শাসনের অভাব প্রভৃতি দোষ বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই সম্পর্কে শুধু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সকল মিউনিসিপ্যালিটিকে সমান দোষযুক্ত বিবেচনা করিলে যেমন ভুল হইবে, অন্যদিকে ঐগুলিকে একেবারে দোষহীন বিবেচনা করিলেও তদ্রূপ ভুল হইবে। মোটামুটি বলা চলে যে, লণ্ডন প্রভৃতি যেমন ইংরেজের, প্যারি ইত্যাদি ফরাসীর, এবং বার্লিন ইত্যাদি জার্ম্মাণের গৌরবের বস্তু, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রবাসীর গৌরবের বস্তু নহে।

মিউনিসিপ্যাল শাসনের দুর্ব্বলতার কয়েকটি কারণ:

প্রশ্ন হইতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের বড় মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের এই প্রকার দুর্ব্বলতার কারণ কি? ১৮৭৬ সনে নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের শহরগুলিতে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। সে সময়ে এই কমিশন কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করেন। এই সব কারণের ক্রিয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নীচে সংক্ষেপে এগুলি বিবৃত হইতেছে:

(১) অযোগ্য কর্ম্মচারী;

(১) শাসক-সমিতিসমূহের ও কর্ম্মচারিগণের অযোগ্যতা ও অবিশ্বস্ততা। অযোগ্য ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তি কিরূপে শহরের কর্ত্তৃত্বভার পায়, এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুত, শুধু জনগণের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিলে, সম্ভবত অনেক সময় এই প্রকার ব্যক্তিগণ কোন কাজের ভার পাইতেন না। কিন্তু ইঁহারা ন্যায্য ও অন্যায্য সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রথমত, ইঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া বহুলোককে বশীভূত করেন। দ্বিতীয়ত, এই সকল লোককে চাকুরী, বড় বড় কোম্পানিকে বা ঠিকাদারকে সুবিধা দিয়া ও যোগ্য ব্যক্তিগণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া নিজেদের পদকে নিরাপদ্ করিয়া লন। যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন শহরে ইহাতে যে কি প্রকার অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়।

(২) রাজনীতির প্রভাব;

(২) মিউনিসিপ্যালিটির শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় রাজনীতির প্রভাব। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত, নগর-শাসন কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুই প্রধান রাজনৈতিক দল হইতেই লোক নির্ব্বাচন করিলে ভাল হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। অধিকাংশ সময়ে দেখা গিয়াছে, কোন লোক নগর-শাসনে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হইলেও অন্য দলের ভোট পান না—এমন কি, যদি এমন হয় যে যাঁহারা নগর-শাসনে ব্যাপৃত থাকেন এবং যাঁহারা নানাপ্রকারে আপনাদের অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন ও মিউনিসিপ্যালিটির অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের দলের লোকেরা বিপক্ষের যোগ্যতর ব্যক্তিগণকে ভোট দেয় নাই।

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হস্তক্ষেপ;

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় শাসন-ব্যাপার সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা। এই প্রথা দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অতিশয় খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমত, স্থানীয় ব্যাপার লইয়া বিশেষভাবে মাথা ঘামাইবার অবকাশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের নাই। দ্বিতীয়ত, তাঁহারা সমগ্র খুঁটিনাটির সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বত্র সুবিচার করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বর্ত্তমান প্রথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ অন্যায়াচরণ করিলে, ব্যবস্থাপক সভা তাহার প্রতীকার করিয়া দিবে। কিন্তু এক্ষণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকৃত পক্ষে সেই স্থান বা শহর হইতে

নির্ব্বাচিত ব্যক্তির উপরেই কার্য্য নির্দ্ধারণের ভার পড়ে এবং দলের প্ররোচনায় ইনি সকল সময়ে ন্যায়পরায়ণ হন না।

(৪) দায়িত্বহীনতা।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যাবলীর জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব নির্দ্দেশের অভাব। যে সকল শহরে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেগুলিতে মেয়র নিজ দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না সত্য, কিন্তু অন্য শহরগুলিতে শাসন-কার্য্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাহাকেও দায়ী করা যায় না। বিভিন্ন বিভাগ যথোচিত কাজ না দেখাইতে পারিলে, তিনি শহরের ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়কে ও বিভিন্ন সমিতিগুলিকে তজ্জন্য দায়ী করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভাদ্বয় একে অন্যের অথবা সমিতিসমূহের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া থাকে। এইরূপে, শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজের জন্য কাহাকেও দায়ী করা চলে না। (ব্রাইস্)

প্রতীকারের পন্থা।

শহর-শাসন-সম্পর্কিত এই সকল দোষ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণ অন্ধ নহে। এগুলির প্রতীকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা উঠিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া যাইতেছে:

(১) শহরের কাজের জন্য লোক নির্ব্বাচনে পরীক্ষা-গ্রহণ প্রথার প্রবর্ত্তন।

(২) মেয়র ও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকাল বৃদ্ধি। কোন কোন শহরে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) মেয়রের হাতে নগরের শাসন-কর্ত্তৃত্বভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া শহরের ব্যবস্থাপক সভার হাতে শুধু আইন-প্রণয়ন কাজ রাখা। কোন কোন নূতন সনন্দে ইহা দেখা যায়।

(৪) শহরের ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ে অথবা উহার একটি শাখায় অথবা ইস্কুল সমিতিতে মহল্লা হইতে লোক নির্ব্বাচন না করিয়া সমগ্র শহর হইতে সমুদায় ব্যক্তির নির্ব্বাচন।

(৫) শহরের মধ্যে কর বসাইবার ও ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা। ইহা বহুল পরিমাণে প্রচলিত করা হইয়াছে।

(৬) অভিনয়ন, প্রত্যুপস্থাপন ও প্রত্যাহ্বানের প্রবর্ত্তন দ্বারা জনগণের মতামতের প্রবলতা সম্পাদন।

(৭) শহরের শাসন-ভার মেয়র ও পরামর্শ সভার হাতে না রাখিয়া কয়েকজন কমিশনার লইয়া গঠিত বোর্ডের হাতে রাখা। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের বিশেষত্ব।

এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের শহরের কয়েকটি বিশেষত্ব প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের শহরসমূহ উহার রাষ্ট্রসমূহের পরে সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভাসমূহ আইন করিয়া তদন্তর্গত শহরগুলি সৃষ্টি করে। সুতরাং এই সব শহরের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। এই কর্ত্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সংখ্যা ৪৮ ও শহরের সংখ্যা পৌনে আট শ (১৯১০)। আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আত্ম-কর্ত্তৃত্বশীলতা বজায় আছে। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইবে, কেন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মধ্যে এত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে শাসক ও শাসিত বলিয়া দুই পৃথক্ সম্প্রদায় নাই। শাসন-ব্যাপারে সর্ব্বত্র জনগণের প্রভাব কিরূপ অধিক, তাহা ইতিপূর্ব্বে বার বার উল্লেখ করিয়াছি। উহার

মর্ম এই যে, যে রাষ্ট্রিকগণ শাসিত হইতেছে, তাহাদের সেই শাসন-কার্য্যে অংশ লইবার অধিকার আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, বিদেশিগণের আগমনে কেন এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা বিদেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে নূতন আসে তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রিকত্ব দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহারা যুক্তরাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য-হীনতার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না বলিয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রিক করিয়া তুলিতে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ বেগ পায়। বিদেশীদিগকে উপযুক্ত রাষ্ট্রিকরূপে গড়িয়া তোলা শহরের একটি বিশেষ সমস্যা। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের শহরসমূহ বেশী দিনের নহে অর্থাৎ লণ্ডন, পারি, বার্লিন প্রভৃতি শহরের পশ্চাতে যেমন কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস রহিয়াছে, ও তাহাতে এই সব শহর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলির পক্ষে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে শহরের নামগন্ধও ছিল না সেখানে বহু শহর গড়িতে হইয়াছে। সুতরাং তজ্জন্য অর্থ-সংস্থান, জল, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী ও সর্ব্বত্র ইস্কুল স্থাপন গুরু-ভার হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া শহরগুলিকে একদিকে যেমন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ভবিষ্যতের উন্নতির কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কতকটা উদাসীন থাকিতে হইয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলা ও অনেক অর্থব্যয় বা অর্থের অপব্যয় দেখা দিয়াছে। একটি শহর গড়িয়া তুলিতে বহু বৎসরের যত্ন ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহর সেইরূপ সময় পায় নাই। সুতরাং শহর-শাসনে যে সকল গলদের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেগুলির জন্য বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বরং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে শহরগুলি এরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। নানা প্রকার গলদ্ সত্ত্বেও কোন কোন শহর মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তব্য সম্পাদনে যে প্রকার উৎকর্ষ দেখাইয়াছে, তাহা প্রশংসার্হ। আলোর ব্যবহার, পুল নির্ম্মাণ ও অন্যান্য নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কোন কোন শহরের স্থান বেশ উচ্চে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে শহর গঠন সমস্যা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা এই কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, শত বৎসর পূর্ব্বেকার বহু গ্রাম আজ শহরে পরিণত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতার সার্থকতা

এতক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের কথা সমাপ্ত হইল। ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু উভয়ের কাঠামো তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, দুই দেশ এক ছাঁচে ঢালা নহে। উভয় দেশেই রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যান্য প্রকার নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেগুলি সমাধানের চেষ্টা দুই দেশ বিভিন্নরূপে করিয়াছে। জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত নানা গলদ্ আলোচনাকালে যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতার অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটির কথা বলিয়াছি এবং সেগুলির কারণ নির্দ্দেশেরও চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই যে প্রশ্নটা মনে জাগিতে পারে তাহা এই যে, এই সকল অসম্পূর্ণতা বা গলদের জন্য গণতান্ত্রিকতা কতটা দায়ী? অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম

করা না হইলে এই সকল দোষ দেখা যাইত কি না অথবা যে সকল দোষ দেখা দিত সেগুলি এতদপেক্ষাও গুরুতর হইত কি না। বলা বাহুল্য, সকলের নিকট হইতে এই প্রশ্নের এক প্রকার উত্তর পাওয়া সম্ভবপর নহে। এখানে মোটামুটি কতকগুলি বিষয় মাত্র নির্দেশ করা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাষ্ট্রনৈতিক গলদের জন্য গণতান্ত্রিকতা দায়ী নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে যে সকল দোষ দেখা যায় তাহার কতকগুলি যে গণতান্ত্রিকতার জন্য উদ্ভূত হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিস্তীর্ণ ভূভাগ হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রবাসীর হাতে আসিয়া পড়ে। ঐ ভূভাগ একদিকে যেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, অন্য দিকে উহার অপর্য্যাপ্ত শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইতে জনগণের তাড়াতাড়ি ধনী হইবার সুবিধাও তেমনি ছিল। বর্ত্তমান কালে কোন ইয়োরোপীয় দেশ বা দেশের আইন-প্রণেতাগণ এরূপ প্রলোভনের সম্মুখীন হন নাই। পশ্চিমাঞ্চলের বহু জনপদ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, কিন্তু বিরলবসতি। সুতরাং এরূপ স্থলে পুলিশের পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ কাজ তাহা সহজেই অনুমেয়। বাহির হইতে বিদেশীয়গণের আগমনের কথা ইতিপূর্ব্বে বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রে নবাগত বিদেশীদের লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রথমত ও প্রধানত বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেই সমাধান করিতে হয়। এই সকল ও অনুরূপ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নীতিতে যে সব দোষত্রুটি দেখা দিয়াছে সেগুলির জন্য গণতান্ত্রিকতাকে দায়ী করা চলে না। (১) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগে এরূপ শিথিলতা দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত অধিকার এবং কতক পরিমাণে সম্পত্তিগত অধিকার নিরাপদে রক্ষিত হয় না; (২) শহর-শাসনে, বিশেষত বড় বড় শহরের শাসনে, অযোগ্যতা, অমিতব্যয়িতা ও অবিচার দেখা যায়; (৩) সরকারী চাকুরীর মর্য্যাদা-রক্ষা হয় না ও চাকুরেদের মধ্যে জনসাধারণকে সেবা করিবার ভাবের অভাব লক্ষিত হয়; (৪) ধনী ব্যবসায়িগণ ব্যবস্থাপক সভাসমূহের উভয় শাখাতে অথবা ব্যবস্থাপক সভায় বা বিচারকের পদের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেন; (৫) যুক্তরাষ্ট্রে প্রখর বুদ্ধিশালী ও দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নাই, তথাপি এইরূপ লোকদিগকে রাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে দেখা যায় না;—এই গুলির কারণ ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কিন্তু সে সব কারণ প্রধানত রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে কাজে পরিণত করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে খুঁজিতে হইবে, গণতান্ত্রিকতার স্বরূপকে তজ্জন্য তত দায়ী করা সমীচীন হইবে না। ব্রাইসের মতে ১৮৩০ হইতে ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণ এরূপভাবে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন যে, ইতিমধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল আগাছা গজাইয়া উঠিয়াছিল সেগুলি দূর করিবার খেয়াল ছিল না। দেশের যাঁহারা সেরা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ এইরূপে ব্যাপৃত থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক গগন দূষিত হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল, আর সে জন্যই দল, চক্র প্রভৃতিতে নানা দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। গণতান্ত্রিকতা এই সকল দোষের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, গণতান্ত্রিকতা এই সকল দোষ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদূরিত করিতেও সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু অন্য কতকগুলি গলদের নাম করা যাইতে পারে যেগুলির জন্য একমাত্র অথবা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতাকে দায়ী না করিয়া উপায় নাই। গণতান্ত্রিকতার বলে

মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক দুর্বলতাসমূহও বিদূরিত হইয়া যায়, যুক্তরাষ্ট্রে এই বদ্ধমূল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিকতার মূলসূত্রগুলি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক কুফলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নীতিতে যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে।

সাম্যবাদের ভাল ও মন্দ।

যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়ানি ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে সকল ব্যক্তির সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাম্য-মন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণকে এরূপভাবে অভিভূত করিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যেক কার্য্যের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা ও সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেও বেশী কিছু মর্য্যাদা না দেওয়া রীতি দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রবাসিগণের কর্ম্ম-সামর্থ্য বাড়িয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে যোগ্য ব্যক্তিও যথোচিত সম্মান ও সমাদর পান নাই। জনগণের সর্ব্ব-কর্তৃত্বও এরূপভাবে স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হইয়াছে যে, এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রে সাক্ষাৎভাবে জনগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কর্ম্মচারী এক্ষণে একমাত্র জনগণকেই নিজেদের সাক্ষাৎ নিয়োগ-কর্তারূপে বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত, আর জনগণ শাসন-ব্যাপারে এইরূপ অংশ গ্রহণ করাকে নিজেদের অধিকারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রয়োগ দ্বারা কোন উপকার হয় নাই একথা মনে করিলে ভুল হইবে। এখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে পার্থক্য ও তজ্জন্য বিদ্বেষ গুরুতর আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই জন্য ঘরোয়া যুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল অতি সহজে অল্পকালের মধ্যে একত্র হইতে সমর্থ হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ ও নীচ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে স্থায়ী কোন সীমারেখা নাই বলিয়া, সেখানে হঠাৎ বিদ্রোহ এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। দরিদ্র ব্যক্তির ধনলাভের বা উচ্চ সম্মানলাভের কোন বাধা এস্থানে নাই। ইহাতে সাধারণ-ভাবে জনগণের মনে শান্তিপ্রিয়তা এবং অন্যের ব্যক্তিগত বা সম্পত্তিগত অধিকারকে যথোচিত মর্য্যাদা দিবার ইচ্ছার স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। আমেরিকা মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ শক্তিশালী দেশ হইলেও ঐ ভূভাগের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অনগ্রসর দেশ-জয় সম্বন্ধে উহার নির্লোভতা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মনে স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব এরূপ প্রবল যে, নবাগত লক্ষ লক্ষ লোককে এই দেশে যত সহজে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ ইহার ফলে, নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভবে যুক্তরাষ্ট্রকে কম ভুগিতে হয় নাই।

সত্য বটে, গণতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তনে যে উচ্চ ধরণের আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করা হইল বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকামিগণ মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে ও তাঁহাদের সকল আশা পূর্ণ হয় নাই, তথাপি একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আদর্শটিকে খুব উঁচু করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়াই, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নীতির গলদগুলি এরূপ বৃহৎ আকারে চোখে ঠেকিতেছে। কিন্তু আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি সভ্য দেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রকে তত খাটো মনে হইবে না, বরং কোন কোন দিকে উহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে একটি কথা এই বলা

চলে যে, আদর্শ বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইহারা যথাযথভাবে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি খাটাইতে না পারিলেও, ব্যক্তিদের যথার্থভাবে চিনিবার শক্তি ইহাদের আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশে কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুবিচার করার চেয়ে ব্যক্তি সম্পর্কে সুবিচার করার শক্তির দাম অনেক বেশী। গণতন্ত্রে যথার্থ নেতার যেরূপ প্রয়োজন এরূপ আর কোথাও নহে। জনগণ সেখানে উপযুক্ত নেতার অধীনে চালিত হইয়া দেশের কাজ নিয়ন্ত্রিত না করিলে, স্বদেশের মঙ্গল-সাধন সম্ভবপর হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতার আতিশয্যের কুফলসমূহ।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দোষের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা অতিমাত্র গণতান্ত্রিকতা। ব্যবহারের দিক্ হইতে ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়াছে। কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন, ব্যবস্থার ভালমন্দ নির্দ্দেশকরণ প্রভৃতি যদি সব কাজই ক্রমাগত জনগণের হাতে অর্পণ করা যায়, জনগণকে বারে বারে যদি ভোট দিয়া নিজেদের মতামত জানাইতে হয়, তাহা হইলে জনগণের পক্ষে কখনও সে কাজ সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ হয় না। জনমত সুগঠিত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় ও অবকাশের প্রয়োজন। সেই সময় ও অবকাশের অভাব ঘটিলে জনমতকে বিপথে চালিত করিবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মচারীদিগকে অল্পকালের জন্য নিয়োগ করিবার ক্ষমতা হাতে থাকিলেই যে জনগণ যথার্থ শক্তির সহিত শাসনকার্য্য চালাইতেছে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। ব্রাইস্ এ বিষয়ে যে সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পদে সাতজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে হইলে ভোটদাতাগণ মুস্কিলে পড়ে। প্রত্যেকের গুণাগুণ বিচার করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায়, তাহাদিগের দলের নির্দ্দেশ মত চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহারা যদি শুধু একজনকে নির্ব্বাচন করে ও সেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তির হাতে অন্য ছয় জনের মনোনয়নের ভার দেয়, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। এই ব্যক্তি যেমন ছয়জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন, উঁহারা অনুপযুক্ত হইলে উঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। দায়িত্ব একব্যক্তির হওয়াতে তিনি সর্ব্বদাই যোগ্য ব্যক্তির অন্বেষণে সচেষ্ট হইবেন, ইহা আশা করা যায়। কারণ অযোগ্য ব্যক্তিকে লইলে তজ্জন্য জনগণের নিকট তাঁহাকেই জবাবদিহি করিতে হইবে। জনগণের তাঁহার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিবার ক্ষমতা থাকায়, তাহারা প্রকারান্তরে তাঁহার ও অন্য ছয়জন কর্ম্মচারীর উপরও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় এই প্রথা অনুসৃত হইলেও, যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ইহা গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ গণতন্ত্রে শাসন-কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টিকে দায়ী করিতে না পারিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফ্রান্সে অথবা বিলাতে ক্ষুদ্র একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মন্ত্রি-সমিতির হাতে আইন ও শাসন-সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যৌথরাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এরূপ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যে, কোন কার্য্যের জন্য দায়ী করিবার মত লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হয়। যৌথরাষ্ট্রে রাষ্ট্র-নেতা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসকদের দায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইলেও ইঁহাদের ক্ষমতা-সমূহ নানাপ্রকারে এরূপ বিভক্ত যে, ইঁহাদিগকেও সম্পূর্ণ দায়ী করা অসঙ্গত। অনেক স্থলে, প্রকৃত ক্ষমতা দলের অথবা দলের অন্তর্গত কোন চক্রের হাতে থাকে,—উহাদের

হুকুমে দেশের সকল প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাতে যে নানারূপ কুফল ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নেতাকে বিশেষ শক্তিশালী করা হইয়াছে। আশঙ্কা ছিল যে, এক ব্যক্তির হাতে এত ক্ষমতা দিলে তাহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা হইবে, সেইজন্য তাঁহাকে দমন করিবার অস্ত্রও হাতে থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা সেই অস্ত্র। রাষ্ট্র-সভার অস্তিত্বের ফলে রাষ্ট্র-নেতার ক্ষমতা কমে নাই। পরন্তু এক্ষণে রাষ্ট্র-নেতা যদি দেশের দুঃসময়ে দেশ-হিতের জন্য নিজ ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তিনি জনগণের আনুকূল্য লাভ করেন।

যৌথরাষ্ট্রের নেতা সম্বন্ধেই শুধু একথা খাটে। রাষ্ট্র বা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে খাটে না। সেখানে আবার গণতান্ত্রিকতার আতিশয্য দেখা যায়। একে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে বহু শত কর্ম্মচারী জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, তদুপরি ইঁহাদের অধিকাংশ যথেষ্ট বেতন পান না; সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে কর্ম্মপটুতা অথবা প্রণালীবদ্ধ কর্ম্মপন্থা আশা করা বৃথা। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য ভাল অথবা যোগ্য লোক নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেই সকল লোককে কম বেতনে পাওয়া দুষ্কর। পদের স্থায়িত্ব থাকিলেও বরং অনেক ঐরূপ লোক পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রতিপদে তাঁহাদিগকে জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাঁহাদের পদের স্থিরতাও থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক শ্রেণীর লোককেই রাষ্ট্রনীতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রিকের অধিকারসমূহ যেমন স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রিক তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করিলে, তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাসন-কার্য্যের অংশ লইবার জন্য প্রার্থী হইতে হইবে, যদিও আইনের চোখে এ বিষয়েও প্রত্যেক রাষ্ট্রিক যুক্তরাষ্ট্রে যোগ্য বিবেচিত হয়। বস্তুত, যাঁহারা শাসন-কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিলে ভাল হইত, তাঁহারা যে নানা কারণে তাহা করেন না তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্র-নীতিতে তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়েন না। বর্ত্তমান সময়ে ধনী ও বড় ব্যবসায়িগণ যুক্তরাষ্ট্রে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ইহাও গণতান্ত্রিকতার আতিশয্যের পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে,—একদল লোক সাক্ষাৎভাবে শাসন-কার্য্যের অংশ না লইয়া ও তজ্জন্য কোন প্রকারে দায়ী না থাকিয়াও আইন ও শাসন-প্রথাকে রূপান্তরিত করিতে পারেন। ইহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নগর-শাসন কোন কোন স্থানে অবনত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ।

তবে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা আশার কথা এই, বহু প্রকার দোষ থাকা সত্ত্বেও এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত সাম্যের কোন সংঘর্ষ বাধে নাই। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র যেমন জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় সকল প্রকার ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রিককে সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ রাষ্ট্রিকের মনে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অপ্রবৃত্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহারই উপর রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেরই নিজ মতবাদ বা কর্ম্মপন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, গ্রাম্য ও নাগরিক শাসন-যন্ত্রে কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা এক্ষণে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু যাহা নির্দ্দেশ করা সম্ভব তাহা এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব কোনরূপে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। জগতের অন্যতম শক্তিশালী দেশরূপে যুক্তরাষ্ট্র এখনো বহুকাল ধরিয়া নানা দিকে জগতের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে বলিয়া মনে হয়।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড

পূর্ব্ব ইতিহাস

সুইট্‌জারল্যাণ্ড অতি ক্ষুদ্র দেশ। ইহার আয়তন মাত্র ১৫,৯৪০ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা ৪০,১৮,৫০০। অর্থাৎ আকারে ইহা বাংলা দেশের মৈমনসিংহ, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলাসমূহ একত্রে যত বড় তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, আর লোকবলে এক মৈমনসিংহ জিলা (৪৮ লক্ষ) ইহার চেয়ে বড়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের আকার ও লোক-বলের ইহা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু ছোট দেশ হইলেও গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। যৌথরাষ্ট্ররূপে এই ক্ষুদ্র দেশে যেরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং ইহার গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, অন্য কোথাও আর সেরূপ দেখা যায় না। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইতালি এই তিন পরাক্রান্ত দেশের দ্বারা চতুর্দ্দিকে সীমাবদ্ধ থাকিয়া এই দেশের লোকেরা পাহাড় ও উপত্যকা উভয় স্থানেই বাস করে। রাইন, পো ও ড্যানিয়ুব্‌-ইয়োরোপের এই তিনটি প্রসিদ্ধ নদীর উৎপত্তিস্থল সুইট্‌জারল্যাণ্ড। আবার জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান্‌ এই তিন জাতি লইয়াই এই দেশ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ২২টি ক্যান্টন বা রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯টির অধিকাংশ অধিবাসী জার্ম্মাণ, ইহাদের সংখ্যা ২৭,৫০,৬২২ (১৯২০ সন); পাঁচটি ফরাসী প্রধান, ফরাসীভাষী লোকসংখ্যা ৮,২৪,৩২০; একটি ইতালিয়ান্‌ প্রধান, ইতালীয়ভাষীদের সংখ্যা ২,৩৮,৫৪৪; ইহা ছাড়া রোমান্সভাষী ৪২,৯৪০ ও অন্যান্য ভাষাভাষী ২৩,৮৯৪ জন আছে। ধর্ম্মের দিক্‌ হইতে ১৯২০ সনের ১লা ডিসেম্বর প্রটেষ্টাণ্টদের সংখ্যা ছিল ২২,৩০,৫৯৭ (৫৭%) আর রোমান ক্যাথলিকদের ১৫,৮৫,৩১১ (৪১%), ইহুদীদের ২০,৯৭৯ (০.৫%)।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

এক কথায় বলা যাইতে পারে, যতগুলি কারণে দেশের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বা জাতিতে জাতিতে অনৈক্য ঘটিতে পারে তাহার অনেকগুলি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বর্ত্তমান। সুতরাং জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষার জন্য যদি এই রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইত অথবা স্বদেশ-প্রেম যথেষ্ট বিকশিত না হইত, তাহা হইলে তাহা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু সুইস্‌ জাতি এই সকল বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা সত্ত্বেও একত্র গ্রথিত ও ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তিশালী জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমুদায় বৈচিত্র্য ও অনৈক্যকে স্বীকার করিয়াও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এই রাষ্ট্রনৈতিক একত্ববোধ ও একত্র কাজ করিবার শক্তি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য বস্তু, সন্দেহ নাই।

১২৯১ সনের ১লা আগষ্ট আল্পস্‌ উপত্যকায় অবস্থিত উরি, স্বোইট্‌স্‌ ও নিম্ন উন্টেরহ্বাল্‌ডেন একত্র একটি চিরন্তন সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হয়। উত্তরের নিম্নভূমিস্থ জমিদার-শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই তিন জনপদে কর আদায়ের কড়াকড়ি করায়, উহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিবার

জন্য দলবদ্ধ হইয়া কর দিতে অস্বীকার করে। ইহারা তৎকালীন হোহেনষ্টাউফেন বংশীয় সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলেও, জমিদারদের আক্রমণ পর পর ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই তিন স্থানের লোকেরা সে সময়ে তাহাদের নিজেদের ক্ষেতের শস্য, বনের কাঠ ও গোচারণ-ভূমি জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিত। সমুদায় জনগণের একত্র হইয়া শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা দস্তুর ছিল—প্রত্যেক গৃহস্থকে সমতুল্য বিবেচনা করা হইত। এইরূপে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।

সুইট্জারল্যাণ্ডে গণ-তন্ত্রের গোড়াপত্তন।

ইহার পর ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য জনপদসমূহ ও কয়েকটি শহর (যেমন জুইরিখ, লুসার্ণ, ব্যর্ণ প্রভৃতি) এই দলের মধ্যে প্রবেশ করে—এগুলি পরস্পরের সহিত কোন বোঝাপড়া না করিয়া সম্মিলিত হয়। ১৩৫৩ সনে ব্যর্ণ এই দলের মধ্যে প্রবেশ করার পর এইরূপ মিলিত রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮। ১৫১৩ সনে এইরূপে ১৩টি যূথবদ্ধ রাষ্ট্র দেখা দেয়। এই রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষার্থ পরস্পরের সাহায্য করিতে মিলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব স্ব প্রধান ছিল। তখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্র গ্রথিত হইয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। সমুদায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতেন, কিন্তু মাথার উপরে কোন কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ ছিল না এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ স্বীয় রাষ্ট্রের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। সমবেত প্রতিনিধিগণ সকলে একমত হইলে, কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইত, শুধু অতিজন উহার পক্ষে থাকিলে যথেষ্ট হইত না; কারণ উনজনকে অতিজনের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করাইবার কোন যন্ত্র ছিল না। সভায় প্রতিনিধিগণ কখন একত্র মিলিত হইবেন তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকায় বিশেষ অসুবিধা ত হইতই; উপরন্তু সমুদায় রাষ্ট্র কোন বিষয়ে একমত হইলেও তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ ছিল না, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনা হইতে উহা অবলম্বন করিলে একমত হওয়ার সার্থকতা ঘটিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছানুসারে আভ্যন্তরীণ কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিত। অন্য কোন রাষ্ট্র বা কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। সকল রাষ্ট্রে যে এক প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। কোন কোনটিতে সাক্ষাৎভাবে জনগণের উপর কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত ছিল,—এগুলি প্রধানত গ্রাম; অন্য কোন কোনটিতে জনগণের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কতকগুলি রাষ্ট্র যুদ্ধফলে কোন কোন ভূভাগ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—এই সব ভূভাগের অধিবাসিগণ রাষ্ট্রিকদের মত কোন সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পাইত না এবং রাষ্ট্রসমূহ ইহাদের উপর রীতিমত প্রভুত্ব করিত।

এই যূথবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুসারে ১৬৪৮ সনে রোমান ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের (হোলি রোমান এম্পায়ার) অধীনতা পাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুইট্জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই দিন বিশেষ স্মরণীয়, কারণ প্রকৃত পক্ষে এই দিনেই ভাবী সুইট্জারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ১৬৪৮ সনে ১৩টি রাষ্ট্র যে একত্র মিলিত হইয়া এক যৌথরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নহে; ঐ সময়েও উহারা স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য এরূপ দুর্ব্বল ছিল যে, তাহা যে কোন

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের স্বাধীনতা ঘোষণা।

মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। তথাপি, এই স্বাধীনতা ঘোষণা ও ১৩টি রাষ্ট্রকে একটি রাষ্ট্র-সঙ্ঘ (কনফিডারেশন) রূপে স্বীকার করার ফলে যে একটি অখণ্ড যৌথরাষ্ট্রের উদ্ভাবনার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা মনে করা যাইতে পারে।

তারপর দেখা দিল ফরাসী বিপ্লব। ১৭৮৯ সনে ইয়োরোপের বক্ষের উপর দিয়া ফরাসী বিপ্লব ঝঞ্ঝার মত বহিয়া গেল। এই সময়ের যুদ্ধবিগ্রহে সুইট্‌জারল্যাণ্ডও যোগদান করে এবং তাহার ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৯৮ সনে ফরাসী সৈন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ড দখল করে। ফরাসীরা এই দেশ জয় করিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বাতিল করিয়া দেয়। তৎস্থলে ফরাসী আদর্শে হেলবেটিক গণতন্ত্র জোর করিয়া স্থাপিত করা হয়। এই গণতন্ত্র ২৩টি রাষ্ট্রে (ক্যাণ্টন) বিভক্ত হইলে, এক একটি রাষ্ট্র এক একজন শাসক (প্রিফে) এর অধীনে আসে। রাজধানী লুকার্ণোতে স্থানান্তরিত হয়। বাহ্যত সুইস্ জনগণ নিজ দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে থাকিলেও, সুইট্‌জারল্যাণ্ড ফ্রান্সের অধীন একটি দেশে পরিণত হইয়াছিল।

ফরাসীর অধীনতায় সুইট্‌জারল্যাণ্ড।

বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা সুইস্‌দের মনঃপূত হয় নাই। প্রথমত এরূপ একীকৃত শাসন-ব্যবস্থা সুইস্ প্রকৃতির অনুকূল ছিল না। দ্বিতীয়ত, সুইস্‌রা বহুকাল যাবৎ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল বলিয়া ফ্রান্সের প্রভুত্ব তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। ফলে নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। কোন কোন স্থলে এই বিদ্রোহ দমনে ফরাসীরা বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের হাতে যখন ফ্রান্সের শাসন-ভার আসিল, তখন তিনি সুইস্‌দিগকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। অনেক রাষ্ট্রনৈতিক বাক্-বিতণ্ডার পর ১৮০২ সনের ২০ মে তারিখে এক রাষ্ট্রীয় কাঠামো খাড়া করা হইল। এই উপলক্ষে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রথম জনগণের "নাকচ্ ক্ষমতা জাতীয় আইন-প্রণয়নে প্রযুক্ত হয়। নেপোলিয়ান সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জন্য যে কাঠামো তৈরী করিলেন তাহা ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক সকল রাষ্ট্রিকঁ কর্তৃক মঞ্জুর হইবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। যাহারা ভোট দিতে সমর্থ ছিল তাহাদের ভোটগ্রহণের ফলে দেখা গেল যে ৭২,৪৫৩ জন কাঠামোর পক্ষে এবং ৯২,৪২৩ জন বিপক্ষে ভোট দিয়াছে, কিন্তু ১,৬৭,১৭২ জন কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই। তখন এই কথা ঘোষণা করা হয় যে, যাহারা ভোট দেয় নাই, তাহারা প্রকারান্তরে কাঠামো-আইনকেই সমর্থন করিয়াছে। অতএব কাঠামো-আইন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ কাঠামোও সুইস্‌গণের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তখন নেপোলিয়ান সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পুনরায় এক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ প্রবর্ত্তন করিলেন (১৮০৩)। সমুদায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি মহাসমিতির ব্যবস্থাও হইল। পূর্ব্বে যে ১৩টি রাষ্ট্র ছিল, তাহার সহিত আরো তিনটি রাষ্ট্র যুক্ত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রসমূহ হইতে আরও তিনটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই ব্যবস্থা সুইস্‌দের পক্ষে তত অপ্রীতিকর হয় নাই এবং ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

১৮১৫ সনে নেপোলিয়ানের পতনের পর অষ্ট্রিয়া, গ্রেটবৃটেন, পর্ত্তুগাল, প্রুশিয়া ও রুশিয়া ভিয়েনা কংগ্রেস দ্বারা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের চিরন্তন নিরপেক্ষতা ও উহার ভূভাগের একতা

স্বীকার করিয়াছে। সেই সময়, কতকগুলি নিয়মের মধ্যে সুইস্‌দিগকে নিজ দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফরাসী-আধিপত্য-কালে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যে স্বাধীনতা অপহৃত হয়, তাহা তাহারা এই সময়ে বহু পরিমাণে ফিরিয়া পায়। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মহাসমিতি এক্ষণে নিয়মমত বসিতে লাগিল ও একটি শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ খাড়া করা হইল। এই সঙ্ঘের শাসন-কার্য্য চালাইবার ভার পড়িল জ্যুইরিখ, লুসার্ণ ও বার্ণের উপর—এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি দুই বৎসর করিয়া সে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। কিন্তু এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা যুদ্ধের সময়ে ব্যতীত শক্তিশালী হইতে পারে না। সুতরাং ইহা রাষ্ট্রের দৃঢ়তা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। ১৮১৫ সনের পর।

এ ব্যবস্থা ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত চলিল। যূথবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের মহাসমিতিতে (ডিয়েট্) যে সকল প্রতিনিধি আসিতেন, তাঁহারা সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরূপে আসিতেন না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হইয়া আসিতেন। সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশীল রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-দূতরূপে ইঁহারা গণ্য ছিলেন। সুতরাং একমাত্র নিজ নিজ রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারেই ইঁহারা কাজ করিতেন। ১৮১৫ সনের পর সুইট্‌জারল্যাণ্ডে দুইটি দলের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ বাধে। এক দল সঙ্ঘের পক্ষপাতী,—রক্ষণশীল রাষ্ট্রসমূহ এই দলের অন্তর্গত ছিল। অন্য দল বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্ব বিনষ্ট করিয়া সমুদায় রাষ্ট্র লইয়া এক অখণ্ড একীকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর ধরিয়া এই দুই দলে বহু তর্কবিতর্ক চলে ও কোন কোন রক্ষনশীল রাষ্ট্র সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে। ১৮৬৪ সনে এই ব্যাপার লইয়া ৭টি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী রাষ্ট্র সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইয়া এক সশস্ত্র সঙ্ঘ (জোণ্ডেরবুণ্ড) খাড়া করিতে সমর্থ হয়। অতিজন রাষ্ট্রসমূহ যাহাতে কোন প্রকারে ক্যাথলিকদের অধিকার ও সুবিধাসমূহ খর্ব্ব করিতে না পারে তজ্জন্য ইহারা ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া এই দুই ক্যাথলিক শক্তিকেও সাহায্যার্থ আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহ ইহাতে ভীত হইয়া সঙ্ঘের মহাসমিতির সাহায্যে ঘোষণা করিল যে, সশস্ত্র সঙ্ঘকে বাতিল করা যাইতেছে। ইহাতে উভয় পক্ষে ঘরোয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়,—তবে এ যুদ্ধ অল্পকালস্থায়ী ছিল ও ইহাতে রক্তপাত হয় নাই। যুদ্ধে ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহ সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হয় ও উহাদের সঙ্ঘকে ধ্বংস করা হয়। ইহারা ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে প্রত্যাশিত সাহায্য পায় নাই, কারণ তখন উভয় দেশেই আত্ম-বিপ্লবের সম্ভাবনা হইয়াছিল। এইরূপে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইল। সমগ্র সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডের উপযোগী এক রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সুতরাং ১৮৪৮ সনে মহাসমিতি এক কাঠামো-আইন প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। ১৮৪৮ সনে যৌথরাষ্ট্র-রূপে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন।

ঘরোয়া যুদ্ধে একটি বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় সুইসেরা তাহাদের রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল। তাহারা বুঝিল যে রাষ্ট্রসমূহের শুধু যূথবদ্ধতা যথেষ্ট নহে, তাহার মধ্যে যথোচিত শক্তিসঞ্চার করাও আবশ্যক। যুদ্ধের ফলে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, উনজনকে যথোচিত ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের দাবী ও অধিকারগুলিকে যথাসাধ্যভাবে মিটাইতে হইবে। এই সকল অভাব প্রতীকারের জন্য মহাসমিতি কাঠামো-

আইন তৈরী করিবার ভার এক সমিতি নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর দেয়। এই সমিতি যে কাঠামো-আইন প্রণয়ন করে তাহা ১৮৪৮ সনে সকল রাষ্ট্র কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে পর গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, এই আইন দুই প্রবল পক্ষের মধ্যে রফার ফল। সুতরাং একদিকে ইহাতে যেমন নব নব চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি প্রাচীন রীতিনীতি রক্ষার প্রয়াসও আছে। ১৮৪৮ সনের এই আইনের ফলে, আগে যেখানে কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের এক সঙ্ঘ বর্ত্তমান ছিল, সেখানে এক যথার্থ যৌথরাষ্ট্র দেখা দিল। অর্থাৎ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব যে পরিমাণে অন্তর্হিত হইল, সেই পরিমাণে উহার জাতীয় বা কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু ১৮৪৮ সনের আইন দ্বারা যৌথরাষ্ট্রের হাতে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হইল সেগুলিও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত ২২টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আত্মকর্ত্তৃত্ব যৌথরাষ্ট্রের মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া গেল না। পররাষ্ট্র ও সৈন্যচালনা এবং ডাক, শুল্ক, ওজন প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়ে মাত্র যৌথরাষ্ট্র সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রকাশের সুযোগ পাইল, অন্য সর্ব্বত্র ইহা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ হইয়াই রহিল। কিন্তু ইহার পর ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই কাঠামো-আইন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রবণতা ক্রমাগত বেশী পরিমাণে দেখা দেয়। একদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ যেমন স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা দরকার হইয়া পড়িল, অন্যদিকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবও বোধ হইতে লাগিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিচার-প্রথা প্রচলিত ছিল—তৎস্থলে সমুদায় রাষ্ট্রে এক ধরণের বিচার-প্রথা প্রবর্ত্তন করা ও যৌথ বিচারালয় স্থাপন করা আবশ্যক বোধ হইল। রেলওয়েসমূহকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা ও সমুদায় সুইস্ জনগণের জন্য একরূপ আইন-প্রণয়ন অভীপ্সিত হইয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ সহজে নিজেদের ক্ষমতা-হ্রাস বিষয়ে সম্মতি দেয় নাই। সেইজন্য ১৮৪৮ সনের পর ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে কাঠামো-আইনকে যথোচিতভাবে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর হয় নাই।

১৮৭৪ সনের পরিবর্ত্তিত কাঠামো-আইন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৭৪ সনে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা ১৮৪৮ সনের কাঠামো-আইনকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইল। একটি নূতন কাঠামো-আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হইলে উভয় শাখা তাহা মঞ্জুর করিল। তখন ঐ খসড়া জনগণের প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা গৃহীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই কাঠামো-আইনই সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মূল রাষ্ট্রীয় আইনরূপে প্রবর্ত্তিত আছে, অবশ্য ইহার পরও মাঝে মাঝে ইহার সংশোধনী হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই।

১৮৭৪ সনে যে কাঠামো-আইন গৃহীত হয়, তাহা একেবারে নূতন না হইলেও, অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যৌথ ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা মনে রাখিতে হইবে যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা ক্রমাগত কমিয়া ও যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়া থাকিলেও, যেখানে

স্পষ্টভাবে যৌথরাষ্ট্রের উপর কোন ক্ষমতা বা অধিকার অর্পিত হয় নাই, সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সর্ব্বকর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য আছে। আমেরিকার যৌথরাষ্ট্রের মত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্র মাত্র সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী যেগুলি স্পষ্টরূপে উহাকে অর্পণ করা হইয়াছে। অন্য সমুদায় ক্ষমতা রাষ্ট্রসমূহের হাতে আছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এখানে যৌথরাষ্ট্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হইতেই নিজ ক্ষমতা পাইয়া থাকে। নিজ এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ সর্ব্বকর্তৃত্বশীল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র শুধু তিনটি নিষেধ মানিয়া চলিলে নিজ কাঠামো-আইন-প্রণয়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ। এই তিনটি নিষেধের কথা পরে বলা হইবে।

১৮৭৪ সনের কাঠামো-আইন সম্বন্ধে গোড়াতেই এই কথা বলা চলে যে, উহা ১৮৪৮ সনের আইন হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, মূলত উহা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিকে বদ্‌লায় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসমূহ আজও বহু বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু ঐ আইন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্র-স্বরূপকে দৃঢ়তর ও অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান কাঠামো-আইন

১৮৭৪ সনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনটি তিনটি পরিচ্ছেদে ও ১২৩টি ধারায় বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে (৭০টি ধারা) সাধারণভাবে কতকগুলি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (১) যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা,—(ক) জাতীয় সভা (৮টি ধারা), (খ) রাষ্ট্র-সভা (৪টি ধারা), (গ) যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক-সভার ক্ষমতা (১১টি ধারা), (২) যৌথরাষ্ট্র সভা (১০টি ধারা), (৩) যৌথরাষ্ট্র চ্যান্সালারি (১টি ধারা), (৪) যৌথরাষ্ট্র বিচারালয় (৯টি ধারা), (৪ক) যৌথরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, (৫) বিবিধ (৩টি ধারা); এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের সংশোধন (৬টি ধারা) সন্নিবিষ্ট আছে। যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন।

কাঠামো-আইনের প্রথম ধারা অনুসারে সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ড যৌথরাষ্ট্র ২২টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রকে দুই ভাগ করিয়া ছয়টি অর্দ্ধরাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সর্ব্বকর্তৃত্বশীল বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারায় এইভাবে সংঘবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। "বিদেশীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রজাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা এবং সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টা" সংঘবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্য। তৃতীয় ধারা দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সীমাবদ্ধ সর্ব্বকর্তৃত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো দ্বারা কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা খণ্ডিত হয় নাই, সেখানে ঐ রাষ্ট্র সে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং "যৌথরাষ্ট্রকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই তাহার সমুদায় অংশ রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে।" পঞ্চম ধারায় রাষ্ট্রসমূহের ভূমি, সীমাবদ্ধ সর্ব্বকর্তৃত্ব, কাঠামো-আইন, জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার এবং জনগণ কর্ত্তৃক অর্পিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধিকার ও ক্ষমতায় যৌথরাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, উল্লিখিত আছে।

আসলে সুইট্‌জারল্যাণ্ড কতকগুলি গণতন্ত্রের সমষ্টীভূত রূপ অথবা কতকগুলি গণতন্ত্র মিলিত হইয়া এক যৌথ গণতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন গণতন্ত্রের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যেক রাষ্ট্র যৌথরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার দাবী করিতে পারে যে, উহার নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রকার অঙ্গীকার পাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তিনটি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিধি নিষেধগুলি নিম্ন প্রকার :

যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা-সমূহ।

(১) যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের বিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না ;

(২) কোন রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণয়নে বা অন্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে স্বারাজ্যনীতি—সাক্ষাৎ গণতান্ত্রিক অথবা প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা—উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে ;

(৩) কোন রাষ্ট্রের জনগণ দ্বারা সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন গৃহীত হওয়া আবশ্যক এবং এরূপ ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রিকগণের অতিজন উহার সংশোধনী আনিতে চাহিলে উহা সংশোধিত হইবার উপায় আছে। (ষষ্ঠ ধারা)

রাষ্ট্রনৈতিক সমুদায় ক্ষমতার কতক যৌথরাষ্ট্রের হাতে, কতক যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে এবং কতক উভয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে একযোগে অর্পিত আছে।

যৌথরাষ্ট্রের কতকগুলি ক্ষমতা নিম্নরূপ :

(ক) পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা।

(খ) যুদ্ধঘোষণা ও যুদ্ধবিরতি এবং বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধিস্থাপন, বিশেষত শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সন্ধিস্থাপন (অষ্টম ধারা)।

(গ) স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতকে বিদেশে প্রেরণ ও বিদেশীয় রাষ্ট্রদূতকে স্বদেশে গ্রহণ।

(ঘ) সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সৈন্যবল শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ; তবে সৈন্যসমূহকে যে সর্ব্বদা সজ্জিত রাখা হইবে এমন কোন নিয়ম নাই (ত্রয়োদশ ধারা), কিন্তু প্রত্যেক সমর্থ সুইস্ পুরুষকে সৈন্যের কাজ শিখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে (অষ্টাদশ ধারা)। এই শেষোক্ত ধারাতে সৈন্যদের বিশেষ অধিকার ইত্যাদির কথাও বর্ণিত আছে। উনবিংশ ধারাতে যৌথ সৈন্যের বিশ্লেষণ ও বিপদের সময়ে যৌথ সৈন্য ব্যতীত অন্যান্য লোকদের বা দ্রব্য-সম্ভারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্রে অর্পিত আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সৈন্য নিয়ন্ত্রণ করিবার নিয়মাবলীও যৌথরাষ্ট্র প্রণয়ন করে (বিংশ ধারা)।

(ঙ) পূর্ত্ত কার্য্যে সহায়তার জন্য অর্থব্যয়। সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ড অথবা উহার এক বৃহৎ অংশ সম্বন্ধীয় পূর্ত্ত কার্য্য বুঝিতে হইবে। (ত্রয়োবিংশ ধারা)।

(চ) নদীর তীরসমূহ ও বনবিভাগ প্রভৃতি রক্ষার নিমিত্ত পুলিশের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ। যেখানে নদীর তীর বাঁধিয়া বা অন্য প্রকারে রক্ষা করিতে হয় সেখানে তাহা করা ও জিলায় জিলায় সরকারী বন তৈরী করার ভার যৌথরাষ্ট্রের উপর অর্পিত আছে (চতুর্বিংশ ধারা)

(ছ) জল-শক্তির ও বৈদ্যুতিক শক্তির সদ্ব্যবহার। জনগণের ব্যবহারের সৌকর্য্য সাধন নিমিত্ত জল-শক্তির যথোচিত নিয়ন্ত্রণ যৌথরাষ্ট্রের কাজ। অবশ্য যৌথকর্ত্তৃপক্ষ যাহাকে ইচ্ছা এই শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে সুবিধা দান করিতে পারে (২৪ক ধারা)।

(জ) নদী, খাল, দরিয়া প্রভৃতিতে নৌচালনা (২৪খ ধারা)।

(ঝ) রেল নির্ম্মাণ ও চালনা বিষয়ে আইন-প্রণয়ন (২৬শ ধারা)।

(ঞ) যৌথ বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত অন্য বিদ্যালয় স্থাপন (২৭শ ধারা)।

(ট) সামুদ্রিক বাণিজ্য (আমদানি রপ্তানি) শুল্ক স্থাপন (২৮শ ধারা)।

(ঠ) শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয় গ্রহণ (৩০শ ধারা)।

(ড) ফ্যাক্টরিসমূহে শিশু-শ্রম, কাজের সময় নিরূপণ, ব্যাধি ও দৈব বীমা আইন, শিল্প ও ব্যবসার নিমিত্ত সর্ব্বত্র একরূপ আইন প্রণয়ন অথবা নিয়ন্ত্রণ (৩৪শ, ৩৪ ক, ৩৪ খ, ৩৫শ ধারা)।

(ঢ) ডাক ও তার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র ডাক ও তার বিভাগের ন্যায্য হার প্রবর্ত্তিত আছে। আর উহা হইতে যে আয় হয় তাহা যৌথরাষ্ট্র পাইয়া থাকে। চিঠি ও তারের গোপনীয়তা সর্ব্বদা রাখিতে হয়। (৩৬শ ধারা)।

(ণ) রাস্তা, পুল প্রভৃতি রক্ষা (৩৭শ ধারা)।

(ত) অটোমবিল ও সাইকেল নিয়ন্ত্রণ (৩৭ ক ধারা)।

(থ) উড়ো জাহাজ নিয়ন্ত্রণ (৩৭ খ ধারা)।

(দ) মুদ্রা-তৈরী, মুদ্রা-নীতির প্রবর্ত্তন ও বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ (৩৮শ ধারা)।

(ধ) ব্যাঙ্ক নোট ও অন্যান্য প্রকার মুদ্রার প্রচলন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহাও উল্লিখিত আছে (৩৯শ ধারা)।

(ন) ওজন ইত্যাদি নির্দ্ধারণ (৪০শ ধারা)।

(প) বারুদ তৈরী ও বিক্রয় (৪১শ ধারা)।

ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন, পীড়া, মাছধরা, শিকার, খাদ্যের জন্য পশু হত্যা সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ প্রভৃতি বিষয়ে যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে। উপরোক্ত সমুদায় ক্ষমতা একমাত্র যৌথ কর্ত্তৃপক্ষের হাতেই আছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আলাদা কোন স্বাধীনতার পরোয়ানা (বিল্ অব্ রাইটস্) নাই। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের প্রথম পরিচ্ছেদের বিভিন্ন স্থানে এই সকল অধিকারের স্বীকৃতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডেরও রাষ্ট্রিক বটে, কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রে অরাষ্ট্রিককে রাষ্ট্রিকতা দান সম্বন্ধে সুইস্ যৌথরাষ্ট্র চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। তবে যৌথরাষ্ট্র কখনো এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে নাই, সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভাগ এ বিষয়ে নিজেরাই আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করিয়াছে। আইনের চোখে সমুদায় সুইস্ জনগণ সমান; সুইট্‌জারল্যাণ্ডে

কাহাকেও প্রজা আখ্যা দেওয়া যায় না; জন্ম, বংশ, প্রভৃতির জন্য বা অন্য কারণে কেহ কোন প্রকার পদবী, সুবিধা বা সম্মান লাভ করিতেও সমর্থ নহে (চতুর্থ ধারা)। নিজ বিবেকানুযায়ী কাজ করিতে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রিক অধিকারী; কাহাকেও জোর করিয়া কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে সভ্য করাইতে রাষ্ট্র পারে না (৪৯শ ও ৫০শ ধারা)। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া যদি মুদ্রাযন্ত্র এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে ত তাহা হইলে যৌথরাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিতে পারে (৫৫শ ধারা)। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে না হইলে ইচ্ছামতভাবে সমিতি বা যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়া বে-আইনী নহে (৫৬শ ধারা)। বিবাহ সম্বন্ধে (৫৪শ ধারা) ও যৌথরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ সম্বন্ধে (৫শ ধারা) প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে।

যৌথরাষ্ট্র ও তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুগ্ম ক্ষমতা।

উপরে যে সকল ক্ষমতা একমাত্র যৌথরাষ্ট্রের হাতে অর্পিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ব্যতীত কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্র একযোগে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। যেমন শিল্প ও বীমা, ইস্কুল শিক্ষা, রাস্তা তৈরী, মুদ্রাযন্ত্রের শাসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ উভয়েই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য, দুইয়ের সংঘর্ষ বাধিলে যৌথরাষ্ট্রের প্রণীত আইনই বলবৎ থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের মত সুইট্জারল্যাণ্ডের কাঠামো-আইনেও যৌথরাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ এবং যৌথরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমূহের সমকালীন ক্ষমতাসমূহ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতার কথা কাঠামো-আইনের কোন কোন স্থলে উল্লিখিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, যৌথরাষ্ট্রে অর্পিত ক্ষমতা ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত আছে।

আইন প্রণয়নে সুইট্জারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা, কিন্তু শাসন ব্যাপারে বিভক্ত ক্ষমতা রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইট্জারল্যাণ্ডেও রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ মর্য্যাদা আছে ও যৌথরাষ্ট্রকে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতার অধিকারী করিয়া বাকী ক্ষমতাগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে, তথাপি উভয় দেশের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও যৌথরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সুইট্জারল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীতে হইয়াছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রীকৃত হইলেও শাসন-ব্যবস্থা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিভক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অল্প কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ে নিজ শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ভার বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর দেওয়া হয়। পররাষ্ট্রনীতি, শুল্ক, ডাক ও তার, মদের একচেটিয়া ব্যবসা, শিল্প-বিদ্যালয়, বারুদ-ঘর ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র বিষয়ে যৌথকর্ম্মচারিগণ মোতায়েন থাকিয়া যৌথরাষ্ট্রের শাসনকার্য্য চালান। কিন্তু অন্যত্র যৌথরাষ্ট্র শুধু তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। এমন কি, সৈন্যের শেষ কর্ত্তৃত্বভার ও যুদ্ধক্ষেত্রে চালনার ভার যৌথরাষ্ট্রের হাতে থাকিলেও রাষ্ট্রসমূহই প্রধানত সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে (১৩শ, ১৯-২১শ ধারা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাই বলিয়া যৌথরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে শিথিল বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিদর্শনের যে ভার কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আছে, তাহা রীতিমতভাবে বিশেষ জোরের সহিত প্রযুক্ত

হইয়া থাকে। এই পরিদর্শন ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা যৌথকর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়। সুইট্জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অথবা এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ তাহা যৌথকর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিবে; এরূপ অবস্থায় যৌথকর্ত্তৃপক্ষ নিজ ক্ষমতার সীমার মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে অথবা যৌথরাষ্ট্রের মহাসমিতিকে আহ্বান করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে। যখন সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্র এরূপ দুর্ব্বিপাকে পতিত হয় যে, উহার যৌথরাষ্ট্রের নিকট কোন সংবাদ পাঠানো ও তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন যৌথরাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই রাষ্ট্রের সাহায্যার্থ আসিতে পারে; আর সে বিপদ্ যদি এমন হয় যে, তাহাতে সমগ্র দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে ত কথাই নাই। (১৬শ ধারা)। এই উদ্দেশ্যে সৈন্য চালনার ভার যৌথকর্ত্তৃপক্ষ লইয়া থাকে ও প্রত্যেক রাষ্ট্র সেই সকল সৈন্যকে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিতে বাধ্য (১৭শ ধারা)। লাওয়েল এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা এই: কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টিসেনো নামক রাষ্ট্রে নির্ব্বাচন সম্পর্কে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়; কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া উহা দমন করিতে অস্বীকার করে। তথাপি যৌথকর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক শুধু দাঙ্গা মিটাইয়া শান্ত হন নাই, নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছিল কি না তাহার অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাঠামো-আইনে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঠামো-আইনের পঞ্চম ধারা মানিয়া চলিয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ কাজ করিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ধারাও মানিতে হয়। উপরে (পৃঃ ২৩৩) এই দুই ধারার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যৌথ কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাও বলা হইয়াছে যে, উহা নিজ ক্ষমতার সীমার মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। তাহার অর্থ এই যে, (ক) কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করা হইবে না, (খ) সুইট্জারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষিত হইবে, (গ) কোন কারণে সৈন্য চালনার প্রয়োজন হইলে, যৌথ-ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মতি ব্যতীত, দুই হাজারের বেশী সেনা চালিত হইতে পারিবে না। আর দুই হাজারের কম সৈন্য থাকিলেও তাহারা তিন সপ্তাহের বেশী সজ্জিত অবস্থায় থাকিতে পারিবে না [১০২ ধারা, (৩), (১০), (১১)]। উপরে যে পঞ্চম ধারার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও যৌথকর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা-প্রয়োগের পরিপোষক; কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভূভাগ, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, কাঠামো-আইন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নানাপ্রকার অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ভার যৌথ-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকায় যে কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবে, আইনত তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্রের আছে। এই ধারার অর্থ এইরূপ ব্যাপক যে, কোন ব্যক্তির প্রতি সেই ব্যক্তির রাষ্ট্র অন্যায় আচরণ করিলে যৌথরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্র অবৈতনিক, বাধ্যতা-মূলক ও ধর্ম্ম-সম্পর্ক-রহিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে বাধ্য। কাঠামো-আইনে এ বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহকে বাধ্য করিবার

ক্ষমতা যৌথকর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে ; যে সকল রাষ্ট্র তাহা না করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। (২৭শ ধারা)। কিন্তু কোন্ রাষ্ট্র কি ভাবে এই শিক্ষা দিবে, সে সম্বন্ধে যৌথকর্তৃপক্ষ কোন পরামর্শ বা ব্যবস্থা দেয় না।

সুইট্জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বাড়িতেছে।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে, যদিও যৌথরাষ্ট্রের সাক্ষাৎ শাসন-ক্ষমতা অধিক নহে, তথাপি উহার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন ও শাসন-ক্ষমতার উপর যৌথকর্তৃপক্ষের প্রভাব প্রবল। সাক্ষাৎভাবে শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগের ভার ক্রমাগত নীচের দিকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়াতে, যৌথকর্তৃপক্ষের হাতে উহার অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে ; কিন্তু অন্য দিকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা ক্রমাগত বিস্তৃত হওয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের বড় একটা পার্থক্য এই যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা না ভাবিয়া আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা ভাবা যায় না ; ফলে সেখানে প্রত্যেক বিভাগে নিম্নতন যৌথ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ সেখানে যৌথকর্ম্মচারীরা সংখ্যায় অনেক হইয়া থাকে এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর কার্য্যবিভাগ এরূপ স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায় যে, সমগ্র দেশে দুই প্রকার কর্ম্মচারীরাই একই কালে নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকেন। অন্য পক্ষে, সুইট্জারল্যাণ্ডে যৌথকর্তৃপক্ষের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য উহার সঙ্গে সঙ্গে শাসন-ক্ষমতা বাড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই, যৌথ আইনকে কাজে খাটাইবার নিমিত্ত বহুল যৌথ কর্ম্মচারীর প্রয়োজনীয়তার কথা সুইট্জারল্যাণ্ডে কেহ ভাবে না। সেইজন্যই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া যৌথ-কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার নিজ হাতে রাখিতে হয়। এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা দ্বারাই যৌথকর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ও ঐক্যবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী বজায় থাকে। ইহাতে যৌথকর্ম্মচারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যৌথ কর্ম্মচারীর সংখ্যা-বিরলতা শুধু যে দেশের আর্থিক ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটাইয়াছে তাহা নহে, বহু কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের মনেও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সমগ্র দেশের ঐক্য ও শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আত্মকর্তৃত্ব স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, রাষ্ট্রীয় জনগণের এ বিষয়ে অসন্তোষের কারণ হ্রাস পাইয়াছে। তবে ১৯২৪-২৫ সনের পর হইতে যৌথ কর্ম্মচারীর সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবণতা সুইট্জারল্যাণ্ডেও দেখা দিয়াছে। শুধু যৌথ নহে, সকল প্রকার কর্ম্মচারীর সংখ্যাই বাড়িতেছে। এক্ষণে সুইট্জারল্যাণ্ডে যৌথ, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর্ম্মচারীর মোট সংখ্যা দেড় লক্ষ। ইহা মোট জনসমষ্টির ৪%। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ মোট জনগণের ৪% এর কম। কিন্তু ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, (১) সুইট্জারল্যাণ্ডে বহু প্রতিষ্ঠান সাক্ষাৎ ভাবে (যেমন রেলওয়ে) যৌথ সরকারের হাতে রহিয়াছে ও তজ্জন্য যে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহারা সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া দাঁড়ায়, এবং (২) মোট কর্ম্মচারীর মধ্যে যৌথকর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় সর্ব্বাধিক নহে, বরং সর্ব্বাপেক্ষা কম।

সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের ক্ষমতার কথা পরে বর্ণিত হইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমিতির যে সকল আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা আছে, তাহা ত সুইট্জারল্যাণ্ডের মহাসমিতির আছেই, তাহা ছাড়া আরো অনেক বেশী ক্ষমতা আছে। যথা, নদী ও বন (২৪শ ধারা), গুরুত্ববিশিষ্ট রাস্তা ও সেতু (৩৭ ধারা), শিকারের নিয়ম (২৫শ ধারা), রেলপথ নির্ম্মাণ ও চালানো (২৬শ ধারা), মদ তৈরী ও বিক্রয় (৩২শ ধারা), ফ্যাক্টরিতে শ্রমজীবি-আইন, বীমা (৩৪শ ধারা), ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্মযাজক (৪৯শ-৫৭শ ধারা), ঋণ আদায় ও বাণিজ্যিক লেনদেন (৬৪শ ধারা), মড়ক নিবারণ (৬৯শ ধারা), ইত্যাদি সম্পর্কে সুইট্জারল্যাণ্ডের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেক দূর বিস্তৃত। কিন্তু এক বিষয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার চেয়ে কম। তাহা কর-সংগ্রহ। যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন অনুসারে সমগ্র যৌথরাষ্ট্রের ব্যয় নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত আয় হইতে করা হয়: কর-সম্পর্কিত আইন-প্রণয়নে যৌথরাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা।

(ক) যৌথরাষ্ট্রের সম্পত্তি-জাত রাজস্ব,

(খ) সুইট্জারল্যাণ্ডের সীমান্ত-দেশে যৌথকর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত শুল্ক-রাজস্ব,

(গ) ডাক ও তার বিভাগের আয়,

(ঘ) বারুদের একচেটিয়া বিক্রয় লব্ধ রাজস্ব,

(ঙ) সৈন্য বিভাগে কাজ না করিতে চাহিলে যে কর বসান হয়, তদ্দরুণ লব্ধ করের অর্দ্ধাংশ (এই কর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়),

(চ) বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে গৃহীত অর্থ (প্রত্যেক রাষ্ট্রের ধন-বল ও কর-যোগ্য সম্পত্তি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার পর যৌথ ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রত্যেক রাষ্ট্রের দেয় করের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়),

(ছ) ষ্ট্যাম্প-শুল্ক হইতে গৃহীত রাজস্ব। (৪২শ ধারা)।

যদি কোন কারণে উপরোক্ত উপায়ে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা যৌথরাষ্ট্রের সমুদায় ব্যয়ের সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে যতটা কম পড়ে ততটা বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্যয় মিটাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই।

কাঠামো-নির্দ্দিষ্ট সুইট্জারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান যৌথ শাসনযন্ত্র নিম্নরূপে গঠিত আছে: সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন-যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ।

(১) শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ। ইহা যৌথরাষ্ট্র-সভা (বুণ্ডেস্রাথ) নামে পরিচিত।

(২) আইন-প্রণয়ন কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা (বুণ্ডেস্ফের্সামলুঙ্গ)। ইহা সমগ্র জাতির সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি-সভা এবং নিম্নলিখিত দুইটি শাখায় বিভক্ত:

(ক) রাষ্ট্র-সভা (ষ্টেইণ্ডরাথ),

(খ) জাতীয় সভা (নাশিওনালরাথ)।

(৩) বিচার-কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ একটি যৌথ বিচারালয় (বুণ্ডেস্গেরিখ্ট)।

(৪) জনগণ,—সর্ব্ববিষয়ে শেষ ক্ষমতা জনগণের উপর ন্যস্ত আছে। ইহারা সাক্ষাৎভাবে ভোট দিয়া আইন-প্রণয়ন ও সমুদায় শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

কাঠামো-আইনের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সংশোধনী সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন আলোচনার প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সেখানে কাঠামো-আইনের সংশোধনী অত্যন্ত কঠিন এবং সেজন্য ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা আইনের প্রসার ঘটিতেছে। কিন্তু সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সংশোধনীর প্রণালী জটিল হইলেও, ব্যবহারের বেলায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত সেরূপ দুঃসাধ্য নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই বলা যায় যে, এক এক বৎসর অন্তর কোন না কোন সংশোধনী গৃহীত হইয়াছে : ১৮৭৮ সন হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত শুধু যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সংশোধনীই গৃহীত হইয়াছে ২৯টি, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র ৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আরো একটি পার্থক্য এই যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ক্রমাগত নূতন বিষয়সমূহ কাঠামো-আইনে সংযুক্ত হইতেছে; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনীগুলি কাঠামো-আইন হইতে পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কাঠামো-আইনে পুরাতন ধারার স্থলে নূতন ধারা অথবা পুরাতন ধারায় আবার নূতন কথা সংযোজিত হয়। এইরূপে কাঠামো-আইনের বিস্তৃতির একটি কারণ এই যে, উহার সংশোধনী সহজ-সাধ্য, কিন্তু আরো একটি গুরুতর কারণ আছে। নীচে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়তন ও অনুমিত লোক-সংখ্যা (১৯২৮) দেওয়া যাইতেছে (ব্র্যাকেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রের যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইবার তারিখ আছে):

কাঠামো-আইনের প্রসারের কারণ : (১) কাঠামো-আইন পরিবর্ত্তনের সহজ-সাধ্যতা;

রাষ্ট্রের নাম	পরিমাণ ফল বর্গ মাইল	লোক-সংখ্যা ১ ডিসে, ১৯২৮ (অনুমিত)
ৎস্যুরিখ্ (১৩৫১)	৬৬৭	৫,৬৩,২০০
বার্ণ (১৩৫৩)	২,৬৫৭	৭,০৩,২০০
লুৎসার্ণ (১৩৩২)	৫৭৫	১,৮৫,৫০০
উরি (১২৯১)	৪১৫	২৫,৪০০
শ্বোয়াইস্ (১২৯১)	৩৪৮	৬১,৯০০
ওব্‌হ্বাল্‌ডেন (১২৯১)	১৮৯	১৮,৩০০
নিড্‌হ্বাল্‌ডেন (১২৯১)	১০৬	১৪,৬০০
গ্লারুস্ (১৩৫২)	২৬৪	৩৪,৩৫০
ৎস্যুগ্ (১৩৫২)	৯২	৩৪,০০০
ফ্রিবুর্গ (১৪৮১)	৬৪৪	১,৫০,১৫০
সোলোথুর্ণ (১৪৮১)	৩০৫	১,৪১,৬০০
বাসেল-ষ্টাড্‌ট (১৫০১)	১৪	১,৫০,৭৫০
বাসেল-লাণ্ড (১৫০১)	১৬৩	৮৮,১০০

শাফ্হাউসেন (১৫০১)	১১৪	৫৩,৪০০
১নং আপেন্‌ৎসেল (১৫১৩)	৯৩	৫৫,৪৫০
২নং ঐ (১৫১৩)	৭২	১৪,৬০০
সেণ্ট গালেন (১৮০৩)	৭৮৫	৩,০১,১০০
গ্রাউবুইণ্ডেন (১৮০৩)	২,৭৪৬	১,২৩,২০০
আরগাউ (১৮০৩)	৫৪৮	২,৫৩,৬০০
টোয়েরগাউ (১৮০৩)	৩৮৬	১,৪১,০০০
টিচিনো (১৮০৩)	১,০৮৫	১,৫২,৯০০
ভো (১৮০৩)	১,২৩৮	৩,২৪,৬০০
ভালে (১৮১৫)	২,০২০	১,৩৬,১০০
নাউ-শাটেল (১৮১৫)	৩০৫	১,২৫,৭৫০
জেনেভ (১৮১৫)	১০৮	১,৬৫,৯০০
মোট	১৫,৯৪০	৪০,১৮,৫০০

উপরের তালিকায় দেখা যাইবে সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ আকারে ও লোক-সংখ্যায় কিরূপ ক্ষুদ্র। রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ১৪ বর্গ মাইল হইতে ২,৭৪৬ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত, আর লোক-সংখ্যা ১৪,৬০০ হইতে ৭,০৩,০৫০ পর্য্যন্ত। সুইট্জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লোক-সংখ্যায় বার্ণ সর্ব্ববৃহৎ, কিন্তু তথাপি ইহা কলিকাতার সমানও নহে, কলিকাতার লোক-সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী লোক সমগ্র বার্ণ রাষ্ট্রে বাস করে। বস্তুত, আধুনিক রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায় সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজে নিজে তাহা নহে এবং এগুলি নিজেরা আধুনিক রাষ্ট্রের সমুদায় অভাব মিটাইতে পারে না। যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রে গড়ে জমি আছে ৭২৪'৫ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ১,৮২,০০০এর কিছু উপরে, সেখানে এক দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে বহুল পরিমাণে যৌথ কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিতে হয়; অন্য দিকে লোকেদের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে ভোট দেওয়া সম্ভবপর হয়। ফলে, কাঠামো-আইন সংশোধনের ভার সাক্ষাৎভাবে জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকিলেও, বহুতর সংশোধন উপস্থাপিত করা ও তদ্দ্বারা কাঠামো-আইনের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভবপর হইয়াছে। (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র আকৃতি।

সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যাপারে জনগণের ক্ষমতা ও প্রভাব কিরূপ বেশী তাহা পরে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু উহার কাঠামোর বিভিন্ন দফা আলোচনা করার পূর্ব্বে এখানে সংশোধনী দ্বারা কাঠামো-আইন কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৬টি ধারায় (১১৮-১২৩) যৌথ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন পরিবর্ত্তনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৯১ সনের ৫ই জুলাই তারিখে এই সমুদায় অধ্যায়টিই সংশোধিত হইয়া নূতন আকারে সংযোজিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, যৌথ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের

কাঠামো-আইনের সম্পূর্ণ ও আংশিক সংশোধনী কিরূপে হয়।

সংশোধন সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, কাঠামো-আইনের সংশোধনের চেষ্টা যে কোন সময়ে করা যায় এবং ঐ আইনকে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সংশোধিত করা চলে (১১৮ ধারা)। কাঠামো-আইনকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা করিতে হয়: (১) যৌথ ব্যবস্থাপক সভার যে কোন একটি শাখা কাঠামো-আইনের সম্পূর্ণ সংশোধনমূলক প্রস্তাব পাশ করিবার পর অন্য শাখাটি তাহাতে অসম্মত হইলে, কিম্বা (২) ৫০,০০০ সুইস্ ভোটদাতা এক সঙ্গে স্বাক্ষর করিয়া সম্পূর্ণ সংশোধনের জন্য আবেদন করিলে, উভয় ক্ষেত্রেই কাঠামো-আইনকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করা হইবে কি না তাহার বিচারের ভার জনগণের উপর অর্পণ করা হয়। ঐ প্রস্তাব বা আবেদন জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিলে জনগণ শুধু 'হাঁ' বা 'না' সূচক ভোট দিয়া থাকে। ভোট 'না' হইলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না, বুঝিতে হয় সুইস্ জনগণ সম্পূর্ণ সংশোধনের পক্ষপাতী নহে। কিন্তু ভোট প্রস্তাবের স্বপক্ষে হইলে, ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নূতন নির্ব্বাচন করিতে হয়। অতঃপর কাঠামো-আইন সম্পূর্ণ সংশোধনের ভার এই নব-নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার হাতে অর্পণ করা হয়। (১২০ ধারা)। ১৮৪৮ সনের পর মাত্র একবার, ১৮৭৪ সনে, কাঠামো-আইনকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত আকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৭৪ সনের পর এ পর্য্যন্ত আর সম্পূর্ণ সংশোধনের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং কার্য্যত কাঠামো-আইন-সম্পর্কিত সম্পূর্ণ সংশোধনের নিয়ম লইয়া এক্ষণে আর বিশেষ আলোচনা উপস্থিত হয় না।

কাঠামো-আইনের আংশিক সংশোধন নিম্নলিখিত প্রকারে হইতে পারে: যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো বর্ণনা কালে অভিনয়ন (ইনিশিয়েটিব্) ও প্রত্যুপস্থাপন (রেফারেণ্ডাম)এর ব্যাখ্যা করিয়াছি। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এই দুই প্রথার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আংশিক সংশোধন জনগণের প্রস্তাবিত অভিনয়ন দ্বারা হইয়া থাকে। কাঠামো-আইনে কোন নূতন ধারা সংযুক্ত করিয়া দিবার জন্য, অথবা কাঠামো-আইনের প্রচলিত এক বা অধিক ধারা উঠাইয়া দিবার বা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ৫০,০০০ সুইস্ ভোটদাতা এক দাবী পেশ করিতে পারে। ইহাকেই অভিনয়ন দাবী বলে। এমন যদি হয় যে, যৌ কাঠামো-আইনে যোগ করিবার জন্য বা সংশোধিত করিবার জন্য একাধিক বিভিন্ন ধারা অভিনয়ন দ্বারা উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা হইলে প্রত্যেকটি বিষয়কে এক পৃথক অভিনয়ন দাবীর অন্তর্গত করিতে হইবে। দ্রষ্টব্য এই যে, প্রথমত, ৫০,০০০ হাজারের কম সুইস্ ভোটদাতা অভিনয়নের দাবী পেশ করিলে চলিবে না, এবং যাহারা দাবী পেশ করিবে তাহাদের সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অধিবাসী রাষ্ট্রিক হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ এই যে, (১) যে ব্যক্তি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক সে সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডেরও রাষ্ট্রিক বটে, এবং সে সমুদায় যৌথ-নির্ব্বাচন ও ভোট গ্রহণের কালে নিজ স্থান হইতে ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী,—অবশ্য ভোটদাতা হিসাবে আগে তাহার যোগ্যতা অর্জ্জন করা প্রয়োজন (৪৩শ ধারা), (২) স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসের মধ্যে পার্থক্য কি এবং অস্থায়ী বাসিন্দা সুইস্ রাষ্ট্রিকের রাষ্ট্রীয় ও অসামরিক অধিকার কি হইবে, সে সম্বন্ধে যৌথ কর্ত্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন করে (৪৭শ ধারা); দ্বিতীয়ত,

পরিবর্ত্তনের জন্যই হোক বা নূতন কিছু যোগ করিবার জন্যই হোক, এক এক বারে একটিমাত্র ধারা সম্বন্ধে অভিনয়ন উপস্থাপিত করা চলে। একই সময়ে একের অধিক ধারা সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়ন দাবী করিতে হয়।

অভিনয়ন দাবী দুই প্রকার হইতে পারে: (১) উহা সাধারণ প্রস্তাব রূপে উপস্থাপিত করা যায়, তখন উহা খুঁটিনাটি শুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রস্তাব নহে, (২) অথবা উহা সমুদায় খুঁটিনাটি শুদ্ধ কোন সম্পূর্ণ 'বিলের' আকার গ্রহণ করে।

উপস্থাপিত সাধারণ প্রস্তাব সম্বন্ধে যৌথ ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয় অনুকূল বা প্রতিকূল মত পোষণ করিতে পারে। যদি আংশিক সংশোধনী বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি থাকে তাহা হইলে উহা অভিনয়ন দাবীর যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করে ও তদনুসারে কাঠামো-আইনের আংশিক সংশোধনীতে প্রবৃত্ত হয়। ইহার পর সংশোধিত কাঠামো-আইনটি জনগণের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাহারা উহা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যদি যৌথ ব্যবস্থাপক সভা আংশিক সংশোধনী বিষয়ে অসম্মত থাকে, তাহা হইলে আংশিক সংশোধনী হইবে কি না তাহা বিচার করিবার ভার জনগণের উপর প্রদত্ত হয়। জনগণ ভোট দ্বারা তাহা স্থির করে। যে সকল সুইস্ রাষ্ট্রিক এই বিষয়ে ভোট দিবার নিমিত্ত আসে তাহাদের অধিকাংশ যদি আংশিক সংশোধনীর স্বপক্ষে ভোট দেয়, তাহা হইলে যৌথ ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয় জনগণের সিদ্ধান্তের সহিত মিল রাখিয়া সংশোধনী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সমুদায় খুঁটিনাটি শুদ্ধ সম্পূর্ণ বিলের আকারে যে প্রস্তাব যৌথ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয়, তাহাতেও উক্ত সভার সম্মতি বা অসম্মতি থাকিতে পারে। যদি যৌথ ব্যবস্থাপক সভা উহাতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে ঐ বিল জনগণের নিকট পেশ করা হয়। জনগণ ঐ বিল মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিতে পারে। কিন্তু যৌথ ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি না থাকিলে, ইহার দুইটি পথ খোলা থাকে। (১) যৌথ ব্যবস্থাপক সভা নিজে একটি বিল তৈরী করে, অথবা (১) প্রস্তাবিত বিলকে নামঞ্জুর করিবার অনুরোধ পাঠায়। উভয় ক্ষেত্রেই অভিনয়ন দাবী দ্বারা পেশ করা বিলের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপক সভার তৈরী বিল অথবা পূর্ব্বোক্ত বিলের না-মঞ্জুর-প্রস্তাব জনগণের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। জনগণ যেরূপ ব্যবস্থা করে তাহাই চরম ব্যবস্থা। (১২১ ধারা)

যৌথ কাঠামো-আইনের সংশোধন সম্পূর্ণ হোক্ বা আংশিক হোক্, এ বিষয়ে শেষ আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র জনগণের আছে। কিন্তু একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ সংশোধনের জন্যই হোক্ বা আংশিক সংশোধনের জন্যই হোক্, যে সকল সুইস্ রাষ্ট্রিক উপস্থিত থাকিয়া ভোট দেয়, সংশোধনের পক্ষে তাহাদের অধিকাংশের ভোট দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ স্বপক্ষে ভোট দিলে পর সংশোধনী আইনে পরিণত হয় ও তদনুসারে কাজ হইতে পারে, নচেৎ নহে। কিন্তু শুধু অধিকাংশ জনগণের ভোট পাইলেও যথেষ্ট হয় না। অধিকাংশ রাষ্ট্রকেও সংশোধনের স্বপক্ষে ভোট দিতে হয়, তবেই সেই সংশোধনী গৃহীত

হইতে পারে। পৃথক্‌ভাবে রাষ্ট্রের ভোট গণনা কালে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোট একটি মাত্র থাকে, কিন্তু অর্দ্ধরাষ্ট্রের বেলায় অর্দ্ধ ভোট মাত্র ধরা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের ভোট পৃথক্‌ভাবে লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের অতিজন যে দিকে ভোট দেয়, সেই দিকে সেই রাষ্ট্রের একটি ভোট, অথবা সেই অর্দ্ধরাষ্ট্রের অর্দ্ধভোট যোগ হয়। দ্বিতীয়ত, সমুদায় রাষ্ট্রের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একসঙ্গে যোগ করিয়া দেখা হয়, কোন্‌দিকে অধিকাংশ ভোট দেওয়া হইয়াছে। কোন সংশোধনের পক্ষে এই প্রকার ভোটের অধিকাংশ প্রদত্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে সেই সংশোধনী গৃহীত হইল বলিয়া বুঝা যায়। (১২৩ ধারা)।

যৌথরাষ্ট্রের আইন, কাঠামো সম্পর্কিত অথবা সাধারণ হইতে পারে। যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, সাধারণ যৌথ আইন যে প্রক্রিয়ায় পাশ করা হয়, সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ও আংশিক সংশোধনী উভয় ক্ষেত্রেই, প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (১২০ ও ১২১ ধারা)। অর্থাৎ এ বিষয়ে সাধারণ ও কাঠামো-আইনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। ১৮৪৮ সন হইতে ১৯২৩ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত যৌথ ব্যবস্থাপক সভা যে সকল সংশোধনী পাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে সুইস্ জনগণ ২৪টি গ্রহণ করিয়াছে, আর অভিনয়ন দ্বারা উপস্থাপিত ১৯টি সংশোধনীর মধ্যে ৫টি গৃহীত ও ১৪টি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অভিনয়ন দাবী ও যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সংশোধনার্থ ভোট গ্রহণ সম্বন্ধে কোন্ কোন্ আইনকানুন মানিয়া চলা হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবার ভার যৌথ ব্যবস্থাপক সভার উপর অর্পিত আছে (১২২ ধারা)।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতি

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্রের চরম শাসন-কর্ত্তৃত্বভার কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে নাই, উহা সাতজন ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর অর্পিত আছে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের চরম শাসন-কর্ত্তৃত্বভার একটি ক্ষুদ্র সমিতির হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুইস্-যৌথরাষ্ট্র সমিতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। জগতের প্রায় সমুদায় দেশেই চরম শাসন-কর্ত্তৃত্বভার অথবা উহার নেতৃত্ব একটি মাত্র ব্যক্তির উপর অর্পিত আছে,—তিনি রাজা, সম্রাট্, রাষ্ট্র-নেতা, বড়লাট প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এই কর্ত্তৃত্বভার কোন ব্যক্তিবিশেষ বহন করিতেছেন না। করিতেছে সাতজন মন্ত্রীকে লইয়া গঠিত এক সমিতি। এই সমিতির একজন সভাপতি আছেন বটে, এবং তিনি সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-নেতা বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুত সমগ্র দেশের চরম শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ তিনি নহেন, তাহা ঐ সমিতি। যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে: যৌথরাষ্ট্রের "চরম পরিচালন ও শাসন ক্ষমতা সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি যৌথরাষ্ট্র-সমিতি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে।" (৯৫শ ধারা)।

বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন গণতন্ত্রে যে দুইপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে উভয় হইতে ভিন্ন এক প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। বিলাত ও বিলাতের অনুকরণকারী দেশসমূহে কেবিনেট সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। উহার অর্থ, মন্ত্রি-সমিতি ব্যবস্থাপক সভাকে পরিচালনা করিয়া থাকে ও মন্ত্রি-সমিতির অস্তিত্ব ব্যবস্থাপক সভার মর্জ্জির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করে। অন্য দিকে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে শাসন-কর্তৃপক্ষ কোনপ্রকারে নিজ অস্তিত্বের জন্য ব্যবস্থাপক সভার উপর নির্ভর করেন না। সুইস্ সমিতিতে এই দুই প্রথারই কিছু কিছু অংশ থাকিলেও, ইহা উভয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতি গঠনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে একেবারে কোন প্রভাব বিস্তার করে না, তাহা নহে, কিন্তু নির্ব্বাচিত সমিতি দলের বাহিরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় ও দলের কাজ করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হয় না।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতি ও উহার সভ্যগণ।

ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা একত্র বৈঠকে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে নির্ব্বাচন করে এবং ইঁহারা তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। এই সম্পর্কে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের কয়েকটি স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। প্রথমত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য কে হইতে পারেন তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, যে সকল সুইস্ রাষ্ট্রিক যৌথ প্রতিনিধি-সভার (জাতীয় সভার) সভ্যপদ প্রার্থী হইতে পারে তাহারাই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির জন্য দাঁড়াইতে সমর্থ। অর্থাৎ এই আইনে এমন কোন কথা নাই যে, একমাত্র ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের সমুদায় সভ্য হইতেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যদের নির্ব্বাচিত করা চলিবে, উপরন্তু এমন কথা আছে, সুইস্ রাষ্ট্রিক হইলেও যৌথ প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইবার গুণাবলী থাকিলে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরের কোন ব্যক্তিরও এইরূপ নির্ব্বাচিত হইবার বাধা নাই। কিন্তু কার্য্যত, ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয় সাতজনকেই নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করে, বাহিরের কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে না। দ্বিতীয়ত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির গঠনকালে যেন কোন রাষ্ট্রের একের অধিক প্রতিনিধি সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত না হন। তৃতীয়ত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির পরমায়ু তিন বৎসর বাঁধিয়া দেওয়া হইলেও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রতিনিধি-সভার নব-নির্ব্বাচনের পর যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সম্পূর্ণরূপে নব-কলেবর ধারণ করিবে। এই নির্দ্দেশের ফল হইয়াছে নিম্নরূপ: (১) প্রত্যেক সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যৌথরাষ্ট্র-সমিতি নির্ব্বাচিত হয়; (২) তিন বৎসরের মধ্যে কোন সভ্য-পদ খালি হইলে, মহাসমিতি (এসেম্ব্লি) বাকী সময়ের জন্য এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইনি ঐ সময়ের জন্যই সভ্যরূপে বাহাল থাকিয়া কাজ করেন, তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন না। (৯৬শ ধারা)।

সুইস্ রাষ্ট্রিক বলিতে কি বুঝায় তাহা উপরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যৌথ প্রতিনিধি-সভায় নির্ব্বাচন বা ভোটদান সম্পর্কে প্রত্যেক ভোটদাতার (১) বয়স ২০ বৎসর পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ও (২) যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক অধিবাসী তাহার আইন অনুসারে ঐ রাষ্ট্রের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার তাঁহার বজায় থাকা প্রয়োজন,—তিনি যদি রাষ্ট্রীয় বিধানে রাষ্ট্রিকের অধিকারচ্যুত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভোট দেওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং যৌথ প্রতিনিধি-সভার পদপ্রার্থী যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যপদের জন্য দাঁড়াইতে পারেন বলায় এই কথাই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে কোন ব্যক্তি উক্ত সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইবেন কি না তাহা শেষ পর্য্যন্ত সেই রাষ্ট্রের কাঠামো-আইনে নির্দ্ধারিত হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের পার্থক্য থাকা বিচিত্র নহে।

যৌথ কাঠামো-আইনে বলা হইয়াছে যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ যতকাল ঐ সভার সভ্য থাকিবেন, ততকাল অন্য কোন কাজ করিতে পারিবেন না। অন্য কাজের অর্থ

যৌথরাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী, অথবা যে কোন প্রকার পেশা ইত্যাদি। (৭৭শ ধারা)। সুতরাং যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কোন সভ্য সভ্য থাকাকালে ব্যবস্থাপক সভার কোন শাখায়, অথবা যৌথরাষ্ট্র সম্পর্কিত কোন চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারেন না।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কার্য্য-বিভাগ।

কার্য্য-বিভাগ সম্বন্ধে ১০৩ ধারায় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহার সংশোধনী হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে এক একটি বিভাগ বণ্টন করিয়া লইবেন অর্থাৎ প্রত্যেক সভ্য একটি পৃথক বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবার অবকাশ পান। কিন্তু এইরূপ স্পষ্ট কার্য্য-বিভাগের ব্যবস্থা থাকিলেও, সমুদায় যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে একটি অখণ্ড কর্ত্তৃপক্ষরূপে বিবেচনা করা হয় এবং বিভিন্ন সভ্যগণ যে প্রকার সিদ্ধান্তই করুন না, শেষ পর্য্যন্ত উহা সমিতির সিদ্ধান্তরূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে বিশদ্‌ভাবে বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির যে ৭টি বিভাগের জন্য একজন করিয়া সভ্য নিযুক্ত হন সেগুলির নাম:

(১) পররাষ্ট্রনীতি (ইহাতে রাষ্ট্রিককরণ, যৌথনির্ব্বাচন আইন, উপনিবেশ আইন ইত্যাদি আছে)

(২) আভ্যন্তরীণ,

(৩) বিচার ও পুলিশ,

(৪) সৈন্য,

(৫) কোষ ও শুল্ক,

(৬) কৃষি ও শিল্প (সরকারী শিল্প),

(৭) ডাক ও রেলওয়ে।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির জন্য সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভা হইতে পদত্যাগ করিতে হয় এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন লোক ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ বৎসরে ১,২৮০ পাউণ্ড বা সতের হাজার টাকা করিয়া বেতন পান। ইহা ছাড়া যাতায়াতের ভাড়া ইত্যাদি বাবদ্‌ও কিছু পান।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের নেতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের চরম যৌথ শাসন-কর্ত্তৃত্ব-ভার উপরোক্ত সাতজনের হাতে অর্পিত আছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই: সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-নেতা বলিয়া কি কোন পদ নাই? বস্তুত, এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নেতার কোন ভিন্ন পদ থাকিতে পারে না। তবে সকল দেশের মত এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র-নেতা ও অপর ব্যক্তিকে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এক সম্মিলিত বৈঠকে যৌথরাষ্ট্র সমিতির জন্য এক সভাপতি মনোনয়ন করিয়া থাকে। সেই সময়ে উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতিও মনোনীত হন। ব্যবস্থাপক সভার সম্মিলিত বৈঠক ছাড়া সভাপতি বা সহকারী সভাপতির মনোনয়ন হয় না; এবং মনোনয়ন সম্বন্ধে কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ এই যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের মধ্য হইতেই বাছিয়া এক ব্যক্তিকে সভাপতি ও অন্য

এক ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি করা হইবে (৯৮শ ধারা)। ঐ ধারাতেই বলা হইয়াছে যে, সভাপতি পরবর্ত্তী বৎসরে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না, আর একই ব্যক্তি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর সহকারী সভাপতি হইতে সমর্থ নহেন। এই নির্দ্দেশের ফলে দ্বিতীয় বৎসর সভাপতি ও সহকারী সভাপতি উভয়েই নূতন লোক হন। কিন্তু তাহাতে প্রথম বৎসরে যিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন তাঁহার পক্ষে সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার কোন বাধা হয় না। এক্ষণে প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে এই যে, এক বৎসরের সহকারী সভাপতি প্রায়ই পর বৎসরে সভাপতি হন, এবং প্রত্যেক বৎসর নূতন একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহার ফলে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির প্রত্যেক সভ্যই একবার করিয়া সভাপতির পদে বসিবার সুযোগ পাইতেছেন। উক্ত সমিতির পরমায়ু তিন বৎসর হইলেও, সমিতির সভ্যদের পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার পক্ষে বাধা না থাকায়, তাঁহাদের প্রত্যেকের সভাপতি হইবার সুযোগ ঘটে।

উপরে যাঁহাকে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভাপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহাকে যৌথরাষ্ট্রের নেতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। যৌথরাষ্ট্রের নেতা যে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অন্যান্য সভ্যের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। কর্ম্মচারী নিয়োগ, বিল নাকচ, পররাষ্ট্রনীতির কার্য্য চালনা প্রভৃতি কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি কোন ক্রমেই শাসন-যন্ত্রের কর্ণধার নহেন এবং রাষ্ট্র-শাসন-ব্যাপারে তাঁহার দায়িত্ব তাঁহার সহযোগীদের সমতুল্য, বেশী নহে। তিনি সমগ্র সুইট্জারল্যাণ্ডের নামমাত্র কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সুইস্ জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রিত্ব তাঁহার বা আর কাহারও হাতে অর্পিত হয় নাই। দেশের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার বিভিন্ন সহযোগীদের কে কি করিতেছেন তাহার তত্ত্ব লইয়া থাকেন। তাঁহারই মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিভাগের পরস্পরের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। প্রথা দ্বারা তিনি এক সাধারণ পরিদর্শকে পরিগণিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন বিভাগের পরিদর্শন-কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হয়। নিজ বিভাগের কার্য্য ব্যতীত তিনি ইহাও করেন। কোন কোন সময়ে, বিশেষত বিপৎকালে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি তাঁহাকে নিজ নামে বিভিন্ন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়। কিন্তু এইরূপে তিনি যে কাজই করুন না কেন, তাহা সমগ্র যৌথরাষ্ট্র-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে তিনি কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নহেন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অন্যান্য সভ্যদের মনোনয়ন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন হাত নাই, যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা যাঁহাদিগকে মনোনীত করে তাঁহাদের সহিত তাঁহাকে কাজ করিতে হয়; তিনি অন্য কোন সভ্যের উপরও নিজ কর্তৃত্ব খাটাইতে পারেন না। ১৮৮৮ সন পর্য্যন্ত পর-রাষ্ট্রনীতির পরিচালনার ভার বরাবর রাষ্ট্র-নেতাকে দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা এইটিতে স্থায়িত্ব বেশী দরকার। বারে বারে মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে নীতির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইত। সেই জন্য ঐ সনের পর হইতে, এই প্রথা আর অবলম্বিত হয় নাই, রাষ্ট্র-নেতাকে এক্ষণে সাতটি বিভাগের যে কোন একটির ভার দেওয়া হয়। রাষ্ট্র-নেতা

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অন্য সকল সভ্যের চেয়ে বেশী বেতন পান। তাঁহার বার্ষিক বেতনের হার ১৪০০ পাউণ্ড বা সাড়ে আঠার হাজার টাকার কিছু উপর, ইহা ছাড়া যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচা পান। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির প্রত্যেক বৈঠকে তিনিই সভাপতিত্ব করেন এবং উভয় পক্ষে সমান সমান ভোট হইলে তাঁহার একটি অতিরিক্ত ভোট দিবার ক্ষমতা আছে। অন্তত চারিজন সভ্য উপস্থিত না থাকিলে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কোন বৈঠক সিদ্ধ হয় না (১০০শ ধারা)। রাষ্ট্র-নেতা বা তাঁহার সহযোগিগণ বেতন ইত্যাদি বাবদ যাহা পান তাহা যৌথ ভাণ্ডার হইতে পাইবেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (৯৯শ ধারা)।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সহকারী সভাপতি।

যাঁহাকে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়, তিনিই সমগ্র সুইট্জারল্যাণ্ডের সহকারী রাষ্ট্র-নেতা হন। রাষ্ট্র-নেতা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে সহকারী রাষ্ট্র-নেতা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। আগেই বলিয়াছি এক্ষণে যিনি এক বৎসর সহকারী রাষ্ট্র-নেতা থাকেন, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে প্রায়ই রাষ্ট্র-নেতারূপে মনোনীত হন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির প্রত্যেক সভ্যেরই একবার করিয়া রাষ্ট্র-নেতা হইবার সুযোগ আছে। অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য পদে বাহাল থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয়বারও সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের নেতা হইবার বাধা থাকে না। কারণ, ৯৮শ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই যে, যৌথরাষ্ট্র-নেতা পরবর্ত্তী বৎসরে রাষ্ট্র-নেতা বা সহকারী রাষ্ট্র-নেতা হইতে পারিবেন না; একথা বলা হয় নাই যে, তিনি কখনোই হইতে পারিবেন না। বস্তুত, তৃতীয় অথবা তাহার পরবর্ত্তী কোন বৎসর হইতে এবিষয়ে কোন বাধা থাকে না। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সমুদায় সভ্যকে একবার করিয়া রাষ্ট্র-নেতৃত্ব প্রদান করা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া, প্রত্যেকের ঐ পদ একের অধিকবার পাইবার সম্ভাবনাও থাকে। অবশ্য, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ প্রতি তিন বৎসর অন্তরও যদি এই পদে বাহাল থাকেন, তাহা হইলেই তাহা সম্ভব।

সুইস্ চ্যান্সেলার।

আরও এক ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মিলিত বৈঠকে মনোনীত করা হয়। তাঁহাকে চ্যান্সেলার বলে। কিন্তু ইনি যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য নহেন। বিলাতের লর্ড চ্যান্সেলারের সহিত ইঁহার কোন সাদৃশ্য নাই। ইঁহার কাজ কতকটা কেরাণীর কাজ, ধরাবাঁধা রহিয়াছে। কিন্তু রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। চ্যান্সেলারকে সুইস্ যৌথশাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণ সম্পাদকরূপে গণনা করা যাইতে পারে। দলিল-দস্তাবেজসমূহ তাঁহার হেফাজতে থাকে। বিভিন্ন আইন প্রণীত হইলে পর তিনি তাহাতে নিজেরও সই দেন, অন্যান্য সরকারী দলিলপত্রেও তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হয় এবং নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহার উপর থাকে। ইনি সুইস্ মহাসমিতি কর্ত্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং মহাসমিতি পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার পর তাঁহাকে আবার নির্ব্বাচিত করা হয়। (১০৫ ধারা)।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের পদের স্থায়িত্ব।

ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের মন্ত্রি-সমিতি হইতে সুইট্জারল্যাণ্ডের যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নহে। যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সাতজন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইলেও কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ এই যে, কোন একটি সুইস্ রাষ্ট্র হইতে একের অধিক

সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন না। সুইস্ রাষ্ট্রের সংখ্যা সমুদায়ে ২২টি (অর্দ্ধ-রাষ্ট্র ধরিয়া ২৫টি)। মনে হইতে পারে বটে যে, একবারে যখন ২২ জনের স্থান হওয়া সম্ভব নহে, তখন তিন বৎসর অন্তর যৌথরাষ্ট্র সভার সমুদায় সভ্যই নূতন নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে বার্ণ ও জুরিখ্ হইতে সর্ব্বদা একজন করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণত, ফরাসীভাষী ভো হইতেও একজন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। রোমান্ ক্যাথলিক রাষ্ট্র হইতে একজন নির্ব্বাচন করাও রীতি দাঁড়াইয়াছে,—ইনি প্রায়শ ইতালীয়ভাষী তিচিনো হইতে নির্ব্বাচিত হন। এইরূপে দেখা যাইবে যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির তিন চারিজন প্রত্যেকবার যে স্থল হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। তদুপরি যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ সাধারণত যতকাল ইচ্ছা করেন ততকাল পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হন। অর্থাৎ এক বৎসর যে সাত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন, তিন বৎসর অন্তর তাঁহাদের পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার কোন বাধা নাই। ১৮৪৮ সন হইতে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত এই নিয়মের একবার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা ছাড়া পূর্ব্ববর্ত্তী যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যেরা বার বার নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। এই কারণে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করিলে ভুল হয় না। তিন বৎসরের পর নূতন নির্ব্বাচনে পুরাতন সভ্যগণ পুনর্নির্ব্বাচিত হন, দেখা যায়। লাওয়েল বলেন যে, ১৮৪৮ সন হইতে ১৮৯৩ সনের জুলাই পর্য্যন্ত যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে মোট ৩১ জন নির্ব্বাচিত হন ও তন্মধ্যে ৭ জন ঐ সময় পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকের কার্য্যকাল গড়ে দশ বৎসর হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫ জন ঐ সময়েরও বেশী সভ্যপদে আসীন ছিলেন,—৪ জন ২০ বৎসরের অধিক এবং ১ জন ৩০ বৎসরের অধিক কাল সভ্য ছিলেন। কোন সভ্য মারা গেলে অথবা পদত্যাগ করিলে, তাঁহার পদে ব্যবস্থাপক সভা হইতে লোক নিযুক্ত করা হয়, তাহা আগেই বলিয়াছি। এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের প্রত্যেকের রাষ্ট্র-নেতার পদে একবার করিয়া উন্নীত হওয়া কিরূপে সম্ভব।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যপদে যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহারা সকলেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বক্তৃতা-শক্তি বা চতুরতার জন্য তাঁহাদের পদে মনোনীত করা হয় না, তাঁহারা শাসন-কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইবেন, ইহাই প্রয়োজন। পারদর্শিতা দেখাইবার একটি মাত্র পথ আছে,—জাতির চোখে নিজ যোগ্যতা প্রমাণের সেই পথ হইল ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে। সেই জন্য ব্যবস্থাপক সভা নিজ সভ্যদের মধ্য হইতেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। বক্তৃতা করিবার শক্তিকে সুইস্‌গণ বিশেষ স্থান দেয় না; অন্যান্য গুণ থাকিলে বক্তৃতা করিবার শক্তির অভাবে কোন ব্যক্তির সভ্যপদে উন্নীত হইবার বাধা হয় না। কারণ, সুইস্ জনগণ চায় যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের শাসনকার্য্যে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও শান্ত মেজাজ থাকিবে। এই সকল গুণ থাকিলেই কোন সভ্য বার বার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যদের পদের স্থায়িত্ব সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের একটি বিশেষত্ব। যৌথরাষ্ট্র সমিতির সভ্যগণ রাষ্ট্র-শাসনে অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি। সেই জন্যই এই সকল যোগ্য লোককে

সহজে কর্ত্তব্যচ্যুত করা সুইস্ জনগণের স্বভাব নহে। ইহা সম্ভবপর হইবার কারণ এই যে, সমগ্র দেশের রাষ্ট্র-নীতি স্থির করিবার ভার ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের উপর সম্মিলিত-ভাবে থাকে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি হুকুম তামিল করে মাত্র। যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে যৌথরাষ্ট্রীয় কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইলে, উহার স্থায়িত্ব ঘটিত না। তখন ব্যবস্থাপক সভার সহিত যৌথরাষ্ট্র-সমিতির বিরোধ বাধিলে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে পদত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু তাই বলিয়া, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি যে ব্যবস্থাপক সভার উপর এ বিষয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করে না, তাহা নহে। বস্তুত, পদের স্থায়িত্ব হেতু যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অধিক হওয়ায়, সাধারণ কার্য্যপ্রণালী স্থির করা সম্পর্কেও ইহাদের প্রভাব দেখা যায়, আর খুঁটিনাটিগুলি সম্পাদন করিবার ভার ইহাদের উপরেই পড়ে। একটি বিষয়ে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাহা পররাষ্ট্র-নীতি। কিন্তু সুইট্জারল্যাণ্ড সর্ব্বদা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় ও উহার চারিদিকে শক্তিশালী দেশসমূহ থাকায়, এ বিষয়ে সাধারণত কোন মতভেদ ঘটে না।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির মতের ঐক্য প্রয়োজন হয় না।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই: ইহার সভ্যদের সর্ব্বদা সকল বিষয়ে একমত হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। এই সমিতির বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করিতে পারেন। বস্তুত, ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের একের অন্যকে অনুমোদন করিতে হয় না অথবা কোন বিষয়ে সকলে একমত না হইলেও তাঁহাদের একমত আছে বলিয়া প্রচার করিবার আবশ্যকতা নাই। এমন দৃশ্য বিরল নহে যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির এক সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া অন্য সভ্যের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন। সত্য বটে, কোন সভ্যই নিজ সহযোগীদের সম্মতি ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইনের খসড়া পাশ করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতে পারেন না। কিন্তু এ বিষয়ে, সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে কোন বাধা দেন না,—সাধারণত যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কোন সভ্য যেরূপ খুসী বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিতে পারেন। আর এই বিল উপস্থাপিত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই যে প্রত্যেক সভ্য সেই সভ্যের সমর্থন করিতে বাধ্য এরূপ কেহ ভাবে না। পরন্তু কেহ প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিলে, প্রতিবাদকারীর নিন্দাভাজন হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সভ্যগণ সর্ব্বদাই এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা করিয়া থাকেন। এই বিরোধিতা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নহে। সাধারণত, কোন ব্যবস্থা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়া সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন প্রস্তাবে উপনীত হন, অথবা সকলে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও কার্য্যের সুবিধার জন্য কোন একটি মতকে এইজন্য অনুমোদন করেন যে, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। একদিকে তাঁহারা নিজেদের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না, অন্যদিকে তাঁহারা জানেন যে, ব্যবস্থাপক সভা কোন আইন পাশ করিলেও জনগণ তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারে। জনগণের হাতে সেরূপ অস্ত্র আছে,—তাহা প্রত্যুপস্থাপন। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ যদি সর্ব্বদা নিজ জেদ্ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উক্ত সমিতির কার্য্যপ্রণালীতে ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুরূহ

হইত। সুইট্জারল্যাণ্ডে বিবিধ জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপ স্থলে কোন দল নিজ জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করে না। রফা করা অথবা মধ্য পথ অবলম্বন করা সুইস্‌গণের স্বভাব। সুতরাং বিভিন্ন মত, স্বার্থ ও রাজনীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে অবিরত করিতে হয়। এই সমন্বয়ের অভাব ঘটিলে, সুইস্ জনগণ তৎক্ষণাৎ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। বলা বাহুল্য, তাহাতে কোন সভ্যের পুনর্নির্ব্বাচনের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না। যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে সর্ব্বদা পক্ষপাতিত্য-শূন্যভাবে ন্যায়ের দণ্ড হাতে করিয়া রাখিতে হয়।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতি দেশের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। সেইজন্য সুইস্‌গণ উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের সময় তাঁহাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে কি না তাহাই ভাল করিয়া বিচার করে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহাদের খ্যাতি কিরূপ তাহা বিচার করে না। সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির মন্ত্রিগণের ব্যক্তিগত কার্য্য-বিভাগের কথা আগে বলিয়াছি, তাঁহাদের সমষ্টিগত দায়িত্বও আছে। এই সমিতি প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া বৈঠক বসায়,—কখনো কখনো বিশেষ প্রয়োজন হইলে দুইয়ের অধিক অধিবেশনও হয়। সমুদায় অধিবেশন গোপনে হয়। অর্থাৎ উহাতে যে সকল আলোচনা ইত্যাদি হয় তাহা কোন কাগজপত্রে প্রকাশিত হয় না এবং লোকেরা সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। সমিতি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে সভ্যদের ভোট গ্রহণ করে। অধিকাংশ সভ্য যে দিকে ভোট দেন তাহাই সমিতির অবলম্বিত নীতি বলিয়া প্রচার করা হয়। বলা বাহুল্য, সুইস্‌দের মধ্যে রক্ষা-নিষ্পত্তির মনোভাব প্রবল হওয়ায় তাঁহারা সহযোগীদের অধিকাংশ প্রস্তাবে মত দেন, যদিও ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিবাদ করিবার অধিকার রাখেন। সকল প্রশ্নেই রাষ্ট্র-নেতা ভোট দিতে পারেন। উভয় পক্ষে সমান ভোট হইলে তাঁহার একটি অতিরিক্ত ভোট আছে।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট দল অতিজন হইলে তাহা হইতে সমুদায় সভ্যগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হয় না। বড় বড় দলের লোকদিগকে বাছিয়া লওয়া হয়। এরূপ একটি সমিতি যে কোন বিশেষ দলের অনুজ্ঞা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের যে প্রভাব, সুইট্জারল্যাণ্ডে সেরূপ প্রভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শুধু যে বিভিন্ন দলের লোককেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে লওয়া হয়, তাহা নহে। অনেক সময় ব্যবস্থাপক সভার যে দল সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ, সমিতিতে সে দলের সভ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকে না। ১৮৭৬ হইতে ১৮৮৩ সন পর্য্যন্ত সাত জন সভ্যের মধ্যে চারিজন উদার মতাবলম্বী ও তিনজন চরমপন্থী (র‍্যাডিক্যাল) ছিলেন; যদিও ব্যবস্থাপক সভায় উদার মতাবলম্বীদের সংখ্যা অন্য দুইটি দলের প্রতিনিধিদের চেয়েও কম ছিল এবং চরমপন্থীদের সংখ্যা সর্ব্বাধিক ছিল। যৌথরাষ্ট্র-সমিতি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই এরূপ ঘটে,—প্রতি তিন বৎসর অন্তর পুরাতন সভ্যেরাই পুনর্নির্ব্বাচিত হন ও তাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিনিধি না হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থারই প্রতিনিধি থাকিয়া যান। (লাওয়েল)। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ অবশ্যই

ব্যবস্থাপক সভার প্রধান দল হইতে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত না হইতেও পারেন।

কোন না কোন দলের লোক হইয়া থাকেন, এবং সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার পরও তাঁহারা দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন না। এমন কি, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে বিভিন্ন দলের নেতারাও থাকিতে পারেন। সেইজন্ত সমিতির সভ্যগণের বিভিন্ন মতামত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সুইস্‌রা শুধু বিভিন্ন সভ্যকে স্বাধীনভাবে নিজ মত প্রকাশের সুযোগ দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অধিকন্তু বিলাত বা ফ্রান্সে মন্ত্রীদের মধ্যে পরস্পর কোন গুরুতর মতভেদ ঘটিলে যেমন তাঁহারা পদত্যাগ করিয়া থাকেন, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে মন্ত্রীদের সেরূপ কিছু করিতে হয় না। গুরুতর মতভেদ থাকিলেও কেহ পদত্যাগ করেন না।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য-গণ ব্যবস্থাপক সভায় ভোট দিতে পারেন না।

ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় উপস্থিত থাকিয়া যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ বক্তৃতা বা অবলম্বিত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ইত্যাদি করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ দিবার ও উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু কোন শাখাতেই কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভোট দিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ব্যবস্থাপক সভায় কোন বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত হইলে তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও আনিতে পারেন না। (১০১ ধারা)। এই ধারার মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যদিও একমাত্র ব্যবস্থাপক সভা হইতেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন হইয়া থাকে, তথাপি তিনি ঐরূপে নির্ব্বাচিত হইবামাত্র আর জনগণের প্রতিনিধি থাকেন না, সরকারী কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত হইয়া যান। সেইজন্তই তাঁহার স্থলে ব্যবস্থাপক সভায় নূতন লোক নির্ব্বাচিত করা হয়। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য হইবার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের মত তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিবার ক্ষমতা থাকে না। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভা না ডাকিলে উত্তর-প্রত্যুত্তরও করিতে পারেন না, সুইস যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ তাহা করিয়া থাকেন।

যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কতকগুলি অধিকার ও কর্ত্তব্যের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এগুলি নীচে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। কিন্তু এগুলি ব্যতীত যৌথরাষ্ট্র-সমিতির আর কোন ক্ষমতা বা অধিকার নাই, এমন কথা কাঠামো-আইনেও বলা হয় নাই। বরং বলা হইয়াছে এগুলিই প্রধান।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অধিকার ও কর্ত্তব্য।

(১) যৌথরাষ্ট্রের আইন অনুসারে ইহা সমুদায় যৌথ-কার্য্য পরিচালনা করে।

(২) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন, এবং যৌথরাষ্ট্রের ও যৌথ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আইন, ইত্যাদি যাহাতে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়, সেদিকে সমিতি দৃষ্টি রাখে। নিজে নিজে অথবা কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে পর, উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সমিতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। কাঠামো-আইনের ১১৩ ধারা অনুসারে যে সকল বিষয় যৌথ বিচারালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবার প্রয়োজন হয় না, সেই সব বিষয়েই সমিতি ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(৩) সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন অব্যাহত রাখিবার যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, সেই অঙ্গীকার যাহাতে পালিত হয় সেজন্ত সমিতি নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে।

(৪) যৌথ ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্ত ইহা আইন প্রণয়ন করে এবং ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ইহার নিকট যে সকল প্রস্তাব পাঠায় সেগুলির সম্পর্কে বিবরণী দাখিল করে।

(৫) যৌথরাষ্ট্রের আইন, যৌথ বিচারালয়ের বিচারসমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদে আপোষ-নিষ্পত্তি ও চুক্তিসমূহ কার্য্যত প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা ইহার হাতে দেওয়া হইয়াছে।

(৬) যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার সুইস্ মহাসমিতি, যৌথ বিচারালয় অথবা অন্ত কোন কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় নাই, সে সকল কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে।

(৭) সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা পররাষ্ট্রসমূহের সহিত সন্ধিসমূহ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ইহা সেগুলিতে সম্মতি দেয়।

(৮) যৌথরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক সমঝোতা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা ইহাকে সর্ব্বদা করিতে হয়। পররাষ্ট্র-বিভাগ পরিচালনার ভারও ইহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

(৯) সুইট্জারল্যাণ্ডের বাহ্যিক নিরাপত্তা (অর্থাৎ বাহির হইতে কেহ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে) এবং উহার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব সমিতির।

(১০) সমিতি সুইট্জারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলাও রক্ষা করিয়া থাকে।

(১১) সুইট্জারল্যাণ্ডে বিপৎকাল উপস্থিত হইলে ও সে সময় সুইস্ মহাসমিতির অধিবেশন না বসিলে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সৈন্যগণকে আহ্বান করিবার ও যেরূপভাবে প্রয়োজন মনে করে সেরূপভাবে ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। কিন্তু আহূত সৈন্য-সংখ্যা যদি দুই হাজারের বেশী হয় অথবা দুই হাজারের কম সৈন্যকে যদি তিন সপ্তাহের অধিককাল সজ্জিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মিলিত অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য।

(১২) যৌথ সৈন্যসামন্ত এবং যৌথরাষ্ট্রে অর্পিত তৎসংক্রান্ত শাসন-ব্যবস্থার সমুদায় শাখার ভার সমিতির হাতে রহিয়াছে।

(১৩) সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতকগুলি আইন বা বিধিনিষেধ সমিতির নিকট পাঠাইতে হয়। সমিতি সেগুলি পরীক্ষা করে। এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারের যে যে অঙ্গ ইহার শাসনাধীনে রহিয়াছে, সেগুলির তত্ত্বাবধান করে।

*(১৪) যৌথরাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করা, আয়ব্যয়ের অনুমিত হিসাব (বাজেট) তৈরী করা ও আয়ব্যয়ের হিসাব (ব্যবস্থাপক সভায়) উপস্থাপিত করা ইহার কাজ।

(১৫) যৌথশাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত সমুদায় কর্ম্মচারী কিরূপভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে তাহার তত্ত্বাবধান করার ভার সমিতির উপর আছে।

(১৬) সুইস্ মহাসমিতির প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনে সমিতিকে নিজের কাজের হিসাব দিতে হয়; সমিতি সে সময়ে যৌথরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের কথা বিবৃত করে এবং দেশের সাধারণ হিতার্থে যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সেগুলিকে উপস্থাপিত করে। সুইস্ মহাসমিতি অথবা ব্যবস্থাপক সভার যে কোন একটি শাখা যখন খুসী যৌথরাষ্ট্র-সমিতির নিকট হইতে কার্য্য-বিবরণী চাহিয়া পাঠাইতে পারে এবং এইরূপ চাহিয়া পাঠাইলে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে বিশেষ বিবরণী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। [১০২ ধারা, ১-১৬ দফা।]

(১৭) যৌথ ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দেশে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির বিভিন্ন বিভাগ অথবা বিভাগের অধীনে কর্ম্মচারিগণ নিজেরা কোন কোন বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকারও জনগণের আছে। (১০৩ ধারা)।

(১৮) বিশেষ প্রয়োজন হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ডাকিবার ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্র-সমিতি অথবা উহার বিভিন্ন বিভাগের আছে। (১০৪ ধারা)।

(১৯) সুইস্ চ্যান্সেলারের বিভাগসমূহের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার যৌথরাষ্ট্র-সমিতির উপর থাকে। (১০৫ ধারা)।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির ক্ষমতাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ:

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির ক্ষমতাসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই ক্ষমতা তিন শ্রেণীর:

(১) কতকগুলি ক্ষমতা শাসন-সম্পর্কিত,

(২) কতকগুলি আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত,

(৩) অন্য কতকগুলি বিচার-সম্পর্কিত।

(১) শাসন-ক্ষমতা;

অর্থাৎ যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সুইট্জারল্যাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ হইলেও, উহার আইন-প্রণয়ন বা বিচার-কার্য্যের ক্ষমতাও কিছু কিছু আছে। সমিতির শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র নানা দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা, কার্য্যতঃ আইন কানুনের প্রয়োগ, যৌথ সৈন্যসামন্তের নিয়ন্ত্রণ, যে সকল যৌথ কর্ম্মচারী সুইস্ মহাসমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত নহে তাহাদের নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষমতা শাসন-সম্পর্কিত ক্ষমতার অন্তর্গত। যৌথ-রাষ্ট্রের অনুমিত আয়-ব্যয়ের হিসাবের খসড়া প্রত্যেক বৎসর যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকেই তৈরী করিতে হয়। খসড়া তৈরী হইবার পর কোষ-বিভাগের সভ্য উহা ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় উপস্থাপিত করেন। খসড়া উপস্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় উহার বিভিন্ন দফা ব্যাখ্যা করিবার অথবা কেহ কোন দফা বা সমগ্র হিসাবকে আক্রমণ করিলে কোষ-বিভাগের সভ্যের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা উপরোক্ত হিসাব পাশ করিলে পর যৌথরাষ্ট্র-সমিতি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ও তাহা খরচের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে যে প্রতি বৎসর আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ব্যাপার লইয়া এক বিবরণী দাখিল করিতে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা এই বিবরণীর বিচার করিয়া থাকে।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে তাঁহাদের শাসন-সম্পর্কিত কার্য্যসমূহের জন্ত সাক্ষাৎভাবে দায়ী করা হইয়া থাকে। সেইজন্ত ব্যবস্থাপক সভার যে কোন শাখার সভ্য যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। যখন যে বিভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, তখন সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভ্য তাহার জবাব দিয়া থাকেন। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য প্রশ্নের জবাব দিলে পর, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আর ভোট লওয়া হয় না, যিনি প্রশ্ন করেন তিনি শুধু প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন অথবা হন নাই তাহা জানাইয়া দেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের যে তাহা লইয়া আলোচনা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে তাহা লইয়া আলোচনাও চলিতে পারে, তবে সাধারণত বিশেষ মতভেদ না ঘটিলে, সভ্যগণ নিজেদের সন্তোষ বা অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন।

(২) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা;

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্য্য কম নহে। সমিতির সভ্যগণ দুই প্রকারে আইন-প্রণয়ন করিতে পারেন। কখনো কখনো ব্যবস্থাপক সভার যে কোন শাখায় প্রস্তাবের আকারে অনুরোধ পাশ করা হয় যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে বিল তৈরী করিতে দেওয়া হউক। সমুদায় ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত বিল-প্রণয়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মোতায়েন আছেন। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের সাহায্যে বিল-প্রণয়ন করিয়া থাকেন। বিল প্রণীত হইবার পর আবার ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় উপস্থাপিত করা হয়। অন্য দিকে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার যে কোন সভ্য কোন বিল আনয়ন করিলে, ব্যবস্থাপক সভা কোন মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির মত জানিবার জন্ত উহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। অর্থাৎ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ প্রথমে কোন ব্যবস্থার বিবেচনা না করিলে, সুইট্স্যারল্যাণ্ডে কোন আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের কোন আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা আছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। বস্তুত, সকল ক্ষেত্রেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতি মাত্র পরামর্শ দেয়। সে পরামর্শ গ্রাহ্য হইবেই, এমন কোন কথা নাই। কোন কোন সময়ে নিজেদের সম্মতি না থাকিলেও, ব্যবস্থাপক সভার অনুরোধে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন বিল পাঠাইয়াছেন এবং সেগুলি পাশও হইয়াছে। আবার ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্য কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কোন বিলের বিরুদ্ধে মত দেওয়া সত্ত্বেও, তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া ব্যবস্থাপক সভা সেই বিল পাশ করিতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের মতামতকে অগ্রাহ্য করিলে, উক্ত সমিতি কখনো পদত্যাগ করে না। সমিতি তখন ব্যবস্থাপক সভার অনুশাসনই শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হয়। ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদের কাজের বিরুদ্ধতা করিয়াছে, সেইজন্ত তাঁহারা আর নিজ আসনে থাকিবার অধিকারী নহেন, এই প্রকার চিন্তা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের মনে স্থান পায় না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণও এরূপ বিশ্বস্ত, কর্ম্মপটু এবং প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী হারাইবার কথা কল্পনা করেন না।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির উপবিধি-প্রণয়ন-ক্ষমতা অর্থাৎ আইনের পরিপোষকরূপে নানারূপ বিধিনিষেধ জারির ক্ষমতা এক্ষণে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির

উপর অনেক গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল ও সেজন্য অনেক আইন-কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগেরও প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের উপবিধি-প্রণয়নের ক্ষমতা বাড়িয়াছে।

(৩) বিচার-ক্ষমতা।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কিছু কিছু বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতাও আছে। গোড়াতে যৌথ কাঠামো-আইন ঘটিত সকল প্রকার মামলার নিষ্পত্তির ভার ইহার হাতেই ছিল এবং সমগ্র যৌথরাষ্ট্রের শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় (এডমিনিষ্ট্রেটিব্ কোর্ট) স্বরূপ হইয়াছিল। অতঃপর যৌথ-বিচারালয়সমূহ কাঠামো-আইন-সম্পর্কিত মোকদ্দমাসমূহের বিচারের ভার গ্রহণ করে। ১৯২৮ সনে শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় গঠনের পর হইতে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণের কাজের চাপ খুব বেশী।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ সর্ব্বদা কাজের চাপে বিব্রত থাকেন। অনেক স্থলে মন্ত্রীদের সহকারিগণ যে সকল কাজ করেন সে সকল কাজ সুইট্জারল্যাণ্ডে উক্ত সমিতির সভ্যগণকে করিতে হয়। সুইস্ মন্ত্রিগণ নিজেরাই নিজেদের সহকারী এবং বিভিন্ন শাসন-বিভাগের কর্ত্তা। অর্থাৎ বিভাগীয় কর্ত্তা হিসাবে তাঁহারা প্রায় স্থায়ী কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান বলিয়া, নিজ বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার মাত্র তাঁহাদের হাতে থাকে না, বিভিন্ন বিভাগের মাথা হিসাবে যে সকল কর্ত্তব্য থাকে সেগুলিও তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। অন্যান্য দেশের মন্ত্রীদের সহিত তাঁহাদের কাজের পরিমাণ তুলনা করিলে, তাঁহারা যে বেতন পান তাহা খুব বেশী বলিয়া মনে হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইয়া তাঁহাদের কার্য্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে।

বিলাত, ফ্রান্স, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের মন্ত্রি-সমিতির সহিত সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির তুলনা।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে সুইস্ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইহার স্থান কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সহিত ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধও আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাত অথবা ফ্রান্সে মন্ত্রি-সমিতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই যে, ব্যবস্থাপক সভার (বিশেষত জনগণের প্রতিনিধিমূলক শাখায়) অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহাদিগের হাতে সমগ্র রাষ্ট্রের চরম শাসন ভা[র] তুলিয়া দেয় তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও রাখে। শেষ পর্য্যন্ত দলের প্রাধ[ান্য] দেখা যায়। সুইট্জারল্যাণ্ডেও বিভিন্ন দল আছে এবং বিভিন্ন দল নানা অনুপাতে নিজেদের প্রতিনিধি-দিগকে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে নির্ব্বাচিত করে। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র-সমিতি গঠনে একমাত্র দলের প্রাধান্যই স্বীকৃত হয় না। দ্বিতীয়ত, *এইরূপে গঠিত ঐ সুইস্ মন্ত্রি-সমিতির কার্য্যকাল আইন দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া আছে। ব্যবস্থাপক সভা প্রতিকূলতা করিলেও তিন বৎসরের আগে কোন সভ্যের কার্য্যকাল ফুরাইয়া যায় না। তৃতীয়ত, যাঁহারা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির জন্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা সাধারণত উহার জন্য প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত সাদৃশ্য এই যে,* সুইস্ মন্ত্রি-সমিতিও যৌথ ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সাদৃশ্য এই যে, সুইস্ মন্ত্রি-সমিতিকে ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধে ভোটে পদত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্র কাহারও সহিত সাদৃশ্য ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় নাই। সুইস্ রাষ্ট্র-নেত

মার্কিণ রাষ্ট্র-নেতার মত ক্ষমতাশালী নহেন; তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া থাকেন, মার্কিণ মন্ত্রি-সমিতির মত রাষ্ট্র-নেতার অধীন নহেন। ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াও সুইস্ মন্ত্রি সমিতি নিজের অস্তিত্বের জন্ত বিলাতী বা ফরাসী মন্ত্রি-সমিতির ন্যায় ব্যবস্থাপক সভার উপর নির্ভর করেন না। মার্কিণ মন্ত্রি-সমিতি ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রশ্নের জবাব দেন না, সেখানে মন্ত্রিগণের সহিত ব্যবস্থাপক সভার যোগাযোগ বিভিন্ন সমিতির সাহায্যে স্থাপিত হয়। সুইট্জারল্যাণ্ডে সমিতি-প্রথার তেমন আদর নাই। মন্ত্রি-সমিতিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবস্থাপক সভায় জবাবদিহি করিতে হয়। এইরূপে দেখা যাইবে, সুইস্ জলবাতাসে ও সুইস্ জনগণের প্রকৃতি-অনুসারে সুইস্ রাষ্ট্রীয় কাঠামো মার্কিণ বা ফরাসী কাঠামোর অনুবৃত্তি মাত্র নহে বা দুইয়ের জোড়াতাড়া দিয়া সৃষ্ট কোন পদার্থও নহে; উহা বৈচিত্র্যময় ও সম্পূর্ণ পৃথক সত্তাবিশিষ্ট একটি নূতন ছাঁচের কাঠামো।

সুইস্ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ কেহ কেহ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছে: *সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কয়েকটি গুণ:*

(১) প্রকৃত পক্ষে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি সুইস্ মহাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা এরূপভাবে গঠিত যে বিলাতী মন্ত্রি-সমিতির প্রধান সুবিধাগুলিকে গ্রহণ ও অসুবিধাগুলিকে ত্যাগ করা হইয়াছে। মন্ত্রি-সমিতিতে স্থায়িত্ব ও দায়িত্বের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। বিলাতী মন্ত্রি-সমিতির মত সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণও পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসশীল ও একে অন্যের সহযোগিতা করিয়া থাকেন। সুইট্জারল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে বহুকাল নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এরূপ কোন ব্যক্তি যে দলেই থাকুন নির্ব্বাচনকালে সেই দল পরাজিত হইলে তাঁহাকে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কারণ, সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতি শুধু অতিজন দলের লোক লইয়া গঠিত হয় না। তাহাতে অন্যান্য দলের লোকও থাকে। *(১) সভ্যগণের স্থায়িত্ব;*

(২) অন্যান্য গণতন্ত্রের মত সুইট্জারল্যাণ্ডে শুধু অতিজন দলই রাষ্ট্র-শাসনের ভার গ্রহণ করে না। রাষ্ট্র-শাসনে বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন স্বার্থের যে দাবী রহিয়াছে সুইস্‌গণ তাহা অস্বীকার করে নাই। আর সেই জন্যই সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সুইট্জারল্যাণ্ডের মন্ত্রি-সমিতির স্থায়িত্ব ব্যবস্থাপক সভার অতিজন দলের উপর নির্ভর করিলে, এই ধরণে গঠিত ঐ সমিতির স্থায়িত্বের কথা কল্পনা করাও সম্ভব হইত না। বস্তুত, সুইস্ রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থকে যথোচিতভাবে মর্য্যাদা দিবার ও রক্ষা করিবার জন্যই যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে বিভিন্ন দলের লোক গ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। *(২) বিভিন্ন দল বা স্বার্থের প্রতিনিধিগণের অবস্থিতি;*

(৩) সুইট্জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতিতে যেরূপ ঐক্য অর্থাৎ অবিভাজ্যতা দেখা যায়, তাহা অন্যান্য গণতন্ত্রে দুর্ল্লভ। প্রায় সকল দেশেই শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতিতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন না করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। বিলাত ও বিলাতের

(৩) ঐক্যবদ্ধ শাসন-প্রণালী।

অনুসরণকারী দেশসমূহে সর্ব্বোচ্চ শাসন-তন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রি-সমিতির জীবন অত্যন্ত চঞ্চল,—তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপক সভার মর্জির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ঘন ঘন মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রণালী অনুসৃত না হইবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত প্রভৃতি দেশে এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য স্থায়ী কর্ম্মচারীদের (সিবিল সার্ব্বিস্) সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক দলের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক থাকে না এবং ইঁহারা মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে পদত্যাগ করেন না। ইঁহাদের বেতন, কার্য্যকাল ইত্যাদি একেবারে আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ইঁহাদের সাহায্যে শাসন-প্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। সুইট্জার-ল্যাণ্ডে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ প্রায় সকলেই বার বার নির্ব্বাচিত হন। একে ত তিন বৎসরের জন্য তাঁহাদের পদচ্যুত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তদুপরি ইঁহারা যৌথরাষ্ট্রের স্থায়ী মন্ত্রি-সমিতিতে পরিণত হন। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইবে যে তাঁহারা শাসন-প্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন।

মন্ত্রি-পদের স্থায়িত্বের দোষ ও তাহার প্রতীকার।

যৌথরাষ্ট্র-সমিতির স্থায়িত্বকে যদিও গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তথাপি এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। বর্ত্তমান কালে গণতন্ত্রসমূহে চরম কর্ত্তৃত্বভার জনগণের উপর ন্যস্ত আছে, একথা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রি-সমিতিকে স্থায়িত্ব প্রদান করিলে, তাঁহারা জনগণের সংস্পর্শ-বিচ্যুত হইয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র-শাসন-কার্য্য না চালাইতেও পারেন। তাহা দ্বারা গণতন্ত্রের মূলসূত্রই খণ্ডিত হইয়া যায়। অন্য দিকে মন্ত্রি-সমিতির উপর জনগণের অত্যধিক ক্ষমতা থাকিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত চক্র বা দলের হাতে গিয়া পড়ে। জনগণের নামে বিশেষ দল রাষ্ট্র-শাসন-কার্য্য চালাইতে থাকে এবং তাহা সমুদায় জনগণের ইচ্ছানুরূপ নাও হইতে পারে। সুতরাং স্থায়ী মন্ত্রি-সমিতি অথবা দায়িত্বশীল মন্ত্রি-সমিতি উভয়েরই যেমন গুণ আছে তেমনি দোষও যথেষ্ট আছে। কেহ কেহ উভয় প্রকার প্রথা সম্মিলিত করিবার কথা, অর্থাৎ মন্ত্রি-সমিতি জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধির নিকট দায়ীও থাকিবে, অথচ তাঁহাদের কতকটা স্থায়িত্বও রাখিতে হইবে, বলিয়া থাকেন। সুইট্জার-ল্যাণ্ডে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির কার্য্যকাল তিন বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ও উহাকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী রাখিয়া উভয় প্রথা সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সময় সময় প্রথা আইনের চেয়েও বলবৎ হইয়া দাঁড়ায়। সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির আয়ুষ্কাল আইনে তিন বৎসর থাকিলেও, প্রথা দ্বারা উহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। তবে এই প্রথাকে না মানিয়া সুইট্জারল্যাণ্ড আইনকে যদি পুনরায় প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বাধা দিবার কেহ নাই। সে ক্ষমতার প্রয়োগ না হইলেও, ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া যৌথরাষ্ট্র-সমিতি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইলেও সুইস জনগণ অভিনয়ন, প্রত্যুপস্থাপন ইত্যাদির দ্বারা ইহার উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তাহা এই : উক্ত সমিতি যথেচ্ছভাবে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া জনগণের পীড়া উৎপাদন করিতে পারে, তখন উপায় কি ? প্রথমত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার

করে না। সুইস্ জনগণ এরূপ স্বাধীনতা-প্রিয় ও রাজনৈতিক মেলামেশা বা আলাপ-আলোচনায় এরূপ অভ্যস্ত যে, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিবামাত্র জনমত তাহা বরদাস্ত করিবে না। দ্বিতীয়ত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতির এরূপ ক্ষমতা অল্পই আছে যাহা দ্বারা জনগণের উপর অত্যাচার চলিতে পারে। যেখানে যৌথ কর্ম্মচারীর সহিত ব্যক্তির বা কোন রাষ্ট্রের সংঘর্ষ বাধে, সেখানে সমিতিকে নিরপেক্ষভাবে রক্ষা-নিষ্পত্তি করিয়া দিতে হয়,—যৌথরাষ্ট্র-সমিতি এরূপ বিবাদে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না। তৃতীয়ত, বর্ত্তমান সময়ে যৌথ কর্ম্মচারীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও সমিতির কোন সভ্যের হাতে কাজে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা তেমন প্রচুর নাই। আর যে সকল চাকুরী যৌথরাষ্ট্র-সমিতির হাতে আছে সেগুলির বেতন অধিক নহে বলিয়া লোকে তত আকৃষ্ট হয় না। চতুর্থত, যৌথরাষ্ট্র-সমিতি যৌথ-শাসন-কার্য্য নিজে না করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের দ্বারা তাহা করাইয়া লয়। অর্থাৎ সমিতির কাজ তত্ত্বাবধানের কাজ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। যদি কোন রাষ্ট্র এবিষয়ে যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে এক অদ্ভুত উপায়ে সেই রাষ্ট্রকে জব্দ করা হয়। সেই রাষ্ট্র যৌথরাষ্ট্রের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য পায় তাহা বন্ধ করিয়া ত দেওয়া হয়ই, অধিকন্তু যৌথ সৈন্যকে ঐ রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। এই সৈন্যগণ সেই রাষ্ট্রে গিয়া কোন প্রকার অত্যাচার করে না, শুধু সেই রাষ্ট্রে বসিয়া বসিয়া সেই রাষ্ট্রের খরচে আত্মপোষণ করে। বলা বাহুল্য, এরূপভাবে দীর্ঘকাল খরচ চালাইবার ক্ষমতা কোন সুইস্ রাষ্ট্রেরই নাই। সুতরাং উহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতির নিজ ক্ষমতা অপ-প্রয়োগের উদাহরণ বিরল কেন।

সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারিগণ

এখানে সুইস্ সামরিক ও অসামরিক যৌথ কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েকটি গুরুত্ববিশিষ্ট পদে সুইস্ মহাসমিতি কর্ম্মচারীদের নিযুক্ত করে। তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজে—রাজধানীতে হউক বা দেশের যেখানে হোক—যৌথ কর্ম্মচারিগণ যৌথরাষ্ট্র-সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিলে উক্ত সমিতি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারে। অর্থাৎ যৌথ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের নিয়োগের জন্য সম্পূর্ণরূপে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির উপর নির্ভর করেন।

সুইট্জারল্যাণ্ডে কর্ম্মচারিগণের পদের স্থায়িত্ব রাজনৈতিক মতামতের উপর নির্ভর করে না।

সুইস্ সিবিল সার্ব্বিস্ বস্তুত স্থায়ী পদ নয়। সুইট্জারল্যাণ্ডে উচ্চ পদগুলিতে যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহারা যাবজ্জীবন ত দূরের কথা, দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হন না। তাঁহাদের কার্য্যকাল তিন বৎসর। কিন্তু কার্য্যত তাঁহারা স্থায়ী হইয়া দাঁড়ান। কারণ তিন বৎসর অন্তর তাঁহারা প্রায়শ পুনরায় নিযুক্ত হন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন যে রাজনৈতিক দল জয়লাভ করে তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে লোক লইয়া বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে, সুইট্জারল্যাণ্ডে সেরূপ কোন প্রথা নাই। অতিজন দল নিজেদের লোকদের বিভিন্ন কাজ দিতে ইচ্ছা করিলেও, শুধু রাজনৈতিক কারণে কর্ম্মচারি-নিয়োগ চলে না। শুধু রাজনৈতিক কারণে লোক নিয়োগ করিলে জনমত তাহা বরদাস্ত না করিবার সম্ভাবনা। এক দিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন অল্প হওয়ায় সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার কোন সুযোগ উপস্থিত

হয় না, অন্য দিকে বিভিন্ন লোককে যোগ্যতায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না করিলে জনমত তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। সুতরাং একমাত্র রাজনৈতিক কারণে কর্ম্মচারী নিয়োগ হয় না। দ্বিতীয়ত, যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তাঁহারা রাজনৈতিক কারণে পদচ্যুতও হন না। অর্থাৎ যে দলই বিজয় লাভ করুক্ অথবা ব্যবস্থাপক সভায় বেশী প্রতিনিধি প্রেরণ করুক্, সেই দলের লোকই যে অন্য দলের কর্ম্মচারিগণের স্থলে নিযুক্ত হইবে, তাহা নহে। যৌথরাষ্ট্র-সমিতি বা ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন দলের সমাবেশ যেরূপ হোক, কর্ম্মচারীদের নিয়োগে তাহার প্রভাব কম হয়। সুতরাং যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে সরকারী কর্ম্মচারিগণ তিন বৎসর অন্তর বার বার নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

সামরিক বিভাগে সুইস্‌দিগের শিক্ষানবিশি করিবার বাধ্যবাধকতা।

যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন অনুসারে প্রত্যেক সুইস্‌কে সৈন্য-বিভাগে কাজ করিতে হয় (১৮শ ধারা); অন্য দিকে সৈন্যসামন্তকে সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখাও নিষিদ্ধ (১৩শ ধারা); এই দুইটি ধারাকে রক্ষা করিবার জন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সার্ব্বজনীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা ১৯০৭ সনে প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা জনগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। কখনো কখনো ইস্কুলে পড়িবার কালেই সামরিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়া যায়। উনিশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র প্রত্যেক পুরুষ রাষ্ট্রিককে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, তাহার সামরিক শিক্ষার পক্ষে উপযোগী শারীরিক স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি আছে কি না। যাহাদের তাহা নাই অথচ প্রাথমিক শিক্ষাদানের পর তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে শারীরিক ও অন্যান্য বিকাশের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া তারপর সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। আর যে সকল সুইস্ রাষ্ট্রিক শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য বিষয়ে যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য কোন সামরিক ইস্কুলে গভীরভাবে শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষার জন্য সৈন্যের বিভাগ অনুসারে পঁয়ষট্টি হইতে নব্বই দিন লাগে। ইহার পর কুড়ি বৎসর হইতে বত্রিশ বৎসর অবধি সুইস্ রাষ্ট্রিককে আউস্‌ৎসুগ নামে সৈন্য-বিভাগের এক বিশেষ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া মাঝে মাঝে শিবিরে থাকিয়া শিক্ষানবিশি করিতে হয়। এই শিক্ষানবিশির সময় বৎসরে এগার হইতে পনের দিন পর্য্যন্ত। বত্রিশ বৎসর বয়সে সুইস্ রাষ্ট্রিককে লাণ্ডহ্বের নামে এক সৈন্য-বিভাগের অন্তর্গত করা হয়। এখানে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য শিক্ষানবিশির প্রয়োজন। চল্লিশ বৎসর বয়সে সুইস্ রাষ্ট্রিককে লাণ্ডষ্টুর্ম নামক শ্রেণীতে বদলী করা হয়। সেই শ্রেণীর লোকের অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের বাৎসরিক পরিদর্শন হয়। একজন পদাতিককে এইরূপে উনিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মাত্র ১৫০ দিনের শিক্ষানবিশি করিতে হয়। সৈন্য-বিভাগে যে সকল উচ্চ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগকে ইস্কুল হইতেই বাছাই করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ২৫০ জন নিয়মিত সামরিক শিক্ষক ব্যতীত সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আর সামরিক কর্ম্মচারী নাই বলিলেও চলে,—অন্যেরা প্রায় সকলেই কোন না কোন অসামরিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। অথচ সৈন্য সমাবেশের দরকার হইলে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এক সপ্তাহের মধ্যে দেড় লক্ষ প্রথমোক্ত শ্রেণীর এবং দেড় লক্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সৈন্য জড় করা যায়। আর সকল রকম বয়সের উপযুক্ত রাষ্ট্রিক সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম হইবে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সুইট্‌জার-

ল্যাণ্ড বিভিন্ন সীমা রক্ষার জন্য অক্লেশে দুই লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছিল। এক কথায় বলা যায়, সুইস্‌রা যুদ্ধ-প্রিয় না হইলেও যোদ্ধা জাতি বটে। (মানরো)। ১৯১৯ সনে সৈন্য-বিভাগের মোট খরচ ছিল প্রায় পৌনে আঠার লক্ষ পাউণ্ড বা সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের সকল প্রকার ব্যয়ের সমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ। (ব্রাইস্)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যৌথ কর্ম্মচারিগণ যৌথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না; সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ম্মচারিগণও সাধারণত সেই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইবার কোন বাধা নাই; বস্তুত, তাঁহারা অনেক সময়ই তাহা হইয়া থাকেন। যৌথ কর্ম্মচারিগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ততটা প্রবেশ না করিলেও, একেবারে যে যান না, তাহা নহে। সম্ভবত, এরূপ ক্ষেত্রে উপরিতন কর্ম্মচারীর অনুমতি লওয়া হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও স্থান গ্রহণ করেন। যেমন জুরিখে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির (অর্থাৎ মন্ত্রি-সমিতির) সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারিগণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া উপরিতন কর্ম্মচারীদের কাজের সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতে পারেন। সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পদত্যাগ না করিয়া রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন,—কেবল যখন আলোচনার জন্ম তাঁহাদের নিজেদের বিবরণী আসে, তখন তাঁহারা ভোট দিতে পারেন না। (ব্রাইস্)।

রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী যৌথ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারেন।

শুধু তাহাই নহে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে ও নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের মত তাঁহারা নিয়োগকারী দলের জন্ম প্রচার ও সংগঠনের কার্য্যে প্রাণপণে সচেষ্ট হন না বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা দলের জন্য কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের তুলনায় তাঁহাদের একটি সুবিধা এই যে, অন্য দল জয়লাভ করিলেও তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হন না। বর্ত্তমান সময়ে, রেলওয়ের শাসনভার সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের হাতে আসাতে বহু মজুর ভোটার নানা প্রকার প্রচার ইত্যাদি দ্বারা মজুরের বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে যৌথ-কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যৌথ কর্ম্মচারিগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন।

রাষ্ট্র-সভা

সুইস্ যৌথরাষ্ট্রীর কাঠামো-আইনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যৌথকর্ত্তৃপক্ষদের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বর্ণনার বিষয়, যৌথমহাসমিতি (বুণ্ডেস্‌ফের্‌সাম্‌লুঙ্),—ইহার আবার দুইটি বিভাগ—রাষ্ট্র-সভা (ষ্টেইণ্ডেরাট্) (৭২-৭৯ ধারা); প্রতিনিধি-সভা (৮০-৮৩ ধারা)। ৭১শ ধারায় বলা হইয়াছে যে,

"জনগণের এবং [সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত] বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সকল অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে (৮৯ ও ১২১ ধারা) সেগুলির কর্ত্তৃত্বাধীনে, যৌথরাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা মহাসমিতি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এই মহাসমিতির দুইটি বিভাগ বা সভা আছে:

(ক) প্রতিনিধি-সভা

(খ) রাষ্ট্র-সভা।"

বুঝা যাইতেছে যে, ৮৯ ও ১২১ ধারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১২১ ধারার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে। তাহা অভিনয়ন-সম্পর্কিত। আর ৮৯ ধারা প্রত্যুপস্থাপন সম্বন্ধে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখাই সুইস্-প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। সুতরাং এই প্রতিনিধিদের হাতে চরম ক্ষমতা অর্পণ করা চলিত। কিন্তু কাঠামো-আইনে স্পষ্টভাবে এই নির্দ্দেশ আছে যে, প্রতিনিধিগণ সাধারণত শেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইলেও, জনগণ তাহাদের সমুদায় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিদের হাতে দিয়া দেয় নাই। অর্থাৎ প্রতিনিধিগণ ততক্ষণ জনগণের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে পারেন, যতক্ষণ জনগণ তাহাতে সম্মতি দেয়; জনগণের অসম্মতি থাকিলে প্রতিনিধিদের কাজ আর জনগণের কার্য্যরূপে গণ্য করা চলে না।

গোড়াতেই মহাসমিতির রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা সম্বন্ধে এইরূপ ক্ষমতার সীমা-নির্দ্দেশ করার অভিপ্রায় এই ছিল যে, জনগণের প্রাধান্য সম্বন্ধে যেন কোনপ্রকার সংশয় না থাকে। এই সীমাবদ্ধতা মানিয়া লইলে পর, সুইস্ যৌথরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় চরম ক্ষমতা যে উহার মহাসমিতি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাষ্ট্র-সভার সভ্য-সংখ্যা ৪৪।

সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ হইতে ৪৪ জন সদস্য লইয়া রাষ্ট্র-সভা গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে; কিন্তু যে রাষ্ট্রগুলি দ্বিখণ্ডিত সেগুলির প্রতি অর্দ্ধ-রাষ্ট্র হইতে একজন প্রতিনিধি পাঠান হয়। (৮০শ ধারা)। এখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ব্যবস্থাপক সভার একটি শাখায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান মর্য্যাদা আছে বলিয়া সুইস্‌রাও স্বীকার করিয়াছে।

রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণের নির্ব্বাচন ও ক্ষমতা।

প্রতিনিধি-সভার ও যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ রাষ্ট্র-সভার সদস্য হইতে পারেন না। (৮১শ ধারা)। অর্থাৎ সুইস্ প্রতিনিধি-সভার সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইলে অথবা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে কাহারও পক্ষে আর রাষ্ট্র-সভার সভ্য হওয়া সম্ভব থাকে না। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ রাষ্ট্র-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিতে ও তৎসম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে; এই বৃত্তি রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের কোষাগার হইতে পাইয়া থাকেন (৮৩শ ধারা)। সুতরাং রাষ্ট্র-সভাসদের খরচা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয়, উহা জাতীয় কোষাগার হইতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণ একই হারে বৃত্তি পান না, এ বিষয়ে নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। বৃত্তির কমবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধন-সামর্থ্য ও বদান্যতার উপর নির্ভর করে। এক্ষণে সুইস্ রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণ গড়ে প্রতিদিন ২০ ফ্রাঁ পান। জেনেভায় দেওয়া হয় ৩০ ফ্রাঁ, আর উরি ও উন্টারহ্বাল্‌ডে ১৫ ফ্রাঁ। শুধু যে বিভিন্ন রাষ্ট্র-সভাসদের বৃত্তির হারেই বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা নহে। তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবার প্রণালী ও তাঁহাদের পদের স্থায়িত্বও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে বলিয়া নানারূপ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ ছয় বৎসরের জন্য রাষ্ট্রসভাসদ্‌দিগকে নির্ব্বাচিত করে।

কিন্তু সুইট্জারল্যাণ্ডে কতকগুলি রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণ জনগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত হন, অন্য কতকগুলিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহ তাঁহাদের নির্ব্বাচন করে। আবার, কোন রাষ্ট্র রাষ্ট্র-সভাসদ্‌দ্বয়কে এক বৎসরের জন্য, কোনটি বা চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত করে,— ইঁহাদের কার্য্যকাল এইরূপে এক হইতে চারি বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের কাজ চালাইবার জন্য রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে একটি নিয়ম এই যে, যে দুইটি (অথবা একটি) রাষ্ট্র হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেগুলি হইতে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিতে হয়। আর একই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদ্বয় অথবা তাঁহাদের একজন পর পর দুইটি সাধারণ অধিবেশনের সহকারী সভাপতি হইতে পারেন না। (৮২শ ধারা)। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদ্বয়কে রাষ্ট্র-সভার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি হইবার সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র-সভায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা যে সকল প্রকারে সমান, তাহার অন্যতম প্রমাণস্বরূপও এই ধারাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কে সভাপতি হইতে পারেন?

রাষ্ট্র-সভায় কোন বিল বা প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সমান সমান ভোট হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত ভোট দিবার ক্ষমতা আছে। নির্ব্বাচনকালে অন্যান্য সভ্যগণ যেভাবে ভোট দেন, তিনিও সেইভাবে দেন। (৮৩শ ধারা)। অর্থাৎ যে নির্ব্বাচনে তাঁহার ভোটের অধিকার আছে, তাহাতে তাঁহার ও অন্য সকলের ভোটের মূল্য একই।

গোড়ায় ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার মধ্যে সুইস্ রাষ্ট্র-সভা বেশী প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৪৮ সনের আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সাত জনের মধ্যে ছয় জন ইঁহাদের দলের লোক ছিলেন। সেই সময় রাষ্ট্র-সভাসদ্‌গণের কার্য্যকাল বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। কিন্তু পরে ইহা হ্রস্ব হওয়ায় ও বিশেষ কাজ না থাকায়, রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ সাধারণত আর রাষ্ট্র-সভার দিকে আকৃষ্ট হইতেন না,—তাঁহারা বরং প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। এইরূপে উদ্যমশীল রাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌গণের পক্ষে রাষ্ট্র-সভা প্রতিনিধি-সভায় প্রবেশের সোপানস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই এক্ষণে দেশের অভিজ্ঞ ও খ্যাত রাজনৈতিকগণকে প্রতিনিধি-সভায় যত দেখা যায়, রাষ্ট্র-সভায় তত দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া, বিলাত প্রভৃতি দেশের ওমরাহ্ সভার মত সুইস্ রাষ্ট্র-সভা যে প্রতিনিধি-সভার নীচে স্থান পায়, তাহা নহে। সুইস্ প্রতিনিধি-সভা যে কোন আইন পাশ করিলেই তৎক্ষণাৎ ইহা তাহাতে সম্মতি দেয় না; অনেক ক্ষেত্রে নিজের জেদ্ রক্ষা বা একটা রফা-নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হয়। বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণের কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিবার দিকে ও যোগ্য লোককে একবার নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকেই বারবার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করার দিকে প্রবণতা দেখা দিয়াছে। তথাপি রাষ্ট্র-সভা তাহার পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। লাওয়েল তাহার এই কয়টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: রাষ্ট্র-সভা বনাম প্রতিনিধি-সভা।

(১) যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা হইতে নির্ব্বাচন করিবার নিয়ম থাকিলেও তাঁহারা সাধারণত প্রতিনিধি-সভা হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। (২) তাহাতে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির অবলম্বিত নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা প্রতিনিধি-সভার হাতে বেশী পরিমাণে অর্পিত হইয়া যায়। (৩) রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণের সংখ্যা কম হওয়ায় তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা সম্ভব হয়; তাহাতে বাকী সময় আর কিছু করিবার থাকে না বলিয়া রাষ্ট্র-সভা সহজেই লোকের চোখে অলস বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

প্রতিনিধি-সভা

প্রতিনিধি-সভার সভ্য-সংখ্যা ১৯৮।

সুইস্‌গণ প্রতিনিধি-সভাকে জাতীয় সভা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই সভার সমুদায় সভ্য জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক ২০,০০০ জন-সমষ্টি একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ। গণনার সময়ে কোন নির্ব্বাচন-জিলায় ১০,০০০এর অধিক লোক অবশিষ্ট থাকিলে তাহারাও একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্র অথবা অৰ্দ্ধ রাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা যত কমই হোক্ না, প্রত্যেকে অন্তত একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারে। (৭২শ ধারা)। এই নিয়ম অবিকৃতভাবে প্রচলিত থাকাতে সুইস্ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি-সভার সভ্য-সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৮ সনের ১লা ডিসেম্বর অবধি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ও তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমিত জন-সংখ্যা বিবৃত করিয়াছি (২৪০ পৃঃ)। এই সময়ে প্রতিনিধি-সভায় মোট ১৯৮ জন সভ্য ছিলেন। ১৮৯১ জন ও ১৯১৯ সনে যথাক্রমে ইঁহাদের সংখ্যা ১৪৭ ও ১৮৯ ছিল। ১৯২০ সনের লোক গণনায় সুইস্‌দের সংখ্যা ৩৮·৮০ লক্ষ—তদনুসারেই বর্ত্তমানে ১৯৮ জন সভ্য বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে নিম্নলিখিতভাবে নির্ব্বাচিত হন।

উহার গঠন।

রাষ্ট্রের নাম		প্রতিনিধির সংখ্যা
ৎস্যুইরিগ্	...	২৭
ব্যর্ণ	...	৩৪
লুৎসর্ণ	...	৯
উরি	...	১
শ্বোয়াইৎ	...	৩
হ্বাল্‌ডেন (উভয় রাষ্ট্র)	...	২
গ্লারুস্	...	২
ৎসুগ	...	২
ফ্রিবুর্গ	...	৭
সোলোথুর্ণ	...	৭
বাসেল (উভয় অৰ্দ্ধ রাষ্ট্রে)	...	১১
শাফ্‌হাউসেন	...	৩
আপেন্‌ৎসেল (উভয় অৰ্দ্ধ রাষ্ট্র)	...	৪

সেণ্ট গালেন	...	১৫
গ্রাউবুইণ্ডেন	...	৬
আরগাউ	...	১২
টোয়েরগাউ	...	৭
তিচিনো	...	৮
ভো	...	১৬
ভালে	...	৬
নেশাটেল	...	৭
জেনেভা	...	৯
মোট		১৯৮

উপরের তালিকায় দেখা যাইবে যে ব্যর্ণ রাষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে। তাহার নীচেই ৎস্যুরিখের স্থান। এই দুইটি রাষ্ট্র একত্রে মোট প্রতিনিধিদের এক তৃতীয়াংশের প্রায় কাছাকাছি প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ভো ও গালেনের স্থান তৃতীয় ও চতুর্থ হইলেও ইহারা একত্রে ব্যর্ণের সমকক্ষ নহে। আর দুটি মাত্র রাষ্ট্র—আরগাউ ও বাসেল—দশের অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির প্রতিনিধির সংখ্যা দশের কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যর্ণ, ৎস্যুইরিখ্, ভো, গালেন এই চারিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ একত্রে যদি এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হন যাহার সভ্য সংখ্যা ৭ বা ততোহধিক তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে যে কোন আইন প্রতিনিধি-সভায় পাশ করা সম্ভবপর হয়। সুইস্ যৌথরাষ্ট্র-সমিতিতে এক্ষণে একজন করিয়া ব্যর্ণ, ৎস্যুইরিখ্ ও ভোর প্রতিনিধি লওয়া দস্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২৪৯ পৃঃ)। প্রতিনিধি-সভার গঠন আলোচনা করিলে এই প্রথার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। যাহারা প্রতিনিধি-সভায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তাহাদের এ বিষয়ে দাবীকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে একদিকে যেমন প্রতিনিধি-সভার প্রাধান্যের সহায়তা করা হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি আইন-প্রণয়নে এই সব বড় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় আনুপাতিক নির্ব্বাচন-প্রথা।

সুইস্ ভোটারগণ সাক্ষাৎভাবে সদস্যগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। সুইট্জারল্যাণ্ডে আনুপাতিক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত আছে। নির্ব্বাচনকালে প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং অর্দ্ধ-রাষ্ট্রকে নির্ব্বাচন কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। (৭৩ ধারা)। এই ধারা নূতন, ১৯১৮ সনের ১৩ অক্টোবর তারিখে প্রত্যুপস্থান দ্বারা এই ধারা সংশোধিত হইয়াছে ও ইহাতে আনুপাতিক নির্ব্বাচনের কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ধারার দ্বারা যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাকে এ বিষয়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া আছে। অর্থাৎ এ ধারার মূলসূত্র অব্যাহত রাখিয়া কাজ করিলে যৌথ ব্যবস্থাপক সভা স্বাধীনভাবে ইহার প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্র কিরূপভাবে

বিভিন্ন নির্ব্বাচন-জিলায় বিভক্ত হইবে এবং উহার কোন্ জিলা হইতে কয়জন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবে সে সম্বন্ধে যৌথ ব্যবস্থাপক সভা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। কিন্তু এ বিষয়েও ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা একদিকে সীমাবদ্ধ। কোন নির্ব্বাচন জিলাই একের অধিক রাষ্ট্রের অংশ লইয়া গঠিত হইতে পারে না ও প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে প্রতি ২০,০০০ লোক একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে।

এক একটি রাষ্ট্রকে ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন নির্ব্বাচন জিলায় ভাগ করিবার কথা। কিন্তু সকল সময়ে এরূপ বিভাগ একেবারে পক্ষপাতিত্ব-শূন্যভাবে করা হয় না বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। এ বিষয়ে নানা প্রকার চতুরতা অবলম্বিত হয় না, একথাও বলা চলে না। এমনভাবে জিলা তৈরী করা হয় যে, তাহাতে দল বা মত বিশেষের প্রাধান্য রক্ষিত হয়। এরূপ প্রচেষ্টা যৌথরাষ্ট্রে বা তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রে কখনো কখনো দেখা যায়। ১৮৯০ সনে এই কারণে ছোটখাট এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং যৌথরাষ্ট্র তাহা তাড়াতাড়ি দৃঢ়হস্তে দমন না করিয়া ফেলিলে সমগ্র সুইট্জারল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইত।

প্রতিনিধি-সভার কার্য্যকাল তিন বৎসর।

সুইস্ প্রতিনিধি-সভা তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হয় এবং প্রত্যেক নির্ব্বাচনে উহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। (৭৬শ ধারা। ফ্রান্সে বা বিলাতে প্রতিনিধি-সভার কার্য্যকাল বাঁধিয়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে ফরাসী বা বিলাতী মহাসমিতির বৈঠক ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু তিন বৎসরের পূর্ব্বে সুইস্ প্রতিনিধি-সভা বা মহাসমিতিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। আইনের অভিপ্রায় এই যে, তিন বৎসরের পূর্ব্বে সুইস্ প্রতিনিধি-সভাকে পুনরায় গঠন করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে যদি জনগণের কোন গুরুতর মতের পরিবর্ত্তন ঘটে বা যদি মন্ত্রিগণ মনে করেন যে, প্রতিনিধি-সভা বা মহাসমিতি বাস্তবিক জনগণের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতেছেন না, তাহা হইলে প্রতিনিধি-সভার পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে না কি? কিন্তু কার্য্যত সেরূপ প্রয়োজন অনুভূত হয় না। আগেই বলিয়াছি শেষ কর্ত্তৃত্বভার জনগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। জনগণের মত জানিবার সুবিধা মন্ত্রিগণের আছে। জনগণের হাতেও নিজ মত প্রকাশের অস্ত্র রহিয়াছে; এবং যে প্রকারেই হৌক্ জনগণের মত প্রকাশিত হইলে, প্রতিনিধি-সভা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু সেজন্য উহার সভ্যগণকে পদত্যাগ করিতে হয় না। কাঠামো-আইনে প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণের সম্পূর্ণ পুনর্নির্ব্বাচনের কথা আছে। তাহার অর্থ এ নয় যে, তিন বৎসর অন্তে সমুদায় সভ্যগণকে নূতন লোক হইতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, সমুদায় বা অধিকাংশ পুরাতন সভ্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রত্যেককেই আবার নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হইতে হইবে।

যে সুইস্ অধিবাসী ২০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাহার প্রতিনিধি-সভার সদস্যদের নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে কিন্তু সে সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা তাহার কোন প্রকারে রাষ্ট্রিকের অধিকার বিচ্যুত না

হওয়া প্রয়োজন। (৭৪শ ধারা)। অর্থাৎ যৌথরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যদের নির্ব্বাচনে কাহারা ভোট দিবে, এবং কাহারা দিবে না, তাহার মীমাংসার ভার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর রহিয়াছে। রাষ্ট্রিকের অধিকার ও কর্ত্তব্যসমূহ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। আর এইরূপে যাহাদের রাষ্ট্রিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, মাত্র তাহারাই ভোট দিতে পারে। বস্তুত, সুইট্জারল্যাণ্ডে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত; রোগ প্রভৃতি কারণ ব্যতীত কাহাকেও এই অধিকারচ্যুত করা হয় না। কিন্তু সুইস্ অধিবাসী বলিতে এখানে শুধু পুরুষদের বুঝিতে হইবে; ভোটাধিকার লাভ করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা আন্দোলন আরম্ভ করিলেও, এখন অবধি তাহা পায় নাই।

সুইস্ প্রতিনিধি-সভার জন্য কাহারা ভোট দেয়;

এই গেল যাহারা ভোট দিতে পারে তাহাদের কথা। কিন্তু এইরূপে যথোচিত ভোট পাইয়া কাহারা নির্ব্বাচিত হইবে, অথবা কাহারা নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? এ বিষয়ে ভোটদাতা ও নির্ব্বাচন-প্রার্থীর মধ্যে একটি মাত্র প্রভেদ রাখা হইয়াছে। কোন প্রকার ধর্ম্মযাজক না হইলে, যে কোন ভোটদাতা প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারে। (৭৫শ ধারা)। অর্থাৎ ভোটদাতার যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন অযাজক নির্ব্বাচন-প্রার্থীর তাহা থাকিলেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। সুইস্গণের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায়, এই ব্যবস্থা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় ধর্ম্ম হেতু কলহের কারণ দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার ফলে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগেরই বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে, কারণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী তাঁহারা আর পদত্যাগ করিতে পারেন না; প্রটেষ্টাণ্ট যাজকদের এ বিষয়ে কোন অসুবিধা নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই পদত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন।

কাহারা নির্ব্বাচিত হ-

সুইস্ রাষ্ট্রিকের পক্ষে প্রতিনিধি-সভার সভ্য হওয়া সহজ বটে, কিন্তু যাঁহারা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্য বা উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা রাষ্ট্র-সভার সভ্য, তাঁহারা তৎ তৎ পদে সমাসীন থাকা কালে প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারেন না। (৭৬শ ধারা)। প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ যৌথ-ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের বৃত্তি পান (৭৯শ ধারা)। এ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত রাষ্ট্র-সভার সভ্যগণের দুইটি পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ইঁহাদের বৃত্তি বাবদ্ অর্থ ইঁহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের তহবিল হইতে পান না, যৌথরাষ্ট্র এই ব্যয়-ভার বহন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র-সভার সভ্যদের মত ইঁহারা সমুদায় বৎসর ধরিয়া বৃত্তি পান না, মাত্র যে কয়দিন তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত থাকেন, সেই কয়দিনের জন্য পান। এইরূপে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ৪০ ফ্রাঁ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া রাজধানী পর্য্যন্ত যাতায়াতের খরচ বাবদ্ প্রতি কিলোমিটারে (১ কিলোমিটার=প্রায় ⅝ মাইল) ২০ সাঁতিম করিয়া তাঁহারা পান। আর যে সকল সভ্য বিভিন্ন সমিতি ইত্যাদিতে নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত হারেই অতিরিক্ত বৃত্তি পান।

তিন বৎসর অন্তর প্রত্যেক অক্টোবরের শেষ রবিবারে প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হন। সাধারণত, গির্জ্জাতেই ভোট-গ্রহণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। মানরো এবং লাওয়েল বলেন বৎসরে প্রতিনিধি-সভার দুইটি করিয়া নিয়মিত অধিবেশন হয়, কখনো

অধিবেশনের সময়।

কখনো তৃতীয় একটি বিশেষ অধিবেশনও হইয়া থাকে। সাধারণত কোন অধিবেশনই চারি সপ্তাহের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখারই একটি সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট দিনে হইবে। আর যৌথরাষ্ট্র-সমিতি কর্ত্তৃকঅথবা যৌথ রাষ্ট্র-সভার বা প্রতিনিধি-সভার এক-চতুর্থাংশ সভ্য অথবা পাঁচটি রাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যায়। (৮৬শ ধারা)। প্রত্যেক অধিবেশনেই নূতন একজন সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। অধিবেশন সাধারণ বা বিশেষ হোক্, নিজেদের মধ্য হইতেই ইঁহারা এই দুই ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন। যে ব্যক্তি একবার সভাপতি হইয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী অধিবেশনে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি হইতে পারেন না। কোন ব্যক্তিকে উপর্য্যুপরি দুই অধিবেশনে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করাও সম্ভবপর নহে। (৭৮শ ধারা)। এই ধারাতেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি-সভায় দুই পক্ষে সমান সমান ভোট হইলে, সভাপতির একটি অতিরিক্ত ভোট দিবার ক্ষমতা আছে, এবং নির্ব্বাচন কালে তিনি সভ্যদের মতই ভোট দিয়া থাকেন।

সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাবলী

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা যেরূপ একত্রে কংগ্রেস নামে অভিহিত হয়, সুইস্ রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভাকেও সেইরূপ একত্রে বুণ্ডেস্‌ফের্‌সাম্‌লুঙ্গ বলে। আমরা ইহাকে মহাসমিতি নামে অভিহিত করিতেছি। সুইস্ যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের কয়েকটি ধারায় (৮৪-৯৪) এই মহাসমিতির ক্ষমতাবলীর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা (১) ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় পৃথক্‌ভাবে যে সকল ক্ষমতা আছে, (২) কোন একটি শাখার যে ক্ষমতা আছে অথচ যাহা অন্য শাখার নাই, এবং (৩) উভয় শাখা সম্মিলিত ভাবে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সুইস্-রাষ্ট্রসভা বনাম প্রতিনিধি-সভা।

কাঠামো-আইনের ব্যবস্থা এই যে, সাধারণত দু একটি বিশেষ কারণ ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের অধিবেশন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হয় (৯২শ ধারা)। আইনের চোখে রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতাবলী সমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কোন প্রকার আইন-প্রণয়নে, শাসন-ব্যবস্থায় অথবা বিচার-কার্য্যে কোন শাখাই অন্য শাখা হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী নহে। প্রত্যেক শাখারই এবং তদন্তর্গত সকল সভ্যের কোন নূতন আইন, এবং কাঠামো-আইনের সংশোধনী আনিবার তুল্য অধিকার আছে। (৯৩শ ধারা)। তথাপি, বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র-সভা কার্য্যত প্রতিনিধি-সভা অপেক্ষা হীন হইয়া গিয়াছে। বস্তুত, প্রবীণ ও খ্যাতনামা রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণকে প্রতিনিধি-সভাতেই দেখা যায় ও প্রতিনিধি-সভার গুরুত্ব রাষ্ট্র-সভার চেয়ে বেশী। ফলে আইনের চোখে দুই শাখা সমান হইলেও কার্য্যকালে প্রতিনিধি-সভা অধিকতর মর্য্যাদা পাইয়া থাকে।

সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার প্রত্যেকটির একটি করিয়া কর্ম্মিসঙ্ঘ (বিউরো) আছে। রাষ্ট্র-সভার বিউরো উহার সভাপতি ও দুইজন সভ্য লইয়া এবং প্রতিনিধি-সভার

বিউরো উহার সভাপতি ও চারিজন সভ্য লইয়া গঠিত ইঁহাদের কাজ হইল ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণ করা ও বিভিন্ন সমিতির নিয়োগ করা। সমিতির নিয়োগ ব্যবস্থাপক সভার যে কোন শাখা ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে, তাহা না করিলে তাহা বিউরো করে।

ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন সমিতিসমূহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার সমিতিসমূহ মার্কিণ সমিতির ন্যায় গুরুত্ববিশিষ্ট নহে। ব্যবস্থাপক সভার যে কোন শাখায় একটি বিল আনা হইলে, তাহা সাধারণত সমিতির নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করা সুইস্ দস্তুর নয়। তবে ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছা করিলে গুরুতর ব্যবস্থাসমূহ পাঠাইতে পারে। বিল উপস্থাপিত করা হইলে, ব্যবস্থাপক সভা-গৃহেই প্রায়শ উহার আলোচনা হইয়া থাকে এবং আইনরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে উহা উভয় শাখায় ঠিক এক অবিকৃত আকারে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন শাখা অন্য শাখা কর্ত্তৃক আনীত বিল নামঞ্জুর করে অথবা উহার কোন সংশোধনী আনে তাহা হইলে মুস্কিল হয়। কারণ সুইস্ কাঠামো-আইনের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, উভয় শাখার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া পরস্পর মতভেদ ঘটিলে, সে বিষয়ে কোন প্রকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নাই। অথচ কাঠামো-আইনের নির্দ্দেশ এই যে, যৌথ আইন প্রভৃতি পাশ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মতি লওয়া প্রয়োজন (৮৯শ ধারা)। কিন্তু ইহাতে দুই কারণে কোন কাজের ক্ষতি হয় না। প্রথমত,রাষ্ট্র-সভায় যে সকল সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রতিনিধি-সভার সভ্যদের চেয়ে অধিকতর রক্ষণশীল নহেন ও দুই শাখার মধ্যে গুরুতর মতভেদ ঘটিবার অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়ত, সর্ব্ব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের উপর অর্পিত থাকায় দুই শাখার মধ্যে মতভেদ ঘটিলে তাহা জনগণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে। মানরো বলেন, এরূপ অবস্থায় কখনো কখনো দুই শাখার প্রতিনিধি-রূপে কয়েকজন সভ্য মিলিত হইয়া একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি সভা একই কালে বিলের আলোচনা করে।

প্রত্যেক বিলই একই সময়ে উভয় শাখায় উপস্থাপিত করা হয়। অর্থাৎ সুইট্জারল্যাণ্ডে এক কালে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখা কোন বিলের আলোচনা করিতেছে, ইহাই স্বাভাবিক ঘটনা। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে বহু সভ্যদেশের সহিত সুইস্ প্রথার মিল নাই। বিল উপস্থাপিত করা সম্বন্ধেও কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই। উভয় শাখার যে কোন সভ্য বিল আনিতে পারেন। তবে মন্ত্রিগণ অর্থাৎ যৌথ-রাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণই সাধারণত বিল পেশ করেন। এই সম্পর্কে ইঁহাদের ক্ষমতার কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। (পৃঃ ২৫৫)।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখায় যে কোন সভ্য তাঁহার মাতৃভাষায় বক্তৃতা ইত্যাদি করিতে পারেন। এখানে মাতৃভাষা বলিতে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান্ বুঝিতে হইবে। এই তিনটি ভাষাই সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রধান ভাষা এবং তিনটিকে যৌথরাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। (১১৬ ধারা)। সুতরাং কোন একটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া এক সঙ্গে তিন ভাষায় বক্তৃতা শোনা কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে। যদিও প্রায় সমুদায় শিক্ষিত সুইস্ জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা জানে এবং ইতালিয়ান্ সভ্যগণ সাধারণত ফরাসী বলিতে পারেন, তথাপি প্রত্যেক সরকারী দলিল-দস্তাবেজ এই তিন ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়া থাকে।

আইনপ্রণয়ন বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ক্ষমতা সমান হইবার একটা কারণ এই যে, প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাব বা বিল সম্বন্ধেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির মতামত লওয়া হয়; অনেকগুলি তাঁহারাই প্রস্তুত করেন,—বিশেষত আয়ব্যয় সম্পর্কিত বিলসমূহ। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সহিত মন্ত্রি-সমিতির সম্বন্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাসমিতির ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, যৌথরাষ্ট্রের লিখিত কাঠামো-আইনে যে সমুদায় বিষয় যৌথরাষ্ট্রের আয়ত্ত মধ্যে রাখা হইয়াছে ও যেগুলি অন্য কোন যৌথ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত হয় নাই, সেগুলি সম্বন্ধে মীমাংসা প্রতিনিধি-সভা ও রাষ্ট্র-সভা করিয়া থাকে। (৮৪শ ধারা)। এই ধারার কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইট্‌জারল্যাণ্ডে কাঠামো-আইনকে পরিবর্ত্তন করা তত কষ্টসাধ্য নহে। প্রথমত, কাঠামো-আইনের সংশোধন সহজসাধ্য ও সংশোধনের বেলায় কাঠামো-আইনের সহিত সাধারণ আইনের ভেদ রাখা হয় না। দ্বিতীয়ত, ইহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যৌথ কাঠামো-আইন নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না।

মহাসমিতির ক্ষমতা-বলী।

প্রসঙ্গত ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার বিবিধ ক্ষমতার কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে:

(১) যৌথ শাসন-বিভাগের বিভিন্ন অঙ্গ কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে অথবা গঠিত হইবে সে বিষয়ে আইন-প্রণয়ন।

(২) কাঠামো-আইন যে সকল বিষয়ের ভার বিভিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছে, সেগুলির সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন।

(৩) বিভিন্ন যৌথ বিভাগের ও যৌথ চ্যান্সেলারির সভ্যগণের বেতন ও বৃত্তি, স্থায়ী যৌথ আফিস্ প্রতিষ্ঠা ও উহার বেতন ইত্যাদি নির্ণয়।

(৪) যৌথ রাষ্ট্র-সমিতি, যৌথ বিচারালয়, চ্যান্সেলার, যৌথ সৈন্যসামন্তের সর্ব্বোচ্চ অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন। যৌথ আইন প্রণয়ন করিয়া যৌথ মহাসমিতিকে অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ বা তাহাদিগকে নিজ নিজ পদে পাকা করিবার অধিকার, দেওয়া যাইতে পারে।

(৫) পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা সমঝোতাসমূহ। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি মঞ্জুর করা। বিভিন্ন রাষ্ট্র যে সকল সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় সেগুলি তখনই কেবল যৌথ মহাসমিতির বিচারাধীনে আসে যখন যৌথরাষ্ট্র-সমিতি অথবা অন্য কোন রাষ্ট্র এ বিষয়ে আবেদন করে।

(৬) সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বাহ্য নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষাসূচক ব্যবস্থাবলী; যুদ্ধঘোষণা ও শান্তি-স্থাপন।

(৭) সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন ও ভূমিগত অবিভাজ্যতা রক্ষা করিবার অঙ্গীকার; এই অঙ্গীকার পালনার্থ হস্তক্ষেপ; সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা; শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা; ক্ষমা প্রভৃতি।

(৮) যৌথ কাঠামো-আইন প্রতিপালনের জন্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন রক্ষা করিবার অঙ্গীকার পালনের জন্য ও বিভিন্ন যৌথকর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাসমূহ।

(৯) যৌথ সৈন্যসামন্তের নিয়ন্ত্রণ।

(১০) বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব (বাজেট্) প্রণয়ন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের হিসাবে সম্মতি দেওন ও ঋণগ্রহণে অনুমতি প্রদান।

(১১) যৌথ শাসন ও যৌথ বিচারালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্য্য।

(১২) শাসন-সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তৎসম্পর্কে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির বিচারের বিরুদ্ধে আপীলসমূহ।

(১৩) বিভিন্ন যৌথকর্তৃপক্ষদের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতার এলাকা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার বিচার।

(১৪) যৌথ কাঠামো-আইনের সংশোধন।

[৮৫শ ধারা, ১-১৪ দফা]

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাসমূহ কিরূপ ব্যাপক। ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ ক্ষমতা আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, আর যৌথরাষ্ট্র যে প্রধানত পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের কাজই নিজ হাতে রাখিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি পৃঃ ২৩৬-২৩৭)। যে সকল ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে, সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার সে সকল ক্ষমতা যদি কোনরূপে সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বলা চলিত যে বিলাতী মহাসমিতির ন্যায় স্থায়িত্বের জন্য সুইস্ মহাসমিতি প্রতিনিধি-সভার উপর নির্ভর না করিলেও, ইহা তত্তুল্য ক্ষমতাশালী। কিন্তু এদিকে ৮৯ ও ১২১ ধারা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপন ও অভিনয়নের ব্যবস্থা করিয়া ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাসমূহকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার উপর নির্ভর না করিয়াও জনগণ ইচ্ছামত আইন তৈরী করিতে সমর্থ এবং প্রয়োজন বুঝিলে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন না-মঞ্জুর করিবার অধিকারও সুইস্‌দের হাতে আছে। এখানে, সুইস্ জনগণ এই দুই ক্ষমতা বেশী বা কম প্রয়োগ করে, তাহার আলোচনা করিতেছি না। কিন্তু জনগণের এই চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে, একথা স্বীকার করিবামাত্র, জনগণ সে ক্ষমতার সর্ব্বদা প্রয়োগ করুক্ বা না করুক্, বুঝিতে হইবে যে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা এইরূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সীমা মানিয়া লইবার পর সুইস্ রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভাকে সুইট্জারল্যাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জনগণ সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতে পারে। বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলে ইহাকে তাহা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ স্বপক্ষে মত দিলে অথবা কোন প্রকার বাধা না দিলে ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এমন কি, বিভিন্ন যৌথকর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, শেষ মীমাংসা করিবার ভারও যৌথ ব্যবস্থাপক সভার উপর। সৈন্য নিয়ন্ত্রণ, বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব তৈরী, সন্ধি ও যুদ্ধবিগ্রহ, সকল প্রকার যৌথকর্ম্মচারী নির্ব্বাচন বা নিয়োগ, যৌথ-বিচারালয়ের কার্য্যের তত্ত্বাবধান, কাঠামো-আইনের সংশোধন প্রভৃতি গুরুতর কর্ত্তব্যসমূহ সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার উপরেই ন্যস্ত আছে। সুতরাং এক কথায় বলা চলে, সুইস্ রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভা নানাভাবে নিজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার সুযোগ পায়।

মহাসমিতির শাখাদ্বয়ের যুগ্ম ক্ষমতা।

এই গেল উভয় শাখার বিভিন্ন ক্ষমতার কথা। কতকগুলি ক্ষমতা উভয় শাখা সম্মিলিত ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে। উপরে ৮৫শ ধারার চতুর্থ দফায় কতকগুলি নির্ব্বাচনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ত্রয়োদশ দফায় বিভিন্ন যৌথকর্তৃপক্ষদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের আপীলের কথা আছে। এই দুইটি ও ক্ষমা প্রয়োগের কালে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মিলিত অধিবেশন হয়; তাহাতে প্রতিনিধি-সভার সভাপতি সভাপতিত্ব করেন; এবং উভয় শাখার সমুদায় ভোটদাতা সভ্যগণের অতিজন যাহা ভোট দিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাহাই গ্রহণ করা হয়। (৯২শ ধারা) এই ধারার অর্থ এই যে, যৌথ রাষ্ট্র-সমিতির সভ্য, যৌথ-বিচারালয়, সুইস্ সেনাপতি নির্ব্বাচন, বিদ্রোহ বা অন্য গুরুতর অপরাধে অপরাধীকে ক্ষমা-প্রদান, অথবা বিভিন্ন যৌথকর্তৃপক্ষদের মধ্যে বিরোধ-সম্পর্কে আবেদন-শ্রবণ কোন একটি শাখায় একাকী হয় না। সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার শাখাদ্বয়ের ক্ষমতা সমান হইলেও, এই সকল বিষয়ে উভয় শাখা সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সম্মিলিতভাবে কাজ করার অর্থ অতি স্পষ্ট। প্রতিনিধি-সভার সভ্য সংখ্যা ১৯৮, আর রাষ্ট্র-সভায় আছেন ৪৪ জন। সুতরাং সম্মিলিত অধিবেশনে প্রতিনিধি-সভার পক্ষে অতি সহজে রাষ্ট্র-সভার ইচ্ছাকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই সকল নির্ব্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিনিধি-সভার ইচ্ছানুসারেই কাজ হইতে পারে। অর্থাৎ উভয় শাখার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশনে এই সকল ব্যাপারের বিচারে প্রত্যেক শাখার যতটা গুরুত্ব থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, মিলিত অধিবেশনে তাহা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যেখানে দুই শাখাকে একত্র কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রতিনিধি-সভার হাতেই পড়িয়াছে ও উক্ত সভাকে অধিকতর ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আয়ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব তৈরী বা আলোচনা সম্পর্কে সুইস্ প্রতিনিধি-সভাকে রাষ্ট্র-সভা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের পার্থক্য রহিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় ভোট গ্রহণের রীতি।

যদি রাষ্ট্র-সভা বা প্রতিনিধি-সভার সমুদায় সভ্যের অধিকাংশ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। (৮৭শ ধারা)। বস্তুত, সভ্যগণ সাধারণত ঠিক সময়ে নিয়মিতভাবে সভায় উপস্থিত থাকেন। যথেষ্ট কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত কারণ দর্শাইতে হয়। এইরূপ কারণ দেখাইতে না পারিলে তিনি সেই দিনের জন্য কোন বৃত্তি দাবী করিতে সমর্থ হন না। যৌথ আইন স্থির করিয়া দিতে পারে যৌথরাষ্ট্রের রাজধানী কোথায় হইবে (১১৫ ধারা)। বর্ত্তমান সময়ে বার্ণ সহরে রাজধানী অবস্থিত। এইখানে ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার অধিবেশন হয়। কিন্তু এখানে ব্যবসা বা আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন এত কম যে, কোন সভ্যের পক্ষে নিজ কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করা বিশেষ কঠিন হয় না। আর কোন সভ্যকে টেলিগ্রাফ করিয়া ডাকিয়া আনার দৃষ্টাও সুইট্জারল্যাণ্ডে বিরল। রাষ্ট্র-সভা ও প্রতিনিধি-সভায় প্রত্যেক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ভোট লইয়া করা হয়। যাঁহারা ভোট দিতেছেন, তাঁহাদের অতিজন কোন পক্ষে ভোট দিলে তবেই সেই পক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন, বুঝিতে পারা যায়। (৮৮শ ধারা)।

এখানে কাঠামো-আইনের ভাষা হইতে বুঝা যায় না, অভিজন বলিতে সমুদায় ভোট-দাতাদের অভিজন বুঝিতে হইবে, না যাঁহারা প্রকৃতই ভোট দিতেছেন তাঁহাদের অভিজন বুঝিতে হইবে।

সাধারণত, কোন সভার অধিবেশনই গোপনে হয় না, প্রকাশ্যভাবে হয়। (৯৪শ ধারা)। কোন সভায় সরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত থাকে না; ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল তর্ক ও আলোচনা ইত্যাদি হয়, তাহা সাধারণত সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় না; তবে কখন কখন ব্যবস্থাপক সভার হুকুমে কোন গুরুতর আলোচনার অবিকল বিবরণী প্রকাশিত হইয়া থাকে। সভার কাজ অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হয় এবং কোন ব্যক্তি বা দলের কাজে বাধা দিবার প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় না। বক্তৃতা করিবার প্রবৃত্তি কম, লোকে যাহা বলিবার তাহা সহজভাবে কার্য্যোপযোগী করিয়া বলিয়া সন্তুষ্ট হয়, কিরূপভাবে বলিতে হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। এক রাজনৈতিক দলের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলে যে একস্থানে বসেন, তাহা নহে। মন্ত্রিগণ অথবা সরকারের বিরুদ্ধ-পক্ষীয়গণ আলাদা আলাদা স্থান জুড়িয়া বসেন না। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ সভাপতির বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেদীর উপরে উপবেশন করেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না হওয়ার দরুণ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করিতে সমর্থ নহেন। (ব্রাইস) ব্রাইস্ আরো বলেন যে, সুইস্ ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়া কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়াছে। সুইস্ চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব এই যে, দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহার বিচক্ষণতা, ভাববিলাসিতার অভাব এবং সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান দেখা যায়। জার্ম্মাণের মত কোন সুইস্ মূলতত্ত্ব লইয়া অত মাথা ঘামায় না; ফরাসীর মত সুন্দর কথার মোহও তাহার নাই; অন্য দিকে ইংরেজ বা আমেরিকান অপেক্ষা তাহার ধাত বেশী দার্শনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হোক্, প্রণালীবদ্ধভাবে সাধারণ তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা সাধারণভাবে সকল সুইস্ সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ইহার মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী সুইস্গণের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। জার্ম্মাণ, ফরাসী বা ইতালীয় ভাষী সুইস্দের মধ্যে কিছু কিছু স্বভাবের বিভিন্নতা থাকিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি এই কথা বলা চলে যে, সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার মত এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।

সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার কয়েকটি বিশেষত্ব: প্রকাশ্য অধিবেশন;

সভ্যগণের রাজনৈতিক মতানুসারে স্থান হয় না;

শৃঙ্খলা ও নিয়মবদ্ধতা।

সুইস্ মহাসমিতির ক্ষমতা বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি ধারা এইরূপ আছে: ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সভ্যগণ কোন প্রকার পরামর্শ না লইয়া ভোট দান করিবেন (৯১শ ধারা)। ইহার অর্থ এই যে, কোন সভ্য তাঁহার রাষ্ট্র অথবা নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইবার পর তিনি সেই রাষ্ট্র বা নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে চলিতে বাধ্য থাকিবেন না। এই ধারা হইতে বুঝা যায়, সুইট্জারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক দলের শাসন কেন সেরূপ প্রবল নহে। সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ জনগণের প্রতিনিধি হইলেও তাঁহাদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকারের কথা একেবারে কাঠামো-আইনে স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন সভ্য যদি মনে করেন যে, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিলে তাহা তাঁহার রাষ্ট্র বা নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে, তাহা হইলে তিনি

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের কাজ করিবার স্বাধীনতা।

তাহা করিলে নিন্দনীয় হন না। বলা বাহুল্য, ফ্রান্স অথবা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের এরূপ কোন স্বাধীনতা নাই। তবে রাজনৈতিক দলসমূহ যে সব সময় একেবারে শক্তিহীন, তাহা নহে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ভোট দ্বারা যেসব সমিতির সভ্যগণ, ফৌজ বিচারকগণ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নির্বাচন-ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

সুইস্ মহাসমিতির উৎকর্ষের কারণ।

সুইস্ মহাসমিতির কার্য্যপটুতা, বিনা বাধায় কাজ করিবার সামর্থ্য প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য উহা সভ্য জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মহাসমিতির সভ্যগণের সম্বন্ধে পক্ষপাতিতা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ, অন্যায় ব্যবস্থার অনুমোদন ইত্যাদির অভিযোগ শুনা যায়, সুইস্ মহাসমিতি সম্বন্ধে এই প্রকার অভিযোগ খুব কম শুনা যায়। সুইসগণ রাজনীতির প্রতি উদাসীন বলিয়া এইরূপ ঘটে,—তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মত তত ঘন ঘন নির্বাচনে ভোট দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রত্যেক সুইস্ রাষ্ট্রিককে নানাবিধ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এবং ইহাদের সাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞানও আছে। নির্বাচনকালে ভোটদাতাদের সংখ্যাও কম হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সুইস্ মহাসমিতি শাসন-ব্যাপারে স্বাভাবিক যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে। তবে দুইটি বিষয় যে তাহাতে সাহায্য করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় স্থানীয় বা বেসরকারী বিল বলিতে যাহা বুঝায়, সুইস্ ব্যবস্থাপক সভায় সেরূপ বিল কম সংখ্যায় আসে। ইহাতে অবৈধভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শনের সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। তুলনায় সুইস্ শুল্কের হার অনেক কাল পর্য্যন্ত নীচু ছিল, সেজন্য নির্দ্দিষ্ট কোন প্রচেষ্টাকে অযথা সাহায্য করিয়া ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা কম ছিল। দ্বিতীয়ত, সুইট্জারল্যাণ্ডে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল সর্ব্বদা মোতায়েন থাকায় একদিকে সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ যেমন শক্তিশালী হইতে পারে নাই, সরকার পক্ষও সেরূপ নিরঙ্কুশভাবে কেবল নিজেদের দলের স্বার্থ সাধনের জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ করে নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই উৎকর্ষ কেন রক্ষিত হইতেছে না।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদের মত এই যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সুইস্ মহাসমিতি আগেকার উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আগে যেরূপ রাষ্ট্রীয় চিন্তাবীরগণের উদ্ভব সুইট্জারল্যাণ্ডে হইয়াছে, এখন আর তাহা হইতেছে না। সম্ভবত, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জাতি যখন কোন দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয় বা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, তখন সেই দুর্দ্দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আপনা হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ সেবা দেশকে দিতে ইতস্তত করেন না। কিন্তু সেই দুর্দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে পর, সেরূপ লোকের প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। আরো একটা কথা এই যে, সুইট্জারল্যাণ্ডে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দেশের মত এখানেও বহু বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রাজনৈতিক সংস্রব ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তবে এই

...বণতা সকল দেশেই দেখা যায়। তথাপি সুইস্ ব্যবস্থাপক সভা যথেষ্ট যোগ্যতা ও উৎকর্ষ ...তে সমর্থ হইয়াছে, জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে এবং শাসন-বিভাগের সহিত ...প্রকার গুরুতর বিরোধ না ঘটাইয়া নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। (ব্রাইস্)

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ

...জারল্যাণ্ডের বর্তমান কাঠামো-আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৩১) সুইস্ ...র সহিত তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্বন্ধের কথা কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। সুইস্ ...র ক্ষমতাবলী সম্পর্কে কাঠামো-আইনের তৃতীয় ধারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ...তে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রগুলির সর্বকর্তৃত্ব আছে, কেবল সেই কর্তৃত্বের দুইটি সীমা আছেঃ (১) যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন, (২) যৌথ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত ... অর্থাৎ কোন্ ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্র বা তদন্তর্গত কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে,— ...শ্নের মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে সে ক্ষমতা ...র্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে কি না। যদি সে ক্ষমতার অর্পণের কথা যৌথরাষ্ট্রীয় ...মো-আইনে না থাকে, তাহা হইলে উহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলিয়া উল্লেখ না করিলেও ...রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারূপেই গণ্য হইবে। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ...র সহিত সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের সাদৃশ্য আছে। বর্তমান সময়ে, কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র দৃঢ়তর ...য়া থাকিলেও, সুইস্ রাষ্ট্রসমূহ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে ...ত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করার একটা ফল এই হইয়াছে যে, সমুদায় রাষ্ট্রে এক প্রকার কাঠামো-আইন বা শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। একটি বিষয়ে শুধু সকল রাষ্ট্র একপ্রকার বিধি মানিয়া চলে,—তাহা এই যে, জনগণ চরম কর্তৃত্বভার নিজ হাতে রাখিয়াছে।

যৌথরাষ্ট্র ও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন।

সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের শুধু যে নিজ ইচ্ছামত কাঠামো-আইন প্রণয়নের অধিকার আছে তাহা নহেঃ উহারা যৌথরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই অঙ্গীকারও দাবী করিতে পারে যে, যৌথরাষ্ট্র সে বিষয়ে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র তিনটি মাত্র সর্তে এই অঙ্গীকার দান করে। যথা, (১) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন-বিরুদ্ধ কিছু থাকিবে না, (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক অথবা সরাসরি লোক নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা মোতায়েন রহিবে এবং (৩) জনগণের ঐ আইনে সম্মতি দেওয়া দরকার এবং জনগণের অতিজন ইচ্ছা করিলে উহার সংশোধনী আনিতে পারিবে। (পৃঃ ২৩৪)।

যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতকগুলি ক্ষমতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে যে ক্ষমতা উহাদের নাই তাহাও বলা হইয়াছে। নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছেঃ

সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলী।

(১) সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সন্ধি বা সমঝোতা স্থাপন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু এই প্রকার সমঝোতা যদি আইন-

তাহা করিলে নিন্দনীয় হন না। বলা বাহুল্য, ফ্রান্স অথবা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের এরূপ কোন স্বাধীনতা নাই। তবে রাজনৈতিক দলসমূহ যে সব সময়েই একেবারে শক্তিহীন, তাহা নহে। ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার ভোট দ্বারা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ, যৌথ বিচারকগণ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নির্ব্বাচন-কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

সুইস্ মহাসমিতির উৎকর্ষের কারণ।

সুইস্ মহাসমিতির কার্য্যপটুতা, বিনা বাধায় কাজ করিবার সামর্থ্য প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য উহা সভ্য জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মহাসমিতির সভ্যগণের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ, অন্যায় ব্যবস্থার অনুমোদন ইত্যাদির অভিযোগ শুনা যায়, সুইস্ মহাসমিতি সম্বন্ধে এই প্রকার অভিযোগ খুব কম শুনা যায়। সুইস্‌গণ রাজনীতির প্রতি উদাসীন বলিয়া এইরূপ ঘটে,—তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মত ঘন ঘন নির্ব্বাচনে ভোট দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রত্যেক সুইস্ রাষ্ট্রিককে নানাবিধ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এবং ইহাদের সাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞানও আছে। নির্ব্বাচন-কালে ভোটদাতাদের সংখ্যাও কম হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সুইস্ মহাসমিতি শাসনকার্য্যে স্বাভাবিক যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে। তবে দুইটি বিষয় যে তাহাতে সাহায্য করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় স্থানীয় বা বেসরকারী বিল বলিতে যাহা বুঝায়, সুইস্ ব্যবস্থাপক সভায় সেরূপ বিল কম সংখ্যায় আসে। ইহাতে অবৈধভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শনের সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। তুলনায় সুইস্ শুল্কের হার অনেক কাল পর্য্যন্ত নীচু ছিল, সেজন্য নির্দ্দিষ্ট কোন প্রচেষ্টাকে অযথা সাহায্য করিয়া ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা কম ছিল। দ্বিতীয়ত, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল সর্ব্বদা মোতায়েন থাকায় একদিকে সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ যেমন শক্তিশালী হইতে পারে নাই, সরকার পক্ষও সেরূপ নিরঙ্কুশভাবে কেবল নিজেদের দলের স্বার্থ সাধনের জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ করে নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই উৎকর্ষ কেন রক্ষিত হইতেছে না।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদের মত এই যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সুইস্ মহাসমিতি আগেকার উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আগে যেরূপ রাষ্ট্রীয় চিন্তাবীরগণের উদ্ভব সুইট্‌জারল্যাণ্ডে হইয়াছে, এখন আর তাহা হইতেছে না। সম্ভবত, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জাতি যখন কোন দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয় বা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, তখন সেই দুর্দ্দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আপনা হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ সেবা দেশকে দিতে ইতস্তত করেন না। কিন্তু সেই দুর্দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে পর, সেরূপ লোকের প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। আরো একটা কথা এই যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দেশের মত এখানেও বহু বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রাজনৈতিক সংস্রব ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তবে এই

রূপ প্রবণতা সকল দেশেই দেখা যায়। তথাপি সুইস্ ব্যবস্থাপক সভা যথেষ্ট যোগ্যতা ও উৎকর্ষ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, জনগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে এবং শাসন-বিভাগের সহিত কোন প্রকার গুরুতর বিরোধ না ঘটাইয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। (ব্রাইস্)

সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ

সুইট্জারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান কাঠামো-আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৩১) সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের সহিত তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্বন্ধের কথা কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলী সম্পর্কে কাঠামো-আইনের তৃতীয় ধারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঐ ধারাতে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রগুলির সর্ব্বকর্তৃত্ব আছে, কেবল সেই কর্তৃত্বের দুইটি সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে: (১) যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন, (২) যৌথ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পিত ক্ষমতা। অর্থাৎ কোন্ ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্র বা তদন্তর্গত কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে,—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে সে ক্ষমতা যৌথকর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে কি না। যদি সে ক্ষমতার অর্পণের কথা যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে না থাকে, তাহা হইলে উহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলিয়া উল্লেখ না করিলেও উহা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারূপেই গণ্য হইবে। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমান সময়ে, কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র দৃঢ়তর হইয়া থাকিলেও, সুইস্ রাষ্ট্রসমূহ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করার একটা ফল এই হইয়াছে যে, সমুদায় রাষ্ট্রে এক প্রকার কাঠামো-আইন বা শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। একটি বিষয়ে শুধু সকল রাষ্ট্র একপ্রকার বিধি মানিয়া চলে,—তাহা এই যে, জনগণ চরম কর্তৃত্বভার নিজ হাতে রাখিয়াছে। যৌথরাষ্ট্র ও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন।

সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের শুধু যে নিজ ইচ্ছামত কাঠামো-আইন প্রণয়নের অধিকার আছে তাহা নহে: উহারা যৌথরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই অঙ্গীকারও দাবী করিতে পারে যে, যৌথরাষ্ট্র সে বিষয়ে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র তিনটি মাত্র সর্ত্তে এই অঙ্গীকার দান করে। যথা, (১) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন-বিরুদ্ধ কিছু থাকিবে না, (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক অথবা সরাসরি লোক নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা মোতায়েন রহিবে এবং (৩) জনগণের ঐ আইনে সম্মতি দেওয়া দরকার এবং জনগণের অতিজন ইচ্ছা করিলে উহার সংশোধনী আনিতে পারিবে। (পৃঃ ২৩৪)।

যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতকগুলি ক্ষমতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে যে ক্ষমতা উহাদের নাই তাহাও বলা হইয়াছে। নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে: সুইস্ রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলী।

(১) সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সন্ধি বা সমঝোতা স্থাপন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু এই প্রকার সমঝোতা যদি আইন-

প্রণয়ন, শাসন ও বিচার-সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কোন বাধা থাকে না,—এই সকল সমঝোতাকে যৌথকর্তৃপক্ষ যৌথ কাঠামো-আইনের অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধ বিবেচনা করিলে সেগুলির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। যেখানে নিষেধ জারি হয় নাই, সেখানেও যৌথরাষ্ট্রের সহযোগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজ করিবার কথা। (৭ম ধারা)

(২) আর্থিক নীতি, পুলিশ ও সীমান্ত সম্পর্কে কখনো কখনো সুইস্ রাষ্ট্র বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই অধিকারকে ব্যতিক্রম মাত্র গণ্য করিতে হইবে ও দেখিতে হইবে যেন উহার প্রয়োগে কোন যৌথ বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ না দলিত হয়। (৯ম ধারা)

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিদেশী সরকার বা উহার প্রতিনিধিদের সহিত কোন রাষ্ট্র সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না,—তাহা করিতে হইলে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির মধ্যবর্ত্তিতায় করিতে হয়। কিন্তু ৯ম ধারায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নিম্নতন কর্তৃপক্ষ বা কর্ম্মচারীদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের কোন বাধা নাই। (১০ম ধারা)

(৪) যৌথকর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্র বা অর্দ্ধ-রাষ্ট্র ৩০০এর অধিক লোকবিশিষ্ট স্থায়ী কোন ফৌজ রাখিতে পারে না। (পুলিশ) রক্ষীর দল রাখিবার বাধা নাই। (১১শ ধারা)

(৫) দুই বা ততোঽধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলে একে অন্যকে আক্রমণ না করিয়া বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য যৌথকর্তৃপক্ষকে সালিশী মানিবে। (১৪শ ধারা)

(৬) হঠাৎ বাহির হইতে কোন আক্রমণ হইলে আক্রান্ত রাষ্ট্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য চাহিতে পারে ও ঐ সকল রাষ্ট্র এইরূপ সাহায্য দান করিতে বাধ্য। এজন্য সমুদায় খরচই যৌথরাষ্ট্র বহন করে। (১৫শ ধারা)

(৭) আভ্যন্তরীণ গোলযোগ উপস্থিত হইলে অথবা এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ সে খবর যৌথরাষ্ট্রকে জানাইতে বাধ্য। যৌথরাষ্ট্র নিজ কর্ত্তব্যানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে অথবা যৌথ মহাসমিতির অধিবেশন ডাকে। বিপদ্ সমুপস্থিত হইলে রাষ্ট্র যৌথরাষ্ট্র-সমিতিকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য চাহিতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্র এরূপ সাহায্য প্রদান করিতে বাধ্য। যৌথরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দরুণ ব্যয়াদি সাধারণত আক্রান্ত রাষ্ট্র বহন করিবার কথা। (১৬শ ধারা) কোন কোন অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সাহায্য চাহিবারও অবকাশ না থাকিতে পারে। সে অবস্থায় যৌথরাষ্ট্র নিজে হইতে হস্তক্ষেপ করে। (২৩৭ পৃঃ)।

(৮) প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ এলাকায় বিনা খরচায় রেল ইত্যাদি যোগে সৈন্যাদি বহন করিতে বাধ্য সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১৭শ ধারা)।

(৯) যৌথ সৈন্যসামন্তের এক ভাগ রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের লইয়া গঠিত ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত। বিপদ্‌কালে যৌথরাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমুদায় সামরিক সংস্থানের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে

পারে। যৌথ সৈন্যের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সৈন্য সামন্তের পরিচালনা রাষ্ট্রসমূহ করিয়া থাকে। (১৯শ ধারা)

(১০) সুইট্জারল্যাণ্ডের সমুদায় জলস্রোতের উপর চরম কর্ত্তৃত্বভার যৌথরাষ্ট্রের হাতে অর্পিত থাকিলেও, যৌথ আইনের বলে বিভিন্ন রাষ্ট্র জল-শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (২৪ক ধারা)

(১১) সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শিক্ষা দান চলে। (২৭শ ধারা) তজ্জন্য যৌথরাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রকে সাহায্য করিয়া থাকে। (২৭ক ধারা)

(১২) শুল্ক রাজস্ব যৌথরাষ্ট্রের সম্পত্তি হইলেও, পূর্ব্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে কয়েকটি মাত্র রাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট হারে বাৎসরিক ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে। এই অর্থ আল্পস্‌এ অবস্থিত রেলওয়ের খরচা পোষণের জন্য ব্যয় হয়।

			ফ্রাঁ
উরি	...	...	৮০,০০০
গ্রিসঁ	...	...	২,০০,০০০
তিচিনো	...	...	২,০০,০০০
ভ্যালে	...	...	৫০,০০০

ইহা ছাড়া সেণ্ট গোটার্ড পথের বরফ্ সাফ করিবার জন্য উরি ও তিচিনো বৎসরে আরো ৪০,০০০ ফ্রাঁ পাইয়া থাকে। (৩০শ ধারা) দেশের সমুদায় রাস্তাঘাটের উপর যৌথ-রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা আছে বলিয়া, আল্পস্ পর্ব্বতের পথ যথোপযুক্তরূপে রক্ষিত না হইলে যৌথরাষ্ট্র সাহায্য দান বন্ধ করিতে পারে। (৩৭শ ধারা)

(১৩) কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন পেশা অবলম্বন করিতে চাহিলে তদ্বিষয়ে তাহার সামর্থ্য আছে কি না তাহা সেই রাষ্ট্র যাচাই করিয়া লইতে পারে। (৩৩শ ধারা)

(১৪) মোটর গাড়ী বা সাইকেল যাতায়াত সম্বন্ধে বিধিনিষেধ জারি করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র প্রয়োজন বুঝিলে সে সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিতে পারে। (৩৭ক ধারা)

(১৫) যৌথরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে মুনাফা হয়, সুদ, লভ্যাংশ প্রভৃতি তাহা হইতে বাদ দিবার পর, তাহার অধিকাংশ বিভিন্ন রাষ্ট্র পাইবার অধিকারী। (৩৯শ ধারা) কিন্তু কোন রাষ্ট্র উহাতে কর বসাইতে সক্ষম নহে।

(১৬) ষ্ট্যাম্প বাবদ্ আদায়ের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রসমূহ পাইয়া থাকে। (৪১ক ধারা)

(১৭) কোন রাষ্ট্রিককে তাহার রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করিবার অথবা তাহাকে অধিকার-চ্যুত করিবার ক্ষমতা নাই। কোন্ নিয়মে বিদেশীদের রাষ্ট্রিক করা হইবে অথবা সুইস্ রাষ্ট্রিকগণ বিদেশী হইয়া যাইবে তাহা স্থির করিবার ভার যৌথরাষ্ট্রের উপর দেওয়া আছে। (৪৪শ ধারা)

(১৮) বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও যৌথরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। (৫০শ ধারা)

(১৯) আইন-প্রণয়ন ও বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকগণের সহিত নিজ রাষ্ট্রিকগণের মত ব্যবহার করিতে বাধ্য। (৬০শ ধারা)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যৌথরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্র যে সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। উপরে যে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি হইল স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করা ক্ষমতা,—ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা আছে, তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। কাঠামো-আইনে কোন ক্ষমতা যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা বলিয়া নির্দ্দেশ না থাকিলে—তাহা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(১) কতকগুলি রাষ্ট্রে জনগণ সাক্ষাৎভাবে আইন-প্রণয়ন করে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসমূহকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রে (আপেনৎসেল, গ্লারুস্, উন্টেরহ্বাল্‌ড প্রভৃতি) জনগণ সাক্ষাৎভাবে আইন প্রণয়ন করে, কোন প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য করে না। এই সকল রাষ্ট্রে বৎসরে একবার করিয়া রাষ্ট্রের জনগণ খোলা মাঠে সভার বৈঠক করে। এই সভাকে 'লাণ্ডসগেমাইণ্ডে' বলে। এই সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য প্রতি বৎসর লাণ্ডামানকে নূতন করিয়া জনগণ নির্ব্বাচন করে। ইনি প্রথমত গত বৎসরের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া ভগবানের নিকট একটি প্রার্থনা করেন। সভার কাজ হইল,—নূতন আইন প্রণয়ন করা অথবা গত সভায় প্রণীত আইন মঞ্জুর করা, বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করা, আয়-ব্যয় ও পূর্ত্তকার্য্য-সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা করা এবং বিচারকগণ সমেত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের নিয়োগ করা। সর্ব্বসাধারণের সভায়, বিশেষত লোক-সংখ্যা অধিক হইলে, কাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, আইন-প্রণয়ন ভালভাবে না হইতে পারে, সেইজন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া উহার হাতে কার্য্য-নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হয়। এই সমিতির সভ্যগণ 'লাণ্ডসগেমাইণ্ডে' কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না, বিভিন্ন নির্ব্বাচন-জেলা দ্বারা হন। ইহার নাম রাষ্ট্রীয় সভা (লাণ্ডরাট্ বা কান্টনস্‌রাট)। এমন অনেক বিষয় আছে যাহার খুঁটিনাটি জনগণের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নহে। এগুলি রাষ্ট্রীয় সভার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাহা ছাড়া কোন কোন শ্রেণীর আইন পাশ করা, হিসাব পরীক্ষা করা ও অধিক অর্থ ব্যয় করা ও কতকগুলি অপ্রধান কর্ম্মচারীর নিয়োগ, ইহার কাজ। এক সময়ে এই সমিতি নিজ হাতে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ও এমন ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল যেন উহার সম্মতি ব্যতীত উক্ত সভা কোন কাজ করিতে সক্ষম না হয়। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। এক্ষণে উপস্থিত জনগণের যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকার প্রশ্ন বা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। ব্রাইস্ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সকল সভা আকারে যত ছোট হয় আইন-প্রণয়ন বিষয়ে তাহা তত উৎকর্ষ দেখাইয়া থাকে।

শাসন-সমিতি সাধারণত সাত ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হয়। ইঁহারা জন-সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। রাষ্ট্রের কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার ইঁহাদের হাতে থাকে। লাণ্ডামমান এই

সমিতির সভাপতি এবং তিনি সমগ্র রাষ্ট্রের নেতা বলিয়াও পরিচিত। তিনি কোন প্রকার বেতন বা বৃত্তি পান না, কিন্তু তাঁহার পদটি বিশেষ সম্মানজনক।

অন্য সমুদায় রাষ্ট্রে এবং অর্দ্ধ-রাষ্ট্রে প্রতিনিধি-মূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এগুলির প্রত্যেকটির নিজ নিজ কাঠামো-আইন জনগণ কর্তৃক প্রণীত। যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন না করিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ কাঠামো-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। আর ইহারা ইচ্ছামত কাঠামো-আইনের পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য যৌথ সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই রাষ্ট্র-সমূহ প্রায় এক ছাঁচে গড়া। প্রত্যেকটিতে এক-শাখাবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা আছে। উহার নাম বড় সমিতি। বিভিন্ন রাষ্ট্রে সার্ব্বজনীন ভোটের প্রথা প্রচলিত। অধিকাংশ রাষ্ট্রে বড় সমিতির সভ্যগণ তিন অথবা চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন।

(২) কতকগুলি রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

রাষ্ট্রীয় কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটি করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আছে। ইহা বিভিন্ন ভাষী রাষ্ট্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাকে ছোট সমিতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে পাঁচ হইতে তের জন পর্য্যন্ত লোক লইয়া গঠিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে, অধিকাংশ রাষ্ট্রে যৌথরাষ্ট্রের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরূপ করিয়া ইহা গড়িবার প্রয়াস দেখা যায়। ফলে অনেক রাষ্ট্রে যে শুধু সাত জন ব্যক্তিকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইতেছে, তাহা নয়, যৌথরাষ্ট্র সমিতির মত ইহারও প্রত্যেক সভ্যকে এক একটি আলাদা বিভাগের ভার দেওয়া হইতেছে। অন্যান্য দিকেও ইহা যৌথ-রাষ্ট্র-সমিতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলে। ছোট সমিতির কার্য্যাবলী একেবারে নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও সমিতি উহার বাৎসরিক বিবরণী লইয়া আলোচনা করিয়া ও নানাবিধ প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সমুদায় শাসন-কার্য্যের উপর কর্তৃত্ব-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। অন্য দিকে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ব্যবস্থাপক সভাকে নানাপ্রকারে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ,—বিবরণী দাখিল ও ব্যবস্থা প্রণয়ন, কোন আলোচনায় যোগদান এবং ব্যবস্থাপক সভার মতে মত দেওয়া বা প্রতিকূল ভোট হইলেও পদত্যাগ না করা ইহার বিশেষত্ব। আর রাজনৈতিক দলের জয়পরাজয় অনুসারে যেরূপ যৌথরাষ্ট্রের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় না, সেইরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিসমূহও সাধারণত এক দলের লোক লইয়া গঠিত হয় না। ঊনজন দল বা দলসমূহের লোকেরা ঐ বিভিন্ন সমিতিতে স্থান পায়। এক বিষয়ে যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির একটি গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে। তাহা এই সকল সমিতির সভ্যদের নির্ব্বাচন সম্পর্কে। পূর্ব্বে অধিকাংশ রাষ্ট্রে সভ্যগণ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে ঝোঁকটা বিপরীত দিকেই প্রবল। অধিকাংশ রাষ্ট্রে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সহিত ইঁহাদের বিরোধ ঘটে নাই। কারণ, এই ব্যবস্থার ফলে প্রথমত রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হ্রাস পাইয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, ছোট সমিতিসমূহের সভ্য-নির্ব্বাচন বিষয়ে জনগণ অধিকতর রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছে এবং যোগ্য লোকদিগকে বার বার নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছে।

অধিকাংশ সুইস্ রাষ্ট্রে একটিমাত্র শাখা বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভা যোজায়েন রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলির আইন-প্রণয়ন ক্ষমতায় বাধা দিবার শক্তি রাষ্ট্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের নাই। বিচার-বিভাগও সে সকলের যুক্তিহীনতা বিচার করিতে সমর্থ নহে। অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পর্কে যে সকল বিধিনিষেধ আছে সেগুলি সুইট্জারল্যাণ্ডে দেখা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বড় সমিতি যাহাতে কোন প্রকারে অত্যাচারী হইয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্য কোন কোন রাষ্ট্রে এক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। তাহা এই: কোন রাষ্ট্রের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক রাষ্ট্রিক—বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহাদের সংখ্যা ১ হাজার হইতে ১২ হাজার পর্য্যন্ত ছিল—দাবী করিতে পারিত যে, বড় সমিতিকে লয় করিয়া দেওয়া হইবে কি না তদ্বিষয়ে জনগণের ভোট লওয়া হউক। জনগণ লয় করিয়া দিবার স্বপক্ষে ভোট দিবামাত্র, বড় সমিতির আয়ু শেষ হইয়া যাইত এবং নূতন নির্ব্বাচন আরম্ভ হইত। ইহা একপ্রকারের প্রত্যাহ্বান। গোড়াতে এই প্রথা কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িবার কারণ দুটি—(১) অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভাসমূহের নির্ব্বাচন, এবং (২) প্রায় সর্ব্বত্র প্রত্যুপস্থাপনের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাপক সভা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা জনগণের আছে। ইহা হইল কাঠামো-ও অন্যান্য আইনের সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন। প্রায় সমুদায় রাষ্ট্রের প্রথা এই যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্রিক দাবী করিলে কাঠামো-আইন সংশোধনের প্রস্তাব সম্বন্ধে জনগণের ভোট লওয়া হইবে।

রাষ্ট্রীয় সভাসমূহ যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারে তজ্জন্য প্রায় সকল রাষ্ট্রে আনুপাতিক নির্ব্বাচন অনুসারে প্রতিনিধি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রীয় সভাসমূহ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মাত্র অতিজন দলের লোকদের লইয়াই গঠিত হয় না,—উনজন দল বা দলসমূহও জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ হয়।

সুইট্জারল্যাণ্ডের বিচারালয়সমূহ

সুইস্ যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে যৌথ বিচারালয় (বুণ্ডেস্-গেরিখ্ট্) সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ আছে (১০৬-১১৪ ধারা)। কিন্তু যৌথ বিচারালয়ের গঠন ও কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ইহা কোনক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিচারালয়ের সমকক্ষ নহে। সুইস্ ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিবার কোন অবকাশ দেওয়া হয় নাই। ইহা শাসন ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের অধীন একটি বিভাগ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ফলে, সুইস্ যৌথ বিচারালয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যৌথ বিষয়ে সুবিচার করিবার জন্য যৌথ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফৌজদারি হইলে জুরির ব্যবস্থাও আছে। (১০৬ ধারা) কিন্তু উচ্চতম বিচার-ব্যবস্থা একটি মাত্র বিচারালয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার শাখাপ্রশাখা নাই এবং যৌথরাষ্ট্র-সমিতি

যৌথ বিচারালয়ের গঠন-প্রণালী।

কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মচারিগণের উপর রাষ্ট্রীয় বিচার-কার্য্য করিবার ভার পড়ে। অর্থাৎ সুইটজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি সম্পূর্ণ যৌথ বিচার-ব্যবস্থা উহার ডালপালা সমেত বিকশিত হয় নাই। সুইসরা তাহার প্রয়োজনও অনুভব করে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বিচারালয়সমূহ আছে ও সর্ব্বোপরি ভো নামক রাষ্ট্রে লোজান সহরে যৌথ বিচারালয় অবস্থিত,—ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। জার্মাণভাষী বার্ণে রাজধানী স্থাপন করিয়া ফরাসীদের আব্দার রক্ষার নিমিত্ত এই সহরে যৌথবিচারালয় স্থাপিত হয়।

যৌথ বিচারালয়ে বিচারকগণ এবং তাঁহাদের বদলে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা যৌথ ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হন। জাতীয় তিনটি ভাষাভাষী লোকেরাই যাহাতে বিচারালয়ে স্থান পান তজ্জন্য চেষ্টা হয়। (১০৭ ধারা) কিন্তু এই বিচারালয় কিরূপে গঠিত হইবে, কোন্ কোন্ ভাগ থাকিবে, কতজন বিচারককে, কতজন বদলী বিচারককে নিয়োগ করা হইবে এবং তাঁহারা কতদিনের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন ও কি হারে বেতন পাইবেন—এই সকল বিষয় কাঠামো-আইনে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই। বরং কাঠামো-আইনে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, এ সকল বিষয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। আইন বলিতে যৌথ ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন বুঝিতে হইবে। তদনুসারে ২৪ জন বিচারক ও ৯ জন বদলী বিচারক এক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়াইতে পারেন। সাধারণত বিচারকেরা পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ও এইরূপে তাঁহারা যাবজ্জীবন বিচারকের কাজ করিতে সমর্থ হন। এই বিচারকদের মধ্যে একজনকে সভাপতি ও আর একজনকে সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করা হয়। ইঁহাদের কার্য্যকাল দুই বৎসর ও ইঁহারা সভাপতি বা সহকারী সভাপতিরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হন না। সভাপতি বৎসরে ২৭,০০০ ফ্রাঁ ও অন্যান্য বিচারক বৎসরে ২৫,০০০ ফ্রাঁ পাইয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি প্রতিনিধি-সভায় নির্ব্বাচন-যোগ্য বিবেচিত হন, তাঁহারাই যৌথ বিচারালয়ে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণ অথবা সুইস্ প্রতিনিধি-সভা ও রাষ্ট্র-সভার সদস্য কিংবা তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের নিজ পদে অবস্থিত থাকিয়া একই কালে যৌথ বিচারালয়ের সভ্য হইতে পারেন না। যৌথ বিচারালয়ের বিচারকগণ তাঁহাদের বিচারক-পদে আসীন থাকা কালে অন্য কোন পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন—তাহা যৌথরাষ্ট্রে বা কোন রাষ্ট্রে চাকুরী হউক বা কোন পেশা হউক। (১০৮ ধারা) অর্থাৎ বিচারকদিগকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কাঠামো-আইনে বিচারকদিগের বিশেষ কোন গুণ থাকার প্রয়োজন আছে বলিয়া উল্লেখ না থাকিলেও, সাধারণত আইন-দক্ষ লোকদিগকে নির্ব্বাচন করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়।

যৌথ বিচারালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারীদের নিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের আছে। (১০৯ ধারা)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যৌথ বিচারালয়ের বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের কথা কাঠামো-আইনে বর্ণিত আছে:

যৌথ বিচারালয়ের ক্ষমতাসমূহ।

প্রথমত, দেওয়ানি মোকদ্দমায় অর্থাৎ (১) যৌথরাষ্ট্রের সহিত তদন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোকদ্দমা বাধিলে, (২) যৌথরাষ্ট্রের সহিত সঙ্ঘ বা ব্যক্তিবিশেষের বিবাদে—এরূপ ক্ষেত্রে সঙ্ঘ বা ব্যক্তি বাদী হওয়া প্রয়োজন এবং মোকদ্দমার গুরুত্ব যৌথ আইন দ্বারা বর্ণিত দাবীর পরিমাণের উপর নির্ভর করে, (৩) এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের মোকদ্দমা ঘটিলে, (৪) কোন রাষ্ট্রের সহিত সঙ্ঘ বা ব্যক্তিবিশেষের মোকদ্দমায়—মোকদ্দমার গুরুত্ব যৌথ আইন দ্বারা বর্ণিত দাবীর পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং এরূপ ক্ষেত্রে বাদী যৌথ বিচারালয়ে বিচারের দাবী করিতে পারে। জাতীয়তা-নাশ ও পল্লীবাসীর রাষ্ট্রিকতার অধিকার লইয়া বিবাদ বাধিলেও যৌথ বিচারালয় তাহার বিচার করে। (১১০ ধারা)

দ্বিতীয়ত, অপরাধ সংলগ্ন ঘটনাবলীর সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য জুরি সহযোগে ফৌজদারি মোকদ্দমায় অর্থাৎ (১) যৌথরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মহাদ্রোহ এবং যৌথকর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে, (২) বিভিন্ন জাতির আইনের বিপক্ষে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে, (৩) যে সকল অপরাধ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়নের হেতু অথবা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার পর যেগুলি দেখা দেয় এবং যেগুলি দমন করিবার জন্য যৌথ-সৈন্যের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় তৎসম্বন্ধে, (৪) যৌথকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সেই কর্ত্তৃপক্ষ যৌথ বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে। (১১২ ধারা)

তৃতীয়ত, যৌথ বিচারালয় অন্য কতকগুলি বিষয়েও নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। যথা: (১) যৌথ ও রাষ্ট্রীয় শাসন-বিভাগের ক্ষমতার এলাকা লইয়া বিরোধ, (২) সার্ব্বজনীন আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতানৈক্য, (৩) রাষ্ট্রিকগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার হরণের অভিযোগ ও ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত সমঝোতা বা সন্ধি না মানার অভিযোগ। (১১৩ ধারা)

যৌথবিচারালয়ের কার্য্য-বিভাগ।

যৌথ বিচারালয়ের তিনটি বিভাগ আছে। কোন্ বিভাগ কোন্ কোন্ প্রকার বিচার কার্য্য করিবে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা ও তদ্বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের আছে। যৌথরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের, যৌথরাষ্ট্র বা কোন রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তি বা সঙ্ঘের, এক দলের সহিত অন্য দলের প্রাথমিক ও শেষ মোকদ্দমার শুনানী যৌথ বিচারালয়ে হইতে পারে; ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামো-আইন বা ব্যবস্থাপক সভার আইন-সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় যৌথ বিচারালয়ে বিচারার্থ পাঠান হয়। যৌথরাষ্ট্র বা কোন রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তি ও সঙ্ঘের এবং এক দলের সহিত অন্য দলের মোকদ্দমায় মোকদ্দমার বিষয়ের মূল্য ৩০০০ ফ্রাঁর অনল্প হওয়া প্রয়োজন। যৌথ বিচারালয়কে রেলওয়ে ঘটিত অনেক মোকদ্দমারও তদ্বির করিতে হয়। অন্য দিকে ইহাকে অন্যান্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পর্কে অথবা যৌথ আইন প্রয়োগকারী রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আদালতরূপে কাজ করিতে হয়। আর মহাদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধের বিচারের জন্য যৌথ বিচারালয়ের নিম্নলিখিত চারিটি পর্য্যায় আছে, যথা, দোষারোপ, অপরাধ পরীক্ষা, দণ্ড ও পুনর্ব্বিচার। ফৌজদারি আদালতের জন্য জুরীগণ জনগণ কর্ত্তৃক ভোটে নির্ব্বাচিত হন ও তাঁহারা দিনে ১০ ফ্রাঁ করিয়া বৃত্তি পান।

শাসন-সংক্রান্ত মোকদ্দমাসমূহ যৌথ বিচারালয়ে বিচার করা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এ

বিষয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে একটি বিশেষ বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কোন অপরাধ করিলে তাহার বিচার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গোড়া হইতেই শাসন-সংক্রান্ত বিচার আইন দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু উহার জন্য বিশেষ কোন আদালত ছিল না। গত ১৯২৮ সন হইতে এই আদালত স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ হওয়ায়, উহা সম্প্রসারিত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। শাসন-সংক্রান্ত বিচার-ব্যবস্থা।

যে সকল বিষয়ে যৌথ বিচারালয়ের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সে সকল বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন ঐ বিচারালয় প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যৌথ ব্যবস্থাপক সভা যে সকল সমঝোতা সন্ধি ইত্যাদি মঞ্জুর করে যৌথ বিচারালয়কে সেগুলিও মানিয়া চলিতে হয়। (১১৩ ধারা)

উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ও যৌথ আইন পাশ করিয়া যৌথ বিচারালয়ের তাঁবে আনা যায়। বিশেষত, অসামরিক ক্ষমতা, অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত বাণিজ্য ও লেনদেন সম্বন্ধে আইনগত সমস্যা, সাহিত্যিক মুদ্রণস্বত্ব ও আবিষ্কার সম্বন্ধীয় অধিকার পত্র, ঋণ ও দেউলিয়া বিষয়ক মোকদ্দমা প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বত্র একরূপ বিচার-ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়া এগুলির ভার যৌথ বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করিতে পারে। (১১৪ ধারা) কিন্তু ১১৩ ধারার এক অংশে বলা হইয়াছে যে, শাসন-ঘটিত বিবাদসমূহ যৌথরাষ্ট্র সমিতি ও যৌথ ব্যবস্থাপক সভা বিচার করে। ইহার ফলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারার দ্বারা যে সকল ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের হাতে অর্পিত হইয়াছিল সেগুলি কতকটা খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, ব্যবসা পরিচালন, বাণিজ্যিক চুক্তি, ভোগ (কন্‌জাম্পশন) সম্পর্কিত কর, শিকারের আইন, কোন পেশা সম্বন্ধে যোগ্যতার পত্র, শিল্পাগার আইন, ব্যাঙ্ক নোট, ওজন, প্রাথমিক সরকারী ইস্কুলসমূহ, স্বাস্থ্য, পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন-বিচার ভার যৌথ মহাসমিতি যৌথ বিচারালয়ের হাতে দেয় নাই।

যৌথ বিচারালয় অন্য প্রকার মোকদ্দমারও বিচার করিতে বাধ্য। কিন্তু সে সকল মোকদ্দমার বিষয়ের মূল্যও গুরুত্ব যৌথরাষ্ট্র আইন করিয়া বাঁধিয়া দিতে পারে অর্থাৎ যৌথ আইন-নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এবং গুরুত্বের কম হইলে কোন মোকদ্দমা এইরূপে যৌথ বিচারালয়ের বিচারাধীনে আসিতে পারে না। অধিকন্তু, এইরূপ মোকদ্দমাকারী উভয় পক্ষকে জামিন গচ্ছিত রাখিতে হয়। (১১১ ধারা)

সুইস্ যৌথ বিচারালয়ের কয়েকটি বিশেষত্ব প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ইহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যৌথবিচারালয়ের ন্যায় শক্তিশালী ও স্বাধীন নহে। এক দিকে সুইস্ যৌথ বিচারালয় যৌথ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন মাত্র প্রয়োগ করিতে পারে; কাজ চালাইবার জন্য কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিবে অথবা করিবে না, এবং কিরূপ নিয়ম কর্ম্মচারী-দিগকে মানিয়া চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিবিধ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, যৌথ বিচারালয়ের থাকিলেও, উহা ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইন বিচারকালে প্রয়োগ করিয়া থাকে। অন্য দিকে, যৌথ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করিবার ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের নাই। যৌথ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনকে লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া কোন যৌথ বিচারালয়ের কয়েকটি বিশেষত্ব।

আইনকে না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা যৌথ বিচারালয়ের আছে, কিন্তু কাঠামো-আইনে একথা পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করা আছে যে, যৌথ কাঠামো-আইন ও উহার তত্ত্বাবধানে যে সকল আইন পাশ হয় সেই সমুদায় ব্যাখ্যা করিবার একমাত্র অধিকারী যৌথ ব্যবস্থাপক সভা। অর্থাৎ যৌথ ব্যবস্থাপক সভা যে আইন পাশ করে তাহার ব্যাখ্যার কাজ যৌথ বিচারালয় করিতে পারে না, করে স্বয়ং ঐ সভা। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইবে। যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ বিচারালয় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। পরন্তু সুইস্ যৌথ বিচারালয়ের স্থান এ বিষয়ে আইন ও শাসন বিভাগের নীচে। দ্বিতীয়ত, সুইস্ যৌথ বিচারালয় সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর বিশেষ কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহে। ১৯২৮ সনে বিশেষ বিচারালয় স্থাপনের পূর্ব্বেও সরকারী কর্ম্মচারীদের বিচারের ব্যবস্থা ভিন্নপ্রকার ছিল। অর্থাৎ ফ্রান্স ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মত সুইস্ সরকারী কর্ম্মচারিগণ সাধারণ বিচারালয়ের বাহিরে বিশেষ বিচারালয়ে বিচারের দাবী করিতে পারেন। এ বিষয়েও বিলাত ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। তৃতীয়ত, সুইস্ যৌথ বিচারালয়ের কর্ম্মচারিগণ কার্য্যত স্থায়ী হইয়া দাঁড়ান; তথাপি তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই নির্ব্বাচিত করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে, যৌথ বিচারালয়ের বিচারকগণ বার বার নির্ব্বাচিত হন বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত না হইলে সে বিষয়ে অভিযোগ করা চলে না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থা।

এক্ষণে রাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা যাউক। ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে একটি করিয়া আপীল আদালত, কতকগুলি প্রাথমিক আদালত ও শান্তি-রক্ষক দেখা যায়। যে-সব রাষ্ট্রে লাণ্ডেস্‌গেমাইণ্ডে আছে সে সব রাষ্ট্রে এগুলি সাক্ষাৎভাবে জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়; অন্যত্র রাষ্ট্রীয় (বড়) সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বিচারকদের বেতনের হার নীচু; কার্য্যকালও তিন অথবা চারি বৎসর, কিন্তু পুনর্নির্ব্বাচনের প্রথা আছে। মোটামুটি বলা চলে, রাষ্ট্রীয় বিচারকগণ সাধারণত দক্ষতা ও চরিত্রবত্তা দেখাইয়া থাকেন—কেহ কেহ আইনেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। বিচারকগণ যথেষ্ট বিদ্বান্ না হইলেও, তাঁহারা যাহাতে বিচার কার্য্যের ক্ষতি না হয় তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন। সুইস্ জনগণ করিতকর্ম্মা লোকেদের বেশী পছন্দ করে। বিচারালয়ের বাহিরে অনেক মোকদ্দমা সালিশী দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

জুরীর বিরলতা।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র এবং গুরুতর অপরাধে ফৌজদারি মোকদ্দমা ব্যতীত জুরী দ্বারা বিচার করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। কখনো কখনো বাহিরের লোকদিগকে বিচারক নিযুক্ত করিয়া ও বিচারকদের সহিত বাহিরের লোকদিগকে এসেসররূপে লইয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে বিনা পয়সায় গরীবদের জন্য বিচার কার্য্য করিয়া দেওয়া হয়।

উপরে শাসন-সংক্রান্ত বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ১৯২৮ সন হইতে বিশেষ আদালত স্থাপিত হইয়াছে। যে আইনের বলে এই আদালত স্থাপিত হইয়াছে তাহা ১৯১৪

নে প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা ১১৪ক রূপে মূল আইনের সহিত যুক্ত হয়। ইহার মর্ম নিম্নরূপ: যৌথ ব্যাপারে শাসন-সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে ও যৌথ আইনে নির্দেশ করিলে তদ্বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা শাসন-সংক্রান্ত যৌথ বিচারালয়ের থাকিবে। যৌথ শাসন-ব্যাপারে কর্মচারীদের দণ্ড দিবার প্রয়োজন হইলে যৌথ আইনের ব্যবস্থায় এই বিচারালয় বিচার করিতে পারে, কিন্তু এরূপ কোন মোকদ্দমা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীনে না থাকিলে তবেই তাহা সম্ভব হয়। যৌথ মহাসমিতি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত যৌথ আইন ও সন্ধিসমূহ শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় প্রয়োগ করে, নিজে কোন আইন তৈরী করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় শাসন-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় কোন রাষ্ট্র শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয়কে তাহা বিচার করিবার ভার দিতে পারে, কিন্তু অগ্রে এ বিষয়ে যৌথ মহাসমিতির অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হয়। শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় কিরূপে গঠিত হইবে ও কোন্ প্রণালীতে বিচার চালাইবে, তাহা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয়ের ক্ষমতা কিরূপ সীমাবদ্ধ। ইহাকে প্রতিপদে যৌথ ব্যবস্থাপক সভার মুখাপেক্ষা করিতে হয়। কোন কোন বিষয়ে ইহাকে ব্যবস্থাপক সভার অন্তর্গত বিশেষ বিভাগ বলিয়া বিবেচনা করিলেও দোষ হয় না। অন্যান্য দেশের মত সুইট্জারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভারও কিছু কিছু বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৯১৪ সনে শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় স্থাপন করিয়া এই ক্ষমতারই কতকাংশ উহাকে অর্পণ করা হয়,—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যাইবে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচার-বিভাগকে ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া রাখা হইয়াছে। সুইস্দের যুক্তি এই যে, বিচার, শাসন ও আইন-প্রণয়ন বিভাগকে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ও স্বাধীন করিয়া রাখা সুশাসনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে; অধিকন্তু আইন-প্রণয়ন বিভাগে জনগণ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিজ মত ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় বলিয়া অন্যান্য বিভাগের তুলনায় উহাকেই প্রবল করা সমীচীন। সুইস্ ব্যবস্থা সুইট্জারল্যাণ্ডের পক্ষে অহিতকর হয় নাই, বরং সেখানে কোন কোন দিকে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে। ব্রাইস্ বলেন, নির্দ্দোষিতা, ক্ষিপ্রতা, ও কম খরচা বিষয়ে সুইস্ বিচার-ব্যবস্থা বিলাত অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা হইতে হীন নহে।

আইন-প্রণয়নে সুইস্ জনগণের চরম কর্তৃত্ব

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। এখানে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপেক্ষা সরাসরি গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী সুইস্দের বেশী মনঃপূত। রুশো জনগণের চরম কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে তিনি প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার প্রচারের ফলে সুইস্গণ তাঁহার তত্ত্বসমূহ নিজেদের শাসন-প্রণালীতে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে জনগণের চরম কর্তৃত্বের প্রকাশ ঃ
১। ল্যাণ্ডস্‌গেমাইণ্ডে।

ল্যাণ্ডস্‌গেমাইণ্ডের কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। যে সকল রাষ্ট্রে উহা প্রচলিত, সেখানে সমুদায় আইন-প্রণয়ন কার্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের উপর অর্পিত আছে। অন্যত্র এই ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারে প্রযুক্ত হয়। প্রত্যুপস্থাপনকে জনগণের একপ্রকার নাকচ্ ক্ষমতা বলা যায়। যৌথরাষ্ট্রের অথবা তদন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা কোন আইন বা প্রস্তাব পাশ করিলে, যৌথরাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় জনগণের তাহা ভোট দ্বারা গ্রহণ করিবার বা না করিবার অধিকার আছে। ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে পুনরায় জনগণের বিচারের নিমিত্ত তাহাদের নিকট উপস্থিত করা হয় বলিয়া ইহাকে প্রত্যুপস্থাপন (রেফারেণ্ডাম্) বলে। জনগণ শুধু যে প্রণীত আইনের পুনর্বিচার করে তাহা নহে, তাহারা এইরূপে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিতেও সমর্থ। যৌথরাষ্ট্রে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি কোন আইন পাশ করিতে চাহিলে তাহা আনয়ন করিতে পারে।

২। (ক) প্রত্যুপস্থাপন ;
(খ) যৌথরাষ্ট্রে।

যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনে এই বিষয়ক আইনের মর্ম নিম্নরূপ : ৩০,০০০ প্রকৃত রাষ্ট্রিক অথবা আটটি রাষ্ট্র যদি দাবী করে তাহা হইলে যৌথ আইন ও সর্বপ্রকার যৌথ প্রস্তাব গৃহীত অথবা পরিত্যক্ত হইবার জন্য জনগণের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। যে সকল যৌথ আইন বা প্রস্তাব বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, এইরূপ দাবী হইলে সেগুলিও জনসাধারণের ভোটের জন্য আনীত হইয়া থাকে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য অথবা পনের বৎসরের অধিক কালের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা সমঝোতা খাড়া করিলে তৎসম্বন্ধেও ৩০,০০০ রাষ্ট্রিক বা আটটি রাষ্ট্রের দাবীতে তাহা গৃহীত অথবা পরিত্যক্ত হইবার জন্য জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। (৮৯ ধারা) জনগণের ভোট কি প্রণালীতে লওয়া হইবে ও কতদিন অন্তর ঐরূপ ভোট লওয়া হইবে, তাহা যৌথ ব্যবস্থাপক সভার আইনে স্থির হয়। (৯০ ধারা)

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে দুই প্রকার প্রত্যুপস্থাপন দেখা যায় : (১) ইচ্ছামূলক, (২) বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক প্রত্যুপস্থাপন বলিতে বুঝিতে হইবে যে, জনগণ দাবী পেশ করুক বা না করুক, সমুদায় আইন জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে। আর ইচ্ছামূলক প্রত্যুপস্থাপনের অর্থ, নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি দাবী পেশ করিলে পর আইনকে জনগণের বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। সুইসগণ বাধ্যতামূলক প্রত্যুপস্থাপনকেই প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষণ বলিয়া মনে করে, কারণ তাহাতে প্রত্যেক আইন সম্পর্কেই তাহারা সাক্ষাৎভাবে নিজ কর্তৃত্ব প্রয়োগের অবকাশ পায়।

যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের সকল প্রকার সংশোধন সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক প্রত্যুপস্থাপন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই প্রকার সংশোধন জনগণের সম্মতি ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। (১২৩ ধারা) জনগণের সম্মতি বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা ইতিপূর্বে বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। (পৃঃ ২৪৩-২৪৪) এখানে শুধু ইহাই দ্রষ্টব্য যে, সমগ্র দেশের অধিকাংশ রাষ্ট্রিক ও যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্গত অধিকাংশ রাষ্ট্র—উভয়ের সম্মিলিত স্বপক্ষ ভোট ব্যতীত কোন সংশোধন সম্ভবপর নহে। উপরে যে ৮৯শ ধারার মর্ম দেওয়া হইয়াছে তাহা কাঠামো-আইনের সংশোধন সম্পর্কে নহে, তাহা সমুদায় সাধারণ আইন ও প্রস্তাব

সম্পর্কে। আটটি রাষ্ট্র অথবা ৩০ হাজার নাগরিক দাবী করিলে তবেই এইরূপ আইন বা প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রত্যুপস্থাপন হয়। অর্থাৎ এই প্রকার প্রত্যুপস্থাপন বাধ্যতামূলক নহে। তাহা ছাড়া আরো একটি বাধা আছে। সুইস্ মহাসমিতি যদি মনে করে বিষয়টি গুরুতর, তাড়াতাড়ি না করিলে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আর প্রত্যুপস্থাপন হয় না। কোন বিষয় গুরুতর কি না তাহা বিচারের ভার মহাসমিতির নিজের হাতেই আছে। ইহাতে যে কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় নাই, তাহা বলা যায় না। বস্তুত, এ অভিযোগ শোনা যায় যে, সুইস্ মহাসমিতি বিষয়ের গুরুত্ব-নির্দ্ধারণে কোন ধরাবাঁধা প্রণালী অবলম্বন করে না। তবে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে প্রত্যুপস্থাপন অবলম্বিত হয় না: বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব, সন্ধি, দুই বিভিন্ন প্রকার কর্তৃপক্ষের বিবাদ-নিষ্পত্তি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের মঞ্জুর, রাস্তাঘাট নির্মাণ অথবা নদীখাল পরিষ্কারের জন্য সাহায্য দান। যে সকল আইন সম্পর্কে প্রত্যুপস্থাপনের প্রয়োগ হইতে পারে, সেগুলি ৯০দিন অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃত আইনরূপে পরিণত হয় না—প্রত্যুপস্থাপনের জন্য এই অবকাশ দেওয়া হয়।

আটটি রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে যৌথ প্রত্যুপস্থাপনের দাবী করিতে সমর্থ হইলেও, এ পর্য্যন্ত এরূপ দাবী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে আসে নাই। আটটি রাষ্ট্রের মত লওয়া যতটা কঠিন, ৩০ হাজার ভোটদাতার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা তত কঠিন নয়। রাষ্ট্রের বেলায় প্রথমত আটটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভাকে একত্র আহ্বান করিতে হইবে, তারপর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় জনগণের ভোট লইতে হইবে। ফলে, ব্যক্তিগত ৩০ হাজার সহি দ্বারা প্রত্যুপস্থাপনের দাবী জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯২১ সন পর্য্যন্ত যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের সংশোধন সম্পর্কিত যে সব প্রত্যুপস্থাপন জনগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে সেগুলি নীচের তালিকায় দেওয়া যাইতেছে:

ধারার নং	ভোটদাতার শতকরা কত অংশ ভোট দিয়াছে	স্বপক্ষে ভোট	বিপক্ষে ভোট	স্বপক্ষে রাষ্ট্র	বিপক্ষে রাষ্ট্র	তারিখ
২৪ (নদী, খাল ও বন নিয়ন্ত্রণ)	৩৪·৩%	১৫৬,১০২	৮৯,৫৬১	১৬	৬	১৮৯৭
২৪ক (জল-শক্তি)	৪৪·৬	৩০৪,৯২৩	৫৬,২৩৭	২১½	½	১৯০৮
২৪খ (নৌচালনা)	৫০·৪	৩৯৯,১৩১	৭৮,২৬০	২২	০	১৯১৯
২৫ক (খাদ্যের জন্য প্রাণিহত্যা)	৪৭·৬	১৯১,৫২৭	১২৭,১০১	১১½	১০½	১৮৯৩
২৭ক (সরকারী প্রাথমিক ইস্কুল)	৪৪·৭	২৫৮,০৬৭	৮০,৪২৯	২১½	½	১৯০২
৩১ (শুঁড়িখানা, মদ-বিক্রয় ইত্যাদি)	৬০·৪	২৩০,২৫০	১৫৭,৪৬৩	১৫	৭	১৮৮৫
৩২ক (ঐ)						
৩২খ (আফসিনথ)	৪৭	২৪১,০৭৮	১৩৮,৬৬৯	২০	২	১৯০৮
৩৪ক (দৈব ও ব্যাধি বীমা)	৫৬·৬	২৮৩,২২৮	৯২,০০০	২০½	১½	১৮৯০
৩৪খ (কারু ও শিল্প)	৪০·২	২৩২,৪৩৭	৯২,৫৬১	২১½	½	১৯০৮

৩৫ (দ্যূতক্রীড়াস্থাননির্ম্মাণে নিষেধ)	৫৫·২	২৬৯,৭৪০	২২১,৯৯৬	১৩½	৬½	১৯২০
৩৭ক (মোটর গাড়ী ও সাইকেল)	৩৫·৬	২০৬,২৯৭	১৩৮,২৭৬	১৫½	৬½	১৯২১
৩৭খ (বাণিজ্যিক বিমানপোত)	৩৪·৯	২১০,৪৪৭	১২৭,৯৪৩	২০½	১½	১৯২১
৩৯ (ব্যাঙ্ক নোট একচেটিয়া)	৫৯·৬	২৩১,৫৭৮	১৫৮,৬১৫	১৪	৮	১৮৯১
৪১ক (ষ্ট্যাম্প শুল্ক) } 42 (ছ) (ঐ)	৪০	১৯০,২৮৮	১৬৭,৬৮৯	১৪½	৭½	১৯১৭
৬৪ (দেওয়ানি আইনের ঐক্য)	৫০·৬	২৬৪,৯১৪	১০১,৭৬২	১৬½	৫½	১৮৯৮
ঐ (আবিষ্কার)	৪০·৪	২০৩,৫০৬	৫৭,৮৬২	২০½	১½	১৮৮৭
ঐ (ঐ)	৩৬·৫	১৯৯,১৮৭	৮৩,৯৩৪	২১½	½	১৯১৫
৬৪ক (ফৌজদারি আইনের ঐক্য)	৫০·৯	২৬৬,৬১০	১০১,৭৮০	১৬½	৫½	১৮৯৮
৬৫ (মৃত্যু-দণ্ড)	৬০·৪	২০০,৪৮৫	১৮১,৫৮৮	১৪	৮	১৮৭৯
৬৯ (ব্যাধি, মড়ক নিবারণ)	৬৩·২	১৬৯,০১২	১১১,১৬৩	১৬½	৪½*	১৯১৩
৬৯ক (খাদ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ)	৩৪·৮	১৬২,২৫০	৮৬,৯৫৫	১৮½	৩½	১৮৯৭
৭৩ (প্রতিনিধি সভায় আনু-পাতিক নির্ব্বাচন)	৪৭·৯	২৯৯,৫৫০	১৪৯,০৩৭	১৯½	২½	১৯১৮
৮৯ (আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি)	৫৭·৯	৩৯৮,৫৩৮	১৬০,০০৪	২০	২	১৯২১
—(জাতি সঙ্ঘে সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডের প্রবেশ)	৭৭·৫	৪১৬,৮৭০	৩২৩,৭১৯	১১½	১০½	১৯২০
১০৩ (শাসন-সংক্রান্ত যৌথ-বিচারালয়) } ১১৪ক (ঐ)	৩৮·৫	২০৪,৩৯৪	১২৩,৪৩১	১৮	৪	১৯১৪
১১৮-১২৩ (অভিনয়ন)	৪৬·৪	১৮৩,০২৯	১২০,৫৯১	১৮	৪	১৮৯১
—(যুদ্ধ-কর)	৫০·৪	৩০৭,৫২৯	১৬৭,১১৯	২০	২	১৯১৯

উপরের তালিকায় উদ্ধৃত প্রত্যুপস্থাপনগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কোথাও পুরাতন ধারার অংশ-বিশেষ, কোথাও সম্পূর্ণ ধারাটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কোথাও একেবারে একটি নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার কোথাও বা একই ধারা বা তাহার অংশবিশেষ পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উপরে শুধু গৃহীত আইন-সমূহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জনগণ যে সকল আইন গ্রহণ করে নাই সেগুলির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আরো দ্রষ্টব্য এই যে, শুধু কাঠামো-আইন সম্পর্কিত প্রত্যুপস্থাপনের তালিকাই দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য আইন ও প্রস্তাবসম্পর্কেও বহুবিধ প্রত্যুপস্থাপন আনীত হইয়াছে,—সেগুলির কতক গৃহীত ও কতক নামঞ্জুর হইয়াছে। সকল রকম যৌথ-রাষ্ট্রীয় প্রত্যুপস্থাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এইগুলিকে বিশেষ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিশেষত্ব ধরা পড়ে:

* একটি রাষ্ট্রে উভয় পক্ষে সমান ভোট হওয়ায় উহা ০ ধরা হয়।

যৌথরাষ্ট্রীয় প্রত্যুপস্থাপনের বিশেষত্ব।

(১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে ত্রিশ হাজার ব্যক্তি জনগণের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। ত্রিশহাজার স্বাক্ষর না পাওয়া গেলে কোন আইন বা প্রস্তাব প্রত্যুপস্থাপিত হইতে পারে না। যৌথরাষ্ট্রে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতার স্বাক্ষর পাওয়া যায় নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত কম।

(২) সাধারণত ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়নে যে ব্যবস্থা করিতে চাহে জনগণের তাহা অভিপ্রেত না হইলেই প্রত্যুপস্থাপন হয়। প্রত্যুপস্থাপিত কোন আইন বা প্রস্তাব গৃহীত না হইলে বুঝিতে হইবে ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃতই জনগণের প্রতিনিধি রহিয়াছে, অর্থাৎ সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিকাংশ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপক সভার কাজের সমর্থন করিতেছে। কিন্তু এ যাবৎ বহু প্রত্যুপস্থাপন গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সুইট্জারল্যাণ্ডের মত গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যবস্থাপক সভার সহিত জনগণের মতের পার্থক্য থাকে।

(৩) জনগণ কর্তৃক যে সকল প্রত্যুপস্থাপিত আইন বা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার সবগুলিই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা চলে না। কাঠামো-আইনে এমন অনেক আইন স্থান পাইয়াছে যাহা অনায়াসে সাধারণ আইন বা প্রস্তাবের অঙ্গীভূত হইতে পারিত। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববিশিষ্ট আইনের প্রস্তাবও জনগণ নামঞ্জুর করিয়াছে, ইহা দেখা যায়।

(৪) স্বভাবত একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে যে, ব্যবস্থাপক সভা ও জনগণের সহিত সুইস্ রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পর্ক কি? মহাসমিতির সভ্যগণ যে দল নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে পারেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ২৭৩)। বিলাত, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশসমূহে শাসন ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা ও প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু ধর্ম্ম বা সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রশ্নে ব্যতীত সাধারণত সুইস্ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। ব্রাইস্ বলেন, সুইস্ ভোটদাতা স্বাধীন প্রকৃতির লোক, এবং ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য পর্য্যালোচনা কালে এই স্বাধীনতার প্রবৃত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। তথাপি কখনো কখনো এমন হইয়াছে যে, অসন্তুষ্ট এক বা অধিক উনজন দল কোন পাশ করা আইন নামঞ্জুর করিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিকাংশ জনগণ তাহা না চাওয়ার দরুণ, তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু উনজনের বিরুদ্ধতা অতিজনের স্বপক্ষতা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল ছিল বলিয়া তাহা হইয়াছিল। ব্রাইস্ এ বিষয়ে নিজেই একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা এই: ১৮৮৪ সনের কিছু পূর্ব্বে যৌথ ব্যবস্থাপক সভা চারিটি বিল পাশ করে। জনগণ ঐ সনে এই চারিটির প্রত্যুপস্থাপন দাবী করিয়া বসে। প্রত্যুপস্থাপন দাবী করিবার হেতু এই ছিল যে, তৎকালীন যে অতিজন দলের হাতে শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাহার কার্য্যকলাপে উনজন দল বা দলসমূহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই ক্ষোভের ফলে চারিটি বিলই নাকচ হইয়া যায়, যদিও ইহার মধ্যে দুইটি বিল পাশ হইলে জনগণের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহা রাজনৈতিক দলের প্রভাবের দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু এই ঘটনার ঠিক পরেই সাধারণ নির্ব্বাচন উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্য এই যে, যে দল পরাজিত হইয়াছিল জনগণ আবার তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইল, অর্থাৎ জনগণ বিলসমূহ নামঞ্জুর দ্বারা নিজেদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিল, কিন্তু

বিশ্বাসী পূর্ব্বতন লোকদিগকে কাজে বহাল রাখিল। বিলাত, ফ্রান্স বা আমেরিকায় ইহা হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ব্রাইস্ বলেন, কখনো কখনো প্রত্যুপস্থাপনের দ্বারা জনগণ মন্দ ব্যবস্থার সহিত ভাল ব্যবস্থাও পাশ করিতে দেয় নাই বটে, কিন্তু সাধারণত প্রস্তাবসমূহের নিরপেক্ষ বিচার হইয়াছে। এবং এই প্রত্যুপস্থাপনের কার্য্যাবলী হইতে সুইস্ জনগণের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলির পরিচয় পাওয়া যায়:

প্রত্যুপস্থাপন ও সুইস্ জনগণ।

(ক) স্বাধীন প্রকৃতি। এই স্বাধীন প্রকৃতির জন্য রাজনৈতিক দলের শাসন দুর্ব্বল, ও শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে জনগণ চরম কর্ত্তৃত্ব নিজ হাতে রাখিয়াছে।

(খ) ব্যয়কুণ্ঠা। সুইস্ চাষী সাদাসিধা জীবনযাপন করে এবং মিতব্যয়ী। ইহারা যে কর-ভার বহন করে তাহা নিতান্ত হাল্কা নয় এবং কোন ব্যবস্থায় এই কর-বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহারা কোন ক্রমেই তাহার সমর্থন করে না। সুতরাং, নিজশ্রমে যে যাহা অর্জ্জন করে সরকারী কর্ম্মচারীরা কেন তাহা অপেক্ষা বেশী পাইবে, এই হইল তাহার প্রশ্ন এবং সে কোন উত্তরেই সন্তুষ্ট হয় না। ইহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, ইহারা আর্থিক প্রস্তাবের গুরুত্ব ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না এবং যে সকল প্রস্তাব বিলাত প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত সহজে পাশ হইয়া যাইত, সেগুলিও নামঞ্জুর করিয়াছে।

(গ) সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকারী কার্য্যের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাবলীর প্রতি বিরাগ। ইহার ফলে শাসন-বিভাগসমূহের শক্তি বাড়াইবার নিমিত্ত সকল প্রকার ব্যবস্থা জনগণ প্রায়ই নামঞ্জুর করিয়াছে।

(ঘ) সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজে যৌথশাসন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি। তবে এ আপত্তি সকল সময়ে প্রবল নহে। বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্র রেলের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

(ঙ) রক্ষণশীলতা। এই রক্ষণশীলতার একটা কারণ এই যে, সুইস্গণ সাধারণত স্থিরমস্তিষ্ক হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারও বেশী এবং হঠাৎ উত্তেজনার মুখে কোন কাজ করা ইহাদের স্বভাব নয়। ব্যবস্থাপক সভার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে ইহারা কোন আইন বা প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে দেরী করে না। তাহা না হইলে, ইহারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। যে বিষয়ে ইহাদের সন্দেহ উপস্থিত হয় অথবা যে বিষয় ইহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না তাহাতে সাধারণত বিপক্ষে ভোট দেয়। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাঁহাদের অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধির বলে হয়ত কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে চান, কিন্তু জনগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া নাকচ্ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং এরূপ প্রস্তাব কখনো নামঞ্জুর হইয়াছে, কখনো বা অনেক দেরীতে পাশ হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা চলে না যে, জনগণ প্রত্যুপস্থাপিত প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধে না সূচক ভোট দেয়। একথা বলা চলে যে, অনেক সময় সুইস্ ভোটদাতা ব্যবস্থাপক সভায় তাহার প্রেরিত প্রতিনিধি অপেক্ষা কম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচলিত প্রত্যুপস্থাপন সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়োজন

নাই। জুরিখ্ প্রভৃতি দু'একটি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ তথ্য-তালিকা পাওয়া গেলেও, অন্যান্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহা কোথাও সংগৃহীত হয় নাই। তবে এক বিষয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত সমুদায় রাষ্ট্রে একপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহা রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন সম্পর্কে বাধ্যতামূলক প্রত্যুপস্থাপন। ইতিপূর্ব্বে (পৃঃ ২৩৪) রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের ৬ষ্ঠ ধারার সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টভাবে এই কথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের জনগণের সম্মতি ব্যতীত উহার কাঠামো-আইনের সংশোধন সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ সংশোধন জনগণের নিকট প্রত্যুপস্থাপিত করিতেই হইবে। কিন্তু কাঠামো-আইন ছাড়া অন্যান্য আইন ও প্রস্তাব সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন রাষ্ট্রে সকল আইন ও প্রস্তাব সম্পর্কে বাধ্যতামূলক প্রত্যুপস্থাপন প্রচলিত। কোথাও কোথাও ইচ্ছামূলক প্রত্যুপস্থাপন রহিয়াছে। আবার কতকগুলিতে উভয় প্রথা একসঙ্গে বর্ত্তমান আছে, দেখা যায়; অর্থাৎ আইন ও প্রস্তাবসমূহের কতকগুলি সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ও অন্য কতকগুলি সম্বন্ধে ইচ্ছামূলক প্রত্যুপস্থাপন প্রবর্ত্তিত আছে। (আ) বিভিন্ন রাষ্ট্রে।

রাষ্ট্রসমূহে প্রত্যুপস্থাপনের কাজ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যেখানে ইহা বাধ্যতামূলক, সেখানে সাধারণত জনগণ বিশেষ সাবধানতার সহিত ভোট দিয়া থাকে। যেখানে ইহা ইচ্ছামূলক সেখানে, বিশেষত ভো, নাউশাটেল ও জেনেভা নামক তিনটি ফরাসী-ভাষী রাষ্ট্রে, প্রত্যুপস্থাপনের ব্যবহার বিরল। কিন্তু জার্ম্মাণ-ভাষী রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রচলন দেখা যায়।

মোটামুটি বলা চলে, যৌথরাষ্ট্রে ও তদন্তর্গত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহে প্রত্যুপস্থাপন বিশেষ কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান,—জনগণ যে সকল আইন পছন্দ করে না তাহার অনেকগুলি নিবারণ করিতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে, জনগণ কি প্রকার আইন সাধারণত না-মঞ্জুর করে? ভোট পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিদের অপেক্ষাও জনগণ অধিকতর রক্ষণশীল। কারণ তাহারা সহজে কোন আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আবার এই প্রবণতা যৌথরাষ্ট্র অপেক্ষাও প্রবল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সকল চরম আইন পাশ হইলে মজুর-শ্রেণীর উন্নতি হইত, সেগুলিও জনসাধারণ অনেক সময় নামঞ্জুর করিয়াছে। যে সকল আইন জটিল অথবা একবারে অনেক পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী সেগুলি প্রায়ই জনগণের মনঃপূত হয় না। এরূপে অনেক ভাল প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হইয়াছে। লাওয়েল প্রভৃতি এই প্রকৃতির এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে, লোকেরা কোন আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে এবং যে সকল আইনের অর্থ বুঝিতে পারে না সেগুলি তাহাদের দ্বারা কোনক্রমে তাড়াতাড়ি পাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুইসরা কিরূপ রক্ষণশীল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বোধ হয় আর কোন দেশে সুইস্ সরকারী কর্ম্মচারীর মত এত কম মাহিনা সরকারী কর্ম্মচারীরা পায় না।

সুইট্জারল্যাণ্ডের যৌথ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরাসরি গণতান্ত্রিকতার প্রভাবের কয়েকটি কারণ এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) সমুদায় জনগণের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বিষয়ক পুথিগত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব প্রথম ফ্রান্সে প্রচারিত হইলেও ইহার প্রভাব সুইট্স্যার- সরাসরি গণতন্ত্রের প্রভাবের কারণ।

ল্যাণ্ডে বেশী হইয়াছিল। তাহাতে সুইস্ জনগণ ইহা কার্যাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পায়। (২) আল্পস্ উপত্যকায় অবস্থিত কয়েকটি ছোটখাট জনপদের সমুদায় জনগণের একত্র মিলিত হইয়া আইন-প্রণয়ন ও শাসন-পরিচালন। এই প্রাচীন প্রথার ফলে সুশাসন বর্ত্তমান ছিল, সেইজন্ত ইহা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সুইস্‌গণ উৎসাহ বোধ করিয়াছিল। (৩) ব্যবস্থাপক সভা সর্ব্বদা যথোপযুক্তরূপে জনগণের ইচ্ছানুরূপ কাজ করে না বা করিতে পারে না, এই বিশ্বাস। (৪) দেশ-প্রেম ও দায়িত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি আশা। লোকেরা বুঝিতে পারে যে আইন-প্রণয়নে তাহাদের সাক্ষাৎ ভাবে যোগ আছে এবং তাহারা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তৃত্ব প্রতিহত করিবার নানারূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সুইট্‌জারল্যাণ্ডে তাহা নাই। কতকটা সেই কারণেও জনগণের হাতে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার দিয়া ব্যবস্থাপক সভার যথেচ্ছা ব্যবহারের সম্ভাবনা নষ্ট করা হইয়াছে।

প্রত্যুপস্থাপনের বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহ।

সুইস্ প্রত্যুপস্থাপন সম্বন্ধে যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যায়, সেগুলি একে একে সংক্ষেপে নীচে আলোচিত হইতেছে। প্রত্যুপস্থাপনের বিষয়ে একটা নালিশ এই যে, ভোটদাতার সংখ্যা কম হয় অর্থাৎ প্রত্যুপস্থাপন হইতে প্রকৃত জনমত বুঝিতে পারা যায় না,— যাহারা কোন প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বিবেচনা করিয়া বিরোধী হয় তাহাদের যেরূপ ভোট দিবার আগ্রহ থাকে, যাহারা উহার স্বপক্ষে তাহাদের সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যুপস্থাপনের সম্পর্কে ভোট দিবার অধিকারী ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ ভোট দেয় না। ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। যথা—জনগণ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন অথবা তাহারা নিজেদের অযোগ্যতার কথা ভাল করিয়া জানে। কারণ যাহাই হোক ফল একই দাঁড়ায় এবং তাহাতে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা বিকাশ লাভ করে না। তাছাড়া প্রত্যুপস্থাপন সকল সময়ে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছানুবর্ত্তী না হইতেও পারে। ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা জনমতকে প্রভাবান্বিত হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন সুইস্ রাষ্ট্রে প্রত্যুপস্থাপন সম্পর্কে প্রদত্ত ভোটের তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কোন কোন রাষ্ট্রে কখনো কখনো সমর্থ ভোটদাতাদের মাত্র ২০% ভোট দিতে আসিয়াছে। যৌথরাষ্ট্রে এই অনুপাত বেশী হইলেও আশানুরূপ নহে। কোন কোন রাষ্ট্রে এমন নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে যে, ভোটদাতাদের একটা বড় অংশ ভোট দিতে না আসিলে প্রত্যুপস্থাপন সম্ভবপর হয় না। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে শুধু এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার শাসন-ব্যবস্থাতেই সমগ্র জনগণ দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে না। দেশের শাসন-ব্যাপারে যাহারা প্রকৃতই সময় ও শ্রম ব্যয় করে, কোন সম্প্রদায়ের মাত্র সেই অংশ আইন-প্রণয়ন করে। অন্যেরা করিতে সমর্থ নহে। বার বার প্রত্যুপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকিলে একদিকে তজ্জন্য অনেক খরচ হয়, অন্যদিকে তাহা জনগণের পক্ষে বিশেষ বিরক্তি ও ঔদাসীন্যের কারণ হইয়া উঠে। যে আইন সম্বন্ধে ভোট লওয়া হয়, তাহা যুক্তি সহ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হয়। জনগণের ভোট লইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তাহার এক খণ্ড প্রেরিত হয়।

(১) প্রত্যুপস্থাপনে ভোটদাতার সংখ্যা অল্প।

ইহাতে রাষ্ট্রসমূহে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া যায়। অথচ ইহা ছাড়া জনগণকে আগে হইতে প্রস্তুত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই।

(২) কোন দেশের জনসাধারণের সকল রকম আইন প্রণয়নে তুল্য যোগ্যতা থাকিতে পারে না, তা সে দেশ যতই উন্নত হোক্। জনগণ যত বুদ্ধিমান্ হোক্, শুধু স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সমালোচনা অথবা বক্তৃতা ও বিতরিত পুস্তিকা হইতে কোন প্রস্তাবের দোষগুণ সর্ব্বদা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। ব্যবস্থাপক সভার তর্ক-বিতর্কও বিভিন্ন সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হয় না, তাহা হইলে বরং জনগণের সুবিধা হইত। কোন কোন রাষ্ট্রে 'বড় সমিতি' দ্বারা আইন-ব্যাখ্যা করাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে, অধিকাংশ রাষ্ট্রে আইনসমূহের যথোচিত আলোচনার কোন সুযোগ নাই। (২) আলোচনার অভাবে জনগণ আইনের মর্ম বুঝে না।

(৩) প্রত্যুপস্থাপনের ফলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব বোধ কমিয়া যায়। ব্যবস্থাপক সভা কোন প্রস্তাব পাশ করিবার পর জনগণ প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যাত করিতে পারিলে ব্যবস্থাপক সভার উপর জনগণের আশা ও শ্রদ্ধা কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আর ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীত আইন চূড়ান্ত না হইতেও পারে, এই জ্ঞান প্রতিনিধিদের থাকায় তাঁহারা কখনো কখনো এমন আইন-প্রণয়নেও সম্মতি দিয়াছেন যাহা জনগণের ভোটে পরিত্যক্ত হইয়াছে; এমন কি তাঁহারা নিজেরাও প্রত্যুপস্থাপনের সময়ে বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা জনগণ ও ব্যবস্থাপক সভার মধ্যেকার ব্যবধানকে বড় করিয়া ফেলা হইয়াছে। (৩) ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব-বোধের হ্রাস।

(৪) প্রত্যুপস্থাপন অনেক সময়ে জাতির আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। লোকের ধারণা এই যে, জনসাধারণের মতবাদ বেশী রকম অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বুঝা যায়, জনগণের স্বভাব রক্ষণশীল। কোন কোন সময়ে ব্যবস্থাপক সভা অগ্রসর আইন পাশ করিতে চাহিলে জনগণ তাহাতে বাধা দিয়াছে। ইহারই জন্য সুইট্জারল্যাণ্ডে মজুর ও চাষীদের মঙ্গলকর কোন কোন আইন জনগণ মঞ্জুর করে নাই। (৪) জনগণ ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা অধিক রক্ষণশীল।

সুইস্ রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ প্রত্যুপস্থাপনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অন্ধ নহেন। কোন কোন সুইস রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ইহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, জনগণ যে সকল বিষয় বুঝিতে পারে না, সেগুলি সম্বন্ধেও তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করার ফল এই হয় যে, প্রত্যুপস্থাপন প্রথাটিই ভালভাবে পরিচালিত হয় না। অন্য কেহ কেহ আবার খুব প্রশংসাও করিয়াছেন। সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যুপস্থাপনের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা যায় যে, ইহার ফল খারাপ হয় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ড অন্যতম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মানুগত দেশ এবং প্রত্যুপস্থাপন ইহাকে এই বিষয়ে আরো সাহায্য করিয়াছে, বাধা দেয় নাই। ভাল আইন পাশ করিতে গিয়া কখনো কখনো দেরীও হইয়াছে, ক্ষতিও হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত যে সকল আইন পাশ হইয়াছে সেগুলিতে জনগণের সম্মতি থাকায় দেশের মধ্যে অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। প্রত্যুপস্থাপনের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মতামত অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও যৌথরাষ্ট্রের অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভায় অকুশল ও অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নহে। অর্থাৎ যোগ্য লোকেরা রাজনৈতিক জীবন অবলম্বন করিতে নিরুৎসাহ বোধ করেন নাই।

সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যুপস্থাপনের কার্য্যকারিতা।

আর জনগণের পক্ষেও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্বের হিসাব না লইয়া স্বাধীনভাবে প্রত্যেক আইন বা প্রস্তাবের বিচার করা সম্ভব হইয়াছে। যৌথরাষ্ট্রে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল মন্ত্রী অথবা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বহুকাল কাজ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই বিশ্বস্ত ও যোগ্য লোকদিগকে বহাল করিবার পক্ষে সুইট্জারল্যাণ্ডে কোন বাধা নাই বলিয়া বিভিন্ন আইন ও প্রস্তাব নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা জনগণ সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিবার অবসর পায়। ইহাতে উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিতে পারে না। প্রত্যুপস্থাপনের প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রিক এই কথা বুঝিতে পারে যে, সমগ্র দেশে বা উহার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় ও আইন প্রণয়নে তাহার সম্পূর্ণ হাত আছে; সে নিজের শক্তি প্রয়োগ করুক্ বা না করুক, কিছু আসে যায় না। প্রত্যুপস্থাপনের দোষগুণ বিবেচনা কালে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সুইট্জারল্যাণ্ড অত্যন্ত ছোট দেশ বলিয়াই সেখানে উহা এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে। আর সুইট্জারল্যাণ্ডেও যে অঞ্চল যত ছোট, ও যে অঞ্চলে রাজনৈতিক দলের প্রভাব যত কম, তাহা তত উৎকর্ষ দেখাইয়াছে।

৩। অভিনয়ন প্রথা। ইহা প্রত্যুপস্থাপনের পরিপোষক।

আইন-প্রণয়ন ও শাসন ব্যাপারে জনগণের চরম কর্তৃত্ব যে দুই উপায়ে প্রকাশ পায় তাহার একটি হইল নেতিমূলক, অন্যটি ইতিমূলক। প্রত্যুপস্থাপন হইল নেতিমূলক উপায়। অর্থাৎ দেশের আইন-প্রণয়ন ইত্যাদির ভার সাধারণত সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা যাহা করে তাহাই চরম না হইতেও পারে, জনগণ ইচ্ছা করিলে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। কিন্তু জনগণ শুধু নেতিমূলক ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা ইতিমূলক ক্ষমতাও প্রয়োগ করিবার অভিলাষী। সেইজন্য সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যুপস্থাপনের পরিপোষকরূপে অভিনয়ন প্রথাও প্রচলিত আছে।

সুইস্ অভিনয়ন-প্রথার কথা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি (২৪২-২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে শুধু সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। প্রত্যুপস্থাপনের মত অভিনয়নেরও মূল কথা এই যে, শুধু পুথিগতভাবে নয়, জনগণ প্রকৃতই চরম কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী। রাষ্ট্রিকগণ যাহাদিগকে নিজেদের প্রতিনিধি করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠায় তাহারা যে সকল সময়ে তাহাদের মতকে প্রতিফলিত করিবে, ইহা নাও হইতে পারে। প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা না হয় জনগণের অনভিপ্রেত নিয়ম নিবারণ করা হইল, কিন্তু জনগণের অভিপ্রেত কোন নিয়ম আদৌ প্রণীত না হইলে তাহার প্রতীকারের উপায় কি? এইরূপে জনগণের সর্ব্বকর্তৃত্ব একবার স্বীকার করিয়া লইলে প্রত্যুপস্থাপনের সহিত অভিনয়নের ব্যবস্থা না করিয়া কোন উপায় নাই।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভিনয়নের বিস্তার।

অভিনয়ন প্রত্যুপস্থাপনের পরিপূরক হইলেও, সকল সময় ইহা প্রত্যুপস্থাপনের আগে, সমকালে বা ঠিক অব্যবহিত পরেই অবলম্বিত হয় নাই। ১৮৪৪ সনে প্রথমে ভো ও ১৮৫২ সনে আরগাউ অভিনয়নের ব্যবস্থা করে। সে সময়ে এ দুটি রাষ্ট্রে সাধারণ আইনের জন্য কোন প্রকার অভিনয়ন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভিনয়ন প্রথার এরূপ বিস্তার ঘটিয়াছে যে, এক্ষণে প্রায় সমুদায় রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন সংশোধনের জন্য

অভিনয়নের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডে ইহা কাঠামো-আইন সংশোধনে প্রযুক্ত হয়, সাধারণ আইনে হয় না।

যৌথরাষ্ট্রে অভিনয়ন প্রথা প্রচলিত হইতে সময় লাগিয়াছিল। ১৮৭২ সনে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইন প্রণীত হয়, তাহাতে সাধারণ আইন সম্পর্কে অভিনয়নের দাবীর কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু উহা গৃহীত হয় নাই। ১৮৪৮ সনের আইনে ও পরে ১৮৭৪ সনের আইনে শুধু যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের সংশোধন সম্পর্কে অভিনয়ন দাবীর কথা ছিল। ফলে বর্ত্তমান সময়ে, যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইনের সংশোধনার্থ অভিনয়ন দাবী সহজেই করা যায়, কিন্তু কোন সাধারণ প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহা করা যায় না। অর্থাৎ সুইট্জারল্যাণ্ডে এ বিষয়ে এক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামো-আইনকে সাধারণত বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখা হয় ও উহা সহজে বদলান যায় না। এখানে কাঠামো-আইনই সহজে বদলাইবার সুযোগ আছে, সাধারণ আইন সহজে বদলান যায় না।

যৌথরাষ্ট্রের কাঠামো-আইন সংশোধন সম্পর্কে অভিনয়ন দাবী।

যৌথ কাঠামো-আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে অভিনয়ন দাবীর সংখ্যা প্রত্যুপস্থাপন অপেক্ষা অনেক কম এবং তাহারও মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র গৃহীত হইয়াছে। ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠায় গৃহীত প্রত্যুপস্থাপনের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অভিনয়ন দাবী দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়:

ধারার নং			কত জন অভিনয়ন দাবী করে
২৫ ক	...	...	৮৩,১৫৯
৩১ খ ও ৩২ খ	...	...	১৬৭,৮১৪
৩৫	...	...	১১৭,৪৯৪
৭৩	...	...	১২২,৬৩১
৮৯	...	...	৬৪,৩৯১

প্রথম অভিনয়ন দাবীটি গবাদি পশু-হনন সম্বন্ধে। অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের মত সুইট্জারল্যাণ্ডেও খাদ্যের জন্য পশু-হত্যার প্রথা প্রচলিত আছে। এই অভিনয়ন দাবী করিয়া প্রত্যুপস্থাপনের দ্বারা যে আইন পাশ করা হইয়াছে, তাহাতে পশুদিগকে আগে সংজ্ঞাহীন করিয়া তারপর হননের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা আবার ইহুদী ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কাজ। যৌথরাষ্ট্র-সমিতি ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিকূলতা করা সত্ত্বেও সুইস্ রাষ্ট্রিকগণ ইহা কাঠামো-আইনরূপে বিধিবদ্ধ করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে সকল সময়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করার জন্যই যে অভিনয়ম দাবী হয়, তাহা নহে। অন্যদিকে, গুরুতর ও প্রয়োজনীয় অভিনয়ন দাবীও রাষ্ট্রিকগণ পাশ করিতে না পারে। কয়েকটি অভিনয়ন দাবী গৃহীত হয় নাই। যথা, (১) শ্রমিকদের পোষণের ব্যবস্থা, (২) যৌথ শুল্ক রাজস্ব হইতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেকের জনানুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া, (৩) জনগণের ভোটদ্বারা যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত করা ইত্যাদি। ১৯১৮ সনে প্রতিনিধি-সভায় সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য আনুপাতিক নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা কাঠামো-আইনের একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন। আর ইহা ব্যবস্থাপক

সভার অভিজনের মতের বিরুদ্ধে পাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমবার (১৯০০ সন) যখন আনুপাতিক ভোটের জন্ত অভিনয়ন দাবী হয়, তখন তাহা জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভিনয়ন দাবীর কার্য্যকারিতা কম।

অভিনয়ন দাবীর প্রথা যৌথরাষ্ট্রে যতকাল প্রচলিত আছে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত কোন কোন রাষ্ট্রে তদপেক্ষা অধিককাল প্রচলিত আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগও বেশী হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করিলে এই কথা মনে হয় যে, প্রথাটি লুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাকে বেশ কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে গণনা করা চলে না। অভিনয়ন দাবী বিষয়ে জুরিখ রাষ্ট্র অগ্রণী। সেখানে ৫,০০০ রাষ্ট্রিক অথবা রাষ্ট্রীয় সভার এক-তৃতীয়াংশ অভিনয়ন দাবী করিতে পারে। কিন্তু এই দাবী সঙ্গত না হইলেও কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রিকগণ তাহা পাশ করিয়াছে। খারাপ ও অহিতকর কোন কোন প্রস্তাবও যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জুরিখ, গালেন, বার্ণ বা আরগাউ রাষ্ট্রের অভিনয়ন দাবীসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া একথা বলা যায় না যে, ইহা এমন কোন সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে যাহা ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সম্ভব হইত না, যদিও হয়ত তাহাতে অধিকতর সময় লাগিত। পরন্তু এমন কোন কোন আইন পাশ হইয়াছে, যাহা পাশ না হইলে ভাল হইত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌগকর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নে বাধা দিয়াছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ফরাসীভাষী রাষ্ট্রসমূহে অভিনয়ন দাবীর প্রচলন কম।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রত্যুপস্থাপনের তুলনায় অভিনয়ন কম কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান।

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ প্রত্যুপস্থাপনের সহিত অভিনয়ন দাবীর তুলনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রথমটি যতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে, দ্বিতীয়টি ততদূর করে নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রত্যুপস্থাপনের প্রয়োগে সর্ব্বদা সুফল ফলিয়াছে একথা বলা না গেলেও, ইহা বলা যায়, যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত যে সকল আইন জনগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে জনগণের প্রকৃত মত জানা গিয়াছে ও তদনুসারে কাজ হইয়াছে। কিন্তু অভিনয়ন দাবী সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। বরং যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভিনয়নের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাই মনে হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভাসমূহই যথোচিতভাবে জনগণের অভাব মিটাইতে সমর্থ হইত, অভিনয়নের প্রয়োজন ছিল না; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত জনমত প্রকাশিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। প্রত্যুপস্থাপিত প্রস্তাবের সহিত অভিনয়ন দাবীর পার্থক্য এই যে, কোন প্রত্যুপস্থাপিত বিল যৌথরাষ্ট্র সমিতি বিশেষ বিবেচনার পর প্রণয়ন করিয়া দেয়, তারপর উহা মহাসমিতির উভয় শাখা বিচার করিয়া প্রত্যুপস্থাপনের জন্ত পাঠায়, কিন্তু অভিনয়ন দাবী যাহারা করে তাহাদের আইন প্রণয়নের প্রস্তাবে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় না বলিয়া ও সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায়, কোন প্রস্তাব অসম্পূর্ণ অথবা অস্পষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। অভিনয়ন দাবীর আরো একটা অসুবিধা এই যে, ইহা হয়ত এমন আইন প্রণয়নে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে যাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সমঝোতা বা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত অনুষ্ঠিত সমঝোতাকে বিফল করিয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া উত্তেজনার বশে বা স্থানীয় স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেও অভিনয়ন দাবী হইতে পারে।

অভিনয়ন দাবীর বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, সুইস্‌গণ সাধারণত তাহা জানে। তথাপি তাহারা প্রত্যুপস্থাপনের ন্যায় অভিনয়ন দাবীরও পক্ষপাতী। সুইট্জারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর রকম অন্যায় অনুষ্ঠিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা কম; তাহা ছাড়া সুইস্ প্রকৃতিও কতকটা বিবেচনাপরায়ণ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং সুইট্জারল্যাণ্ডে, জনগণের চরম কর্ত্তৃত্বের দেশে, লোকে একথা ভাবিতেই পারে না যে, তাহারা শুধু আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারিবে (প্রত্যুপস্থাপন), কিন্তু নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না (অভিনয়ন)। বস্তুত, বর্ত্তমান সময়ে লোকে সুইস যৌথরাষ্ট্রেও অভিনয়ন দাবীর প্রসার করিবার অভিলাষী। এক্ষণে সাধারণ আইন সম্পর্কে অভিনয়ন দাবী হয় না। সেজন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কাঠামো-আইনের সংশোধনের জন্য যত স্বাক্ষর দরকার (৫০,০০০) সাধারণ আইনের বেলা তদপেক্ষা বেশী (৭০।৮০ হাজার) স্বাক্ষর সাধারণ আইন প্রবর্ত্তনের জন্য প্রয়োজন হইলে আর অভিনয়ন দাবী সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহ

সাতটি রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্র একত্র মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সেই ঘরোয়া যুদ্ধে যৌথরাষ্ট্র জয়লাভ করে। যাঁহারা এই সময়ে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, যৌথরাষ্ট্র সমিতির প্রথম সভ্যদের তাঁহাদের মধ্য হইতেই বাছিয়া লওয়া হয়। কিন্তু যেই দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল এবং কাঠামো-আইন পরিগৃহীত হইল, অমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইতে লাগিল। প্রথম মতভেদ হইল, পরদেশে বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে সুইট্জারল্যাণ্ড কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবে, তাহা লইয়া। অন্য দেশের যুদ্ধবিগ্রহে যোগ না দেওয়াই অধিকাংশের মত ছিল। কিন্তু ইতালির স্বাধীনতা সমরে সাহায্য করিবার ইচ্ছাও বহুলোকের ছিল। ইহাদের অনেকে ইতালির যুদ্ধে যোগদান করে। তারপর পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, দলে দলে লোক আসিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডে আশ্রয় লইতে থাকে ও সমস্যা আরো গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশেষে, মহাসমিতি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যৌথরাষ্ট্র সমিতি আইন প্রণয়ন করিয়া আগন্তুকদের মধ্যে আন্দোলনপ্রবণ লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সময়ে উদারপন্থী (লিবারেল) লোকদেরই প্রাধান্য ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ :

পররাষ্ট্রনীতি,

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মতভেদের আরো একটি কারণ ঘটিল। শত শত বৎসর ধরিয়া সুইস্‌গণ বিদেশে ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে কাজ করিয়া আসিয়াছে। ১৮৪৮ সনেও কোন কোন সুইস্ রাষ্ট্রের বিদেশী এক বা অধিক রাষ্ট্রকে সৈন্য যোগাইবার সর্ত্ত ছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সনের কাঠামো-আইনে এই বিষয়ে নিষেধ বিধিবদ্ধ হয়। চরমপন্থী (র‍্যাডিক্যাল) দলের লোকেরা এই নিষেধের সুযোগে অবিলম্বে তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন, কিন্তু নরমপন্থিগণ (মডারেট) সর্ত্তসমূহ পালন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, অর্থাৎ নূতন আর কোন সর্ত্ত করা হইবে না, কিন্তু পুরাতন সর্ত্তগুলি মানা হইবে, এই ছিল তাঁহাদের মত। মহাসমিতি একটা রফার উদ্দেশ্যে, সমঝোতা রদ্ করিবার জন্য বিভিন্ন পররাষ্ট্রের

সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তবে শীঘ্রই ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই সমস্যার আর গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দুই দলে রেষারেষি তীব্র আকার ধারণ করে।

রেলওয়ে সমস্যা,

ইহার পর রেলওয়ে সমস্যা লইয়া দলাদলির সৃষ্টি হয়। ১৮৫২ সনে মহাসমিতিতে পরস্পরের ঘোরতর বিরোধী দুইটি দল দেখা যায়। একটি দল রেলের সরকারী পরিচালনা ও অন্যটি তাহার বেসরকারী পরিচালনা সমর্থন করে। দ্বিতীয় দলটিই প্রাধান্য লাভ করে ও কনষ্টান্‌স হ্রদ হইতে জেনেভা হ্রদ পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন নির্ম্মিত হয়। ইহা নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাসমিতিতে দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায় ও প্রতিযোগী লাইন খুলিবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। সরকারী পরিচালনার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থাপক সভাগৃহ ছাড়াইয়া সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্দোলনসমূহে যে রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল, অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট দলের লোক স্থান বা জাতিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু রেলওয়ে সমস্যা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে এক স্থানের সহিত অন্যস্থানের প্রতিযোগিতা হইতে লাগিল। অর্থাৎ কখনো কখনো সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে, এ দৃশ্যও দেখা গেল। ১৮৫৮ সনে রেল কোম্পানিসমূহের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত হেলভেশিয়া নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। ইহা তেমন সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হইলেও, কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রতিযোগী রেল লাইনও খোলা হয়। ইহার পর আল্পসের উপর দিয়া রেল লাইন খুলিবার সঙ্কল্প করা হইলে পর দলাদলি আরো জটিল আকার ধারণ করে। একটি সুড়ঙ্গ কোথায় নির্ম্মিত হইবে, তাহা লইয়া সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হয়। ১৮৬৩ সনে রেল লাইন বাড়িবার ফলে শেষ পর্য্যন্ত মধ্য অঞ্চল জয়লাভ করে ও গোটার্ডে সুড়ঙ্গ হইবে স্থির হয়। উত্তর জার্ম্মাণি, বাডেন ও ইতালি এই লাইন রক্ষা করিবার জন্য বাৎসরিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে পর ও সুইটজারল্যাণ্ডে রেললাইনের বিশেষ প্রসার হইবার পর দলাদলির কারণ দূর হইয়া যায়।

স্যাভয়-সমস্যা,

রেলপথ সমস্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি সমস্যা দেখা দেয়। স্যাভয়ের উত্তরাংশের নিরপেক্ষতা স্থির হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র উহার স্বাধীনতা হরণ করিবে না এইরূপ একটি সমঝোতা হইয়াছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়া সুইট্‌জারলাণ্ড সার্ডিনিয়াকে স্যাভয়ের দুইটি অঞ্চল দেয়। সুতরাং ১৮৫৯ সনে নেপোলিয়ানকে এই স্যাভয় দেওয়া হইতেছে শুনিয়া সুইসগণ তাহার প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই। ইহার পর দুই দলের উৎপত্তি হয়। এক দল যুদ্ধকামী, ইহারা সর্ব্ব প্রকারে সুইটজারল্যাণ্ডের অধিকার বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর; অন্যদল শান্তিকামী—ইহারা ফ্রান্সের ন্যায় পরাক্রান্ত দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক। এই দলভেদ যৌথরাষ্ট্র সমিতিতেও দেখা যায়। ৎস্যুরিখ, উরগাউ, ভো, বাসল শান্তিকামী এবং ব্যর্ণ, জেনেভা, সোলোথুর্ণ যুদ্ধকামী ছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল স্থলে রেল লাইনের প্রভাব ছিল সেগুলিই শান্তিকামী ছিল, আর একচেটিয়ার বিপক্ষদল যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। এই দুই দলের বাহিরে অবস্থিত বহু লোকের চেষ্টায় মহাসমিতি এক রফা নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। তাহার ফলে শান্তিকামী দলেরই জয়লাভ ঘটে ও স্বাভয় সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

রেলওয়ে ও স্বাভয় সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে আরো একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। তাহা কাঠামো-আইনের সংশোধন (১৮৭৪)। ১৮৬৪ সনে ফ্রান্সের সহিত এক সন্ধি কায়েম করা হয়, তদনুসারে ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ফরাসী রাষ্ট্রিক মাত্রকেই সুইট্জারল্যাণ্ডের বাসিন্দা হইবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত যৌথ কাঠামো-আইনের বলে কেবল সুইস্ খৃষ্টানগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে সমর্থ ছিল। কোন কোন রাষ্ট্রে ইহুদীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ জারী ছিল ও তাহারা সেগুলি দূরীভূত করিতে রাজী হয় নাই। [কাঠামো আইনের সংশোধন (১৮৭৪)।] সুতরাং অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, সুইস্ ইহুদীদের পক্ষে বাস করিবার যে বাধা ছিল, ফরাসী ইহুদীদের সম্পর্কে তাহা ছিল না। ইহা সুইস্দের পক্ষে অসহ্য হয়। যৌথরাষ্ট্র সমিতির সভ্যেরা এই আইনের সংশোধন করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই সুযোগে অন্যান্য আইনের সংশোধনও আনিতে চাহেন। ১৮৬৬ সনে এই সকল সংশোধন যখন জনগণের নিকট উপস্থিত করা হইল, তখন তাহারা একটি ব্যতীত অন্যগুলি নামঞ্জুর করিল। একে তখন রেলওয়ে সমস্যায় লোকের মন ক্ষুব্ধ ছিল, তাহার উপর অনেকে সংশোধন সমূহ যথেষ্ট নয় মনে করিয়া ও অন্য অনেকে আবার সেগুলিকে অতি অগ্রসর ভাবিয়া বিপক্ষে ভোট দিয়াছে। একমাত্র ইহুদীদের সম্পর্কিত আইনটির সংশোধন হয়। ইহুদীগণ সুইট্জারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রিকত্ব লাভ করে। কিছুকাল বাদে সুইস্ মহাসমিতি বর্ত্তমানে প্রচলিত কাঠামো-আইন অপেক্ষাও অধিকতর কেন্দ্রীকৃত ও গণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করিয়া জনগণের নিকট প্রেরণ করে। ইহা লইয়া আবার দল ও ঘোরতর মতভেদের সৃষ্টি হয়। চরমপন্থি (র‍্যাডিক্যাল) গণ সুইস্ যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ও ক্যাথলিক (ফরাসী ও ইতালীয়) গণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্প্রসারণে অভিলাষী ছিলেন। এইরূপে প্রথম সুইট্জারল্যাণ্ডে জাতি অনুসারে দলের গঠন হয়। যদি ১৮৭২ সনে জনগণ সেই কাঠামো-আইন নামঞ্জুর না করিত তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত হয়ত এইরূপ দল গঠন বর্ত্তমান থাকিত।

১৮৭৪ সনে নূতন কাঠামো-আইন গৃহীত হইবার পর হইতে রাজনৈতিক দলসমূহ কতকটা স্থিরতা লাভ করিয়াছে ও পূর্ব্বের ন্যায় আর বিষম রেষারেষিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে রাজনৈতিক দল-বিভাগ দেখা যায়, তাহা ভাষা বা জাতির উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থিত নয়, বরং বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মের বিভিন্নতা হইতেই এই সকল দলের কতকটা উৎপত্তি হইয়াছে। গোড়াতে যে ১৩টি রাষ্ট্র লইয়া সুইস্ যৌথরাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহা হইতে সাতটির বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টার মূলে ছিল ধর্ম্মগত বিভিন্নতা। আজ সেই ধর্ম্মগত পার্থক্য তত উগ্রভাবে বর্ত্তমানে না থাকিলেও উহার ক্রিয়া এখনো আছে। তবে অন্যান্য কারণ যুক্ত হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাবধানতা ও রক্ষণশীলতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়, আবার অন্য এক শ্রেণীর মধ্যে জনগণের প্রতি প্রবল বিশ্বাস বর্ত্তমান।

এই দুই প্রকার লোকই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেখা যায়। ফলে একই রাজনৈতিক দলেও বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক-সমাবেশ এক্ষণে বিরল নহে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলসমূহের (১৯৩২) নাম ও ঐ সময়ে প্রতিনিধি-সভায় ও রাষ্ট্র-সভায় কোন্ দলের কত জন লোক ছিলেন তাহার তালিকা নীচে দেওয়া যাইতেছে :

ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন দলের লোক-সংখ্যা।

চরমপন্থী গণতান্ত্রিক (রেডিক্যাল ডিমোক্রাট্) ...	৫২ জন
রক্ষণশীল ক্যাথলিক (যাজক)	৪৫ ,,
সমাজতান্ত্রিক (সোশ্যাল ডিমোক্রাট্)	৪৯ ,,
চাষী (আগ্রারিয়ান্) শিল্পী ও মধ্যবিত্ত	৩০ ,,
উদার গণতান্ত্রিক (লিবারেল ডিমোক্রাট্)	৬ ,,
অন্যান্য	৬ ,,
	১৮৮ জন*

চরমপন্থী গণতান্ত্রিক	১৯
রক্ষণশীল ক্যাথলিক	১৮
সমাজতান্ত্রিক	২
চাষী ইত্যাদি	৩
উদার গণতান্ত্রিক	১
অন্যান্য	১
	৪৪

এক্ষণে সাত আটটি দল থাকিলেও, ইহার মধ্যে তিন চারিটি দলই বরাবর প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম যাজক (ক্লেরিক্যাল), চরমপন্থী (রেডিকাল), নরমপন্থী (লিবারেল) ও সমাজতন্ত্রবাদী দল। যাজক ও চরমপন্থী দলকে দুই বিপরীত দল বলিয়া গণনা করা চলে। যাজকদলের লোকেরা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা সেই সকল রাষ্ট্র হইতে অধিকাংশ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে যে গুলিতে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। কাহারো কাহারো মতে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দল। অন্যদিকে চরমপন্থিগণ চিরকালই রোমান ক্যাথলিকদিগকে ও গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্টদিগকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরোধী বলিয়া মনে করে। এই দলের জার্ম্মাণভাষী রাষ্ট্রিকগণ সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ও যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্প্রসারণে অভিলাষী, কিন্তু ফরাসীভাষিগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য ইচ্ছুক। এই দুই দলের

* পূর্ব্বে প্রতিনিধি-সভার সভ্যের সংখ্যা ১৯৮ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২৬৪ ও ২৬৫)। ১৯৩১ সনের পর হইতে ২২,০০০ ব্যক্তি একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবেন এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। সেজন্য এক্ষণে প্রতিনিধি সভায় সভ্যের সংখ্যা ১৮৮ দাঁড়াইয়াছে (এন্ সাইক্লোপিডিয়া অব্ সায়েন্সের ৮ম ভাগ)।

মাঝামাঝি অবস্থিত দলকেই নরমপন্থী বলা হয়। সমাজতন্ত্রবাদীর এক অংশ প্রকৃত পক্ষে রমপন্থী দলের অংশ বিশেষ ও অন্য অংশ সমাজতন্ত্রবাদী দলের অন্তর্গত। এই দুই প্রকার লোক মিলিয়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদী দল গঠিত হইয়াছে। উদার রক্ষণশীল দল বর্ত্তমান খুব অল্প লোক লইয়া গঠিত হয়, কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহার প্রভাব বেশী। ইহারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষপাতী। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বড় বড় কারবারী ব্যাঙ্কার ও ধনশালী ব্যক্তিগণ সাধারণত এই দলের অন্তর্গত। ইঁহারা প্রধানত আর্থিক সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও চাষী দল বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা ক্রমেই অধিকতর প্রভাবশালী হইতেছে।

সুইস্ যৌথরাষ্ট্রে সাধারণত রাজনৈতিক গগনে চাঞ্চল্যের অভাব দৃষ্ট হয়। উহার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি বরং বেশী, যদিও স্থানীয় সমস্যা লইয়াই ইহারা বিশেষ আলোচনা করিয়া থাকে। সকল রাষ্ট্রের প্রকৃতি একরূপ নহে। সেজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পার্ব্বত্য ও কৃষি জনপদসমূহে ক্যাথলিকদের প্রাধান্য হইবার সম্ভাবনা ও সেই সব স্থানে স্থানীয় সমস্যা প্রধান স্থান অধিকার করে। তিচিনোতে রাষ্ট্রে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের সহিত বিপ্লববাদীদের ঘোরতর বিরোধের ফলে রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটে। জুরিখ, ঠুরগাও, আরগাও ও বাসল শিল্প-প্রধান বলিয়া এই সব স্থলের দলসমূহ বিশেষ কার্য্যপটুতা দেখাইবার অবকাশ পায়। রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এখানে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। মোটামুটি এই কথা বলা চলে যে, যৌথরাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল এক বস্তু নহে; এমন কি, রাষ্ট্রে ও যৌথরাষ্ট্রে কোন কোন দল একই নামে পরিচিত হয় না, অর্থাৎ যৌথরাষ্ট্রের কোন রাজনৈতিক দল কোন রাষ্ট্রে ভিন্ন নামে পরিচিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দলের বাঁধন যেরূপ দৃঢ় ও বিস্তৃত সুইট্‌জারল্যাণ্ডে তাহা সেরূপ নয়। আর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এক রাজনৈতিক দলের সহিত অন্য দলের প্রভেদ এরূপ নহে যে, ঘোরতর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ও অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণত উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না,—একমাত্র যে সকল শহর-অঞ্চলে কলকারখানার উদ্ভবের ফলে নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবরাশি জন্মলাভ করে ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব দেখা যায়, সেই সকল স্থানে দলাদলি প্রবল হয়।

যৌথরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র লইয়া কচিৎ দলাদলি হইয়া থাকে। কারণ, সকল দলই এই বিষয়ে একমত যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে ইহার প্রতিবেশী সমুদায় রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যৌথ কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা আরো বাড়ানো হইবে কি না তদ্বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। কেহ কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রকে আরো দৃঢ় ও ক্ষমতাশালী করিবার পক্ষপাতী, কেহ বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসী। যৌথরাষ্ট্র কর্ত্তৃক রেলওয়ে গ্রহণের পর হইতে বর্ত্তমান সময়ে এই দুই প্রকার মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে বিরোধিতা কমিয়া গিয়াছে। আর্থিক প্রশ্ন লইয়া যে মতভেদের সম্ভাবনা ছিল, সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সংরক্ষণমূলক টারিফ্ প্রচলনের পর হইতে তাহাও প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। শিক্ষার ব্যবস্থাকে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রহিত অথবা

যুক্ত করা হইবে, তাহা লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে আজিও মতভেদ বর্ত্তমান আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ভার এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকায়, যে সকল রাষ্ট্রে প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিকদের সংখ্যা সমান সমান সেই সকল স্থানেই বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে। দলগত বিরোধিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল উনজনদের নির্ব্বাচন সম্পর্কে। ১৯১৯ সনে আনুপাতিক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া যৌথরাষ্ট্র সমিতির নির্ব্বাচন ব্যবস্থাপক সভায় না করিয়া, জনগণের দ্বারা করাইবার সম্বন্ধে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

যৌথশাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব কম।

রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে এই কথা বুঝা যাইবে যে, সুইট্জারল্যাণ্ডে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব থাকিলেও, যৌথ শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যৌথরাষ্ট্র সমিতি ও রাষ্ট্রসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসমূহ শুধু অতিজন দলের লোকদের দ্বারাই গঠিত হয় না, উনজন দল বা দলসমূহও তাহাতে স্থান পায়। ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধেও একথা খাটে, সেখানেও রাজনৈতিক দলের শাসন শিথিল। ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভা ও যৌথরাষ্ট্র সমিতির আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানে শুধু অতিজন দলই প্রভুত্ব করে না, সুইট্জারল্যাণ্ডে যে দল বা দলসমষ্টি জয়লাভ করুক না, তাহা পরাজিত দল বা দলসমূহকে স্থান দিয়া থাকে। বিলাতী, ফরাসী বা মার্কিণ রাজনৈতিক দলসমূহ নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলে কল্পনাও করিতে পারে না যে, শাসন ব্যবস্থায় বা আইন-প্রণয়নে উনজনের স্থান থাকিবে। অথচ সুইট্জারল্যাণ্ডে তাহা নিয়ত ঘটে। সুইস্ রাজনৈতিক দলের সাধারণত কোন অর্থ-ভাণ্ডার নাই, থাকিলেও তাহা বৃহৎ নহে। প্রথমত, নির্ব্বাচনের জন্য অর্থব্যয় করা কেহ সমীচীন মনে করেন না। কেহ করিলে জনগণ তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে করে ও তাহার অনুমোদন করে না। দ্বিতীয়ত, দলের জয়লাভ হইলেও দলস্থ ব্যক্তিগণের স্বার্থ পুষ্টির সম্ভাবনা কম। কারণ একে ত সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন কম, তার উপর আবার তাঁহাদের স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করাই দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু যখন কোন বিশেষ বিষয় লইয়া জনগণের চিত্ত আন্দোলিত হয়, তখন সাময়িকভাবে অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়।

বিলাতে যত নির্ব্বাচন হয়, সুইট্জারল্যাণ্ডে তদপেক্ষা বেশী হয়, যদিও আমেরিকায় নির্ব্বাচন-সংখ্যা আরো বেশী। এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের সহিত সুইট্জারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য আছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে এমন অনেক কর্ম্মচারীকে জনগণ নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে, যাঁহারা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে ব্যবস্থাপক সভা অথবা শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। নির্ব্বাচন-সম্পর্কে ভোটদানকালে সুইস্ ভোটদাতাগণ যে অন্যান্য দেশের ভোটদাতাগণের চেয়ে বেশী সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোটদান বিষয়ে সুইস্ রাজনৈতিক দলসমূহ সাধারণত কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয় না ও নিজ নিজ দলের লোকদিগকে ভোট দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে না; অন্য দিকে সার্ব্বজনীন ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভোটদাতার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, নির্ব্বাচন কালে শতকরা ভোটের সংখ্যা কমিয়া যাইবার কথা। তথাপি সুইট্জারল্যাণ্ডের নির্ব্বাচনে প্রায়

যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচনের মতই ভোটদাতার সমাগম হয়। সুইস্ রাষ্ট্রসমূহে ভোটদাতার সংখ্যা আরো বেশী হইয়া থাকে। ব্রাইস্ বলেন, ভোটদানের সময়ে রাষ্ট্রিকগণের বুদ্ধি ঘটাইবার কথা, তাহা তিন প্রকারে বিকৃত হইতে পারে: (১) ভয় দ্বারা,—ভয় দেখাইয়া ভোটদাতার নিকট হইতে ভোট আদায় করিলে তাহা হয়; (২) উৎকোচ দ্বারা; (৩) প্রতারণা দ্বারা,—ভোটসমূহ ঠিক ভাবে গ্রহণ বা গণনা করা না হইতে পারে। কিন্তু সুইট্জারল্যাণ্ডে এই তিন প্রকার বিকৃতিই বিরল। সুইট্জারল্যাণ্ডে বড় জমিদারের সংখ্যা কম হওয়ায় জমিদারে ও কৃষকে বিরোধের কথা উঠিতে পারে না। নিয়োগকারিগণ মজুরদের উপর চাপ দেন না। পুরোহিতেরাও যথেচ্ছভাবে নিজ যজমানদের চালাইতে সমর্থ নহেন। উৎকোচ সম্বন্ধে প্রধান বাধা এই যে, অল্প লোকেই উহা দিতে সমর্থ; যাহারা সমর্থ তাহারাও উহা দিবার কোন সার্থকতা দেখিতে পায় না; আর সুইস্ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রসমূহ ছোট ও পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া জানে বলিয়া উৎকোচের কথা সহজে জানাজানি হইয়া যায় ও তজ্জন্য শাস্তির সম্ভাবনা থাকে। ভোট গ্রহণ বা গণনায় কখনো অসত্যের আশ্রয় লওয়া হয় না, একথা বলা না গেলেও, তাহার দৃষ্টান্ত কম। সুইট্জারল্যাণ্ডে ভোট দানের খরচাও কম। ভোট দানের স্থান, ভোট বাক্স, কেরাণী ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর-ভাড়া, এজেণ্ট রাখা অথবা বিজ্ঞাপনের খরচা ইত্যাদি বাবদ্ প্রায় সমুদায় খরচা সরকার বহন করিয়া থাকেন, নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে বহন করিতে হয় না। সুইট্জারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ দেওয়ায় রাজনীতিবিদ্গণের ব্যক্তিগত বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রীদিগের স্বপক্ষে ভোট দিলে সাধারণত কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তিগত সুবিধা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কাহাকেও ভোটের জন্য দাঁড়াইতে হয় না, আবার দলস্থ লোকদিগকে উপাধি বা সম্মান বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাও করা হয় না।

নির্ব্বাচন, যৌথ ব্যবস্থাপক সভা, ও যৌথরাষ্ট্র সমিতিতে দলের প্রভাব নির্ণয়।

নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের কাজ আরম্ভ হয়। সুইস্ দলসমূহ নিজ নিজ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া দাঁড় করায়। সুইট্জারল্যাণ্ডে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু এরূপভাবে সাধারণত কেহ দাঁড়ায় না। রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সমিতি এক উপযুক্ত ব্যক্তির নাম ঠিক করিয়া দলের সভায় পেশ করে। দলের সভায় শুধু দলস্থ ব্যক্তিগণই উপস্থিত থাকিতে পারেন। এই সভায় অন্য নামও প্রস্তাবিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণত সমিতি কর্তৃক প্রেরিত নামই গৃহীত হয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে এইরূপ নির্ব্বাচন সহজসাধ্য ব্যাপার। কারণ, এখানে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বা কর্ম্মচারী বা বিচারক পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের কেহ নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইলে স্থানীয় সমিতি অথবা জনগণ গুরুতর কারণ ব্যতীত তাঁহাকে ত্যাগ করে না। স্থানীয় নির্ব্বাচনের নিমিত্ত স্থানীয় বাসিন্দাকে মনোনীত করা হয়; প্রতিনিধি-সভায় এক রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তির অন্য রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা কম; আর রাষ্ট্র সভায় কোন রাষ্ট্রিক মাত্র সেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। (ব্রাইস্) ব্রাইস্ আরো বলেন যে, সুইট্জারল্যাণ্ডে স্ব স্ব স্থান-প্রীতি প্রবল

হইলেও, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রবল নহে। প্রতি দলই ভাল ও যোগ্য লোকদের নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে সুইস্ ভোটদাতার স্বাধীনতা মার্কিণ বা ফরাসী ভোটদাতার চেয়ে বেশী। গুণী ব্যক্তিরা নিজ দলের বাহিরের লোকদের নিকট হইতেও ভোট পাইয়া থাকেন। কখনো কখনো প্রধান প্রধান দলের নেতারা একত্র মিলিত হইয়া যোগ্য লোকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন,—ইঁহারা প্রতি দল হইতে যথা পরিমাণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে চেষ্টা করেন। সাধারণত প্রতি দলে ভোট দাতার সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন হইলেও, এমন কোন কোন লোককেও নির্ব্বাচিত করা হয় যাঁহাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

শুধু নির্ব্বাচনের ব্যাপারে নয়, যৌথরাষ্ট্র সমিতি গঠন ও ব্যাবস্থাপক সভার নিয়ন্ত্রণেও রাজনৈতিক দলের প্রভাব যে কম তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আনুপাতিক ভোট ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় একদিকে কোন একটি দলের পক্ষে নিজ দলের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশী ভোট পাওয়া সম্ভব নহে; অন্য দিকে ব্যবস্থাপক সভা হইতেই যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যদিগকে নির্ব্বাচন করা হয় বলিয়া সেখানেও রাজনৈতিক দলের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। যৌথরাষ্ট্র-সমিতির সভ্যেরা জনগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত হইলে, রাজনৈতিক দলের বিকাশ লাভের সহায়তা হইত। তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ-ব্যাপী দল-গঠন ও কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়িত। অধিকন্তু, মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন বলিয়া ও তাঁহাদের কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট বলিয়া, রাজনৈতিক দলসমূহ তাঁহাদের কার্য্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ব্যাবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন কালে স্থানীয় সমস্যা জাতীয় সমস্যার চেয়েও অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর একই দল প্রায় সকল রাষ্ট্রে অভিজন দল হওয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাব ঘটে। একে প্রতিনিধি-সভার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচন-জিলাসমূহ আকারে ছোট হওয়ায় পরিচিত প্রতিবেশীদের ভোট দেওয়া সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তদুপরি প্রতিনিধি-সভা ও যৌথরাষ্ট্র-সমিতি উভয়েই প্রায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্বরূপ হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে কেন দলের প্রভাব ব্যবস্থাপক সভা ও যৌথরাষ্ট্র-সমিতির উপর সেরূপ কার্য্যকরী হয় নাই।

প্রত্যুপস্থাপন কিরূপে রাজনৈতিক দল-গঠন ও বিকাশে বাধা দিয়াছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক দলের বিকাশ লাভ না করিবার অন্যতম কারণ প্রত্যুপস্থাপন। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যুপস্থাপনের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, ১৮৮৪ সন অবধি রাজনৈতিক দলসমূহ যৌথরাষ্ট্রে প্রত্যুপস্থাপনকে নিজেদের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু তারপর প্রত্যুপস্থাপন বেশ কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও, তাহা কোন দলের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে নাই। জনগণ কোন আইন বা প্রস্তাব বিচারের সময় দল অনুসারে ভোট দেয় না। তথাপি এরূপ বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্ম্মের দেশে তাহারা যে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি প্রবণতা দেখাইবে এবং রাজনৈতিক দলসমূহ এই সব প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যুপস্থাপন কি ভাবে দলের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়াছে তাহা লাওয়েল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তিগুলি

রূপ: (ক) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে জনগণের প্রধান কাজ হইল নির্ব্বাচন, তাহারা র্বাচিত প্রতিনিধিগণকে সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে র্বাচনের অর্থ এক বা অন্য ব্যক্তি কি দলের হাতে দেশের শাসন-ভার তুলিয়া দেওয়া হইবে, বয়ে বিবেচনা। অর্থাৎ দল ও দলের মতামত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কাঠামো-ইনের নির্দ্দেশ অনুসারে সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যেক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনগণ পৃথক্ ভাবে ভোট া থাকে। ফলে কোন দলের সম্পূর্ণ মতামত বা কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা হারা অনুভব করে না। যে ব্যক্তিই নির্ব্বাচিত হউন, প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা তাঁহার কোন বস্থা নাকচ্ করিয়া দিবার কোন বাধা নাই। বস্তুত, নির্ব্বাচনের কালে হোক্ বা ত্যুপস্থাপনের ব্যাপারে হোক্, কোন রাজনৈতিক দলের সমুদায় কার্য্যকলাপ বিচারের র জনগণের উপর দেওয়া হয় না। এইজন্যই এগুলির বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা নাই।) প্রত্যুপস্থাপন দ্বারা লোকের মনোযোগ নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়, াকের প্রতি হয় না। অথচ রাজনৈতিক দল-গঠনে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা কার্য্যকরী া। (গ) চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে অর্পিত থাকায় প্রতিনিধিগণের রাজনৈতিক য়িত্ব জ্ঞান হ্রাস পায়। কোন আইন জনগণের মনোমত না হইলে তাহারা তাহা নামঞ্জুর রে, কিন্তু যে দল ঐ আইন প্রণয়ন করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন আলোচনা উপস্থিত হয় না। সুতরাং এক দলের পরিবর্ত্তে অন্য দলের হাতে শাসনভার ত করিবার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এইরূপে দলের প্রাধান্য বলবৎ না থাকিলেও দলের ায়িত্ব বজায় থাকে। দল-পরিবর্ত্তন না করিয়া আইন নামঞ্জুরের ব্যবস্থা থাকার ফলে এক কে প্রায় সমুদায় রাজনৈতিক দলই বর্ত্তমান সময়ে অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অন্য দিকে কল দল হইতেই ব্যবস্থাপক সভায় অথবা যৌথরাষ্ট্র সমিতিতে লোক নিযুক্ত করা হইয়া াকে। প্রত্যুপস্থাপনের ফলে যেমন দলগত শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই, তেমনি আবার াজনৈতিক দলের সম্যক্ বিকাশের অভাবে প্রত্যুপস্থাপন কার্য্যকরী ব্যবস্থারূপে পরিণত হইতে ারিয়াছে।

অন্যান্য গণতন্ত্রের তুলনায় সুইট্জারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক দল কেন দুর্ব্বল, ব্রাইস্ তাহার নিম্ন-লিখিত কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:

সুইস্ রাষ্ট্রনৈতিক দল-সমূহের দুর্ব্বল হইবার কারণ।

(১) অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল এই দেশে কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার উদয় হয় াই। শাসন-ব্যবস্থা বহুপূর্ব্বেই পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আর ঔপনিবেশিক বা পররাষ্ট্র ম্বন্ধীয় কোন সমস্যা সুইস্‌দের চিত্তকে আন্দোলিত করে নাই।

(২) বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় সুইস্ জনগণ অসন্তুষ্ট নহে, সেই জন্য আর্থিক সাম্যের বা নীদের প্রতি বিদ্বেষের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় নাই।

(৩) বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ভাব এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা আর আগের মত প্রবল নহে। তা'ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকায়, ক্যাথলিকবহুল রাষ্ট্র নিজ মনোমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রটেষ্টান্টবহুল রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দেয় না।

(৪) শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ নাই বলিলেই চলে। ধন-বৈষম্য একেবারে নাই, তাহা নহে। সুইট্জারল্যাণ্ডে লক্ষপতির সংখ্যা কম এবং ধনী ব্যক্তিরা শুধু বিলাস-ব্যসনে কালযাপন করিয়া দরিদ্রদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করেন না।

(৫) বিশেষভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুইস্দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নেতৃত্বের অভাব লক্ষিত হয়। যোগ্যতার আদর করিতে সুইস্রা ভাল করিয়া জানে এবং যাঁহাদের বহুকাল ধরিয়া সৎ ও সাহসী বলিয়া জানে তাঁহাদের বিশ্বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা বা সর্ব্বদা তাঁহার অনুবর্ত্তন করা সুইস্দের ধাতে পোষায় না। এই জন্যই সুইট্জারল্যাণ্ডে অন্যান্য দেশের মত প্রসিদ্ধ দলপতির নাম বিরল।

(৬) সুইস্দের নিকট রাজনীতি গুরুতর কাজের বিষয়। সেই জন্য রাজনৈতিক দলাদলিকে ইহারা ইংরেজ বা মার্কিণের চোখে দেখিতে পারে না।

(৭) রাজনৈতিক দল জয়লাভ করিলেও উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণের চাকুরীর বা অন্য কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা নাই।

(৮) শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার জনগণের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং কোন দল ব্যবস্থাপক সভায় বা যৌথরাষ্ট্রসমিতিতে প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টাকেও অবান্তর বলিয়া মনে করে।

(৯) সুইসদের মনে দেশপ্রীতি এরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা দেশের বৃহৎ স্বার্থকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া থাকে। চারিদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান দেশ-প্রীতি বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে জনমতের স্থান

সুইস্ জনগণের মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ গুণের বিকাশ :

অধিকাংশ সুইস্ রাষ্ট্রিক টিউটন বংশ সমুদ্ভূত। এবং প্রটেষ্টাণ্টগণ সংখ্যায় অনেক অধিক, রোমান্ ক্যাথলিকগণ সংখ্যায় কম ; জার্ম্মাণভাষী জনগণের একপ্রকার স্বভাব, ফরাষীভাষীদের অন্যপ্রকার। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, সুইস্ চরিত্রে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য অনেক রহিয়াছে। সুতরাং এই প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুইস্ জনগণের মত দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে গোড়ায় এ কথা বলা প্রয়োজন যে, সুইস্ চরিত্রে বিভিন্নতা থাকিলেও জার্ম্মাণভাষী সুইস্ অপেক্ষা ফরাসীভাষী সুইস্ কম দেশভক্ত নহে। নিজেদের পরস্পর জাতিগত, ধর্ম্মগত ও ভাষাগত বহু বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইহারা সুইট্জারল্যাণ্ডকেই মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে ও সুইস্ ইতিহাসের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়। দেশের অতীত ঘটনা, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য অথবা অন্য যে কোন প্রকার প্রভাবে হোক্, সুইস্দের কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইস্ এগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :

(১) সকল লোকের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। ইহা যে শুধু ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহা নহে ; প্রত্যেক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। সুইস্ রাষ্ট্রিকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এরূপ প্রবল যে, সকলকে একই প্রকার ভাবে ভাবিত করা

না। সুইস্ রাষ্ট্রিক নিজের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ দৃঢ়, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেও সেইরূপ অনিচ্ছুক। ফলে অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির হইয়াও তাহার পক্ষে পরমত-সহিষ্ণু হওয়া, আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী না হওয়া ও অন্যের যুক্তি-তর্ক-শ্রবণেচ্ছু হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। (১) স্বাধীনতা-স্পৃহা;

(২) গ্রাম্য রক্ষণশীলতা সুইস্ রাষ্ট্রিকের অন্যতম বিশেষত্ব। সুইট্জারল্যাণ্ডে ফরাসী-ভাষীদের অধিকাংশ, আর জার্মাণভাষীদিগেরও অনেক ব্যক্তি চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করে। সব দেশেই চাষীরা একটু রক্ষণশীল হইয়া থাকে। সুইস্ চাষীর কোন কোন বিষয় বুঝিতে সময় লাগে, কিন্তু একবার বুঝিতে পারিলে, সে নিজ মতানুসারে কাজ করে। (২) রক্ষণশীলতা;

(৩) সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রাচীন গ্রাম্য রাষ্ট্রসমূহে জনগণের মনে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য যে রুচি জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলে, সুইস্দের স্বাধীনতা, বুদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যজ্ঞান বাড়িয়াছে। প্রত্যেক প্রশ্ন বা সমস্যার নিরপেক্ষ বিচার করা সুইস্ রাষ্ট্রিকের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এদেশে কোন ব্যক্তি-বিশেষের অতি-প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না। অন্য দিকে সুইস্রা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, সুতরাং বক্তৃতা-শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করা যায় না। এই দুই কারণে সুইস্ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতার আকস্মিক আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। (৩) স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য চিরাগত রুচি;

(৪) সর্বত্র সামাজিক বিষয়ে অবৈষম্য স্থাপিত হইয়াছে। ফলে চাষী বা মজুর ধনী অভিজাত শ্রেণীর প্রতি অহৈতুক বিদ্বেষ পোষণ করে না। (৪) সামাজিক সাম্য;

সুইস্ রাষ্ট্রিক সাধারণত বস্তুনিষ্ঠ হওয়ায় ফরাসী বা জার্মাণদের তুলনায় তাহার উপর ভাব-বিলাসিতার প্রভাব কম। কিন্তু তাই বলিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার উদারতার অভাব দেখা যায় না। যথা, সুইট্জারল্যাণ্ডে অরাষ্ট্রিকগণ সহজে রাষ্ট্রিকত্ব লাভ করে। ভাব ও চিন্তার জগতে না ক্ষেত্রে সুইস্দের দান উল্লেখযোগ্য হইলেও, রাষ্ট্রনীতি বা দর্শনের জগতে প্রথম শ্রেণীর লেখক সুইট্জারল্যাণ্ডে নাই। (ব্রাইস) অথচ জনগণের চরম কর্তৃত্ব আর কোন দেশে এরূপ পরিপূর্ণ আকার লাভ করে নাই। অভিনয়ন ও প্রত্যুপস্থাপন জনগণের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতীকরূপে গণনা করা যাইতে পারে। বস্তুত, আর কোন ইয়োরোপীয় দেশে রাষ্ট্রিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে এতটা মন দেয় না। পল্লী, রাষ্ট্র, এমন কি সমগ্র দেশের ক্ষুদ্রায়তন ইহার একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশের আকর্ষণের ন্যায় সুইট্জারল্যাণ্ডে অন্য প্রবল আকর্ষণ না থাকাও তাহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। ইহাতে জনগণের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিকতর অবকাশ ঘটিয়াছে। (৫) চরম কর্তৃত্ব।

উপরে সুইস্ চরিত্রের যে সকল গুণ ও বিশেষত্ব বর্ণনা করিলাম, তাহা দ্বারা সুইস্ জনগণের রাজনৈতিক মতামত যে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণত, সুইস্গণ কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী অর্থাৎ তাহারা যৌথরাষ্ট্রের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলিয়া দিতে চায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যখন কোন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহারা উহাতে পশ্চাৎপদ হয় না। তবে সুইট্জারল্যাণ্ডে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশী পরিমাণে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুইস জনমতের বিশেষত্ব।

বজায় রাখিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুইসগণ যে বিশেষ সাবধানতার সহিত অর্থব্যয় করিয়া থাকে, তাহার পরিচয় বহুক্ষেত্রে পাওয়া গিয়া থাকে। একে সুইস্ চাষীর আয় কম, তদুপরি তাহাকে যে কর দিতে হয় তাহা পরিমাণে কম হইলেও তাহার আয়ের একটি বড় অংশ। সুতরাং করবৃদ্ধির প্রস্তাব মাত্রেই যে জনমত প্রতিকূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ধর্ম্মের গোঁড়ামির ফলাফল জনমতের উপর একেবারে প্রভাব বিস্তার করে না, একথা বলা চলে না। কিন্তু সে প্রভাব এরূপ নহে যে, তাহাতে এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সর্ব্বদা অন্যায় ব্যবহার করে। পরস্পরের প্রতি বিরূপতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা সুইট্জারল্যাণ্ডে শান্তিতে বাস করিতেছে। ১৮৭৪ সনের কাঠামো-আইনে মৃত্যু-দণ্ড রহিত করিবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরে আইন এরূপভাবে সংশোধিত হইয়াছে যে, তাহাতে কোন রাষ্ট্রের বিচারালয় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ফাঁসির দৃষ্টান্ত বিরল। সুইস্ আইনের একটি বিশেষত্ব এই যে, বাধ্যতামূলক আইন প্রায়ই করা হয় না। অর্থাৎ সুইসগণ স্বভাবত পরমতসহিষ্ণু। সেই জন্য অতিজন দল উনজন দলকে দমন করিবার বা তাহার উপর জোর খাটাইবার প্রয়াস করে না। অথচ দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দমনের জন্য ইহারা শাসকদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিতেও প্রস্তুত থাকে। সুইসগণ মোটামুটিভাবে রাজনীতিবিদ্‌গণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা ও সুবিচার করে। এই হিসাবে জনমত দৃঢ়, সাবধান ও পক্ষপাতশূন্য। সুইস্ রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনের গুণে কোন নূতন আইনের সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে সেই আইনের সমর্থনকারী ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া আইন প্রণয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়। খবরের কাগজসমূহে বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌গণের যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কচিৎ স্থান পায়।

জনমত গঠনে সংবাদ-পত্রের প্রভাব।

এখানে সুইস্ সংবাদপত্র সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সুইস্ খবরের কাগজের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুইস্ কাগজগুলি সাধারণত সুপরিচালিত ও সুলিখিত হইয়া থাকে। সারগর্ভ লেখা তাহাতে স্থান পায় এবং ব্যক্তিগত গালাগালি বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রায়ই দেখা যায় না। জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় পরিচালিত এখানকার কয়েকটি পত্রিকা ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে পরিগণিত। এগুলি জনসাধারণের চিন্তার ধারাকে যথোচিতভাবে পরিচালিত হইতে সাহায্য করে। সকল শ্রেণীর সুইস্ নরনারী পড়িতে পারে এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে ইয়োরোপের আর কোন দেশে এত বেশী পত্রিকা নাই। কোন পত্রিকাই একেবারে পক্ষপাতদুষ্ট নয় একথা বলা চলে না বটে, কিন্তু রাজনীতিবিদের স্বার্থসাধনের জন্য বা তাঁহার তাঁবে কোন পত্রিকা পরিচালিত হয় না। আর, সম্ভবত অন্য দেশেই পত্রিকার প্রভাব এরূপ অধিক। (ব্রাইস্)

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতে সুইট্জারল্যাণ্ডে জনমতের কতটা প্রাধান্য তাহা বুঝা যাইবে। অভিনয়ন ও প্রত্যুপস্থাপনকে সর্ব্বদা জনমতের প্রকাশকরূপে বিবেচনা করা সমীচীন হইবে না; কারণ সুইস্ রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রবল না হইলেও শুধু

হে এবং সেই প্রস্তাবের দ্বারা প্রত্যুপস্থাপন ও অভিনয়নের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অন্যদিকে প্রত্যুপস্থাপন যে জনমতের দিকে ইঙ্গিত করে তাহা স্বীকার করা প্রয়োজন। ত্যুপস্থাপনের ফলাফল দ্বারা রাজনৈতিক নেতাগণ কখনো কখনো নিজেদের কর্ম্মপ্রণালী স্থির করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা সুইট্জারল্যাণ্ডের সকল রাষ্ট্রে এক প্রকার নহে। বিশেষত, এ বিষয়ে ফরাসীভাষী রাষ্ট্রগুলির সহিত জার্ম্মাণভাষী রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের কয়েকটি সাধারণ বিষয় মাত্র বর্ণিত হইতেছে।

জিলা ও পল্লী-শাসন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বিভাগ কমিউন বা পল্লী। এই পল্লী ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী বিভাগকে জিলা বলা হয়। কতকগুলি পল্লী একত্র যূথবদ্ধ হইলে জিলার সৃষ্টি হয়। জিলার সৃষ্টি প্রধানত শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য এবং সুইট্জারল্যাণ্ডের কোন কোন রাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠান দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের প্রতিনিধিরূপে প্রত্যেক জিলায় একজন করিয়া নগর-শাসক থাকেন। ইনি জিলার প্রধান কর্ম্মচারী এবং সাধারণত জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কখনো কখনো ইঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি পরামর্শ-সমিতি নিযুক্ত হয়। শাসক তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের সহযোগে রাষ্ট্রীয় শাসন-বিভাগের আদেশসমূহ প্রতিপালন করেন, আইন প্রয়োগ করেন এবং পল্লী ও জিলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

সুইট্জারল্যাণ্ডে সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পল্লী হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে,—ব্রাইস্ এইরূপ বলেন। কোন কোন স্থলে পল্লীতে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতেও পুরাতন। পল্লী বলিতে শহরের ও গ্রামের পল্লী বুঝিতে হইবে। পল্লীর মর্য্যাদা কম নহে। সুইট্জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রিকরূপে পরিণত হইতে হইলে, কোন ব্যক্তিকে আগে পল্লীর সভ্য হইতে হয়। পল্লীর অন্তর্গত হইলে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রে অথবা যৌথরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিকত্ব লাভ করা কষ্টকর হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে তিন হাজারের উপর পল্লী রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে আকৃতিগত ও জনসংখ্যাগত গভীর পার্থক্য বর্ত্তমান। প্রত্যেক পল্লীর ক্ষমতাও সমান নহে। তবে পল্লীসমূহ সাধারণত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের তাঁবে শিক্ষা, পুলিশ, দরিদ্রদের সাহায্য, জল প্রভৃতি স্থানীয় ব্যাপারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কোন কোন পল্লীর নিজ সম্পত্তি আছে, কোথাও গ্রাম্য পল্লীসমূহ তদন্তর্গত বন ও গোচারণ-ভূমির তদারক করে।

জার্ম্মাণ-ভাষী রাষ্ট্রসমূহের গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহুরে পল্লীতে পল্লীর শাসন-ভার সাক্ষাৎভাবে জনগণের হাতে ন্যস্ত আছে। জনগণ কোন স্থানে মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব আনয়ন করে ও তৎসম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করে। যে সকল প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হয়, তদনুসারে কাজ হয়। পল্লীর বিভিন্ন কর্ম্মচারিগণও এইরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নিত্যকার কাজ চালাইবার নিমিত্ত একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির নেতা উহার অন্যান্য সভ্য অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবিশিষ্ট। তাঁহাকে মেয়র বা তদ্রূপ কোন নামে অভিহিত করা হয়।

যেখানে লোকসংখ্যা বেশী, বিশেষত ফরাসী রাষ্ট্রসমূহের পল্লীতে, একটি জনগণের প্রতিনিধি সভা ও পল্লী-সমিতি নামক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মোতায়েন আছে। এই সকল পল্লীতে প্রথমটি আইন-প্রণয়ন ও দ্বিতীয়টি শাসন-কার্য্য চালাইয়া থাকে। পল্লী-সমিতি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ইহার সভ্য সংখ্যা ৪ বা ততোঽধিক। ইহার একজন সভাপতি থাকেন, তাঁহাকে মেয়র বলে। এই সমিতি ছোট ছোট কর্ম্মচারীদের নিযুক্ত করিয়া থাকে।

বড় বড় শহরে পল্লী মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত হয়। এগুলির শাসন-ব্যবস্থা চালাইবার জন্য তিন বৎসরের জন্য এক একটি সমিতি নিযুক্ত হইয়া থাকে। শহরের ব্যাপার সম্পর্কে এইরূপ সমিতির সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে। এই সমিতির সভাপতি বা মেয়রের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। কোন কোন স্থানে ইঁহার হাতে কিছু কিছু শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। গ্রাম্য সমিতির ন্যায় শহরগুলিও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বিবিধ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়া থাকে। কোন কোন শহর জল, গ্যাস অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার লইয়াছে। কোথাও বা ট্রাম চালান হইতেছে। শহরগুলির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ বা নানা বিষয় লইয়া ক্ষতিকর পরীক্ষার অভিযোগ থাকিলেও, সাধারণত শহর-সমিতি দ্বারা কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হয়, করভার গুরুতর নয় এবং কর্ম্মচারীদের বেতনের হার নীচু। তথাপি বর্ত্তমান সময়ে, সহরের ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। শহরে নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক দল যাহাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে সাধারণত তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিভিন্ন পল্লীতে ইস্কুল-শিক্ষকগণও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অল্পকালের জন্য নির্ব্বাচন করা দস্তুর।

সুইস্ গণতন্ত্রের মূল্য-নির্ণয়

সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছোট দেশ হইলেও ইহার কাঠামোর কথা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইল। এই বর্ণনা হইতেও সুইস্ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইবে। কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সাদৃশ্য থাকিলেও, অন্য কতকগুলি বিষয়ে ইহার ব্যক্তিত্ব ও বৈষম্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আর কোন দেশে জনগণ এরূপ চূড়ান্তভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, এমন কি যৌথরাষ্ট্র ও বিভিন্নরাষ্ট্রে শেষ কথা বলিবার ক্ষমতা জনগণের হাতেই রহিয়াছে। কিন্তু সে দেশে রাজনৈতিক দলের প্রভাব এরূপ অধিক যে, জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গরূপে সর্ব্ববিষয়ে দলের অঙ্গুলি চালনে মাত্র চালিত হয়, তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করা সম্ভবপর নহে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক কোন দলের প্রভাব যে অনেক কম, ইহা বহুবার দেখানো হইয়াছে। ফলে সুইস্ জনগণ যে ক্ষমতার অধিকারী, তাহা প্রকৃত ক্ষমতা এবং এতটা রাজনৈতিক প্রভাব আর কোন দেশের লোকেরা বিস্তার করিতে পারে না।

সুইস্ গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিচালক সুইস্ রাষ্ট্রিকগণ।

সুইট্জারল্যাণ্ডে সকলের আগে অভিনয়ন-প্রত্যুপস্থাপন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রেও এই দুই প্রতিষ্ঠান বহুল পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু এ দুটি, বিশেষত প্রত্যুপস্থাপন, সুইটজারল্যাণ্ডে যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে, অন্য কোথাও সেরূপ করে নাই। প্রত্যুপস্থাপনের ও অভিনয়নের দোষগুণের কথা যথাস্থানে বিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে এই কথাই প্রতীত হইবে যে, প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভাকে তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জনগণ এই দুই অস্ত্র নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। সুইস্গণ যে ইহাদের বহুল ব্যবহার বা অপব্যবহার করে নাই, তাহা তাহাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বহুল প্রয়োগ দ্বারাই কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব বা গভীরতার প্রমাণ হয় না, যথাসময়ে উপযুক্তভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যথেষ্ট। সুতরাং সুইস্গণ যৌথরাষ্ট্রে অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রত্যুপস্থাপন বা অভিনয়ন অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, বুঝা যায় যে, আইন প্রণয়নের অথবা ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে নাকচ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি জনগণের আছে। জনগণের হাতে এরূপ প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না হওয়ার একটি কারণ সুইট্জারলণ্ডের ক্ষুদ্র আয়তন ও লোকসংখ্যার অল্পতা হইতে পারে, কিন্তু সুইস্ চরিত্রের কতকগুলি বিশেষত্বও যে তাহাতে সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সুইস্ অভিনয়ন ও প্রত্যুপস্থাপনের কৃতকার্য্যতা।

সুইস্ চরিত্রের কোন কোন বিশেষত্ব ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এ বিষয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রচার প্রভাবের কথা প্রণিধান যোগ্য। সুইট্জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ও যৌথরাষ্ট্রীয় কাঠামো-আইনগুলি নানা দিকে অসম্পূর্ণ ছিল, সেগুলি প্রচার সাহায্যে বিকশিত হইয়া প্রতিদিনকার কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডে জনগণের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হইলেও, শক্তিত্রয়ের মধ্যে অর্থাৎ আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আইন বা ব্যবস্থাপক সভার স্থান সকলের উপরে। রাষ্ট্রের কার্য্য চালনা সম্পর্কে এখানে শক্তিত্রয়ের বিভাগ বাঁধাধরা ভাবে মানিয়া চলা হয় না। বস্তুত, সুইস্রা প্রায় সর্ব্বত্রই শুধু তত্ত্বদ্বারা নিজেদের কর্ম্মপ্রণালী স্থির করে না, তাহাদের দৃষ্টি কার্য্যকারিতার দিকে থাকে। সেইজন্য, রাজনৈতিক কোন তত্ত্বকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেয়ে কিসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ সম্পন্ন হয় সেদিকে তাহারা যত্নবান্ হয়। সুতরাং একদিকে বিচারালয়সমূহকে দুর্ব্বল রাখিতে যেমন ইহাদের বাধে না, অন্য দিকে ব্যবস্থাপক সভায় বা যৌথরাষ্ট্র সমিতিতে একই ব্যক্তিকে পুনঃপুনঃ নির্ব্বাচিত করিতেও ইহারা পরাঙ্মুখ হয় না।

ব্রাইস্ সুইস্ গণতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আধুনিক বা প্রাচীন গণতন্ত্রসমূহে এই গুণাবলী এরূপ প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

সুইস্ গণতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব।

(১) স্থায়িত্ব। এ বিষয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ যৌথরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চাদ্পদ হইলেও অন্য দেশের তুলনায় নহে।

(২) লক্ষ্যের স্থিরতা ও সামঞ্জস্য।

(৩) প্রণীত আইনের উৎকর্ষ। যৌথরাষ্ট্রের মত বিভিন্ন রাষ্ট্র উন্নতি লাভ না করিলেও

সাধারণত প্রয়োজনীয় ও ভাল আইনই প্রণীত হইয়াছে। আর অন্ত কোথাও আইনে জনমত এরূপভাবে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

(৪) মিতব্যয়ী ও কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা। শাসন-ব্যাপারে সুইস্ চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব ব্যয়কুণ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকুশলতার দিকেও নজর থাকে। যে অর্থব্যয় হয় তাহার পরিবর্ত্তে কাজ আদায় করিয়া লওয়া সুইস্‌দের দস্তুর।

(৫) কোন কোন রাষ্ট্র ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্র সকল প্রকার শিক্ষার জন্ম যথোচিত ব্যবস্থা।

(৬) সরকারী কাজে মনোযোগ। সুইস্ রাস্তাগুলি সুন্দর ও সুরক্ষিত। সুশৃঙ্খলা দেখা যায়। আর শস্তায় সুবিচারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৭) স্বায়ত্তশাসনের দোষহীনতা ও কার্য্যকারিতা।

(৮) দেশরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা।

(৯) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সম্মান। এখানে সাধারণত রাজনৈতিক কর্ম্মচারী-গণ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উহাদিগের কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইতে কম দেখা যায়।

উপরোক্ত গুণসমূহ প্রধানত সুইস্ শাসন-ব্যবস্থার ফল-প্রসূত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আরো কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি উহার ফল না হইলেও অনুকূল অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে। যথা, জাতীয় ঐক্যবোধ, সমাজ, আইনের চোখে প্রত্যেক সুইস্ সমান এই জ্ঞান, রাজনৈতিক দলাদলি ও বিদ্বেষের অভাব, রাজনীতিবিদ্ নামে ভিন্ন কোন শ্রেণীর অনুপস্থিতি, চক্র, চক্রপতি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

সুইস্ গণতন্ত্রের দোষ-গুণের খতিয়ান্।

সুইস্ গণতন্ত্র একেবারে নির্দ্দোষ, একথা কেহ বলে না। কারো কারো মতে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সাম্যবাদের তত্ত্বটা কার্য্যক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহার ফলে কোন কোন রাষ্ট্রে ধনীদিগের উপর এরূপ গুরুতর করভার চাপান হইয়াছে যে, দেশে বড় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক দলাদলি ও বিদ্বেষ অন্য গণতান্ত্রিক দেশের মত উগ্রভাবে বর্ত্তমান না থাকিলেও ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। স্বার্থপরতা, চাকুরীর জন্ম অতিরিক্ত আগ্রহ, চুক্তি সম্পর্কে নানা প্রকার অন্যায় ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সভা ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সমূহবাদের প্রসারের ফলে কোন কোন লোকের মনে শান্তিপ্রিয়তা বিনাশ পাইতেছে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দোষগুণ একত্র তুলনা করিয়া, এই কথাই বলিতে হয় যে, দোষের পরিমাণ যত অধিক হইতে পারিত এখানে তাহা তত অধিক নয়। একেবারে দোষমুক্ত কোন গণতন্ত্রই নহে। সুইস্ গণতন্ত্র যে এ বিষয়ে বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুইস্ গণতন্ত্র যে নানা প্রকারে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এমন কতকগুলি নৈসর্গিক সুবিধা আছে যাহা অন্য কোন গণতন্ত্রের নাই। তন্মধ্যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে লোক সংখ্যার অল্পতা ও চারিদিকে পরাক্রান্ত জাতিসমূহের মধ্যে উহার অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড উভয়ই যৌথরাষ্ট্র বটে, কিন্তু

একের সমস্যাসমূহের সহিত অন্যের সমস্যার তুলনা হইতে পারে না। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডেও ঔপনিবেশিকদের আগমন-সমস্যা দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা আমেরিকার তুলনায় কিছু নয়।

তথাপি এই ক্ষুদ্র দেশ কাঠামো-আইন লইয়া তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক্‌ হইতে যে সকল পরীক্ষা পরিচালনা করিয়াছে সেইগুলি এইজন্য শ্রদ্ধার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিবার দরকার আছে যে, শাসন-ব্যাপারের কোন কোন দিকে সুইট্‌স্থারল্যাণ্ড অপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিয়াছে। সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অন্য কোন গণতন্ত্রের বেলায় কাজে লাগিবে কি না সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুইস্‌ দানের পরিমাণ সামান্য নহে। সুইস্‌ প্রতিষ্ঠান সমূহ নীরবে আপন কার্য্য সমাধা করিয়া যায়। সুইস্‌ রাজনৈতিক গগনে মন্ত্রিগণের উত্থান-পতন, জাতীয় মনোনয়ন বৈঠক প্রভৃতির ন্যায় চমকপ্রদ ঘটনাবলী দেখা যায় না ও সেজন্য উহা সাধারণত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য সাধনে, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে, নিয়ম ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার এবং প্রত্যেক মানুষকে তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবার সুবিধা দান বিষয়ে এই অত্যন্ত সাদাসিধা গণতন্ত্রের স্থান কাহারো চেয়ে নীচে নয়।

সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ।

সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনো সম্পূর্ণরূপে কিছু নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাঠামো-আইনের উপর প্রথার প্রভাব খুব বেশী। এই প্রথা ধীরে ধীরে সমগ্র সুইস্‌ শাসন-ব্যবস্থাকে কিরূপ রূপান্তরিত করিবে তাহা আন্দাজ করা শক্ত। অন্যান্য দেশের মত সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধেও এই নালিশ শোনা যায় যে, আগেকার মত উৎকৃষ্ট লোকদের সমাবেশ হইতে দেখা যায় না। এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এরূপ নহে যে, তাহার দিকে সব শ্রেষ্ঠ লোকেরা আকৃষ্ট হইয়া যায়, যদিও অন্যান্য দেশের মত এখানেও বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আকর্ষণ ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু সুইস্‌গণ যথাশক্তি নিজেদের রাজনৈতিক কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রকার উৎকর্ষের অভাব না ঘটাই উচিত ছিল। ইহার একমাত্র কারণ সর্ব্বত্রই এই যে, বর্ত্তমান সময়ে জাতির নিকট কোন দুরূহ সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত না থাকিলে, রাজনৈতিক গগনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উদ্ভব সম্ভব হয় না। সুতরাং শুধু এই দিক্‌ হইতে সুইট্‌স্থারল্যাণ্ডের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। সুইস্‌ জনগণের অটুট স্বাধীনতার স্পৃহা, কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা, সুশাসনের ব্যবস্থা, জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অবিরত প্রচেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও ধর্ম্ম সত্ত্বেও তীব্র ঐক্য ও জাতীয়ত্ব বোধের জন্য সুইট্‌স্থারল্যাণ্ড এখনো বহুকাল অন্যতম আদর্শ গণতন্ত্ররূপে লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

সূচীপত্র

ফ্রান্স

পূর্ব্ব ইতিহাস

ফ্রান্সের রাষ্ট্র-নেতা

রাষ্ট্র-সভা

প্রতিনিধি-সভা

মন্ত্রি-সমিতি

ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল

বিচার-ব্যবস্থা

শাসন-ব্যবস্থা

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

ফ্রান্সে জনমতের শক্তি

ফরাসী নাগরিক, ব্যবস্থাপক, শাসক ও বিচারক

ফ্রান্সে গণতন্ত্রের সার্থকতা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

যৌথরাষ্ট্রের পত্তন

কাঠামোর ক্রমবর্দ্ধন

রাষ্ট্র-নেতা

মন্ত্রি-সমিতি

রাষ্ট্র-সভা

প্রতিনিধি-সভা

ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন সমিতি

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের প্রাধান্য

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা

জনগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন

বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়

উন-রাষ্ট্র ও অধিকৃত দেশসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতার সার্থকতা

সুইট্জারল্যাণ্ড

পূর্ব্ব ইতিহাস

সুইট্জারল্যাণ্ডের বর্ত্তমান কাঠামো-আইন

কাঠামো-আইনের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন

যৌথরাষ্ট্র-সমিতি

সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারিগণ

রাষ্ট্র সভা

প্রতিনিধি-সভা

সুইস্ ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাবলী

সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ

সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের বিচারালয় সমূহ

আইন-প্রণয়নে সুইস্ জনগণের চরম কর্ত্তৃত্ব

রাজনৈতিক দল সমূহ

নির্ঘণ্ট

ফ্রান্স

যুক্তরাষ্ট্র

সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড

নামের তালিকা

পরিভাষা

অতিজন = মেজরিটি

অত্যভিযোগ = ইমপিচ্‌মেণ্ট

অনুরক্ত লোকদের চাকুরী দেওয়ার প্রথা = স্পয়েল্‌স সিষ্টেম

অভিনয়ন = ইনিশিয়েটিভ্

অর্থ-সংস্থান সমিতি = ওয়েজ অ্যাণ্ড মিন্‌স্ কমিটি

অর্থ-সচিব = ট্রেজারার (যুক্তরাষ্ট্র)

আইন-সভা বা ব্যবস্থাপক সভা = লেজিস্‌লেচার বা লেজিস্‌লেটিব্ কাউন্সিল

উনজন = মাইনরিটি

উনরাষ্ট্র = টেরিটরি

কাঠামো-আইন = কনষ্টিটিউশন

কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তি = সেণ্ট্রাল এক্‌সিকিউটিব্

গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র = ডিমোক্রাসি

গণতন্ত্রবাদী = ডিমোক্রাট্

চক্র = রিং

চক্রপতি = বস্

জন-সভা = হাউস্ অব্ কমন্‌স্

জাতিসঙ্ঘ = লীগ অব্ নেশনস্

নাকচ্ = ভিটো

নির্ব্বাচন = ইলেক্‌শন

ন্যূনসংখ্যা = কোরাম

পল্লী = কমিউন

প্রতিনিধি = ডেপুটি

প্রতিনিধি-সভা = চেম্বার অব্ ডেপুটিস বা হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিবস্

প্রত্যুপস্থাপন = রেফারেণ্ডাম
প্রথা = ইউসেজ, কাষ্টম
বিধান = ষ্ট্যাটিউট্
বিবরণী-দাতা = রিপোর্টার
ভাবগ্রহণ = কনষ্ট্রাক্‌শন
মধ্যবিত্ত = বুর্জোয়া
মনোময়ন = নমিনেশন
মনোনয়ন বৈঠক = নমিনেটিং কন্‌ভেনশন
মন্ত্রি-সমিতি = ক্যাবিনেট
মহাদ্রোহ = ট্রিজন
যৌথরাষ্ট্র = ফেডারেল ষ্টেট
রাজতন্ত্র = মনার্কি
রাষ্ট্র-নেতা = প্রেসিডেণ্ট
রাষ্ট্র-সচিব্ = সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট
রাষ্ট্র-সভা = { সেকেণ্ড চেম্বার বা সেনেট }
রাষ্ট্র-সভাসদ্ = সেনেটার
রাষ্ট্রসভার সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভার সভাপতি = স্পীকার
রাষ্ট্রিক = সিটিজন
রাষ্ট্রিক-করণ = নেচারালিজেশন্
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ = ষ্টেট সোশ্যালিজম্
শাসক = গবর্ণর
সংশোধনী = অ্যামেণ্ডমেন্ট
সমঝোতা = য়্যালায়েন্স
সমাজতন্ত্রবাদ = সোশ্যালিজম্
সমূহতন্ত্রবাদ = কমিউনিজম্
সম্মেলক সভ্য = হুইপ্
সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব = সব্‌রেণটি
সশরীরে হাজির করাইবার পরোয়ানা = রিট্ অব্ হেবিয়াস্ কর্পাস্
স্বত্বসংরক্ষণ চিহ্ন = ট্রেড্‌মার্ক
স্বরাজ = রিপাব্‌লিক
স্বাধীনতার পরোয়ানা = বিল্ল অব্ রাইট্‌স্
স্বারাজ্যবাদী = রিপাব্‌লিকান

হৃষীকেশ সিরিজের কতিপয় গ্রন্থ

১।	কীর্ত্তিলতা	স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	মূল্য ১॥০
২।	রূপক ও রহস্য	„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার	„ ২৲
৩।	বর্ত্তমান যুগে চীন-সাম্রাজ্য	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার	„ ৩৲
৪।	ধনদৌলতের রূপান্তর	„ „ „ „	„ ১॥০
৫।	চীনা সভ্যতার অ আ ক খ	„ „ „ „	„ ১৲
৬।	বিচিত্র প্রসঙ্গ (২য় পর্য্যায়)	„ „ বিপিনবিহারী গুপ্ত	„ ২॥০
৭।	পুরাতন প্রসঙ্গ	„ „ „ „	„ ২৲
৮।	ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস	„ „ হেমন্তকুমার সরকার	„ ২৲
৯।	সেক শুভোদয়া	„ „ সুকুমার সেন	„ ২৲
১০।	পেশবাদিগের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি	„ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন	„ ১৲
১১।	দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক	„ „ নরেন্দ্রনাথ লাহা	„ ১৸০

অন্যান্য পুস্তকাবলী

১।	প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি	ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা	মূল্য ১৲
২।	ভারতে শিক্ষাবিস্তার	„ „ „	„ ১৲
৩।	প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ	„ „ „	„ ১॥০

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

(প্রতিষ্ঠিত আশ্বিন ১৩৩৪, অক্টোবর ১৯২৮)

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ"—শুক্রনীতি ৩।১৭৬

উদ্দেশ্য :—বাঙ্গালা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা, (খ) দেশ ও দুনিয়ার সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা।

সভাপতি :—ডক্টর স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গবেষণাধ্যক্ষ :—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম এ

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

সহকারী সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম এ, বি এল

মুখপত্র—**আর্থিক উন্নতি**

পত্রিকা-সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

পরিচালক—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ :—১। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ উকীল, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস, ৩। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। লেপ্টেন্যান্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, ৬। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৭-১০। সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

আর্থিক উন্নতি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-সম্পাদিত অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। প্রতি সংখ্যায় পৃষ্ঠার সংখ্যা প্রবাসীর আকারের ৮০। ঠিকানা :—৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ মাস হইতে অষ্টম বর্ষ চলিতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও নানা আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ছেলের বাড়তির পরিচয় এই পত্রিকায় পাইবেন। আপনি যদি আপনার ছেলেকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে নিযুক্ত করিতে চান ত এই পত্রিকা আপনাকে সাহায্য করিবে। দুনিয়ার সমুদয় দেশের খবর ইহাতে স্থান পায়। যাঁরা অর্থশাস্ত্রে এম এ, বি এ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁরা ইহা প্রতি মাসে পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

গত বৈশাখ হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। এই পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর করিবার অবিরত চেষ্টা হইতেছে। আজই গ্রাহক হউন।

দ্রষ্টব্য—পরিষদের সভ্যগণের দেয় চাঁদার হার বার্ষিক ৬৲ টাকা। সভ্যগণ বিনামূল্যে আর্থিক উন্নতি পাইবেন।

ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ইত্যাদি গম্ভীর সাহিত্যের অভাব সকলেই অনুভব করেন। এ বিষয়ে আমরা ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, মার্কিন প্রভৃতি জাতির অনেক পশ্চাতে ত রহিয়াছিই, পরন্তু দু'একটি বিষয়ে ভারতীয় কোন কোন প্রদেশ আমাদের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে। এই অবস্থায় বাঙ্গালীদের এ বিষয়ে অধিকতর সচেষ্ট হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে লোকের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ও নানা বিষয়ে গম্ভীর পুস্তক রচিত হইতেছে। এই প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ১২ বৎসর পূর্ব্বে 'হৃষীকেশ সিরিজ' বাহির করিয়া আমি এ যাবৎ বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ ক্লাসগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেই এই অভিযোগ শোনা যায় যে, বঙ্গভাষায় রচিত উপযোগী গ্রন্থের অভাবে এ কাজ সম্ভবপর নহে। যথোচিত উৎসাহ পাইলে ও অর্থব্যয় করিলে যে পুস্তকের অভাব থাকিবে, তাহা আমার মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্যোগী হউন, ইহা আমি প্রার্থনা করি।

গত 'রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সে' যোগ দিবার প্রাক্কালে, আমাকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হয়। সেই সময়ে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করি। বর্ত্তমানে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই সময়ে জগতের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রকৃত স্বরূপ ও ক্রমবিকাশের কথা আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। নিজ দেশ সম্বন্ধে কি চাই, তাহা ভাল করিয়া আমাদের জানা দরকার। বিভিন্ন দেশের কাঠামোর স্বরূপ হইতে এ বিষয়ে আমাদের কিছু ধারণা জন্মিতে পারে।

এক্ষণে 'দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।* ইহাতে ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড—এই তিনটি মাত্র দেশের কাঠামো সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি দেশই রিপাব্‌লিক বা স্বারাজ্য—তন্মধ্যে দুইটি ফেডারেল বা যৌথরাষ্ট্র। অথচ এই তিন দেশের কাঠামোই কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময়! পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, গণতন্ত্রের কোন এক ও অখণ্ড রূপ নাই। অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রভেদে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও তাহার ক্রিয়া-কলাপ একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে ও প্রত্যেকের বিবর্ত্তন ধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় আছে। তাহা হইতেও এই কথা উপলব্ধি করা যাইবে।

---

* ইহা ধারাবাহিকভাবে মৎসম্পাদিত 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারে' (আষাঢ়, ১৩৩৮—বৈশাখ, ১৩৪০) প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়নে বহু গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। যাঁহাদের লেখা হইতে এইরূপ সাহায্য লইয়াছি, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা গেল :—ব্রাইস্, লাওয়েল, মানরো, ম্যারিয়ট্, লি-স্মীথ, গার্ণার, গেটেল, সিলি, সিজ্উইক, ব্লুণ্টশ্লি, লেকি, মিল। যতদূর সম্ভব আধুনিকতম সংবাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বর্ষ-পঞ্জী (ইয়ার-বুক)-র সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের সম্পাদকতায় প্রকাশিত সমাজ-বিজ্ঞান-কোষের যে ১০ ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থকারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান সময়ে, বাঙ্গালা দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনার জন্য তিন চারিটি প্রতিষ্ঠান মোতায়েন রহিয়াছে। তন্মধ্যে ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্ মাত্র বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চধরণের গবেষণা কার্য্য চালাইতেছে। এই পরিষদের নিযুক্ত কয়েকজন গবেষক ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা লইয়া অধ্যয়ন ও আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। উক্ত পরিষদের অন্যতম পরিচালকরূপে আমি কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সংস্পর্শে আসিয়া উপকৃত হইয়াছি। গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উৎসাহ দেন। পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে আমার পুস্তক-লেখায় সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রুফ্ দেখিয়া এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, বর্ত্তমান পুস্তক-রচনায় এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে—যে তিনটি কাঠামো এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটির ভিত্তি লিপিবদ্ধ কাঠামো-আইন; এই আইনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনটি দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থ লিখিতে কতকগুলি পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সেগুলি গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হইল। রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে রচিত এই পুস্তক আমি সুধীজনের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ইহা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আগষ্ট, ১৯৩৩
৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৭

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

প্রথম খণ্ড

(ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা
১৯৩৩

মূল্য ৩॥০ টাকা

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীনলিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।